banglabooks.in

শরদিন্দু অমনিবাস-৫

(অতিপ্রাকৃত ও হাসির গল্প)

banglabooks.in

শরদিন্দু অম্নিবাস

পঞ্চম খণ্ড

ছোট গল্প

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। কলিকাতা ৯

banglabooks.in

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী—গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও কিশোরদের জন্য লেখা কাহিনী—কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অম্নিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও কিশোরদের জন্য লেখা গল্পগুলি যথাক্রমে শরদিন্দু অম্নিবাস প্রথম—চতুর্থ খণ্ডে ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদয় অলৌকিক গল্প এবং হাস্য কৌতুকরসের ঊন-পঞ্চাশটি গল্প রচনাকাল অনুসারে সঙ্কলিত হল।

—প্রকাশক

banglabooks.in

সূচী

প্রেতপুরী	...	...	১
রক্ত-খদ্যোত	...	...	৬
টিকটিকির ডিম	...	...	১২
অন্ধকারে	...	...	১৬
মরণ-ভোমরা	...	...	২৪
অশরীরী	...	...	৩০
সবুজ চশমা	...	...	৩৭
বহুরূপী	...	...	৪২
প্রতিধ্বনি	...	...	৪৮
পঞ্চভূত	...	...	৫৭
আকাশবাণী	...	...	৬৫
ধীরেন ঘোষের বিবাহ		...	৬৯
দেহান্তর	...	...	৭২
ভূত-ভবিষ্যৎ	...	...	৮০
নিরুত্তর	...	...	৮৭
দেখা হবে	...	...	৯৪
গুহা	...	...	৯৯
শূন্য শুধু শূন্য নয়		...	১০৬
মধু-মালতী	...	...	১২৫
চিরঞ্জীব	...	...	১৩২
মায়া কুরঙ্গী	...	...	১৩৬
সতী	...	...	১৪৪
নীলকর	...	...	১৪৯
কালো মোরগ	...	...	১৫৯
নখদর্পণ	...	...	১৬৪
প্রত্নকেতকী	...	...	১৭০
ছোট কর্তা	...	...	১৮০
মালকোষ	...	...	১৯০
ফকির বাবা	...	...	১৯৩
পিছু পিছু চলে	...	...	১৯৫
কামিনী	...	...	১৯৯
কর্তার কীর্তি	...	...	২০৩
রূপকথা	...	...	২১০
মেথুশীলা	...	...	২১৯
মনে মনে	...	...	২২৩
নারীর মূল্য	...	...	২২৮
বহুবিঘ্নানি	...	...	২৩১
গ্রন্থকার	...	...	২৩৫
তিমিঙ্গিল	...	...	২৩৯

ভেন্‌ডেটা	...	...	২৪৪
জটিল ব্যাপার	...	...	২৫০
আদিম নৃত্য	...	...	২৫৫
প্রতিদ্বন্দ্বী	...	...	২৫৯
কেতুর পুচ্ছ	...	...	২৬২
বরলাভ	...	...	২৬৬
প্রেমের কথা	...	...	২৭০
ভালবাসা লিমিটেড		...	২৭২
সন্দেহজনক ব্যাপার		...	২৭৪
তন্দ্রাহরণ	...	...	২৭৭
দন্তরুচি	...	...	২৮০
প্রেমিক	...	...	২৮২
স্বর্গের বিচার	...	...	২৮৬
অযাত্রা	...	...	২৮৯
কুতুব-শীর্ষে	...	...	২৯১
টুথ-ব্রাশ	...	...	২৯৪
নাইট ক্লাব	...	...	২৯৬
যস্মিন্ দেশে	...	...	৩০০
গ্যাঁড়া	...	...	৩০৬
মাংস্যন্যায়	...	...	৩০৭
লম্পট	...	...	৩০৯
আরব সাগরের রসিকতা		...	৩১১
এপিঠ ওপিঠ	...	...	৩১৩
ঝি	...	...	৩১৫
অসমাপ্ত	...	...	৩১৮
শাপে বর	...	...	৩২২
ভাল বাসা	...	...	৩২৪
আধিদৈবিক	...	...	৩২৮
ভূতোর চন্দ্রবিন্দু	...	...	৩৩১
সেকালিনী	...	...	৩৩৫
মুখোস	...	...	৩৪০
পরীক্ষা	...	...	৩৪৩
নূতন মানুষ	...	...	৩৫০
ভক্তিভাজন	...	...	৩৫১
গ্রন্থি-রহস্য	...	...	৩৫৫
অলৌকিক	...	...	৩৫৮
সন্ন্যাস	...	...	৩৬১
আদায় কাঁচকলায়	...	...	৩৬৩
বনমানুষ	...	...	৩৬৬
শেষে বিসর্জন	...	...	৩৭০
কা তব কান্তা	...	...	৩৭২
গল্প পরিচয়	...	...	৩৭৬

banglabooks.in

প্রেত পুরী

সূর্যাস্তের পর শ্রাবণের বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিয়াছিল। আমরা কয়জনে ক্লাবের একটা ঘরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিলাম। আলোটা টেবিলের উপর নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছিল। এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় ভিজিতে ভিজিতে বরদা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মধ্যে একজন তাহাকে সম্ভাষণ করিল, আয়াহি বরদাবাবু!

বরদা ছাতাটা মুড়িয়া এককোণে দাঁড় করাইয়া দিয়া কোঁচা দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে একটা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, 'এ ভরা বাদর মাহ 'শাওন' শূন্য মন্দির মোর। গিন্নী বুঝে-সুঝে আজই বাপের বাড়ি গেলেন।'

অমূল্য এককোণে গুড়িসুড়ি পাকাইয়া বসিয়াছিল; বলিল, 'তাই আমাদের জ্বালাতে এসেছ?'

বরদা ওদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'বাড়িটা ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল, তাই—'

মিনিট দুই নীরব থাকিয়া বুক-পকেটের ভিতর হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আজকের বৃষ্টি দেখে একটা পুরনো গল্প মনে পড়ছে—'

'এই সারলে!' অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ক্লাবে বসব তার যো নেই। আমি বাড়ি চললুম; হৃষী, তোমার ছাতাটা যদি দাও—'

হৃষী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, আমাকেও তো বাড়ি যেতে হবে। বৃষ্টি আজ রাত্রে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

অমূল্য ব্যাকুলচক্ষে ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু ছাতার স্বত্বাধিকারী কাহারও মুখে করুণার কণামাত্র না দেখিয়া হতাশভাবে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

পৃথ্বী জোরে হাসিয়া উঠিল, 'অমূল্য, কপালে লিখিতং ঝাঁটা, কোন্ শালা কিং করিষ্যতি। বরদার গল্পটা শুনেই যাও।'

অমূল্য জবাব দিল না।

বরদা আরম্ভ করিল:

বছর কয়েক আগেকার কথা। সেবারও এমনি নিদারুণ বর্ষা; ভাসছে বিলখাল, ভাসছে বিলকুল, ঝাপসা ঝাপটায় হাসছে জুঁইফুল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছি।

দাদা বিয়ে করলেন বাংলাদেশের এক অতি পুরনো পচা পাড়াগাঁয়ে। আমাদের কারুর মত ছিল না কিন্তু প্রজাপতি শুনলেন না, অগত্যা সেইখানেই যেতে হল।

একে পল্লীগ্রাম, তায় বর্ষাকাল। সে-দৃশ্য বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। সুবিধের মধ্যে রেলের স্টেশন ক্রোশখানেকের মধ্যেই ছিল।

স্টেশনে নেমে সকলে পদব্রজে কনের বাড়ির দিকে যাত্রা করলুম; কারণ, জানা গেল যে মধ্যে একটা পুল ভেঙে গিয়ে পথ গরুর-গাড়ির পক্ষেও দুর্গম হয়ে উঠেছে। পুরোহিত ন্যায়রত্ন মশায় সঙ্গে ছিলেন, কাদার মধ্যে তাঁর একপাটি খড়ম অন্তর্হিত হল দেখে আমরা আপন আপন জুতো খুলে বগলে নিলুম। তারপর অনেক বাধা-বিঘ্নের ফাঁড়া কাটিয়ে যখন মেয়ের বাড়ি উপস্থিত হলুম, তখন বর থেকে নাপিত পর্যন্ত কাউকে চেনা গেল না। কেবল, মেসোমশায় গোঁফ থেকে কাদা নিঙড়োতে নিঙড়োতে কাকে খিঁচোচ্ছিলেন, গলার আওয়াজে তাঁকে ধরে ফেললুম।

এই একক্রোশ পথ পায়েসের মত কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। তাই কন্যাপক্ষ যখন মুগের ডালের খিচুড়ি আর হাঁসের ডিম ভাজা দিয়ে আমাদের

banglabooks.in

অভ্যর্থনা করলেন, তখন কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় খেয়ে ফেললুম।

আহারান্তে কিন্তু বড় কষ্ট পেতে হল। আমরা সংখ্যায় বরযাত্রী প্রায় কুড়িজন ছিলাম। যে ঘরটিতে আমাদের বিশ্রাম করতে দেয়া হল, তাতে শোয়া নয়, ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে কুড়িজন বসতে পারে। গুরুভোজনের পর সকলের মনেই একটু গড়াবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। শুধু শীর্ণদেহ ন্যায়রত্ন মশায় কোনমতে একটা কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আর সকলে পান-তামাক খেয়ে গল্প-গুজবে সময় কাটাতে লাগল, একদিকে জন-কয়েক ছোকরা তাস নিয়ে বসে গেল; আমার কিন্তু বড় বিরক্তি বোধ হতে লাগল। জানলার ধারে বসে মন-খারাপ করে ভাবতে লাগলুম—দিনের বেলা তো যাহোক হল, রাত্রেও কি ওই ব্যবস্থা নাকি?

গোধূলি-লগ্নে বিয়ে, সুতরাং রাত্রে ঘুমোবার কোন বাধা নেই। দাদা না হয় বাসরঘর আলো করে শ্যালী আর দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে রসিকতা করে রাত কাটাবেন, কিন্তু সেজন্যে আমার সারারাত জেগে পাহারা দেবার তো কোন দরকার নেই। তাই বাড়ির একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, রাত্রে শোবার ব্যবস্থা কি রকম?

তিনি বললেন, পাড়াগাঁয়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না, অতিকষ্টে এই বাড়িটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর আর একটি ঘরে জিনিসপত্র আছে, রাত্রে খালি করে দেয়া হবে।

শুনে বড় ভরসা হল না, কুড়িজনের শোবার জন্যে মাত্র দুটি ঘর! অন্যমনস্কভাবে বাইরের অবিশ্রাম বারিধারার দিকে চেয়ে চেয়ে কিছুদূরে একটি অন্ধকারদর্শন ছোট পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িতে কেউ আছে বলে বোধ হয় না, দরজা-জানলাগুলো সব বন্ধ। আগে বোধহয় বাড়িখানার হলদে রঙ ছিল, এখন সবুজবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের স্থানে স্থানে চুন-বালি খসে গিয়ে ঘায়ের মত দেখাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ও বাড়িটি কার?

ভদ্রলোকটি হেসে বললেন, আপাতত ভূতের।

একটু বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি যা বললেন তার মর্ম এই: কিছুকাল পূর্বে ওই বাড়িটি এক ভদ্রলোকের ছিল, অবশ্য তাঁর নিজের তৈরী নয়, পৈতৃক সম্পত্তি। তিনি গ্রাম থেকে ক্রোশ দুই দূরে জমিদারের কাছারীতে পনেরো টাকা বেতনে গোমস্তা ছিলেন। সংসারে কেবল স্ত্রী আর এক মেয়ে ছিল। বাবুটি মদ খেতেন, অনেক সময় মাতাল হয়ে স্ত্রীকে প্রহারাদি করতেন, কিন্তু মেয়েটি তাঁর বড় আদরের ছিল। জীবনে একবার ছাড়া আর কখনো তার গায়ে হাত তোলেননি।

তাঁর স্ত্রী সতীসাধ্বী ছিলেন, তাই বছর তিনেক আগে তিনি একদিন স্বর্গে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে স্বামীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগল। এই আঘাত সত্যি কি ভণ্ডামী বলা যায় না—কিন্তু তাঁর মাতলামি ভারি বেড়ে উঠল। একদিন তিনি জমিদারের নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে তার গালে একটি চপেটাঘাত করে বাড়ি ফিরে এলেন। পরদিন সকালে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, তার বদলে তাঁর ছ'বছরের মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিস তাঁকেই কন্যাঘাতী বলে সন্দেহ করে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পায়নি।

মাঝে মাঝে কানাঘুষো শোনা যায় যে, তিনি কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে আছেন; গ্রামের কেউ কেউ তাঁকে অন্ধকার রাত্রে মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে...কিন্তু সেসব গুজব নিতান্তই বাজে কথা। বাড়িখানা সেই অবধি খালি পড়ে আছে, কেউ ব্যবহার করে না। গ্রামের দু-একজন সাহসী লোক একবার রাত্রে ওই বাড়িতে শোবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেইরাত্রেই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে—তারা বলে বাড়িতে ভূত আছে।

গল্পটা শেষ শুনে বললুম, আমরা কয়েকজন যদি রাত্রে ওখানে শুই, কারুর আপত্তি হবে কি?

ভদ্রলোকটি বললেন, না মশায়, আমাদের সাহস হয় না।

banglabooks.in

আমি বললুম, আমাদের যদি সাহস হয়, তাহলে আপনাদের হতেই বা বাধা কি? আর সকলের দিকে ফিরে বললুম, ওহে, তোমরা কেউ ভূতের বাড়িতে শুতে রাজী আছো?

সকলেই ব্যাপার কি জানতে চাইলে—কিন্তু সমস্ত শুনে, আমার মত দু' তিনজন ছাড়া আর কেউ রাজী হল না। যাহোক, সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি একটু ধরেছে—আমরা বাড়িখানা দেখতে গেলুম। বাড়িতে তালা লাগানো ছিল—সেই ভদ্রলোকটি তার চাবি জোগাড় করে আনলেন।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই ভিতরকার বন্ধ অন্ধকার যেন বন্যজন্তুর মত আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। স্যাঁতসেঁতে ভিজা একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি পাশের একটা জানলা খুলে দিতেই বাইরের মলিন আলো ম্রিয়মাণভাবে ঘরে ঢুকল। দেখলুম, মেঝের ওপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলো পড়েছে—কোণে কোণে ঝুল আর মাকড়সার জাল। মোটের ওপর যতদূর নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর হতে পারে।

বাড়িতে মাত্র দুটি ঘর, তার মধ্যে একটি শয়নকক্ষ। আসবাবের মধ্যে একটি পুরনো কীটদষ্ট খাট আর তার মাথার কাছে একটি কপাটযুক্ত দেওয়াল-আলমারি। ঘরটি নেহাত ছোট নয়, খিড়কির দিকে একটা জানলাও আছে।

দেখে-শুনে সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাসবার চেষ্টা করে বললেন, না হে, আজ রাত্রে আর শোবার দরকার হবে না, তাস-পাশা খেলে কাটিয়ে দেয়া যাবে। কাজ কি বাবা!

ভদ্রলোকটি সঙ্গে ছিলেন, তিনি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি বললুম, বেশ, তোমরা তাস-পাশাই খেলো, আমার কিন্তু না ঘুমোলে চলে না।

ভদ্রলোকটিকে বললুম, আপনি দয়া করে একটা চাকর পাঠিয়ে দেবেন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে দেবে।

ভদ্রলোকটি এবং সঙ্গীরা ক্ষীণভাবে একবার বাধা দিলেন, কিন্তু আমার জিদ চেপে গেছে দেখে আর কিছু বললেন না।

রাত্রে শুভকর্ম যথাসময়ে শেষ হয়ে গেল। সাড়ে দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে লণ্ঠন হাতে একলা শুতে গেলুম। সন্ধ্যার পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল; এখনো সমভাবে চলেছে।

বাড়িতে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলুম, তারপর লণ্ঠন হাতে শোবার ঘরে গেলুম। চাকর বিছানা পেতে মশারি ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, খিড়কির দিকে জানলাটা পূর্ববৎ বন্ধই ছিল। আলো ধরে ঘরখানাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘরটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ বোধ হতে লাগল, বায়ুর অভাবে একটু গরমও বোধ হল। জানলাটা ধরে দু' তিনবার টানাটানি করবার পর সেটা খুলে গেল, তখন আবার ব্যাঙ ও ঝিঁঝি-পোকার কনসার্ট শুনতে পেলুম।

জানলা খুলে ফিরে আসতে পাশে দেয়াল-আলমারিটা পড়ে; কৌতূহল হল, সেটাকেও খুলতে গেলুম—দেখি, মরচে পড়ে সেটাও এঁটে গেছে। জোরে এক টান মারতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গেল। ভেতরে দরকারী জিনিস কিছুই নেই, কেবল গোটা পাঁচ-ছয় খালি মদের বোতল গৃহস্বামীর সুরাসক্তির ঐতিহাসিক স্তম্ভের মত ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে।

শরীর বেশ ক্লান্ত হয়েছিল, তাই আলোটা কমিয়ে খাটের পায়ার কাছে রেখে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে রবিবাবুর একটা গল্প বারবার মনে পড়তে লাগল, দু-একবার গায়ে কাঁটাও দিলে। কিন্তু বেশী ক্লান্ত হয়েছিলুম বলেই হোক বা ভয় বস্তুটা আমার শরীরে কম আছে বলেই হোক, এই ভুতুড়ে বাড়িতে একলা শুয়েও অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাত্রি বোধ করি তখন দুটো কি আড়াইটে হবে, হঠাৎ কানের খুব কাছে একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনে একেবারে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলুম। দেখি দেয়াল-আলমারি থেকে শব্দটা আসছে।

banglabooks.in

নিমেষের মধ্যে দারুণ ভয়ে আমার সমস্ত যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এই শব্দটার যে কোন স্বাভাবিক কারণ থাকতে পারে, সেকথা আমার মনের ধার ঘেঁষেও গেল না। সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম, সেই শূন্য মদের বোতলগুলো সজীব হয়ে ল্যাফিয়ে লাফিয়ে কপাটে ঘা দিচ্ছে। সে-শব্দ আর থামে না। নিশাচর প্রেতযোনির এই নিশীথ উল্লাস ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে সমভাবে সমব্যবধানে চলতেই লাগল। আমি মশারীর মধ্যে একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ, বাইরে অজস্র বারিপাত—ভিতরে অশরীরীর নৃত্য! আমি আর বিছানার মধ্যে থাকতে পারলুম না, মশারী ছিঁড়ে বাইরে এসে পড়লুম। আলোটা বাড়িয়ে দিতেই ঘরের নিরাভরণ শূন্যতা যেন আমার চারদিকে দাঁত বার করে হেসে উঠল। অন্ধকার এর চেয়ে ছিল ভাল। মনে হতে লাগল ওই বোতলগুলো এখনি নাচতে নাচতে আলমারি থেকে বেরিয়ে আসবে। এবং তারপর যে কি কাণ্ড শুরু হবে তা আমার বিধ্বস্ত মস্তিষ্ক দিয়ে কল্পনা করতে পারলুম না।

আমি ছুটে জানলার কাছে গিয়ে সজোরে গরাদ চেপে ধরলুম।

ঠিক এই সময় আকাশের মাঝখানে বিদ্যুৎ চমকালো।

বাইরের সমস্ত দৃশ্যটা এক মুহূর্তে চোখের ওপর মুদ্রিত হয়ে গেল। জানলা থেকে হাত পঁচিশেক দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল—নিম কিম্বা তেঁতুল ঠিক ধরা গেল না—সেই গাছের গোড়ায় একটা ভীষণাকৃতি লোক কোদাল দিয়ে প্রাণপণে কোপাচ্ছে। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল পড়ছে, পরনে কাপড় আছে কি উলঙ্গ, ঠিক ধরা গেল না।

কৌতূহলে ভয় অনেকটা চাপা পড়ে গেল। আমি আর একবার বিদ্যুতের আশায় বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আবার বিদ্যুৎ! দেখলুম ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, বৃষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, লোকটা সমভাবে গাছের গোড়ায় কোদাল চালাচ্ছে, আর সেই কোদালের তালে তালে ঘরের মধ্যে আলমারির ভিতর থেকে শব্দ আসছে—ঝন্‌ঝন্‌, ঝন্‌ঝন্‌। আমার ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল—একবার ভাবলুম ডাকি, কিন্তু যদি চোর হয়! কিম্বা হয়তো পাগল!

কোন কিছু স্থির করবার আগেই না বুঝে-সুঝে লণ্ঠনটা জানলার সুমুখে তুলে ধরলুম। বাইরের লোকটাকে সে-আলোতে দেখা গেল না। কিন্তু হঠাৎ আলমারির ঝনঝনানি বন্ধ হয়ে গেল। শব্দটা এতক্ষণ সয়ে গিয়েছিল, থামতেই বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। আবার থামে কেন?

শব্দ থামতেই দেয়াল-আলমারির দিকে তাকিয়ে ছিলুম, সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জানলার দিকে চাইতেই ভয়ে আমার গায়ের রক্ত প্রায় জল হয়ে গেল। লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোতে দেখলুম, ঠিক জানলার ওপারে একটা মস্ত ঝাঁকড়া মাথা, আর তারই ভিতর থেকে দুটো বড় বড় লাল চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।

আমার হাঁটু দুটো এবং গলার আওয়াজ তখন একেবারে শাসনের বাইরে চলে গেছে। চেঁচামেচি কিম্বা পলায়ন দুই সমান অসম্ভব। তাই কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কেবল ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলুম।

হঠাৎ বাঘের থাবার মত একজোড়া হাত বাইরের অন্ধকার থেকে উঠে এসে জানলার দুটো গরাদ ধরে টান দিলে। জানলার ঘুণধরা পচা কাঠ অকস্মাৎ ভেঙে গিয়ে গরাদ দুটো বার হয়ে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রেদাক্ত গিরগিটির মত সেই ফাঁক দিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, তুমি কে?

নিজের নামটা পর্যন্ত সাফ ভুলে গিয়েছিলুম, তাই উত্তর দেওয়া হয়ে উঠল না। লোকটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল। সে ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, তুমি পুলিস!

আমি প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জানালুম যে আমি পুলিস নই।

banglabooks.in

আশ্চর্য, লোকেটা তখনই অকপটে তাই বিশ্বাস করে মাটিতে বসে পড়ল। কোমরে একটা শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া জড়ানো ছিল মাত্র। একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললে, তিন মাস মদ খাইনি। বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাকে একটু মদ দিতে পারো? বেশী নয়, একটি গ্লাস!

এমন বুকফাটা মিনতি আর কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না। বোধ হল, মদের দুর্নিবার পিপাসা লোকটাকে পাগল করে দিয়েছে। একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই আমার মনে উঁকি মারছিল; আমি বললুম, মদ তো নেই, কিন্তু আপনিই কি—?

লোকটা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, শেষে মাথা তুলে বললে, এই বাড়ির মালিক আমি, নিজের মেয়েকে খুন করে পালিয়ে যাই। গোমস্তাগিরি করতুম, একদিন ঝগড়া করে চলে এলুম। তখন স্ত্রী বেঁচে নেই—শুধু মেয়ে। বাড়ি আসতেই মেয়েটা বললে, বাবা, খেলা করতে করতে পায়ের মল গাছতলায় কোথায় পুঁতে রেখেছিলুম, আর খুঁজে পাচ্ছি না।—মাথায় রাগ চড়েই ছিল, মারলুম মেয়েটার রগে এক চড়, মেয়েটা সেইখানে পড়েই মরে গেল।...সেই থেকে পুলিসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।—মেয়েটা মরেছে—যাকগে! কিন্তু তার মল ক'গাছা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

এই বলে লোকটা লাফিয়ে উঠে একবার আলমারির দিকে ছুটে গেল। খালি বোতলগুলো পেড়ে পেড়ে মাটিতে আছড়ে ভাঙতে লাগল। তারপর উন্মত্ত একটা চিৎকার করে, যে-পথে এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেল। মিনিট দুই ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। তারপর আলমারির কাচের কপাট দুটো সজোরে শব্দ করে উঠল—ঝন্ ঝন্ ঝন্!

বরদা নীরব রইল।

অমূল্য শ্লেষ করিয়া বলিল, 'ব্যাস, এই গল্প? খালি ঝন্ ঝন্ ঝন্!'

বরদা বলিল, 'আর একটু বাকি আছে। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। দেখলুম ঘর একেবারে অন্ধকার, আলোটা কখন নিভে গেছে।

'অনেকক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইলুম। কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে এলো না। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

'সকালবেলা উঠে দেখি, বালিশের তলা থেকে সোনার ঘড়ি আর মনিব্যাগটা চুরি গেছে।'

১৯১৫

banglabooks.in

রক্ত-খদ্যোত

সন্ধ্যার সময় প্রাত্যহিক অভ্যাসমত গুটিকয়েক সভ্য ক্লাবঘরের মধ্যে সমবেত হইয়াছিলাম।

বরদা সিগারেটের ক্ষুদ্র শেষাংশটুকুতে লম্বা একটা সুখটান দিয়া সেটা সযত্নে অ্যাশ্-ট্রের উপর রাখিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "ভূতের গল্প তোমরা অনেকেই শুনেছ, কিন্তু ভূতের মুখে ভূতের গল্প কেউ শুনেছ কি?"

অমূল্য এক কোণে বসিয়া একখানি সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। বলিল, "অসম্ভব একটা কিছু বরদার বলাই চাই।"

বরদা বলিল, "আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তবে বলি শোন—"

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আজ যে আমাদের সাহিত্য-সভার অধিবেশন। অতুল, তোমার 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র' প্রবন্ধটা তাহলে—"

হৃষী বলিল, "কাল হবে। বস্তুতন্ত্রের চেয়ে বড় জিনিস আজ এসে পড়েছেন। বরদা, তোমার গল্প আরম্ভ হোক।"

অমূল্য অস্থির হইয়া বলিল, "আজ তাহলে বরদার কতকগুলো মিথ্যে কথা শুনেই সন্ধ্যেবেলাটা কাটাতে হবে?"

প্রশান্তকণ্ঠে বরদা বলিল, "কথাটা শুনে তারপর সত্যি-মিথ্যে বিচার করা উচিত। তাহলে আরম্ভ করি। গত বৎসর—"

অমূল্যর নাসারন্ধ্র হইতে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

বরদা বলিল, "গত বৎসর আমার প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার শখ হয়েছিল, বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। যারা জানে-শোনে, তাদের পক্ষে ভূত-নামানো অতি সহজ ব্যাপার। দরকারী আসবাবের মধ্যে কেবল একটি তেপায়া টেবিল।"

অমূল্য বিড় বিড় করিয়া বলিল, "আর একটি গুলিখোর।"

বরদা ওদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "একদিন একটা ছোট দেখে তেপায়া টেবিল যোগাড় করে সন্ধ্যের পর আমাদের তেতলার সেই নিরিবিলি ঘরটায় বসে গেলুম— আমি, আমার বউ, আর পেঁচো—"

অমূল্য বলিল, "এই বয়স থেকেই ছোট ভাইটির মাথা খাওয়া হচ্ছে কেন? বউয়ের কথা না হয় ছেড়ে দিই, কারণ যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেদিনই তার যা হবার হয়ে গেছে—"

বরদা বলিল, "পেঁচোকে নেবার কারণ, তিনজনের কমে চক্র হয় না। তাছাড়া সে ছেলেমানুষ, সুতরাং মিডিয়ম হবার উপযুক্ত। সে যাক, মেঝের উপর টেবিল ঘিরে তো বসা গেল—কিন্তু ভাবনা হল কাকে ডাকি! ভূত তো আর একটি-আধটি নয়, পৃথিবীর আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যত লোকের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে সকলের দাবি সমান। এখন কাকে ফেলে কাকে ডাকি?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বরদা বলিল, "আমাদের সুভাষকে চেনো তো—জুনিয়র উকিল? তার ভগ্নীপতি সুরেশবাবু হাওয়া বদলাতে এসে গত শীতকালে নিউমোনিয়ায় মারা যান, বোধ হয় তোমাদের স্মরণ আছে।...অমূল্য, তুমি তো পোড়াতে গিছলে? হঠাৎ সেই সুরেশবাবুকে মনে পড়ে গেল। তখন তিনজনে আলোটা কমিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে সুরেশবাবুর ধ্যান শুরু করে দিলুম। বেশিক্ষণ নয় ভাই, মিনিট-পাঁচেক চোখ বুজে থাকবার পর চোখ চেয়ে দেখি পেঁচোটা কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে, —কশ বেয়ে নাল গড়াচ্ছে, চোখ শিবনেত্র, বিজ বিজ করে কি বকছে! 'কি রে!'—বলে তাকে একটা ঠেলা দিলুম—কাৎ হয়ে পড়ে গেল। বউ তো 'বাবা গো!' বলে আমাকে খুব ঠেসে

banglabooks.in

জড়িয়ে ধরলে।"

হৃষী বলিল, "বস্তুতন্ত্র এসে পড়ছে। এবার আসল গল্পটা আরম্ভ হোক।"

বরদা বলিল, "বুঝলুম ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। পেঁচোকে অনেক প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে উত্তর দিলে বোঝা গেল না। বড়ই মুস্কিল। তখন আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজাল। কাগজ-পেনসিল এনে পেঁচোর হাতে ধরিয়ে দিলুম। পেনসিল হাতে পেয়ে পেঁচো সটান উঠে বসল। উঠে বসে লিখতে আরম্ভ করে দিলে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! পেঁচো-র চোখ বন্ধ, মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে, আর প্রাণপণে কাগজের ওপর লিখে যাচ্ছে।"

পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বরদা বলিল, "আবার হাতের লেখা দেখে অবাক হয়ে যাবে, দস্তুরমত পাকা হাতের লেখা। কে বলবে যে পেঁচো লিখেছে?"

অমূল্য লেখাটা তদারক করিয়া বলিল, "পেঁচো লিখেছে কেউ বলবে না বটে, কিন্তু তোমার লেখা বলে অনেকেরই সন্দেহ হতে পারে।"

বরদা বলিল, "এই লেখা হাতে পাবার পর আমি সুভাষের বাড়ি গিয়েছিলুম। সুরেশ-বাবুর পুরোনো একখানা চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম,—অবিকল তাঁর হাতের লেখা। বিশ্বাস না হয় তোমরা যাচিয়ে দেখতে পারো।"

অমূল্য বলিল, "অবশ্য দেখব।"

হৃষী বলিল, "সে যাক্। এখন তুমি কি বলতে চাও, ঐ কাগজের তাড়াটা সুরেশবাবুর প্রেতাত্মার জবানবন্দি?"

বরদা বলিল, "এটা হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস। পুরোপুরি সত্যি কি না সে-কথা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু গোড়ার খানিকটা যে সত্যি তা সুভাষ সেদিন স্বীকার করেছিল।"

"এইবার তবে আসল গল্পটা শোন"—এই বলিয়া বরদা কাগজের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।—

যাঁহারা মুঙ্গের শহরের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, উক্ত শহরে পিপর-পাঁতি নামক যে বিখ্যাত বীথিপথ আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার কূলে মুসলমানদের একটি অতি প্রাচীন গোরস্থান আছে। বোধ করি এই গোরস্থানের সব গোরগুলিই শতাধিক বর্ষের পুরাতন। স্থানটি অনাদৃত। কাঁটাগাছ ও জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অস্থিপঞ্জর প্রকট করিয়া এই কবরগুলি কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই গোরস্থানের এক কোণে একটি কষ্টিপাথরের গোর আছে। এই গোরটি সম্বন্ধে শহরে অনেক ভূতুড়ে গল্প প্রচলিত ছিল। এই সব আজগুবি গল্প শুনিয়া আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক বলিলেন যে, গোরটা সজীব; পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নাকি এক সাহেব ঐ গোর লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল। গুলির আঘাতে পাথর ফাটিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়াছিল। সে রক্তের দাগ এখনও মিলায় নাই, গোরের গায়ে তেমনি শুকাইয়া গড়াইয়া আছে। আর, যে নাস্তিক সাহেব গুলি করিয়াছিল সেও প্রাণে বাঁচে নাই, সেই রাত্রেই ভয়ংকর ভাবে তার মৃত্যু হইয়াছিল।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় শ্যালককে সঙ্গে লইয়া গোরটি দেখিতে গেলাম। শ্যালক আমারই সমবয়সী, প্রেতযোনিতে অটল বিশ্বাস। আমি কিছুদিন যাবৎ মুঙ্গেরে আসিয়া শ্যালক-মন্দিরেই বায়ুপরিবর্তন করিতেছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন।

গোরস্থানের নিকটে গিয়া দেখিলাম স্থানটি কাঁটাগাছের বর্মে প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া আছে। অনেক যত্নে অনেক সাবধানে পা ফেলিয়া এবং কাপড়-চোপড় বাঁচাইয়া সেই ভূতুড়ে গোরটির সম্মুখীন হইলাম। কালো পাথরের গোর, আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিকত্ব কিছুই চোখে পড়িল না।

হঠাৎ, যখন আমরা গোরটির একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন সেই কালো পাথরের উপর শায়িত আরও কালো একটা জন্তু বোধ হয় আমাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিয়া, একবার আমাদের মুখের উপর তাহার চক্ষু দুটা মেলিয়া ধরিয়া, আস্তে আস্তে

banglabooks.in

গোরের অন্তরালে মিলাইয়া গেল।

দেখিলাম একটা কুকুর। রং কুচকুচে কালো, শরীর যে হিসাবে লম্বা সে হিসাবে উঁচু নয়—পা-গুলা বাঁকা বাঁকা এবং অত্যন্ত খর্ব। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ তাহার চক্ষু দুটা—হলুদে রঙের সহিত ঈষৎ রক্তাভ এবং মণিহীন। পলক ফেলিলে মনে হয় যেন অন্ধকার রাত্রে খদ্যোত জ্বলিতেছে।

শ্যালক বলিলেন, "লোকে বলে ওই কুকুরটাই সাহেবের টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।"

আমি বলিলাম, "পঞ্চাশ বছর আগে? কিন্তু কুকুরটাকে তো অত প্রাচীন বলে বোধ হল না।"

আমরা কবরটার একেবারে পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম কুকুরটা যে-স্থানে শুইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে পাথরের খানিকটা চটা উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহারই চারি পাশে লাল রঙের একটা পদার্থ শুকাইয়া আছে—হঠাৎ রক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। যেন ঐ কুকুরটা সমাধির রক্তাক্ত ক্ষতটাকে বুক দিয়া আগলাইয়া থাকে।

শ্যালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম বোধ হচ্ছে?"

আমি বলিলাম, "আশ্চর্য বটে। আমার মনে হয় খুব গরম একটা ধাতু দিয়ে এই পাথরে আঘাত করা হয়েছিল, তাতেই এই রকম হয়েছে।"

আমার মন্তব্য শুনিয়া শ্যালক আধ্যাত্মিকভাবে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা হবে।" কিন্তু তাহা যে একেবারেই হইতে পারে না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে বেশ বুঝা গেল।

কোনও একটা তর্কাধীন বিষয়ের আলোচনায় মানুষ যখন উচ্চ অঙ্গের হাসি হাসিয়া এমন ভাব দেখায় যেন অপর পক্ষের সঙ্গে তর্ক করাটাই ছেলেমানুষী, তখন অপর পক্ষের মনে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমারও একটু রাগ হইল। কিন্তু যে-লোক তর্ক করিতে অসম্মত, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তাই আমি বলিলাম, "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এই পাথরটা ভেঙেই দেখা যাক না, ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোয় কি না। প্রত্যক্ষের বড় তো আর প্রমাণ নেই—"

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়া ছিল, আমি সেটা তুলিয়া লইয়া গোরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় সেই কুকুরটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা বিশ্রী রকমের চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া অত্যন্ত হিংস্রভাবে আমাকে শাসাইয়া দিল।

শ্যালক আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "চলে এসো, চলে এসো, কি যে তোমার পাগলামি—"

কুকুরটার আকস্মিক আবির্ভাবে আমার শ্যালক মহাশয় যতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাস্তবিকপক্ষে আমি ততটা হই নাই। অথচ একটা হিংস্র কুকুরকে অযথা ঘাঁটানো বিশেষ যুক্তির কাজ নয়। তাই পরীক্ষা-কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমরা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম তখন তুমুল তর্ক বাধিয়া গিয়াছে; কুকুরের জীবনের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের শাণিত যুক্তিগুলি শ্যালকের কুসংস্কারের বর্মের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিতেছে।

বাড়ি ফিরিতেই আমার শ্যালাজ এবং যাঁহার সম্পর্কে শালার সহিত সম্বন্ধ তিনি আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। দুজনেই নবীনা, বিদুষী—প্রতীচ্যের আলোক তাঁহাদের চোখে সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়াছে—তাঁহারা আসিয়াই আমার পক্ষে যোগদান করিলেন। শ্যালক বেচারির বর্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল।

তর্কে যে ব্যক্তি হারে তাকার জিদ বাড়িয়া যায়। যুক্তির দিকে তখন আর তাহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। শ্যালক শেষে চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মানতে না চাও, মেনো না; কিন্তু দুপুর রাত্রে একলা ঐ জায়গায় যেতে পারে এমন লোক তো কোথাও দেখি না।"

banglabooks.in

শালাজ উৎসাহদীপ্ত চক্ষে কহিলেন, "আচ্ছা, এমন লোক যদি পাওয়া যায় যে যেতে পারে, তাহলে তো মানবে যে, তোমার ভূত শুধু তোমার ঘাড়েই ভর করে আছে—আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই?"

শ্যালক গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, "একলা রাত্রে সেখানে যেতে পারে এত সাহস কারুর নেই; আর যদি বা কেউ যায়, সে যে ফিরে আসবে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখি না।"

আমি বলিলাম, "সকলের সাহস এবং সম্ভাবনা সমান নয়। আমি যেতে প্রস্তুত আছি।"

শ্যালক অতি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া বলিলেন, "তুমি—প্রস্তুত আছ? রাত বারোটার সময় একলা—"

তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়। খোট্টার দেশে বেশি দিন থাকিনি বলেই বোধ হয় আমার সে সাহসটুকু আছে। তাহলে আজই ভালো। আজ বোধ হয় অমাবস্যা। শাস্ত্র অনুসারে রাজ্যের ভূতপ্রেত দৈত্যদানা আজ সবাই এই মর্ত্যভূমিতে ফিরে এসে দিগ্বিদিকে নৃত্য করে বেড়াবেন। অতএব এ সুযোগ ছাড়া অনুচিত।"

শ্যালক ভীত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "গোঁয়ার্তুমি করো না সুরেশ, ভারি খারাপ জায়গা। এ সব বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নেই—"

তাঁর হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শালাজের নিকট হইতে প্রতিবাদ আসিল, "ভয় পাবেন না সুরেশবাবু, আপনার জন্যে একটা খুব ভালো প্রাইজ ঠিক করে রাখলুম। আপনি জয় করে ফিরে এলেই এ-বাড়ির কোনও এক মহিলা তাঁর বিম্বাধরের রক্তিমরাগে আপনার কপালে ললাটিকা পরিয়ে দেবেন। ভূতজয়ী বীরের সেই হবে রাজটিকা।"

আমি উৎসাহ দেখাইয়া বলিলাম, "লোভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মহিলাটি কে শুনি?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না।"—বলিয়া আমার গৃহিণীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "ঐ জাতীয় প্রাইজ যদিও আমার ভাগ্যে খুব দুর্লভ নয় (গৃহিণী জনান্তিকে—'আঃ—কি বকছ—দাদা রয়েছেন!'), তবু অধিকের প্রতি আমার বিরাগ নেই। তাহলে চুক্তি পাকা হয়ে গেল—আজ রাত্রেই যাব। কিন্তু আমি যে সত্যি সত্যিই কবরের কাছে গিয়েছি, এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে আসিনি, এ কথা শেষকালে আপনাদের বিশ্বাস হবে তো?"

শালাজ অতি দূরদর্শিনী, বলিলেন, "আপনার মুখের কথা আমরা বিশ্বাস করব নিশ্চয়, কিন্তু যাঁকে বিশ্বাস করানো দরকার তিনিই হয়তো করবেন না। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। খড়ি দিয়ে গোরের ওপর নিজের নাম লিখে আসতে হবে।"

"তথাস্তু!" গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "তোমার দাদার প্রেততত্ত্বের মাথায় বজ্রাঘাত করে দিয়ে আসা যাক—কি বলো?"

অল্প দ্বিধাজড়িত হাসি ভিন্ন আর কোন জবাব পাওয়া গেল না।

শ্যালক বলিলেন, "ফাজলামি ছাড়ো। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।"

শ্যালকের কথা শুনিলাম না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যত সহজ, পশ্চাৎপদ হওয়া তত সহজ নয়।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় গরম জামায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া একটা কড়া গোছের বর্মা চুরুট ধরাইয়া বাহির হইলাম। এতক্ষণে গৃহিণীর মুখ ফুটিল। প্রতীচ্য বিদায় অঞ্জলি দিয়া বলিলেন, "থাক্, গিয়ে কাজ নেই।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম, "পাগল! ভাই-বোন দুজনকার ধাত একই রকম দেখছি।"

শ্যালক নিরতিশয় ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "তুমি এমন একগুঁয়ে জানলে কোন্ শালা তর্ক করত!"

banglabooks.in

এমন বিশ্রী অন্ধকার বোধ করি আর কখনও ভোগ করি নাই। একটা গুরুভার পদার্থের মতো অন্ধকার যেন চারিদিকে চাপিয়া বসিয়া আছে। পথ চলিতে চলিতে পদে পদে মনে হয় বুঝি পরমুহূর্তেই এক চাপ অন্ধকারে ঠোকর লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইব।

চুরুটে লম্বা টান মারিয়া মনে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অজ্ঞাতসারে এমন সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল যে, নিজের পরধ্বনি শুনিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিলাম, মনে হইল কে যেন চুপি চুপি পিছন হইতে আমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তথাপি অকারণে ভয় পাইবার পাত্র আমি নই। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম, দ্বিপ্রহর রাত্রির এই অন্ধকার, এই স্তব্ধতা, এই বিজনতা সকলে মিলিয়া আমার আন্তরিক সাহসকে দুশ্ছেদ্য একটা ষড়যন্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। একটা অলৌকিক মায়া যেন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মাকড়সা যেমন শিকারকে প্রথমে সূক্ষ্ম তন্তুর সহস্র পাকে জড়াইয়া পরে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তেমনি এই অদৃশ্য শক্তি আমার সহজ সত্তাকে ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ক্রমে পিপর-পাঁতি রাস্তার পূর্বপ্রান্তে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই অপর প্রান্তে কবরস্থান। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছ, মাথার উপর বহু ঊর্ধ্বে তাহাদের শাখা-প্রশাখা মিলিয়াছে। অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া আসিল।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা নিঃশ্বাসের মতো একটা স্পর্শ পাইলাম। শরীরের সমস্ত রোম শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা খুব লঘু পদার্থ পিঠের উপর দিয়া খড়্ খড়্ শব্দে নিচে গড়াইয়া পড়িল। বুঝিলাম, ভয় পাইবার মতো কিছু নয়, মাথার উপর যে-ঘনপল্লব শাখাগুলি আলিঙ্গনকে নিবিড় বিচ্ছেদবিহীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটি শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিতে লাগিলাম।

লম্বা টানের চোটে চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অন্য সময়ে হইলে ফেলিয়া দিতাম, কিন্তু আজ সেটাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিলাম না। তাহার অগ্নিদীপ্ত প্রান্তটুকুতে যেন একটু প্রাণের সংস্রব ছিল। এই নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যখন সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন ওই ক্ষীণ রশ্মিটুকুই জীবন্ত সঙ্গীর মতো প্রাণের মধ্যে ভরসা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ওটাকে ফেলিয়া দিলে যে অনেকখানি সাহসও চলিয়া যাইবে তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম।

কিন্তু ক্রমে যখন আঙুল পুড়িতে লাগিল তখন সেটাকে ফেলিয়া দিতেই হইল। একবার বেশ ভালো করিয়া টানিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে কিছু দূরে ফেলিয়া দিলাম।

ফেলিয়া দিবা মাত্র মনে হইল, যে-আঙুল দুটা দিয়া চুরুট ধরিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কোনও ছিদ্র পাইয়া খানিকটা ঠান্ডা বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমার দৃষ্টি ছিল নিক্ষিপ্ত চুরুটটার উপর—সেটা মাটিতে পড়িবামাত্র আগুন ছিট্‌কাইয়া উঠিল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। ছিটকানো আগুনটা মধ্যপথে দুটা আকৃতি ধরিয়া পাশাপাশি একসঙ্গে নড়িতে আরম্ভ করিল। মাটি হইতে প্রায় এক হাত উপরে থাকিয়া পরস্পরের চারি আঙুল ব্যবধানে এই ক্ষুদ্র অগ্নিগোলক দুটা একজোড়া লাল জোনাকির মতো সম্মুখে দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং মাঝে মাঝে মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল।

আমার মাথা বোধ হয় গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কি জানি কেন, আমার ধারণা জন্মিল যে, ওই মিট্‌মিট্ করা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দুটা আর কিছুই নয়, দুটা চক্ষু আমার পানে তাকাইয়া আছে; এবং এই চক্ষু দুটার পশ্চাতে একটা খর্বাকৃতি কুকুরের কালো রং যে অন্ধকারে মিশাইয়া আছে তাহা যেন মনে স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

চলিতে চলিতে কখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলাম লক্ষ্য করি নাই, চক্ষু দুটাও সম্মুখে কিছু দূরে দাঁড়াইল। তারপর কতক্ষণ যে নিস্পলকভাবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি ব্যাদান করিয়া রহিল জানি না, মনে হইল বহুক্ষণ পরে সেই চক্ষুর পলক পড়িল। তখন সেটা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দেহের উপর তখন কোনও

banglabooks.in

অধিকারই নাই। স্বপ্নে বিভীষিকার সম্মুখ হইতে পলাইবার ক্ষমতা যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, আমিও তেমনি নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ওই চক্ষুর পশ্চাদ্বর্তী হইলাম। স্বাধীন ইচ্ছা তখন একেবারে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সমস্ত চেতনাব্যাপী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভয়।

কতক্ষণ এই অগ্নিচক্ষুষ্মান আমাকে তাহার আকর্ষণ প্রভাবে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল আমার ধারণা নাই। একবার চেতনার অন্তরতম প্রদেশে যেন ক্ষীণ অনুভূতির ছায়া পড়িয়াছিল যে, পাকা রাজপথ দিয়া চলিতেছি না; আর একবার মনে হইয়াছিল বুঝি একটা গাছের মোটা শিকড়ে ঠোক্কর খাইলাম; কিন্তু সে-সব আমার ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির বাহিরে।

হঠাৎ একটা বড় রকমের ঠোক্কর খাইলাম। এটা বেশ স্মরণ আছে। তারপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াই নিচের দিকে গড়াইতে শুরু করিলাম। কোথায় পড়িতেছি কোনও ধারণাই ছিল না; অন্ধকারে দেখাও অসম্ভব; কিন্তু এই পতন যে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে এবং পতনের লক্ষ্যও যে একটা অতলস্পর্শ স্থানে লুকাইয়া আছে তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অথচ কি নিদারুণ সেই পতন! গড়াইতে গড়াইতে এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে পড়িতে-ছিলাম এবং প্রত্যেক স্তরে অবরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অস্থিগুলা যেন একবার করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই অবরোহণের শেষ ধাপে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন জ্ঞান বিশেষ ছিল না, কিন্তু একটা অনন্ত যন্ত্রণার পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা সমস্ত শরীর দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিলাম। সেই দেহহীন লাল চক্ষু দুটা আমার মুখের অত্যন্ত নিকটেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। দেহের রক্ত তো জল হইয়া গিয়াছিলই, এবার তাহা একেবারে বরফ হইয়া গেল। একটা অসহ্য শীতের শিহরণ সমস্ত দেহটাকে যেন ঝাঁকানি দিয়া গেল। তারপর আর কিছু মনে নাই।

সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে জ্ঞান হইল। কল্যকার রাত্রি যে স্বাভাবিকভাবে কাটে নাই এই চিন্তা লইয়া চক্ষু মেলিলাম। ঘাসের উপর শুইয়া আছি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলাম—উঃ! গায়ে দারুণ বেদনা। আবার শুইয়া পড়িলাম। তখন ক্রমশঃ সব মনে পড়িল। ঘাড় না নাড়িয়া যতদূর সাধ্য দেখিয়া বুঝিলাম, পিপর-পাঁতি রাস্তার পাশে পাশে কেল্লার যে শুষ্ক গড়খাই গিয়াছে তাহারই তলদেশে বাবলা গাছের ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছি।

সূর্য উঠিল। এখানে সমস্ত দিন পড়িয়া থাকিলেও কেহ সন্ধান পাইবে না ইহা স্থির। শরীরে তো নড়িবার শক্তি নাই। প্রচণ্ড এক হেঁচকা মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; চক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের সমস্ত রোম বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ি গিয়া পৌঁছিতেই হইবে। অসীম বলে মৃতপ্রায় দেহটাকে টানিতে টানিতে কি করিয়া বাড়িতে পৌঁছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই। বাড়ি যাইতেই সকলে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল এবং উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে আমার ক্ষীণ চেতনা আবার লুপ্ত করিয়া দিবার যোগাড় করিল। শ্যালক সকলকে সরাইয়া দিয়া আমাকে একটা ইজি-চেয়ারে বসাইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারা রাত কোথায় ছিলে? আমরা সকলে তোমার জন্যে—"

উত্তর দিতে গেলাম, কিন্তু কি ভয়ানক! গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। শ্যালক আমাকে দুধ ও ব্রান্ডি খাওয়াইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন বিছানায় শুইয়া আছি—ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিতেছে। স্ত্রী ও শ্যালক মলিন মুখে মাথার শিয়রে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দুটো লাংসই অ্যাফেক্ট্ করেছে—নিউমোনিয়া।"

তারপর আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিয়া দেখি শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে—কোথাও কোনও গ্লানি নাই।

banglabooks.in

কে একজন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বোধ হচ্ছে?"

ফিরিয়া দেখি বিনোদ,—আমার ছেলেবেলার স্কুলের বন্ধু। অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। বলিলাম, "বেশ ভালোই বোধ হচ্ছে, ভাই। বুকের ওপর যে একটা ভার চাপানো ছিল সেটা আর টের পাচ্ছি না।"

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রথমটা ঐ রকম বোধ হয় বটে। আমার যখন কলেরা হয়—"

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—তাই তো! বিনোদ তো আজ দশ বৎসর হইল কলেরায় মরিয়াছে; আমি স্বহস্তে তাহাকে দাহ করিয়াছি। তবে সে এখানে আসিল কি করিয়া! মহাবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিনোদ, তুমি তো বেঁচে নেই—তুমি তো অনেক দিন মারা গেছ!"

বিনোদ আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তুমিও আর বেঁচে নেই, বন্ধু!"

১৯২৯

টিকটিকির ডিম

শীতের সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ক্লাবে বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেছিলাম, যদিও ক্লাবে বসিয়া উক্তরূপ আলোচনা করা ক্লাবের আইনবিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশে বাস করিয়া বাঙালীর ক্লাব করিতে হইলে ঐ রকম গুটিকয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

আলোচনা ক্রমশঃ দুইজন সভ্যের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম।

পৃথ্বী বলিল, যাই বল, গান্ধীটুপী পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না।

গান্ধীটুপী পরিহিত চুনী বলিল, হওয়া যায়। বাংলাদেশের সাতকোটি লোক যদি গান্ধীটুপী পরে তাহলে অন্ততঃ এককোটি গজ খদ্দর বিক্রি হয়, তার দাম নিদেন পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা। ঐ টাকাটা দেশের লোকের পেটে যায়।

পৃথ্বী বলিল, হতে পারে। কিন্তু টুপী পরলে বাঙালীর বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তা সে যে-টুপীই হোক। 'ন্যাংগা শির' হচ্ছে বাঙালীর বিশেষত্ব!

চুনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, কেবল ওই বিশেষত্বের জোরে যদি বাঙালী বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।

দূরে টেবিলের এক কোণে বরদা কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করিল, টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ?

banglabooks.in

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক দুজনে কিছুক্ষণের জন্য গুম হইয়া গেল; তারপর সবাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বরদা বলিল, হাসির কথা নয়। মিথ্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি আমার একটা দুর্নাম আছে; সেটা কিন্তু নিন্দুকের অখ্যাতি। স্রেফ গান্ধীটুপী পরলে দেশ উদ্ধার হয় কিনা বলতে পারি না কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি হয় তার সদ্য সদ্য প্রমাণ যদি চাও তো আমি দিতে পারি।

সকলেই বুঝিল একটা গল্প আসন্ন হইয়াছে। অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার গাঁজার শ্রাদ্ধ হবে, আমি বাড়ি চললুম—। দরজা পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখ, তোমরা ভাল চাও তো বরদাকে ক্লাব থেকে তাড়াও বলছি; নইলে শুদ্ধ গাঁজার ধোঁয়ায় এ ক্লাব একদিন বেলুনের মত শূন্যে উড়ে যাবে, বলিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরদা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যি কথা যারা বলে তাদের এমনিই হয়, যীশুকে তো ক্রুশে চড়তে হয়েছিল। যাক, হৃষী, একটা সিগার দাও তো।

হৃষী বলিল, সিগার নেই। বিড়ি খাও তো দিতে পারি।

বরদা আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, থাক, দরকার নেই। দেখি যদি আমার পকেটে—

নিজের পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া সযত্নে ধরাইয়া বরদা বলিতে আরম্ভ করিল, —ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে বলতে আমারই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু তোমরা যখন শুনবে বলে ঠিক করেছ তখন বলেই ফেলি। দেখ, শুধু যে মানুষ মরেই ভূত হয় তা নয়, পশুপক্ষী এমন কি কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলুম।

এই তো সেদিনের কথা, বড় জোর বছর-দুই হবে।

ছুটির সময়, কাজের তাড়া নেই, তাই নিশ্চিন্ত মনে গী-দ্য মোপাসাঁর গল্পগুলো আর একবার পড়ে নিচ্ছি। আমাদের দেশের অকালপক্ব তরুণ সাহিত্যিকেরা দ্য-মোপাসাঁর দোষটি ষোলো আনা নিয়েছেন কিন্তু তার গুণের কড়াক্রান্তিও পাননি। যাকে বলে, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর।

সে যাক। সে-রাত্রে টেবিলে বসে একমনে পড়ছি, কেরাসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কখন টেবিলের ওপর উঠে পোকা ধরে খাচ্ছে। টিকটিকিটার স্পর্ধা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সব চেয়ে টিকটিকি বীভৎস। মাকড়শা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ, এমন কি ব্যাং পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু টিকটিকি! জানো, টিকটিকির এক কানের ভেতর দিয়ে আর এক কান পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়? তার ল্যাজ কেটে দিলে ল্যাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনা-আপনি লাফাতে থাকে? মোট কথা, টিকটিকি দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়, শিরদাঁড়া সিরসির করতে থাকে। হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয়; ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের বেরাল দেখলে ঐ রকম হত।*

যাহোক, টিকটিকিটাকে আমার টেবিলের ওপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখেই আমি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর দূর থেকে তাকে একটা তাড়া দিলুম। সে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে একবার হেসে নিলে।

তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিলুম যে টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ কিনা। কুকুরের হাসি, বেরালের হাসি, শিম্পাঞ্জীর হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পড়েছি কিন্তু টিকটিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্যন্ত কোথাও শুনেছি বলে স্মরণ হয় না।

---

*বরদা ভুল করিয়াছে, ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন নয়—লর্ড রবার্টস্।

banglabooks.in

এই টিকটিকিটার মুখে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল; তার হাসিটা নিরতিশয় অবজ্ঞার হাসি। সে হাসির অর্থ—দেখেই তো চেয়ার ছেড়ে পালালে, দূর থেকে বীরত্ব ফলাতে লজ্জা করে না?

বড় রাগ হল। একটা টিকটিকি—হোক না সে ছয় ইঞ্চি লম্বা, আমারই টেবিলের ওপর উঠে আমাকেই কিনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে? ভারী দেখে একটা অভিধান, বোধহয় সেটা ওয়েব্‌-স্টারের, হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের কোণায় দমাস্‌ করে এক-ঘা বসিয়ে দিলুম। টিকটিকিটা বিদ্যুতের মত ফিরে গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল, প্রায় দু'মিনিট! তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁত বার করে হাসি।

আমার গিন্নী পর্দা ফাঁক করে পাশের ঘর থেকে আমাদের এই শব্দভেদী যুদ্ধ দেখছিলেন, চুড়ীর শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দে হাসছেন। টিকটিকি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা তিনি আগে থেকেই জানতেন।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অভিধানখানা হাতেই ছিল, দু'হাতে সেটা তুলে ধরে দিলুম টিকটিকি লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে!

হুলস্থূল কাণ্ড। ল্যাম্পটা উল্টে গিয়ে ডোম-চিম্‌নি ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মা রান্নাঘর থেকে শব্দ শুনে রান্না ফেলে ছুটে এলেন; আমার ছোট ভাই পাঁচুর হিন্দুস্থানী মাস্টার বাইরের ঘরে বসে পড়াচ্ছিল, 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে চেঁচাতে লাগল।

আমি চীৎকার করে ডাকলুম, রঘুয়া, জল্‌দি একঠো লণ্ঠন লে আও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবলি ভয় হচ্ছিল পাছে টিকটিকিটা টেবিল থেকে নেমে এসে আমার পা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে!

রঘুয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হল। তখন দেখা গেল, ভাঙা কাঁচের মাঝখানে, বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিকটিকির মুণ্ডটা কেবল বেরিয়ে আছে, ধড়টা পিষে ছাতু হয়ে গেছে। মুণ্ডটা একেবারে অক্ষত, যেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছে আর অসংখ্য দাঁত বার করে একটা অত্যন্ত পৈশাচিক হাসি হাসছে!

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু-চার বার শিউরে উঠল। বীভৎস মৃত দেহটাকে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর ভাত খাবার রুচি হল না।

সমস্ত রাত্রি ঘুমের মধ্যে কতকগুলো দুঃস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না অথচ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠলুম তখন শরীর-মনে প্রফুল্লতার একান্ত অভাব।

বিরস মনে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। দেখি, দু'টি ছোট ছোট ডিম পাশাপাশি রাখা রয়েছে। দেখতে ঠিক খড়ি-মাখানো করমচার মত। ইতিপূর্বে টিকটিকির ডিম কখনো দেখিনি কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে এ দু'টি সেই বস্তু। হাঁকাহাঁকি করে চাকরদের জেরা করলুম, কে এখানে ডিম রেখেছে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না, এমন কি প্রহারের ভয় দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না। তখন পেঁচোর ওপর ঘোর সন্দেহ হল। পেঁচোকে নিয়ে পড়লুম, সে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললে, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে না। শাস্তি-স্বরূপ তাকে ডিম দুটো বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলুম।

এ-যে আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কোনো লোকের বজ্জাতি এই কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাবি-দেয়া দেরাজ খুলেও যখন দেখলুম তার মধ্যে শাদা শাদা ক্ষুদ্রাকৃতি দু'টি ডিম বিরাজ করছে তখন কেমন ধোঁকা লাগল। তাইতো! এখানে ডিম কে রাখে?

তারপর দেখতে দেখতে বাড়িময় যেন টিকটিকির ডিমের হরির লুঠ পড়ে গেল। যেদিকে তাকাই, যেখানে হাত দিই, সেইখানেই দু'টি করে ডিম। হঠাৎ যেন জগতের যত স্ত্রী-টিকটিকি সবাই সঙ্কল্প করে আমার চারিপাশে ডিম পাড়তে শুরু করে দিয়েছে।

এমনি ব্যাপার দু'দিন ধরে চলল। মন এমন সন্ত্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠল যে,

banglabooks.in

সহসা কোনো একটা জায়গায় হাত দিতে পর্যন্ত ভয় করতে লাগল, পাছে সেখান থেকে টিকটিকির ডিম বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সাধারণ পাঁচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই অকিঞ্চিৎকর যে মনের কথা কাউকে খোলসা করে বলাও যায় না। টিকটিকির ডিম দেখেছে তার আর হয়েছে কি? এ প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। আমিও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ ফল হল না। বরঞ্চ সর্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা করতে লাগল যে, এ ঠিক নয়, স্বাভাবিক নয়, কোথাও এর একটা গলদ আছে।

কিন্তু একটা টিকটিকিকে অপঘাত মেরে ফেলার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ বুদ্ধিতে একথাও মেনে নেওয়া যায় না। তবে কি এ? অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলুম, সম্ভবতঃ যে টিকটিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে বধ করেছিলুম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবলি ডিম পেড়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলুম না।

বাড়িতে যখন মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবলুম—যাই ক্লাবে। ছুটির সময়, তোমরা কেউ এখানে ছিলে না; ক্লাব একরকম বন্ধ; তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিয়ে আলো জ্বালিয়ে এই ঘরেই এসে বসলুম। টেবিলের উপর পাতলা একপুরু ধুলো পড়েছে; অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইএর কাঠিটা অ্যাশ্‌ট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখি, ছাই পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে দু'টি ডিম।

তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ি চলে এলুম!

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁ রে, ক'দিন থেকে তোর মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো দেখছি—শরীর কি ভাল নেই?

আমি বললুম, হ্যাঁ—ঐ একরকম; বলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

ব্যাপার যে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ নেই। টিকটিকি-বধূর অতি-প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়—ভূত, ডিমভূত! সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ টিকটিকিটা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; এবং ঐ ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নয়, তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে।

ইতর প্রাণীর ওপর কেন যে আমাদের শাস্ত্রে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বুদ্ধদেব সামান্য ছাগলের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, আমার দৃষ্টান্ত দেখেও সে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের অদৃষ্টে কুম্ভীপাক নরক অনিবার্য। আসল কথা, আমার মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; অনুতপ্ত হয়ে সেই দংষ্ট্রাবহুল গতাসু টিকটিকিকে উদ্দেশ্য করে কেবলি বলছিলুম, হে প্রেত! হে নিরলম্ব বায়ুভূত! যথেষ্ট হয়েছে, এইবার তোমার ডিম্ব সম্বরণ কর!

কিন্তু সম্বরণ করে কে? রাত্রে খেতে বসে ভাত ভেঙেই দেখলুম ভাতের মধ্যে দু'টি সুসিদ্ধ ডিম্ব! কম্পিত কলেবরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মা বললেন, কি হল, উঠলি যে?

শরীরের প্রবল কম্পন দমন করে বললুম, ক্ষিদে নেই—

বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলুম মা বধূকে তিরস্কার করছেন, বোকা মেয়ে, কয়লা কখনো ভাতে দিতে আছে! ওর যা ঘেন্নাটে স্বভাব, দেখেই হয়তো না খেয়ে উঠে গেল!

রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলুম। অপূর্ব এই হিসাবে যে, তার পূর্বে কখনো অমন স্বপ্ন দেখিনি, এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে নেই।

স্বপ্ন দেখলুম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। শোবামাত্র বুঝতে পারলুম যে, বিছানায় চাদর পাতা নেই—তার বদলে আগাগোড়া টিকটিকির ডিম দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে যেতে লাগল আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কালসার সরীসৃপের মত লক্ষ লক্ষ টিকটিকির ছানা বেরিয়ে আমার সর্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল। প্রাণপণে উঠে পালাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু স্বপ্নে পালানো যায় না।

banglabooks.in

সেইখানে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলুম আর সেই ধেড়ে টিকটিকিটা—যাকে আমি মেরে ফেলেছিলুম—আমার ঘাড় বেয়ে নাকের ওপর উঠে বসে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল।

গিন্নীর ঠেলায় ঘুম ভেঙে দেখলুম, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং তখনো যেন টিকটিকির বীভৎস ছানাগুলো গা-ময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

ভাই, অনেক রকম দুঃস্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছি এবং আরো অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনটি যেন আর দেখতে না হয়।

ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, সেই বস্তুই বোধ করি জগতে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভূতের ভয় ঐ জাতীয়। তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চলল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পন্থাটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি করব, কোথায় যাব—যেন কোন দিকেই কিছু কিনারা পেলুম না।

এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এল। শুভেন্দু গয়া থেকে লিখেছে; চিঠি এমন কিছু নয়, 'তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি' গোছের, কিন্তু হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। মনে হল এ চিঠি নয়—দৈববাণী।

তৎক্ষণাৎ শুভেন্দুকে 'তার' করে দিলুম। আজই যাচ্ছি।

তারপর যথাকালে গয়ায় পৌঁছে টিকটিকির প্রেতাত্মার সদ্গতি সঙ্কল্প করে পিণ্ডি দিলুম। গয়াতে আজ পর্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না, কিন্তু সেই থেকে আমার ওপর আর কোনো উপদ্রব হয়নি।

সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছেন!

১৩৩৬

অ ন্ধ কা রে

বছর কয়েক আগে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একটা রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হইয়া কলিকাতা শহরটা দেখিতে দেখিতে দুই হাত জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ করি এখনো অনেকের স্মরণ আছে। অবশ্য কলিকাতার জলনিকাশের যেরূপ সুব্যবস্থা তাহাতে শহরের কোনও কোনও অংশে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হইবার পরই এক হাঁটু জল জমিয়া যাওয়া কিছু নূতন নয়। কিন্তু সেবারের দুর্যোগ এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, বোধ করি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এমনটা দেখা যায় নাই। ইলেক্‌ট্রিক তার ছিঁড়িয়া রাস্তায় গ্যাস-

banglabooks.in

বাতি নিভিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য মহানগরী একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সত্য-মিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি সেই এক রাত্রের জন্য একটা মোমবাতির দাম পাঁচ পয়সা হইতে দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বাদুড়বাগানে আমার বাসা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা জরুরী কাজে শহরের উল্টাদিকে হাওড়ার অভিমুখে গিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিতে সাতটা বাজিয়া গেল। ফিরিবার পথে চা খাইবার জন্য দর্মাহাটার কাছাকাছি একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকিলাম। বাহিরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় গ্যাসের আলো কাচের উপরকার বৃষ্টিবিন্দু ভেদ করিয়া ঝাপসাভাবে বাহির হইতেছে। আমার দুর্ভাবনার বিশেষ হেতু ছিল না—সঙ্গে ছাতা ছিল। আরাম করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিলাম।

দোকানে বেশী লোকজন ছিল না। দুটি লোক—একজন আধবয়সী ও একজন কর্ণমূল পর্যন্ত জুলপি বিশিষ্ট যুবক—অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দানীবাবু এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীর পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করিবার আপেক্ষিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে উত্তপ্তভাবে আলোচনা করিতেছিল। চা খাওয়া অনেকক্ষণ তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তর্কের ভালরকম নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্যই বোধ করি, তাহারা উঠিতে পারিতেছে না।

যুবক বলিল, 'জানেন মশায়, শিশির ভাদুড়ী আগাগোড়া বুড়ো আলমগীরের পার্ট করে, একবারও দাঁত বেরোয় না।'

আধবয়সী লোকটি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, 'ভারী কেরামতি! দাঁত নেই তো বেরুবে কোত্থেকে? আর দাঁত না বেরুলেই বড় অ্যাক্টর হয় নাকি?'

যুবক চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'আপনিও তো বুড়ো হয়েছেন, দাঁত না বার করে একটা কথা বলুন না দেখি!'

তর্ক শুনিতে শুনিতে ও চা খাইতে খাইতে প্রায় মিনিট পনের কাটিয়া গেল। চা শেষ করিয়া দাম দিয়া দোকান হইতে বাহির হইতেছি—যুবক তখন দানীবাবু সম্বন্ধে অত্যন্ত মানহানিকর কথাবার্তা বলিতেছে—এমন সময় সোঁ সোঁ করিয়া একটা উন্মত্ত হাওয়া কোথা হইতে আসিয়া দরজা জানালাগুলোকে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই নীল রঙের ভয়ঙ্কর আলোতে দু'চোখ একেবারে ধাঁধিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় শব্দে বাজ পড়িয়া কানদুটোকে যেন বধির করিয়া দিল। তাহারি মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, আকাশের গায়ে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। দিগন্ত ব্যাপিয়া নিকষকালো মেঘের উপর আরও কালো মেঘ জমিয়া যেন নিরেট নিভাঁজ হইয়া গিয়াছে—অন্য জিনিসের একতিল সেখানে জায়গা নাই।

এইবার ভীষণ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড় বড় ফোঁটা তির্যক্‌ভাবে নিরবচ্ছিন্ন মুষল-ধারে পড়িতে শুরু করিল। রাস্তার আলোগুলা জলের পুরু পর্দার অন্তরালে পড়িয়া নিস্তেজ হইয়া গেল. শুধু তাহাদের চারিদিক হইতে একটা মণ্ডলাকার প্রভা বাহির হইতে লাগিল।

দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম; চাকরটাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'আর এক পেয়ালা চা দাও তো হে!'

মেঘের আকস্মিক ধমকে তার্কিক দু'জনের বিসম্বাদ সহসা থামিয়া গিয়াছিল। তাহারা আবার আরম্ভ করিল. 'দানী ঘোষ যদি ইচ্ছে করে, অমন পাঁচটা শিশির ভাদুড়ীকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে!'

জুলপি বিশিষ্ট ছোকরা কড়া রকম একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'থাক না মশায়! পৃথিবীতে দানী ঘোষ আর শিশির ভাদুড়ী ছাড়া আর কি লোক নেই? অন্য কিছু আলোচনা করুন না।'

জুলপি সিংহবিক্রমে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চা খাচ্ছেন চা খান। মেলা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করবেন না।

আমি চা খাইতে লাগিলাম।

ক্রমে আটটা বাজিল। বৃষ্টির বিরাম নাই—সমভাবে সতেজে চলিয়াছে। তার সঙ্গে ঠান্ডা

banglabooks.in

এলোমেলো বাতাস। রাস্তায় লোক চলাচল কমিয়া আসিল।

নয়টা বাজিল। বাহিরে বৃষ্টি ও ভিতরে তর্ক একভাবে চলিয়াছে। অদ্ভুত একনিষ্ঠা এই দুটি লোকের, তখনো দানী ঘোষ ও শিশির ভাদুড়ীকে লইয়া কামড়াকামড়ি করিতেছে। পৃথিবীতে যেন অন্য প্রসঙ্গ নাই।

সাড়ে নয়টায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে করিয়া হোক রাত্রে বাড়ি পেঁছিতেই হইবে। কিন্তু যাই কি করিয়া? ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাইবে না—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইব। একে আমার সর্দির ধাত—তখন নিউমোনিয়া ঠেকাইবে কে? এই সময় বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল; হঠাৎ হাওয়ার বেগ যেন বাড়িয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

দোকানের চাকরটা নিস্পন্দভাবে নিবন্ত উনানের পাশে উপুড় হইয়া দেয়াল-ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। মাথার উপর ধুঁয়ায় মলিন ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা পীতবর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। বাহিরে আশেপাশের দোকান-পাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—মোটরের হর্ণ ও ট্রামের ঢং ঢং আর শুনা যাইতেছে না।

যুবক বলিল, 'শিশির ভাদুড়ী—'

ঠিক এই সময় হঠাৎ আলো নিভিয়া গেল।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

দোকানের চাকর ভাঙা গলায় বলিল, 'তার ছিঁড়ে গেছে—আজ রাতে আর মেরামত হবে না। দেশলাই দেবেন বাবু—ল্যাম্পোটা জ্বালি!'

অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেশলাই দিলাম। ল্যাম্পো জ্বলিল। মিটমিটে আলো ও দুর্গন্ধ ধুঁয়ায় ঘর ভরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণে প্রথম অন্য কথা কহিলেন, বলিলেন, 'নীলমণি, কেটলিটা আর একবার চড়াও—আর এক পেয়ালা চা হোক।'

জুল্পিধারী যুবক তীব্রভাবে আমার দিকে একবার তাকাইয়া গর্বিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'সিগারেট আছে?'

আমি পকেট হইতে সিগারেট কেসটা বাহির করিয়া দিলাম। গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া যুবক কেসটা তাচ্ছিল্যভরে আমায় ফেলিয়া দিল। তারপর এমনভাবে আমার দিকে পিছু করিয়া বসিল, যেন আমার বাঁচিয়া থাকার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আর আমি কাহারও কোনও কাজেই লাগিব না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহিরের দিকে একটা উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'এ বৃষ্টিতে বেরুনো যাবে না। গ্যাসগুলোও নিভে গেছে দেখছি! যা বাবা!' বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে আবার সেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

আমিও বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলাম,—সত্যই তো! রাস্তার গ্যাস-বাতি একটাও জ্বলিতেছে না। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও জনমানব নাই। কেবল অবিশ্রান্ত বারি পতনের ঝুপঝুপ ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ।

আর এক পেয়ালা চা খাইলাম। প্রৌঢ় লোকটি বলিলেন, 'আজ রাত্রে বাড়ি যাওয়া হল না দেখছি। নীলমণি, বিষ্টি থামলে আমাকে তুলে দিও।' বলিয়া বেঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। যুবক কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সিগারেট টানিতে লাগিল।

কিন্তু আমার তো বেঞ্চির উপর রাত কাটাইলে চলিবে না, বাড়ি যাওয়াই চাই। বাড়িতে স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া একলা আছেন। ঝিও হয়তো বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। অথচ বৃষ্টি না ধরিলে যাই বা কেমন করিয়া?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি—এগারোটা!

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাকের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে একটা অনৈসর্গিক শব্দ বাহির হইতেছে। যুবক স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাঁহার ঘুম ভাঙিলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

রাত্রি যত গভীর হইতেছে, আমার মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ততই বাড়িতেছে। এদিকে

banglabooks.in

ঝড়বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্যে কিছুমাত্র শ্রান্তির লক্ষণ নাই।

ঘড়ির কাঁটা সরিয়া সরিয়া পৌনে বারোটায় পৌঁছিল। নীলমণির ল্যাম্পোর জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে উঠিয়া বাতিটা একবার নাড়িয়া বলিল, 'তেল ফুরিয়ে গেছে—আর পাঁচ মিনিট।'

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাসিকা-নিঃসৃত একটি ধ্বনি অর্ধপথে রুখিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ, থেমেছে?'

নীলমণি বলিল, 'না বাবু, আলো নিভে যাচ্ছে।'

'ওঃ' বলিয়া নিরুদ্বেগে প্রৌঢ় আবার শুইবার উপক্রম করিলেন।

শিকার ফস্কায় দেখিয়া যুবক বলিল, 'আমি তখন বলছিলুম শিশি—'

আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'খবরদার বলছি! ফের যদি ওদের নাম করেছ ছোকরা, তোমার জুল্পি ছিঁড়ে নেব।'

আমার এই আকস্মিক উগ্রতায় যুবক ও প্রৌঢ় দুজনেই স্তম্ভিতবৎ আমার মুখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

নীলমণি ভগ্নস্বরে কহিল, 'বিষ্টি ধরে আসছে বাবু, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। আমি দোকান বন্ধ করি।'

সাগ্রহে বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখি সত্যই বৃষ্টির বেগ প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে—ঝড়ও যেন থামিয়াছে। একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া বুঝি তাহারা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ছাতাটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর দেরি নয়। যাইতে হয় তো এই সময়!

পশ্চাৎ হইতে যুবকের কণ্ঠস্বর আসিল, 'মশায়, দেশলাইএর গোটাকয়েক কাঠি দেবেন কি?'

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এই সময় পিছু ডাক! পকেট হইতে দেশলাইএর বাক্সটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ল্যাম্প দপ্ দপ্ করিয়া দু'বার খাবি খাইয়া নিভিয়া গেল।

কি অন্ধকার! একটা প্রকাণ্ড শহর বর্ষার রাত্রিকালে সহসা আলোকহীন হইয়া গেলে যে কিরূপ ভয়ানক অন্ধকার হয়, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। খুব শক্ত করিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলে কিম্বা অন্ধ করিয়া দিলেও বোধ করি এর চেয়ে বেশী অন্ধকার হয় না। নিষ্পলক চক্ষু দুটা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বিস্ফারিত হইয়া থাকে—এবং অন্য ইন্দ্রিয়গুলো অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সতর্ক হইয়া উঠে।

প্রথম ঝোঁকে খুব খানিকটা চলিয়া আসিয়া থমকিয়া পড়িলাম। কোথায় যাইতেছি—কোন্ দিকে যাইতেছি? বাড়ি গিয়া পৌঁছিবার একান্ত আগ্রহে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু এই বিদ্ঘুটে অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাইব কি প্রকারে? দোকান হইতে বাহির হইয়া ঠিক যে কোন্ মুখে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না! হয়তো বা যেদিকে বাড়ি তাহার উল্টা পথেই গিয়াছি। এখন উপায়!

কিন্তু পথের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। যে দিকে হোক চলা দরকার, যদি এমনিভাবে চলিতে চলিতে কোথাও একটা আলো বা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং আবার সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বৃষ্টি ও ঝড় ক্রমে কমিয়া কমিয়া একটা বিষাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া থামিয়া গেল। তখন এই অন্ধকারের বুকের উপর আর একটা জিনিস চাপিয়া বসিল—সেটা এই মধ্যরাত্রির ভয়াবহ নীরবতা। এতক্ষণ বৃষ্টির ঝপ্ ঝপ্ শব্দ ও বাতাসের গোঙানিতে যাহা চাপা ছিল, এখন তাহা উলঙ্গ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। পৃথিবীর সব মানুষ যেন মরিয়া গিয়াছে, শুধু আমি একা বাঁচিয়া আছি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা—একেবারে নিঃসঙ্গ।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। মনের গূঢ়তম প্রদেশে বোধ করি এই আকাঙ্ক্ষাটাই দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ চাই, সঙ্গী চাই, কোনও প্রকারে এই

banglabooks.in

দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিন্তু বেশী দূরে যাইতে হইল না। খানিক দূর গিয়াই প্রচণ্ড একটা হোঁচট লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে এক কোমর জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। ছাতাটা হাত হইতে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম,—না, এক কোমর নয়, তবে জল এক হাঁটু বটে। আন্দাজে বুঝিলাম বোধ হয় এতক্ষণ ফুটপাথে চলিতেছিলাম, এবার রাস্তায় নামিয়াছি। কিন্তু এই অবতরণটি যেমন সুখকর নয়, ফুটপাথে ফিরিয়া যাওয়াও তেমনি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ ফুটপাথ যে কোন্ দিকে তাহা জলে পতনের সঙ্গে সঙ্গে গুলাইয়া গিয়াছে।

পাঁচ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইবার পর যে রাস্তায় জল জমিতে পারে এ সম্ভাবনাটা তখন পর্যন্ত মাথায় আসে নাই। কিন্তু ভগবান যখন চোখে অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন দুশ্চিন্তা হইল—না জানি কোথায় অথৈ গভীর জল আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, হয়তো এক পা অগ্রসর হইলেই হুস করিয়া ডুবিয়া যাইব।

এক হাঁটু জলের মধ্যে এক পা এক পা করিয়া সাবধানে অগ্রগামী হইতে লাগিলাম। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। হায় ভগবান! এ আমার কি দুর্দশা করিলে। কেন মরিতে আজ ঘরের বাহির হইয়াছিলাম। যদি বাহির হইয়াই ছিলাম তবে চায়ের দোকানে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম না কেন?

কিন্তু পশ্চাত্তাপে কোনও ফল হইবে না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিতে চেষ্টা করিলাম—এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত। প্রথমতঃ কোনও রকমে ফুটপাথে ওঠা চাই—মাঝ রাস্তায় জলের মধ্যে দিয়া দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেও কোনও একটা লক্ষ্যে পৌঁছানো যাইবে না। ফুটপাথে উঠিতে পারিলে, কোনও একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়া লোক জাগাইয়া রাত্রির মত আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে কিম্বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব। মোট কথা যে উপায়েই হোক, নরলোকের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করা দরকার। এই অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে বেশী নয়, আপাততঃ একটা মানুষের দেখা পাইলেও যে সাক্ষাৎ চাঁদ হাতে পাইব তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

শামুকের মত হাঁটিয়া হাঁটিয়া কিন্তু কোনও দিকেই এমন একটা বিশিষ্ট কিছু ধরিতে পারিলাম না যেখান হইতে আমার যাত্রাটাকে সুনিশ্চিত করিতে পারি। এক হাঁটু জল কখনো কমিয়া আধ হাঁটুতে নামিতেছে, কখন উরু্ত পর্যন্ত পৌঁছিতেছে। এ ছাড়া, দিগ্‌দর্শন করিবার কিম্বা আবার যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার আর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্নই নাই।

সৃষ্টির প্রথম জীব বোধকরি এমনি অন্ধভাবে প্রলয়পয়োধির অতলতলের মহা স্তব্ধতার মধ্যে অদৃষ্ট পরিচালিত হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইত; এবং আবার মহাপ্রলয়ের দিন যখন সূর্যচন্দ্রের আলো নিভিয়া যাইবে, তখন সৃষ্টির শেষ জীব এমনি নিরুপায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

এইভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না—সময়ের ধারণাও এই ঘোর নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের আঙুলে একটা শক্ত বস্তু ঠেকিল। অনুভবে সিঁড়ির ধাপের মত বোধ হইল। তাহার উপর উঠিয়া দু'চার পা এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বুঝিলাম এতক্ষণে আমার সেই ঈপ্সিত ফুটপাথে পৌঁছিয়াছি।

যাক—তবু তো কিছু পাইয়াছি! দুই হাত বাড়াইয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে কিছুক্ষণ চলিলাম। একটা ভিজা দেয়াল হাতে ঠেকিল। তখন সেই দেয়াল ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল এইভাবে যাইবার পর কাঠের দরজায় হাত পড়িল। সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিলাম—এতক্ষণে বুঝি দুঃখ সাগরে কূল মিলিল।

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম। তারপরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম—'কে আছ দোর খোল' 'মশায় দয়া করে একটিবার দোর খুলুন' 'ওহে কেউ শুনতে পাচ্ছ, একবার দরজাটি খুলবে?' কিন্তু কোথায় কে? দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই রহিল। বাড়ির ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না। শুধু আমার আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কোথাও আশ্রয়

banglabooks.in

না পাইয়া একটা নিঃসঙ্গ প্রেতযোনির মত এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গুমরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূর্ব্ববৎ দেয়াল ধরিয়া আবার আর একটা দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। দরজা খুলিল না,—এমন কি দরজার অন্তরালে কোথাও যে লোক আছে, তাহার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। আরও দুই তিনটা দরজা এমনিভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং—ফলের কোনও তারতম্য হইল না।

শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল,—মনও উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হইয়া গেল। যদি কলিকাতার সবাই মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আমার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? এখন কোথাও একটু শুইবার জায়গা পাইলে আর কিছুরই আমার দরকার নাই। জলের মধ্যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা দুটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—যদি মরিতেই হয় তবে কোনও একটা শুষ্ক স্থানে পা ছড়াইয়া শুইয়া মরিতে পারিলেই ভাল।

কিন্তু পা ছড়াইয়া শুইবার মত স্থান এই প্রলয়-প্লাবিত কলিকাতা শহরটার মধ্যে কোথায় পাওয়া যায়? ফুটপাথের ওপরেও তো প্রায় এক ফুট জল!

যা হোক, এরকমভাবে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। মন যতই অবসাদে ডুবিয়া যাইতে চাহিল, ততই তাহাকে জোর করিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতে লাগিলাম। একটা কিছু সুরাহা হইবেই। এমন কখনো হইতে পারে যে কোনও বাড়ির লোক সাড়া দিবে না? হয়তো এখনই একটা বিলম্বিত ভাড়াটে গাড়ি কিম্বা একজন আলোকধারী পথিক আসিয়া পড়িবে।

হঠাৎ আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কোনও অভাবনীয় উপায়ে অন্ধ হইয়া যাই নাই তো! নহিলে এ কি সম্ভব যে এতক্ষণ ধরিয়া এই দু'চক্ষে একটা কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? এত অন্ধকার কি হইতে পারে? হয়তো সেই যখন জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম—

দু'চক্ষু সজোরে কচ্‌লাইতে আরম্ভ করিলাম—কিন্তু চক্ষুর দুর্ভেদ্য তিমির দূর হইল না। হঠাৎ মনে হইল দেশলাই জ্বালিয়া দেখি না কেন! দু'পকেট খুঁজিলাম, দেশলাই নাই। দেশলাই যে জুলপিকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তখন কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না।

যেন পাগলের মত হইয়া গেলাম। অন্ধ হইয়া গিয়াছি কিনা এ সন্দেহটা তখনি যেমন করিয়া হোক ভঞ্জন করিতেই হইবে—মুহূর্ত বিলম্ব সহে না! আর একটা দরজার সম্মুখে গিয়া দু'হাতে তক্তার উপর চাপড়াইতে লাগিলাম, 'ও মশায়, কে আছেন একটিবার দোর খুলুন না। ও মশায়!'

পিছন হইতে শান্তস্বরে কে বলিল, 'মিছে চেঁচামেচি করছেন—এখানে কি লোক আছে যে উত্তর দেবে! এগুলো সব দোকান।'

আমি যেন আঁতকাইয়া উঠিলাম; 'অ্যাঁ—কে—কে—কে?'

'কোনও ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে। আমার হাত ধরুন।'

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। একখানা হাত—বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—আমার আঙুলগুলো চাপিয়া ধরিল। আমার পা হইতে চুলের ডগা পর্যন্ত যেন একবার অসহ্য শীতে কাঁপিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁতে ঠুকিয়া ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হইতে লাগিল।

আমি বুদ্ধিভ্রষ্টের মত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কি অন্ধ হয়ে গেছি?'

ছোট্ট একটি হাসির শব্দ হইল।

'না, ভারি অন্ধকার তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম, 'আমার বাড়ি বাদুড়বাগানে।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। অদৃশ্য আগন্তুক স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে আমাকে সব রকম বাধা-বিঘ্ন বাঁচাইয়া লইয়া চলিল। আমার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

banglabooks.in

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, এই অন্ধকারে আপনি তো বেশ দেখতে পাচ্ছেন।'

কোনও উত্তর পাইলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি দর্মাহাটার একটা দোকানে চা খেতে ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কোথায় এসে পড়েছিলাম, বলতে পারেন?'

উত্তর হইল, 'আপনি নিমতলা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।'

নিমতলা ঘাট! সর্বাঙ্গের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে? আপনার নাম কি?'

'আমার নাম—শুনে আপনার লাভ নেই।—এদিক দিয়ে ঘুরে আসুন, ওখানে একটা ম্যানহোল খোলা আছে। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? ওর মধ্যে যদি আপনি গিয়ে পড়েন তাহলে আর—'

সভয়ে সরিয়া আসিলাম।

অল্পকাল পরে আমার দিব্যচক্ষুষ্মান পথ-প্রদর্শক বলিল, 'অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। শহরের মাঝখানে, ঠন্ঠনের কালীবাড়ী ঘিরে প্রায় দেড় মানুষ জল জমেছে। আপনি সে পথ দিয়ে যেতে পারবেন না।'

আমি নিঃশব্দে পথ চলিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে বলিলাম, 'কলকাতা শহরটা মনে হচ্ছে যেন শ্মশান হয়ে গেছে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষ নেই—'

'ও রকমটা মনে হয়। শহরের প্রাণ হচ্ছে তার রাস্তাঘাট। সেখানে মানুষ না থাকলে শ্মশান আর শহরে কোন তফাৎ থাকে না।'

আমি কতকটা নিজের মনেই বলিলাম, 'মনে হচ্ছে যেন এটা ভূতের রাজ্য!'

হাসির শব্দ হইল।

'এই রকম রাত্রে ভূতেদের ভারি ফুর্তি হয়—কি বলেন?—আচ্ছা, আপনি যখন একলা দরজা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন যদি একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হত, আপনি কি করতেন বলুন দেখি?'

'কি করতাম? বোধহয় দাঁতকপাটি লেগে মারা যেতাম।'

হা হা হা হা! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! আচ্ছা, ভূতকে এত ভয় কিসের বলুন দেখি? একটা লোক মরে গেছে বৈ তো নয়?'

'বলেন কি মশায়! ভূত হল গিয়ে একটা—প্রেতাত্মা। তার চালচলন রীতিনীতি স্বভাব-চরিত্র কিছুই জানা নেই—ভয় করবে না?'

'তা বটে।—আচ্ছা, মনে করুন—না থাক—'

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুরুগুরু করিয়া উঠিল। এ কাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছি?

তবু মনে সাহস আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'আপনার নাম তো বললেন না। কোথায় থাকেন বলবেন কি?'

'কোথায় থাকি? যেখানে দেখা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি থাকি।'

'আজ আমার যে উপকার করলেন, জন্মেও তা ভুলব না। আবার আমাদের দেখা হবে নিশ্চয়!'

'দেখা—বোধহয়—আর হবে না—তবে যদি আবার কখনো এমনি বিপদে পড়েন—হয়তো...'

'আচ্ছা, আপনি কি করেন? কোন কাজকর্ম করেন নিশ্চয়—তাও কি বলতে দোষ আছে?'

'আমি কিছু করি না, এমনি ঘুরে বেড়াই—বেকার।'

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ।...

'আপনার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সব ভাল আছে—কোন ভাবনা নেই।'

আমি চমকাইয়া উঠিলাম।

'আপনি আমার মনের কথা জানলেন কি করে?'

আবার হাসির শব্দ হইল।

banglabooks.in

'এ রকম অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে স্বভাবতঃ কি চিন্তা আসে তা আন্দাজ করা কি খুব শক্ত?'

'না—তা বটে। কিন্তু—কিন্তু—আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে আছে, আপনি জানলেন কি করে?'

'ওটাও আন্দাজ।'

দীর্ঘ নীরবতা। এ কে? কোন জগতের অধিবাসী?

আমি মরীয়া হইয়া আরম্ভ করিলাম, 'দেখুন—'

'ওকথা জিজ্ঞাসা করবেন না।'

আমার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'আ—আ—আমায় ছেড়ে দিন—আমি—' গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হইল না।

'ভয় পাবেন না—এতক্ষণ যখন এসেছেন, তখন আরও খানিকটা আসুন। আপনার বাড়ি প্রায় এসে পড়েছে।'

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল, গলা এমনভাবে বুজিয়া গেল যেন শত চেষ্টা করিয়াও একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিব না। বরফের মত হাতখানা আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।...

সহসা শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিল। সে দাঁড়াইল, আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

'এইবার আপনি একলাই যেতে পারবেন। এখান থেকে গুণে একশ' পা এগিয়ে যান, গিয়ে ডানদিকে ফিরলে সামনেই পাবেন—সেই আপনার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে,—এবার আমাকে যেতে হবে।'

আমি অর্ধমূর্ছিতের মত নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনরায় হাসির শব্দ হইল। কিন্তু এবার যেন শব্দটা বড় ব্যথাপূর্ণ।

সে বলিল, 'আপনি বড় ভয় পেয়েছেন। আচ্ছা চললাম তবে, এই নিন আপনার ছাতা, জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ভোর হতে আর দেরি নেই—আচ্ছা—বিদায়।' শেষ কথাটা যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত মিলাইয়া গেল।

আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আছেন কি?'

উত্তর আসিল না।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম—অতি দূরে পূর্ব আকাশের পুঞ্জিত মেঘ ভেদ করিয়া অল্প একটুখানি ফ্যাকাসে আলো দেখা দিয়াছে।

১৩৩৭

banglabooks.in

মরণ-ভোমরা

বড়দিনের ছুটি শেষ হইতে আর দেরি নাই। গত কয় দিন হইতে পছিয়া বাতাস দিয়া দুর্জয় শীত পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন ক্লাবের সভ্য চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া চিম্‌নির গন্‌গনে আগুনের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। বাহিরের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ও প্রবল বায়ু মিলিয়া একটা দুর্যোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল।

অমূল্য বলিল, "আজ আর কেউ আসছে না, চলো বাড়ি ফেরা যাক। তিনজনে ভূতের মতো বসে থেকে কোনও লাভ নেই—চারজন হলেও না হয় ব্রিজ্ খেলা যেত।"

বরদা স্তিমিতনেত্রে আগুনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই বলিল, "সেবারে এই ডিসেম্বর মাসে কসৌলী গিয়েছিলুম—বাপ! কী শীত! মাথার ঘিলু পর্যন্ত জমে যাবার উপক্রম। পালিয়েই আসতুম—যদি না একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে সব ওলট্-পালট্ করে দিত।—আচ্ছা, কত বড় গঙ্গাফড়িং তোমরা দেখেছ বলো দেখি?"

অমূল্য বলি, "হুঁ, আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবার মতলব। ওসব চালাকি চলবে না বরদা, আমি উঠলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কসৌলী গিয়েছিলে কেন?"

বরদা বলিল, "কুকুরে কামড়েছিল; সেই কথাই তো—"

অমূল্য বলিল, "জানি, সে বিষ এখনও তোমার শরীর থেকে বেরোয়নি। আমি আর এখানে থাকছি না, তোমার গঙ্গাফড়িং নিয়ে তুমি থাকো।"

অমূল্য উঠিয়া পড়িল, শালখানা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘোমটার মতো করিয়া মাথায় দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বার বন্ধ ছিল, ঠেলা দিয়া খুলিয়াই অমূল্য চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "কে রে!"

"মশায়, আসতে পারি কি?"

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখিলাম, ওভারকোট ও মাঙ্কি-ক্যাপে সর্ব অবয়ব আচ্ছন্ন করিয়া একটি লোক দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মুখচোখ কিছুই দেখা গেল না, শুধু ব্যালাক্লাভা ও ওভারকোটের কলারের অন্তরালে একজোড়া কালো গোঁফের আভাস পাওয়া গেল মাত্র।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান?"

লোকটি বলিল, "এইটি কি বাঙালীদের ক্লাব?"

বরদা আহ্বান করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। অমূল্য, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো হে, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।'

লোকটি ঘরে আসিয়া প্রথমে মাঙ্কি-ক্যাপ ও পরে ওভারকোট খুলিয়া চেয়ারের পিঠের উপর রাখিল, তখন প্রকাণ্ড খোলের ভিতর হইতে অতি ক্ষুদ্র শামুকের মতো তাহার চেহারাখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মানুষ যে এত শীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা এই লোকটিকে না দেখিয়া ধারণা করা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি বা মানসিক দুশ্চিন্তা তাহার নিরতিশয় ক্ষীণ শরীরটির প্রত্যেক অবয়বে যেন জরার ছাপ মারিয়া দিয়াছে। মাংসহীন মুখের উপর ঘনকৃষ্ণ একজোড়া গোঁফ মুখখানাকে আরও শুষ্ক শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে। কপালে গভীর কালো রেখা—মুখের রং ফ্যাকাসে পীতবর্ণ। মাথার দুই পাশে বড় বড় একজোড়া কান যেন পাখা মেলিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে। তাহার মুখের সমস্ত প্রত্যঙ্গই মৃত বলিয়া মনে হয়—কেবল কালিমা-বেষ্টিত বড় বড় দুইটা চক্ষু যেন দেহের শেষ প্রাণশক্তিটুকু হরণ করিয়া জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

অজীর্ণ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির তাড়নায় যাঁহারা শীতকালে সুজলা বাংলাদেশের

banglabooks.in

মায়া কাটাইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধরনের চেহারা দুই-একটা যে দেখি নাই এমন নয়। বুঝিলাম, ইনিও একজন স্বাস্থ্যান্বেষী বায়ুভুক্ জীব। মনে মনে ভাবিলাম, কেবলমাত্র মুঙ্গেরের জলহাওয়া এই কংকালে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি? ঘোর সন্দেহ হইল।

অমূল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ক্লাবের কোন সভ্যকে খুঁজছেন?"

লোকটি একবার আমাদের তিনজনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার গোঁফজোড়া নড়িয়া উঠিল। তারপর অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা হতেও পারে, এখনও ঠিক বলতে পারছি না।"

আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম। লোকটি পুনশ্চ বলিল, "আমি এ শহরে নবাগত। আজ তিন দিন হল এসেছি—ডাকবাংলোয় আছি; কিন্তু এ ক'দিন বাঙালীর সঙ্গে কথা না কয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, মশায়। আজ সন্ধ্যেবেলা বেয়ারার কাছে খবর পেলুম, এখানে বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, তাই খোঁজ করতে করতে এসে হাজির হয়েছি। আর থাকতে পারলুম না।"

আমি বলিলাম, "বেশ করেছেন। যতদিন থাকেন নিয়মিত আসবেন, আমরা খুব খুশি হব। তা—স্বাস্থ্য উপলক্ষে এখানে আসা হয়েছে বুঝি?"

লোকটি বলিল, "না, স্বাস্থ্য তো আমার বেশ ভালোই।"—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটা তুলিয়া বলিল, "সে জন্যে নয়, মশায়; মৃত্যু আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভারতবর্ষময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি; কিন্তু রেহাই নেই। যেখানেই যাই, মৃত্যু আমার পেছনে লেগে আছে। মনে ভাবি, আর বাঙালীর সঙ্গে দেখা করব না; কিন্তু পারি না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

কথাটা খাপছাড়া ঠেকিল, কিন্তু তবু মৃত্যু যে তাহাকে তাড়া করিয়াছে এবং অচিরাৎ ধরিয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে অন্ততঃ আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তথাপি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "এখানকার জলহাওয়া খুব ভালো, কিছু দিন থাকুন, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।"

লোকটি পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস্ বাহির করিয়া বলিল, "ধূমযাত্রা করেন কি?"—বলিয়া তিনটি ভীষণদর্শন সিগার আমাদের তিনজনকে দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। আমরা নির্বাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। এই শরীরের উপর এইরূপ বিকটাকৃতি বিষাক্ত কড়া সিগার টানিয়া লোকটা কয় দিন বাঁচিবে?

আমাদের মুখের প্রতি কিন্তু তাহার নজর ছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনারা ভুল করছেন। আমি দেখতে একটু রোগা বটে, কিন্তু আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। ধরুন তো আমার পাঞ্জা।"—এই বলিয়া কাঠির মতো অঙ্গুলিযুক্ত কংকালসার হাতখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

পাগল নাকি! আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না, না, সে কথা বলিনি। আমি বলছিলুম—"

"ধরুন পাঞ্জা—" লোকটির চক্ষু দু'টা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা মনে মনে প্রমাদ গণিলাম; কোথা হইতে একটা উন্মাদ আসিয়া জুটিল! আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিতেছি দেখিয়া লোকটা নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, "আপনারা ভাবছেন, রোগা বলে আমার গায়ে জোর নেই। ভুল! ভুল! পাঞ্জায় গামা পালোয়ানও আমাকে হারাতে পারে না। ধরুন পাঞ্জা।"

কি করি, নিরুপায় হইয়াই তাহার পাঞ্জা ধরিলাম। নিজের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে ভালো ধারণাই ছিল; ভয় হইল, বুঝি একটু চাপ দিলেই ঐ প্যাঁকাটির মতো আঙুলগুলো মট্‌মট্ করিয়া ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার হাতে হাত দিয়াই বুঝিলাম, সে আশংকা অমূলক। তাহার আঙুলগুলো ইস্পাতের তারের মতো আমার আঙুলগুলোকে জড়াইয়া ধরিল। আমি যতই বলপ্রয়োগ করি, তাহার কব্জি ততই লোহার মতো শক্ত হইতে থাকে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ নির্বিকার, দাঁতে সিগার চাপিয়া স্বচ্ছন্দে ধূম্র উদ্‌গিরণ করিতেছে।

banglabooks.in

ক্রমে আমার হাত অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর সবিস্ময়ে দেখিলাম, হাতখানা অজ্ঞাতসারে ঘুরিয়া যাইতেছে।

আমার কব্জির কাছে মট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। "ব্যাস্! কাবার!"—বলিয়া লোকটা পাঞ্জা ছাড়িয়া দিল। আমি স্তম্ভিতভাবে অবশ হাতখানা তুলিয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না, লোকটা অর্ধমুদিতনেত্রে সিগার টানিতে লাগিল।

অবশেষে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের নামটি কি?"

সে বলিল, "ভূতনাথ শিকদার। দেখলেন তো যা বললুম সত্যি কি না? রোগ আমার শরীরে নেই মশায়, রোগ এইখানে।"—বলিয়া নিজের কপালে তর্জনী ঠেকাইল।

বরদা নিজের চেয়ারখানা ভূতনাথ শিকদারের পাশ হইতে একটু সরাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিলেন, তা তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না; ভোজবাজি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু শরীর যদি আপনার নীরোগই হয়, তবে আপনি এত রোগা কেন? মাথার কি কোনও অসুখ আছে?"

ভূতনাথ শিকদার বলিল, "মাথার অসুখ নেই, অসুখ আমার কপালের, ভাগ্যের। বলছি তো, মৃত্যু আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

বরদা বলিল, "কথাটা আর একটু খোলসা করে না বললে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

শিকদার চুরুটে তিন চারটা টান দিয়া যেন কি চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "আচ্ছা, বলছি, কিন্তু এ কথা শোনবার পর আর আপনারা আমার মুখদর্শন করতে চাইবেন না। এই ভয়েই তো দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—বাঙালীর ছায়া মাড়াতে চাই না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আপনারা আমায় মাফ করবেন, আমি একটা মহা অলক্ষণ, যাদের সঙ্গে মিশি, তাদেরই অমঙ্গল হয়।"

তাহার কথাগুলা এমন একটা অবসন্ন করুণ রেশ রাখিয়া গেল যে, কিছু না-বুঝিয়াও আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। হয়তো লোকটি জীবনে অনেক দুঃখশোক পাইয়াছে, তাই মাথাটা কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছে—মনে করে, যাহার সহিত কথা কহিবে তাহারই অমঙ্গল ঘটিবে। আমার এক দূর-সম্পর্কীয় পিসীমার এইরূপ হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে স্বামী, তিন পুত্র ও সাতটি নাতি-নাতনী হারাইয়া তিনি প্রায় পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সর্বদা চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, বলিতেন—আমি কাহারও মুখ দেখিব না, আমার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িবে, সে আর বাঁচিবে না। ভূতনাথ শিকদারেরও হয়তো সেই রকম কিছু হইয়া থাকিবে।

আমি বলিলাম, "তা হোক, আপনি বলুন। ও সব অলক্ষণ-কুলক্ষণ আমরা মানি না।"

শিকদার বলিল, "আপনাদের তরুণ বয়স, ও সব না-মানাই স্বাভাবিক। ভূত-প্রেত, পরকাল, সূক্ষ্মদেহ এ সব আপনাদের মানতে বলছি না, কিন্তু আসন্ন দুর্ঘটনা যে আগে থাকতে মানুষের জীবনে ছায়াপাত করে, এ কথাও কি আপনারা স্বীকার করেন না?"

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। শিকদার বলিতে লাগিল, "তবে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। আমার জীবন কেন যে মনুষ্যসমাজ থেকে একটা ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুনলে আপনারা হয়তো আমাকে পাগল মনে করবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমি পাগল নই, আপনাদের মতো সহজ মানুষ। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে, হেসে-কেঁদে সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতে চাই; কিন্তু পারি না। কেন পারি না, জানেন? ভয়! দারুণ ভয়ে আমি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। একটা মহা আতঙ্ক সব সময় আমাকে গ্রাস করে আছে। যখন একলা থাকি বেশ থাকি, কিন্তু আপনারাই বলুন তো, মানুষ একলা সঙ্গিহীনভাবে কত দিন থাকতে পারে? তাই মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হয়।

"আমি বিবাহ করিনি, কেন করিনি তা সহজেই বুঝতে পারবেন। বাপ-মা অনেক দিন গত হয়েছেন, আত্মীয়স্বজনও এখন বড় কেউ নেই, চিৎপুর রোডে পৈতৃক বাড়িখানা এখনও বিক্রী করিনি, টাকাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তবু একটা সৃষ্টিছাড়া অন্ধকার ধূমকেতুর মতো কেবল শূন্যের মাঝখানে ছুটে বেড়াচ্ছি—কেন?

banglabooks.in

"যখন আমার ষোল বছর বয়স, তখন একদিন গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় তিনজন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে আমি আমাদের বাড়ির তেতলায় একটা ঘরে বসে তাস খেলছিলুম। সেই দিনটা হচ্ছে আমার জীবনের একটা অভিশাপ। স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে গেছে, রোজই আমাদের এই রকম খেলা বসে। তেতলার এই ঘরটি দিব্যি নিরিবিলি, চিৎপুর রোডের চিৎকার সেখান পর্যন্ত পৌঁছয় না, শুধু মাঝে মাঝে ট্রামের ঢং ঢং শব্দ শোনা যায়। সে দিন আমরা চারজন নিবিষ্টমনে বসে খেলছি, এমন সময় খোলা জানলা দিয়ে একটা কালো ভোমরা ঘরে ঢুকে আমাদের ঘিরে ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরতে লাগল। খেলায় এত তন্ময় ছিলুম যে প্রথমটা লক্ষ্যই করিনি, কিন্তু সেটা যখন মাথার চারিদিকে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করলে, তখন আমরা চারজনেই উঠে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু সেও কিছুতেই যাবে না; পাখা দিয়ে, ব্যাড্‌মিণ্টনের ব্যাট্‌ দিয়ে যতই তাকে মারবার চেষ্টা করি, সেও ততই আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে কখনও নিচুতে, কখনও প্রায় কড়িকাঠের কাছে উঠে ঘুরতে থাকে। আমরা যেই আবার খেলতে বসি, অমনই আমাদের কানের কাছে এসে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে উড়তে আরম্ভ করে।

"প্রায় আধ ঘণ্টা তার পেছনে লেগে থাকবার পর যখন আমরা হয়রান হয়ে পড়েছি, তখন ভোমরাটা ভন্‌ভন্‌ করে এসে একবার আমাদের মাথার চারিদিকে চক্র দিয়ে নিজে থেকেই জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরের তপ্ত বাতাসে তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

"গোপাল বললে, 'দেখ ভাই, আশ্চর্য ভোমরা! একবার আমি ব্যাড্‌মিণ্টন ব্যাট্‌ দিয়ে মারলুম, ঠিক মনে হল ভোমরাটা তাঁতের ভেতর দিয়ে গলে গেল।'

"বীরেন বললে, 'দূর! অত বড় ভোমরা কখনও অতটুকু ফাঁক দিয়ে গলতে পারে?'

"হরিপদ বললে, 'কিন্তু এই কলকাতা শহরে ভোমরা এলো কোত্থেকে, ভাই? কাছে-পিঠে কোথাও বাগানও তো নেই!'

"সত্যি তো, ভোমরা এলো কোত্থেকে? আমরা নানারকম আঁচ-আন্দাজ করতে লাগলুম, কিন্তু কোনটাই বেশ লাগসই হল না। তখন আমাদের বয়স কম, ভোমরা কোথা থেকে এলো, এ সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালুম না; কিন্তু ভোমরাটাকে মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতেও পারলুম না।

"পরদিন দুপুরে গোপাল তাস খেলতে এলো না। তিনজনে খেলা ভালো জমল না, সারা দুপুর গল্প করে আর গোপালকে গালাগাল দিয়ে কাটিয়ে দিলুম।

"গোপাল গ্রে স্ট্রীটে থাকত। বিকেলবেলা তার বাড়ি গিয়ে দেখলুম, সে বিছানায় শুয়ে আছে, মাথায় বরফ দেওয়া হচ্ছে। আমার দেখে চিনতে পারলে কি না বোঝা গেল না,—চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে লাল। শুধু একবার গোঙিয়ে গোঙিয়ে কি একটা কথা বললে—মনে হল যেন বললে—ভোমরা!

"তার চারিদিকে ডাক্তার আর বাড়ির লোক ভিড় করেছিল; কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, গোপালের কি হয়েছে। পরে শুনেছিলুম—সর্দিগর্মি। সান্‌-স্ট্রোক্‌।

"আমি চুপি চুপি চোরের মতো বাড়ি ফিরে এলুম; তার সেই অস্পষ্ট কথাটা আমার মাথার মধ্যে কেবলই গুমরে গুমরে উঠতে লাগল—ভোমরা! ভোমরা!

"পরদিন গোপাল মারা গেল। সেই থেকে, কি করে জানি না, আমার মনে গেঁথে গেল যে, সেই ভোমরাটা ছিল মৃত্যুর দূত। গোপালের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, এই খবরটা সে আমাদের দিতে এসেছিল।

"তারপর থেকে এই কুড়ি বছরের মধ্যে কতবার ভোমরা দেখেছি জানেন?—তিনশ' একুশবার। আর, একবারও আমার ভোমরা দেখা নিষ্ফল হয়নি!"

নির্বাপিত সিগারটা আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শিকদার আর একটা সিগার ধরাইল। আমরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

শিকদার বলিল, "প্রথম প্রথম মনে হত, বুঝি আমার মনের ভুল; কিন্তু তা নয়—

banglabooks.in

ভোমরাটাকে সকলেই দেখতে পায় এবং দেখার তিন দিনের মধ্যে যারা দেখেছে, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু অনিবার্য। বাবা মারা যাবার আগে ভোমরা দেখলুম,—মা'র বেলাতেও দেখা পেলুম।

"ক্রমে মানুষের সঙ্গ আমার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠল—সর্বদাই আতঙ্ক, কি জানি কখন ভোমরা দেখে ফেলি। হয়তো পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব মিলে গল্প করছি, হঠাৎ ভোমরা দেখা দিলেন। দুম্ করে বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল। আমার এই সুস্থ সবল বন্ধুদের মধ্যে একজনের মেয়াদ ফুরিয়েছে—তিন দিনের মধ্যে তাঁকে যেতে হবে।

"একটা উৎকট কৌতূহল হত; জানতে ইচ্ছে করত, এদের মধ্যে কাকে ভোমরা নোটিশ দিয়ে গেল। মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করতুম—এবার কার পালা; কিন্তু আন্দাজ ঠিক হত না। ভোমরার মৃত্যু-পরোয়ানার মধ্যে ঐটুকু ছিল কৌতুক—কার ওপর সমন জারি করে গেল, শেষ পর্যন্ত বোঝা যেত না।

"একবারকার ঘটনা বলি। বর্ধমানে মামার বাড়ি গিয়েছি; মামার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে ; পৌঁছনোর পরদিন সকালবেলা আমরা সকলে মিলে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় ভোমরার আবির্ভাব হল। আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল। সুবী বলে মামার একটা বছর দশেকের মেয়ে দেয়ালের ধারে বসে চা তৈরি করছিল, ভোমরাটা উড়তে উড়তে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে টপ্ করে পড়ল একেবারে সুবীর মাথায়। সুবী হাঁউমাউ করে উঠে দাঁড়াতেই জ্বলন্ত স্টোভটা উল্টে গিয়ে তার কাপড়ে আগুন ধরে গেল। ভোমরা ভোঁ করে উড়ে পালাল।

"আমরা পাঁচজনে মিলে সুবীর কাপড়ের আগুন নেবালুম বটে, কিন্তু তার পা দুটো ঝলসে সাদা হয়ে গেল। ডাক্তার এসে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে বলে গেলেন—সিরিয়াস্ কিছু নয়, খুব বেঁচে গেছে।

"আমি মনে মনে বললুম—বেঁচে মোটেই যায়নি,—এ ভোমরার নোটিশ, ব্যর্থ হবার নয়। ঘা থেকে সেপ্টিক্, তার পরেই সাফ।

"দুপুরবেলা সুবীর জ্বর এলো। সন্ধ্যের সময় আমি একটা ছুতো করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বর্ধমান ছেড়ে পালালুম। সুবীটা বড় ভালো মেয়ে ছিল, মামাতো ভাইবোনের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতুম।

"বাড়ি ফিরে এসে কাউকে কিছু বললুম না। যথাসময়ে টেলিগ্রাম এলো—সুবীর কিছু হয়নি, মামা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন!

"ভোমরার অভিসন্ধি বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম, তাই সে আমার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করে গেল।

"আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন,—সর্বদা যেন মৃত্যুর দূতকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি। অনেক ভেবে ভেবে একটা মতলব ঠিক করলুম,—দিনের বেলা যতদূর সম্ভব একলা থাকতুম, রাত্তিরে বাড়ি থেকে বার হতুম। মনের ভাবটা এই যে, রাত্তিরে তো আর ভোমরা আসতে পারবে না!

"কিন্তু আমার ফন্দি খাটল না। দিন-রাত্রি নির্বিচারে ভোমরা আসতে লাগল—রাত্তিরে কানামাছির মতো টাউরি খেতে খেতে আসে, আবার টাউরি খেতে খেতে চলে যায়।

"আমার মানসিক অবস্থা ক্রমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই জিজ্ঞাসা করে, "তুই অমন কুনো হয়ে যাচ্ছিস কেন? চেহারাটাও দিন দিন ভূতে-পাওয়া গোছের হয়ে যাচ্ছে। হয়েছে কি?"

"আমি চুপ করে থাকি—কি বলব? সত্যি কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারি না।

"অতঃপর বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে এই নিরুদ্দেশ-যাত্রা শুরু হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু মৃত্যু-দূত আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এক এক সময় হাত জোড় করে ডাকি, 'মরণ-ভোমরা! তুমি এবার আমাকে নাও, এই দুঃসহ শাস্তি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।'—কিন্তু আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। এ সংসারে কেবল আমিই যেন অমর,

banglabooks.in

সকলের মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে বেড়াচ্ছি।"

শিকদারের কণ্ঠস্বর একটা গভীর নিরাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল। তাহার কথাগুলো ঘরের মধ্যে যেন একটা অবাস্তব দুঃস্বপ্নের জাল বুনিয়া দিয়াছিল। আমরা আগুনের দিকে তাকাইয়া মোহাচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শেষ কবে মরণ-ভোমরা দেখেছেন?"

শিকদার চোখের উপর দিয়া ডান হাতখানা একবার চালাইয়া বলিল, "সাত দিন আগে, আগ্রায়। তাজ দেখতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি বাঙালী দম্পতির সঙ্গে দেখা হল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তাজ দেখতে এসেছে—ছেলেমানুষ, নবপ্রণয়ী। প্রণয়ের মহাতীর্থে নিজেদের সম্মিলিত ভালোবাসা বোধ হয় নিবেদন করতে এসেছিল। তার পর...ভোমরা... সেই রাত্রেই আগ্রা ছেড়ে চলে এলুম।"

চারজনেরই সিগার নিবিয়া গিয়াছিল, পুনশ্চ ধরাইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিলাম।

মিনিট পনের সকলেই চুপচাপ।

হঠাৎ শিকদার বলিল, "একটু গরম বোধ হচ্ছে না? জানলাটা খুলে দিতে পারি?"

বন্ধ ঘরে সিগারের কটু ধোঁয়া ও আগুনের উত্তাপে সত্যই দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেই শিকদার উঠিয়া পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলিয়া দিল।

বরদা আমার কানে কানে বলিল, "একেবারে বদ্ধ পাগল—মনোম্যানিয়াক্। ওর চোখের চাউনি দেখছ?"

শিকদার জানালা খুলিয়া দিতেই একটা এলোমেলো কন্‌কনে হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাদের উত্তপ্ত মুখের উপর যেন ঠান্ডা হাত বুলাইয়া দিল। টেবিলের উপর আলোটা নিব-নিব হইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল।

শিকদার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছে, এমন সময়—

ভন্‌ন্—

ও কিসের শব্দ? চারিজনেই চেয়ারের উপর সোজা শক্ত হইয়া বসিলাম।

পরক্ষণেই খোলা জানালা দিয়া একটা কালো কুচকুচে ভোমরা পাখার শব্দে আমাদের মগজ ভরিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভোমরা টেবিলের উপরের বাতিটাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; তারপর সোঁ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ছাদে বাধা পাইয়া টপ্ করিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার গুঞ্জন নিস্তব্ধ।

আবার ভন্ করিয়া শব্দ হইল। ভোমরা মেঝে হইতে উঠিয়া একবার বিদ্যুদ্বেগে ঘরময় উড়িয়া বেড়াইল। তারপর আমাদের কানের পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার গুঞ্জন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে মিলাইয়া গেল।

শিকদার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটা পাগলের মতো। প্রায় চিৎকার করিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন!—আমি একটা অভিসম্পাত। আর কখনও আমার দেখা পাবেন না!"—বলিয়া ওভারকোট ও টুপি ফেলিয়াই ঝড়ের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা তিন বন্ধু বিহ্বল জিজ্ঞাসুভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।

তিন দিনের মধ্যে কাহাকে যাইতে হইবে?

৫ পৌষ ১৩৩৮

banglabooks.in

অশরীরী

পুরাতন উই-ধরা ডায়েরিখানি সাবধানে খুলিয়া বরদা বলিল, 'অদ্ভুত জিনিস, কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। আমাদের আবদুল্লা কুঁজড়াকে জান তো? সাহেবদের কুঠি থেকে পুরানো বই সের দরে কিনে বিক্রি করতে আসে? তারি কাছ থেকে এটা কিনেছি, ঝাঁকায় করে এক গাদা বই নিয়ে এসেছিল, বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা বাংলায় লেখা ডায়েরি। নগদ দু-পয়সা খরচ করে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললুম।'

অমূল্য দৈবক্রমে আজ ক্লাবে আসে নাই, তাই বাকবিতণ্ডায় বেশী সময় নষ্ট হইল না। বরদা বলিল, 'পড়ি শোনো। বেশী নয়, শেষের কয়েকটা পাতা খালি পড়ে শোনাব। আর যা আছে তা না শুনলেও কোন ক্ষতি নেই। এ ডায়েরির লেখক কে তা ডায়েরি পড়ে জানা যায় না। তবে তিনি যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন য়্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।'

ল্যাম্পটা উস্কাইয়া দিয়া বরদা পড়িতে আরম্ভ করিল,—৭ ফেব্রুয়ারী—আজ মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে পীর-পাহাড় প্রায় মাইল-তিনেক দূরে—শহরের বাহিরে। মুঙ্গের শহরের যতটুকু দেখিলাম, কেবল ধুলা আর পুরাতন সেকেলে বাড়ি। যা হোক, আমাকে শহরের মধ্যে থাকিতে হইবে না ইহাই রক্ষা। স্টেশন হইতে আসিতে পথে কেল্লার ভিতর দিয়া আসিলাম। কেল্লাটা মন্দ নয়। পুরাতন মীরকাশিমের আমলের কেল্লা—গড়খাই দিয়া ঘেরা। প্রাকারের ইট-পাথর অনেকস্থানে খসিয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ উচ্চ প্রাচীরের উপর জন্মিয়া শুষ্ক গড়খাইয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন এই গড়ের প্রাচীরে সতর্ক সান্ত্রী পাহারা দিত, প্রহরে প্রহরে দুর্গদ্বারে নাকাড়া বাজিত, সন্ধ্যার সময় লোহার তোরণ-দ্বার ঝনৎকার করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত—কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না।

পীর-পাহাড়ের বাড়িখানি চমৎকার। এমন বাড়ি যাহার, সে চিরদিন এখানে থাকে না কেন এই আশ্চর্য। যা হোক, পাহাড়ের উপর নির্জন প্রকাণ্ড বাড়িখানিতে একাকী একমাস থাকিতে পারিব জানিয়া ভারি আনন্দ হইতেছে। বন্ধু কলিকাতায় থাকুন, আমি এই অবসরে তাঁহার বাড়িটি ভোগ করিয়া লই।

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় দেড়মাস ধরিয়া প্রকাণ্ড দায়রা মোকদ্দমা চালাইবার পর সত্য সত্যই বিশ্রাম করিতে হইলে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান আর নাই। আমার শরীর যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শুধু অত্যধিক পরিশ্রম নয়—মানুষের সহিত অবিশ্রাম সংঘর্ষ। যে-লোক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়া আসিয়াছে তাহার পেট হইতে সত্য কথা টানিয়া বাহির করা এবং যে-হাকিম বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কিরূপ বুকভাঙা ব্যাপার তাহা যিনি এ পেশায় ঢুকিয়াছেন তিনিই জানেন। মানুষ দেখিলে এখন ভয় হয়, কেহ কথা কহিবার উপক্রম করিলেই পলাইতে ইচ্ছা করে। তাই একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, বামুন-চাকর পর্যন্ত সঙ্গে লই নাই। ইক্‌মিক্‌ কুকার সঙ্গে আছে, তাহাতেই নিজে রাঁধিয়া খাইব।

কি সুন্দর স্থান! পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর বাড়িটি, চারিদিকের সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন-চার শ' ফুট উচ্চে। ছাদের উপর দাঁড়াইলে দেখা যায়, একদিকে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চর। তাহার উপর এখন সরিষা জন্মিয়াছে—সবুজ জমির উপর হলুদ বর্ণ ফুলের স্ফুলিঙ্গ। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অগণ্য অসংখ্য তালগাছের মাথা জাগিয়া আছে, আরও কত প্রকারের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল; তাহার ভিতর দিয়া গৈরিমাটি-ঢাকা পথটি বহু নিম্নে গোলাপী ফিতার মত পড়িয়া আছে। এ যেন কোন্‌ স্বর্গলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়িতে একটা মালী ছাড়া আর কেহ নাই, সে-ই বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এবং দু'চারটা মৃতপ্রায় গোলাপ গাছে জল দেয়। জল

banglabooks.in

পাহাড়ের উপর পাওয়া যায় না, পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার ধারে একটি কূয়া আছে সেখান হইতে আনিতে হয়। মালীটার সহিত কথা হইয়াছে আমার জন্য দু-ঘড়া জল রোজ আনিয়া দিবে, তাহাতেই আমার স্নান ও পান দুই কাজই চলিয়া যাইবে।

মালীটাকে বলিয়া দিয়াছি, পারতপক্ষে যেন আমার সম্মুখে না আসে। আমি একলা থাকিতে চাই।

৮ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে এত ঘুমাইয়াছি যে, জীবনে বোধ হয় এমন ঘুমাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় শুইতে গিয়াছিলাম, যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাতটা—ভোরের রৌদ্র খোলা জানালা দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গোছগাছ করিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছি। সঙ্গে কিছু চাল ডাল আলু ইত্যাদি আনিয়াছিলাম, তাহাতে আরও তিন-চার দিন চলিবে। ফুরাইয়া গেলে মালীকে দিয়া শহরের বাজার হইতে আনাইয়া লইব। ট্রাঙ্কগুলা খুলিয়া দেখিলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই আছে। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম সাবান তেল আয়না চিরুণী কিছুই ভুল হয় নাই। এক বাণ্ডিল ধূপের কাঠিও রহিয়াছে দেখিলাম, ভালই হইল। এখনও অবশ্য একটু শীত আছে, কিন্তু গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে মশার উপদ্রব বাড়িতে পারে। চাকরটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি, কতকগুলা বই ও কাগজ পেন্সিল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছে। যদিও এই একমাসের মধ্যে বই স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তবু হাতের কাছে দু' একখানা থাকা ভাল।

বইগুলো কিন্তু একেবারেই বাজে। পরলোক ভূতদর্শন, উন্মাদ ও প্রতিভা—এ-সব বই আমি পড়ি না। চাকরটা বোধ হয় ভাবিয়াছে আইন ছাড়া অন্য যে-কোনও বই পড়িলেই আমি ভাল থাকিব। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে—সাধে কি বলে, স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

এখানেও একটা ছোটখাটো লাইব্রেরী আছে দেখিতেছি। একটা ক্ষুদ্র আলমারীতে গোটাকয়েক পুরাতন উপন্যাস, অধিকাংশই সম্মুখের ও পশ্চাতের পাতা ছেঁড়া। যা হোক, পড়িবার যদি ইচ্ছা হয়—বইয়ের অভাব হইবে না।

দুপুরবেলাটা ভারি আনন্দে কাটিল। শূন্য বাড়িময় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পাহাড়ের উপর এই বৃহৎ বাড়ি কে তৈয়ার করিয়াছিল—ইহার কোনও ইতিহাস আছে কি? কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাড়ি যে-ই তৈয়ার করুক, তাহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়। যে-পাহাড়ের উপর বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে একটি উল্টানো বাটির মত,—কবি হইলে আরও রসাল উপমা দিতে পারিতাম,—হয়তো সাদৃশ্যটাও আরও বেশী হইত,—কিন্তু আমার পক্ষে উল্টানো বাটিই যথেষ্ট। শাদা বাড়িখানা তাহার উপর মাথা তুলিয়া আছে। বাড়িখানা যেমন বৃহৎ তেমনি মজবুত—মোটা মোটা দেওয়ালের মাঝখানে বিশাল এক একটা ঘর, নিজের বিশালতার গৌরবে শূন্য আসবাবহীন অবস্থাতেও সর্বদা গমগম করিতেছে। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা সমতল স্থান আছে, তাহাতে গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগানের শেষে ফটক, ফটকের বাইরেই নীচে যাইবার ঢালু পাথরভাঙা পথ বাঁকিয়া বাড়ির কোল দিয়া নামিয়া গিয়াছে। ফটকের সম্মুখে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড কূপ, গভীর হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার তল পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। কূপের চারিপাশে আগাছা জন্মিয়াছে, একটা শিমুল গাছ তাহার মুখের বিরাট গর্তটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কূপের ভিতর এক খণ্ড পাথর ফেলিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পরে একটা ফাঁপা আওয়াজ আসিল। কূপটা নিশ্চয় শুষ্ক।

সন্ধ্যার সময় কূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দূরে দূরে দু-একটি প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপরে এখনও বেশ আলো আছে। পশ্চিম দিকটা গৈরিক ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে ভারি চমৎকার। এই বাড়িতে আমার দুই দিন কাটিল।

হঠাৎ কাঁধের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করিয়া দেখি, এক ঝলক রক্ত সেখানে পড়িয়াছে। কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিলাম, রক্ত নয়—ফুল। শিমুল গাছটায় দু-চারটা ফুল ধরিয়াছিল, ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

banglabooks.in

ফুলটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফুল দিয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারী। আজ শরীরটা ভাল ঠেকিতেছে না; বোধ হয় একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করিতেছি। মোকদ্দমা লইয়া যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কুফল এখনও শরীরে লাগিয়া আছে; অকারণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া ওঠে। আজ উপবাস করিয়াছি, আশা করি কাল শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া যাইবে।

১০ ফেব্রুয়ারী। প্রাচীন গ্রীসে সংস্কার ছিল, প্রত্যেক গাছ লতা নদী পাহাড়ের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাসিত যুগে কথাটা হাস্যকর হইলেও উপদেবতা অধিষ্ঠিত গাছপালার কথা কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না। সাঁওতালদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কার আছে শুনিয়াছি। যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস হয়তো স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই থাকুক, দেবতা সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা সভ্য হইয়া ইট-পাথরের মন্দিরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহারা বনের মানুষ তাহারা গাছপালা নদী-নালাতেই দেবতার আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাব, সেইখানেই দেবতার জন্ম। মানুষ সহজ অবস্থায় ভূত-প্রেত উপদেবতা, এমন কি দেবতা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না; ও-সব বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমত মস্তিষ্কের ব্যাধি থাকা চাই। কিন্তু সে যাহাই হোক, উপদেবতার কথা কল্পনা করিতে বেশ লাগে। আমার ঐ শিমুল গাছটার যদি একটা দেবতা থাকিত তাহাকে দেখিতে কেমন হইত? কিংবা অতদূর যাইবার প্রয়োজন কি, এই পাহাড়টারও তো একটা দেবতা থাকা উচিত—তিনিই বা কিরূপ দেখিতে শুনিতে? তিনি যদি হঠাৎ একদিন আমাকে দেখা দেন তবে কেমন হয়?

১১ ফেব্রুয়ারী। দিনের বেলাটা পাহাড়ের উপরেই এধার-ওধার ঘুরিয়া এবং রান্নাবান্নার কাজে বেশ একরকম কাটিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। এখন কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে, সূর্যাস্তের পরই চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া যায়। তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যায়, কেবল আকাশের তারাগুলো যেন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি ইক্‌মিক্‌ কুকারে রান্না চড়াইয়া দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া থাকি। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না—আনাচে-কানাচে অন্ধকার থাকিয়া যায়।

প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি একা।

১২ ফেব্রুয়ারী। মনটা অকারণে বড় অস্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে যেন কাহার অদৃশ্য চক্ষু আমাকে অনুসরণ করিতেছে, বার বার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখিতেছি। অথচ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। স্নায়বিক উত্তেজনা—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় অস্থির বোধ হইতেছে,—নার্ভের কোনও ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত।

১৩ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার স্নায়ুগুলা এখনও ধাতস্থ হয় নাই—কিংবা—

না, না, ও-সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার সর্বাঙ্গে অতি লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া দিতেছে! কি অপূর্ব রোমাঞ্চকর সে স্পর্শ তাহা বলিতে পারি না। মুখের উপর হইতে আঙুল চালাইয়া পায়ের পাতা পর্যন্ত লইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘর অন্ধকার ছিল; এই শারীরিক সুখস্পর্শের মোহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিয়া, ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল কে যেন নিঃশব্দে শয্যার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে ঘুমের আবেশ একেবারে ছুটিয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম—চোর নয় তো? কিন্তু

banglabooks.in

চোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কেন? তা ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—কে? কোনও সাড়া নাই। গা ছমছম্ করিতে লাগিল। বালিশের পাশে দেশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরে কেহ নাই, দরজা পূর্ববৎ বন্ধ। ভাবিলাম, ঘুমাইয়া নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিয়াছি। এমন অনেক সময় হয়, ঘুম ভাঙিয়াছে মনে হইলেও ঘুম সত্যই ভাঙে না—নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে মনটা অর্ধচেতন অবস্থায় থাকে।

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম, খোলা বারান্ডায় আসিয়া দেখিলাম এক আকাশ নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। ঘরের বন্ধ বায়ু হইতে বাহিরে আসিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। একটা ঠান্ডা হাওয়া বাড়ির চারিদিকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করিবার পর একটু গা শীত-শীত করিতে লাগিল, আবার ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইলাম। আলোটা নিবাইলাম না, কমাইয়া দিয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলাম।

এটা কি সত্যই স্বপ্ন?—রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না।

১৪ ফেব্রুয়ারী। কাল আর কোনও স্বপ্ন দেখি নাই। আধ-আশা আধ-আশঙ্কা লইয়া শুইতে গিয়াছিলাম—হয়তো আজ আবার স্বপ্ন দেখিব; কিন্তু কিছুই দেখি নাই। আজ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতেছে।

চাল ডাল কেরোসিন তৈল ইত্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল, মালীকে দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া লইয়াছি। মালীটা জাতে গোয়ালা হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক, সেই যে, তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম তারপর হইতে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার কাছে আসে না। কখন জল দিয়া যায় আমি জানিতেও পারি না। আমিও আসিয়া অবধি পাহাড় হইতে নীচে নামি নাই, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এ-কয়দিন হয় নাই বলিলেই চলে। নীচে রাস্তা দিয়া মানুষ চলাচল করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এতদূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই।

আজ বাড়িতে চিঠি দিয়াছি, লিখিয়াছি—বেশ ভাল আছি। কিন্তু তাহাদের চিঠিপত্র দিতে বারণ করিয়া দিয়াছি। আমার এই বিজন বাসের মাধুর্য চিঠিপত্রের দ্বারাও খণ্ডিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। বাহিরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে-না-ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখিতে চাই না।

১৫ ফেব্রুয়ারী। আজ আবার মনটা অস্থির হইয়াছে। কি যেন হইয়াছে, অথচ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরীর তো বেশ ভালই আছে। তবে এমন হইতেছে কেন?

কাল, ভাবিতেছি, একবার শহরটা দেখিয়া আসিব। শুনিয়াছি নবাবী আমলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

কাছেই কোথায় নাকি সীতাকুণ্ড নামে গরম জলের একটা প্রস্রবণ আছে, বন্ধু বলিয়া দিয়াছিলেন সেটা দেখা চাই। অতএব সেটাও দেখিতে হইবে।

১৬ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে আবার সেইরূপ ঘটিয়াছে। স্বপ্ন নয়—এ স্বপ্ন নয়! স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে আমার পাশে বসিয়া অতি কোমল হস্তে ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ বক্ষে শুইয়া রহিলাম। বালিশের তলায় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম, সুতরাং এ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা হইতেই পারে না।

অদৃশ্য হাতটা কতবার আমার আপাদমস্তক বুলাইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। একবার হাতখানা যখন আমার বুকের কাছে আসিয়াছে তখন হাত বাড়াইয়া আমি সেটা ধরিতে গেলাম। মনে হইল আমার মুঠির মধ্যে হাতটা গলিয়া মিলাইয়া গেল। হাতবুলানোও বন্ধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, এখনও যায় নাই। আমি চোখ চাহিয়া শুইয়া রহিলাম—সেও দাঁড়াইয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—চোখ খুলিয়া থাকা বা বুজিয়া থাকার কোনও প্রভেদ নাই। উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম কোনও শব্দ হয় কি-না। দরজায় কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে—তাহারই শব্দ

banglabooks.in

শুনিতেছি। আর কোনও শব্দ নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিলাম, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল; আজ আর আসিবে না। ঘুমাইয়া পড়িলে হয়তো থাকিত। আমি যখনই ঘুমাই, তখনই কি সে আমার সুপ্ত শরীরের উপর পাহারা দেয়?

কিন্তু আশ্চর্য! আজ আমার একটুও ভয় করিল না কেন?

১৭ ফেব্রুয়ারী। আমার শিমুল গাছ রক্তরাঙা ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে পাতা নাই, কেবলই ফুল।

সেদিন যে আমার কাঁধের উপর এক ঝলক রক্তের মত ফুল পড়িয়াছিল—সে কি স্বাভাবিক? এত স্থান থাকিতে আমারে কাঁধের উপরই বা পড়িল কেন? তবে কি কোনও অদৃশ্য হস্ত গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আমার গায়ে ফেলিয়াছিল? কে সে? বৃক্ষদেবতা? না, আমারই মত মানুষের দেহ-বিমুক্ত আত্মা? তাই কি? একটা দেহহীন আত্মা! সে আমাকে পাইয়া খুশী হইয়াছে তাহাই কি আকারে ইঙ্গিতে জানাইতে চায়? সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায় তাই কি সেদিন ফুল দিয়া আমারে সংবর্ধনা করিয়াছিল!

তবে কি সত্যই প্রেতযোনি আছে? দেহমুক্ত অশরীরী আত্মা? বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু there are more things in heaven and earth—

একটা বিষয়ে ভারি আশ্চর্য লাগিতেছে,—ভয় করে না কেন? এই নির্জন স্থানে একলা আছি, এ অবস্থায় ভয় হওয়াই তো স্বাভাবিক!

১৮ ফেব্রুয়ারী। আনমনে দিন কাটিয়া গেল। শূন্য বাড়িময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পাছিয়াঁ হাওয়া দিতেছে—খুব ধূলা উড়িতেছে। গঙ্গার ওরের দিকটা বালুতে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

আজ কিছু ঘটে নাই। মনটা উদাস বোধ হইতেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারী। দিনটা যেন রাত্রির প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কিছু অনুভব করি না কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পশ্চিম আকাশে সরু একটি চাঁদ দেখা দিয়াছে—যেন অসীম শূন্যে অপার্থিব একটু হাসি! অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্ত গেল, তখন আবার নীরন্ধ্র অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিয়া লইল।

ইক্‌মিক্‌ কুকারে রান্না চড়াইয়া অন্যমনে বসিয়া ছিলাম। আলোটা সম্মুখের ভাঙা টেবিলে বসানো ছিল। অদূরে কতকগুলা ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছিলাম, তাহারই সুগন্ধ ধূমে ঘরটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আর তো যা-হোক একটা কিছু না পড়িয়া থাকা যায় না। বসিয়া বসিয়া সহসা কি মনে হইল, বাক্স হইতে সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

গল্প—নেহাত গল্প! সত্য অনুভূতির ছায়া মাত্র এ-সব কাহিনীতে নাই। আমি যেমন করিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছি, চোখে না দেখিয়াও সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার সামীপ্য উপলব্ধি করিয়াছি—সেরূপ ভাবে আর কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?

ইহারা লিখিতেছে, চোখে দেখিয়াছে। চোখে দেখা কি যায়? যে আমার কাছে আসে, সে কেমন দেখিতে? আমারই মত কি তার হস্ত পদ অবয়ব আছে? মানুষের চেহারা, না অন্য কিছু!

বই হইতে চোখ তুলিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ঘটিল। ধূপের কাঠিগুলি হইতে যে ক্ষীণ ধূমরেখা উঠিতেছিল তাহা শূন্যে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে যেন একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য কাচের শিশিতে রঙীন জল ঢালিলে যেমন তাহা শিশির আকারটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আমার মনে হইল ঐ ধোঁয়া যেন কোনও অদৃশ্য আধারে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তদাকারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ধূসর রঙের একটি বস্ত্রের আভাস দেখা দিল। বস্ত্রের ভিতর মানুষের দেহ ঢাকা রহিয়াছে, বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তাহার পরিচয়

banglabooks.in

পাইতে লাগিলাম।...ধূম্র কুণ্ডলী মূর্তি গড়িয়া চলিল; আবছায়া মূর্তির ভিতর দিয়া ওপারের দেয়াল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তবু তাহার ডৌল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একটা মানুষের চেহারা। ধূম্র পাকাইয়া পাকাইয়া উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমে মূর্তির গলা পর্যন্ত পৌঁছিল। এইবার তাহার মুখ দেখিতে পাইব...কি রকম সে মুখ? বিকট? ভয়ানক? কিন্তু ঠিক এই সময় সহসা সব ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঐ ধূম্রমূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। মুখ দেখা হইল না।

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যদি আবার দেখিতে পাই। কিন্তু আর সে মূর্তি গড়িয়া উঠিল না।

২০ ফেব্রুয়ারী। সে আছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। দিনের বেলা সে কোথায় থাকে জানি না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া থাকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই কি মিথ্যা! বাতাস দেখিতে পাই না, বাতাস কি মিথ্যা? শুনিয়াছি একপ্রকার গ্যাস আছে যাহা গন্ধহীন ও অদৃশ্য, অথচ তাহা আঘ্রাণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। সে গ্যাস কি মিথ্যা?

না, সে আছে। আমার মন জানিয়াছে সে আছে।

২১ ফেব্রুয়ারী। কে সে? তাহার স্পর্শ আমি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না কেন? ছুঁইতে গেলেই সে মিলাইয়া যায় কেন? সে দেখা দিতে চেষ্টা করে জানি, কিন্তু দেখা দিতে পারে না কেন? রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া কি ইহাদের দেখা যায় না?

আমি এখন শয়নের পূর্বে ডায়েরি লিখিতেছি, আর সে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার লেখা পড়িতেছে। আমি জানি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইলে তাহাকে দেখিতে পাইব না- সে মিলাইয়া যাইবে।

কেন এমন হয়? তাহাকে কি দেখিতে পাইব না? দেখিবার কি দুর্দম আগ্রহ যে প্রাণে জাগিয়াছে তাহা কি বলিব! তাহার এই দেহহীন অদৃশ্যতাকে যদি কোনও রকমে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতাম! কোনও কি উপায় নাই?

২২ ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে সে আর আসে নাই। সমস্ত রাত্রি তার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তবু সে আসিল না। কেন আসিল না? তবে কি আর আসিবে না?

নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। আমার প্রতি রজনীর সহচর সহসা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর যদি না আসে?

২৩ ফেব্রুয়ারী। জানিয়াছি—জানিয়াছি! সে নারী!

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার, যেন ধারণা করিতে পারিতেছি না। আজ সকালে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, একগাছি দীর্ঘ কালো চুল আমার চিরুণীতে জড়ানো রহিয়াছে। এ চুল আমার চিরুণীতে কোথা হইতে আসিল! বুঝিয়াছি- বুঝিয়াছি এ তাহার চুল। সে নারী! সে নারী!

কখন তুমি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়া অভিজ্ঞানখানি রাখিয়া গিয়াছ? কি সুন্দর তোমার চুল! তুমি আমায় ভালবাস তাই বুঝি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়াছিলে? আমার আরসীতে মুখ দেখিয়াছিলে কি? কেমন সে মুখ? তাহার প্রতিবিম্ব কেন আরসীতে রাখিয়া যাও নাই? তাহা হইলে তো আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

ওগো রহস্যময়ি, দেখা দাও! এই সুন্দর সুকোমল চুলগাছি যে তরুণ তনুর শোভা-বর্ধন করিয়াছিল সেই দেহখানি আমাকে একবার দেখাও। আমি যে তোমায় ভালবাসি। তুমি নারী তাহা জানিবার পূর্বে হইতেই যে তোমায় ভালবাসি।

কেমন তোমার রূপ? যে-শিমুল ফুল দিয়া প্রথম আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে তাহারই মত দিক্-আলো-করা রূপ কি তোমার? তাই কি নিজের রূপের প্রতিচ্ছবিটি সেদিন আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে? অধর কি তোমার অমনই রক্তিম বর্ণ, পায়ের আলতা কি উহারই রঙে রাঙা!

banglabooks.in

কেমন করিয়া কোন্ ভঙ্গীতে বসিয়া তুমি আমার চিরুণী দিয়া চুল বাঁধিয়াছিলে? কেমন সে কবরীবন্ধ! একটি রক্তরাঙা শিমুল ফুল কি সেই কবরীতে পরিয়াছিলে?

আমার এই ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কখনও আমি নারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি নাই। আজ তোমাকে না দেখিয়াই তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়াছি। ওগো অশরীরিণি, একবার রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

২৪ ফেব্রুয়ারী। তাহার প্রেমের মোহে আমি ডুবিয়া আছি। আহার নিদ্রায় আমার প্রয়োজন কি? আমার মনে হইতেছে এই অপরূপ ভালবাসা আমাকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, আমার অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা জীর্ণ করিয়া জঠরস্থ অম্লরসের মত আমাকে পরিপাক করিয়া ফেলিতেছে। এমন না হইলে ভালবাসা?

২৫ ফেব্রুয়ারী। আজ সকালে হঠাৎ মালীটার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। মানুষের মুখ আমি দেখিতে চাই না।

সমস্ত দিন কিছু আহার করি নাই। ভাল লাগে না—আহারে রুচি নাই। তা ছাড়া রান্নার হাঙ্গামা অসহ্য।

গরম পড়িয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাল সারা রাত্রি জাগিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে কাল আমার পাশে আসিয়া শুইয়াছিল। স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহার অস্পষ্ট মধুর দেহ-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখিলাম শূন্য—কিছু নাই। জানি, সে আমার চোখে দেখা দিবার জন্য, আমার বাহুতে ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া আছে। কিন্তু পারিতেছে না। তাহার এই ব্যর্থ আকুলতা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

মধ্যরাত্রি হইতে প্রভাত পর্যন্ত খোলা আকাশের তলায় পায়চারি করিয়াছি, সেও আমার পাশে পাশে বেড়াইয়াছে। তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কি করিলে তাহার দেখা পাইব। সে উত্তর দেয় নাই—কিংবা তাহার উত্তর আমার কানে পৌঁছায় নাই।

সকাল হইতেই সে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঐ রক্তরাঙা শিমুল গাছটার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চর্মচক্ষে তাহাকে দেখিতে পাওয়া কি সম্ভব নয়?

২৬ ফেব্রুয়ারী। না, রক্তমাংসের শরীরে তাহাকে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী; স্থূল মর্তলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড়দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।

২৭ ফেব্রুয়ারী। আহার নাই নিদ্রা নাই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখিলাম! এ কি সত্যই আমি—না আর কেহ?

আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হোক চাই। স্থূল শরীরে যদি না পাই—তবে—

২৮ ফেব্রুয়ারী। হাঁ, সেই ভাল। আর পারি না।

শিমুল গাছের যে ডালটা কূপের মুখে ঝুঁকিয়া আছে তাহাতে একটা দড়ি টাঙাইয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তাহার আসিবার সময় হইবে—তখন—

সখি, আর দেরী নাই, আজ ফাগুনের সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিবে তুমি কবরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিও। তোমার রক্তরাঙা ফুলের থালা সাজাইয়া রাখিও। আমি আসিব। তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিব। আজ আমাদের পরিপূর্ণ মিলনরাত্রি...

বরদা আস্তে আস্তে ডায়েরি বন্ধ করিয়া বলিল, 'এইখানেই লেখা শেষ!'

১৬ ফাল্গুন ১৩৩৯

banglabooks.in

সবুজ চশমা

বরদা বলিল, "আমিও একদিন তোমাদের মত নাস্তিক ছিলুম।"

আমরা সকলে উৎসুকভাবে নিরুত্তর রহিলাম, কারণ, এরূপ ভূমিকার উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল না; কেবল অমূল্য মুখ বিকৃত করিয়া হাসিল।

বরদা টেবিলের উপর হইতে পা নামাইয়া বলিল, "কিন্তু একবার এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে, তার পর প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব। অনেক দিন আগেকার কথা—প্রায় দশ বছর হল। সে রকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও হয়নি। রেলে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলুম।"

অমূল্য সক্ষোভে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমাদের ভাগ্যই মন্দ—কাকে দোষ দেব?"

পাছে আবার ঝগড়া বাধিয়া যায়, তাই পৃথ্বী তাড়াতাড়ি বলিল, "কাউকে দোষ দিতে হবে না। বরদা, তুমি আরম্ভ করে দাও।"

বরদা শত্রুমিত্র সকলকে সমান অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিতভাবে একটা চুরুট ধরাইল, তার পর আরম্ভ করিল—"কিউল জংসনের মত এমন লক্ষ্মীছাড়া স্টেশন বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। লুপ লাইন থেকে যে দিকেই যেতে চাও কিউলে অন্তত তিনটি ঘণ্টা বিশ্রাম করতে হবে।

সেবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলুম—এলাহাবাদে। সন্ধ্যার সময় মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে রাত্রি আটটা নাগাদ কিউল পৌঁছুনো গেল। সেখানে পশ্চিমের ট্রেন আসবে রাত্রি এগারোটায়—সুতরাং অফুরন্ত অবকাশ। আমার সঙ্গে কেবল একটা স্যুটকেস ছিল; সেটা কুলীর জিম্মা করে দিয়ে লম্বা কাঁকর-ঢাকা প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে লাগলুম। ক্রমে ট্রেন বেরিয়ে গিয়ে স্টেশনটা একেবারে খালি হয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আর গাড়ি নেই।

কিন্তু একলা শূন্য প্ল্যাটফর্মে কাঁহাতক পায়চারি করা যায়? ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াবার পর দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, স্টেশন স্টাফও বোধ করি এই অবসরে একটু নিদ্রা দিয়ে নিচ্ছে; গ্যাসের বড় বড় ল্যাম্পগুলো জনহীন প্ল্যাটফর্মে অনর্থক আলো বিকীর্ণ করছে। আমিও এদিক-ওদিক চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়লুম, ভাবলুম, নিরিবিলি একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।—অ্যাঁ? হ্যাঁ, টিকিট ইণ্টার ক্লাসেরই ছিল।

ওয়েটিং রুমের মাঝখানে একটি বড় গোছের গোল টেবিল, তার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প ঘোলাটে ভাবে জ্বলছে। টেবিলের চারপাশে দশ-বারোখানা চেয়ার, আরাম-কেদারাও আছে। একটি চেয়ারে বসে একজন ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছিলেন, একটা চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ তাঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখা ছিল। আমি ঢুকতেই তিনি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিজের কাছে টেনে নিলেন।

আর কেউ যে ওয়েটিং রুমে আছে, তা প্রত্যাশা করিনি। যা হোক, অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচ দমন করে একটা চেয়ার টেনে বসলুম; ভদ্রলোক মিটমিট করে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। বয়স্থ লোক, মুখে দাড়ি আছে,—ওস্তাগরের তৈরী ঝল্‌ঝলে কোট-প্যাণ্টলুন পরা, কিন্তু তবু বাঙালী বলে সন্দেহ হল। একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলুম, "মশায়ের কোন্ দিকে যাওয়া হচ্ছে?'

ভদ্রলোক ব্যাগটি তুলে নিজের কোলের ওপর রাখলেন; এমন সন্দিগ্ধ-চোখে আমার দিকে চাইতে লাগলেন, যেন তাঁর ঐ ব্যাগটি চুরি করবার জন্যই আমি ঢুকেছি। তার পর সতর্কভাবে বললেন, 'আমি বিলেত যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললুম, 'অ্যাঁ?'

banglabooks.in

তিনি আবার বললেন, 'বিলেত যাচ্ছি। আপনি?'

লজ্জিতভাবে বললুম, 'আমি এই—কাছেই, এলাহাবাদ যাচ্ছি।'

'এলাহাবাদ? এলাহাবাদে কি করেন?'

'কিছু করি না—মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি কি কখনও সেখানে ছিলেন?'

তাঁর সতর্ক সাবধান ভাব অনেকটা কেটে গেল, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেখানে আমি মিউর কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলুম—আমার নাম বিরাজমোহন সেন।'

বিরাজমোহন সেন! নামটা খুব পরিচিত, আমার মামাদের মুখে তাঁর অনেক গল্প শুনেছি; মামারা তাঁর কাছে পড়েছিলেন। বিরাজবাবু একজন নামজাদা প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। আমি সচকিত হয়ে উঠলুম, তার পর খুব ভাল করে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করলুম; কিন্তু তাঁর চেহারায় মাথা খারাপের কোনও লক্ষণই দেখতে পেলুম না। প্রকাণ্ড কপালখানা বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে,—উঁচু বাঁকা নাক, চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু নেই—যা পাগলামি বলে মনে করা যেতে পারে। আমি বললুম, 'আমি আপনার নাম শুনেছি—আমার মামারা আপনার ছাত্র!'

'তাই না কি? কি নাম তাদের বল তো।'

আমি নাম বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শৈল, নীরজ! বিলক্ষণ! তাদের খুব চিনি। তুমি তাদের ভাগ্নে? বেশ বেশ! বড় খুশী হলুম।' বলে তিনি ব্যাগটা আবার টেবিলের উপর রাখলেন।

আমার বড় হাসি পেল, জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনার ঐ ব্যাগটিতে কোনও মূল্যবান জিনিস আছে—না?'

'মূল্যবান!' তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, তা বলতে পার। এমন মূল্যবান জিনিস পৃথিবীতে আর নেই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি জিনিস?'

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'একটা চশমা। বিলেতে নিয়ে যাচ্ছি স্যর অলিভার লজকে দেখাব বলে।'

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বললুম, 'চশমা! স্যর অলিভার লজকে দেখাবেন? কিসের চশমা?'

তিনি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, মাথা নীচু করে বসে রইলেন, তার পর হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'ভূত?'

'হ্যাঁ—প্রেতযোনি।'

মনে হল মাথা খারাপের কথাটা হয়তো নেহাত মিথ্যে নয়; নইলে আপাতদৃষ্টিতে এমন একজন বিজ্ঞ লোক আবোল-তাবোল কথা কয় কেন? বললাম, 'যা চোখে দেখা যায় না, তা বিশ্বাস করি না।'

তিনি একটু হাসলেন, 'যা চোখে দেখা যায় না, তাই যদি অবিশ্বাস কর, তা হলে তো পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসই অবিশ্বাস করতে হয়। এক বিন্দু জলে লক্ষ কোটি বীজাণু আছে, সে কি চোখে দেখা যায়? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। এক্সরে দিয়ে জ্যান্ত মানুষের শরীরের গোটা কঙ্কালটা দেখা যায়—শাদা চোখে কি দেখতে পাও?'

আমি বললুম, 'তা পাই না বটে, কিন্তু ভূত যে মাইক্রোস্কোপ কিংবা এক্সরে দিয়েও দেখা যায় না।'

তিনি আবার হাসলেন, গূঢ় রহস্যময় হাসি। তারপর বললেন, 'তা বটে, কিন্তু শাদা চোখেও যে অনেকে দেখেছে!'

আমি বললুম, 'তারা হয় ভ্রান্ত, নয় ঠগ।'

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে সকলকে ভ্রান্ত কিম্বা ঠগের পর্যায়ে ফেলা যায়

banglabooks.in

না—খাঁটি লোকও আছে। শিশির ঘোষ জোচ্চোর ছিলেন না, নির্বোধও ছিলেন না। কিন্তু তোমার এখন বয়স কম, নাস্তিকতাই তোমার বয়সের ধর্ম। আমিও তোমার মতই অবিশ্বাসী ছিলুম—বেশী দিন নয়, দু'বছর আগে পর্যন্ত আমি প্রেতযোনি সম্বন্ধে ঘোর নাস্তিক ছিলুম। তার পর হঠাৎ একদিন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। যে অপূর্ব জিনিস না জেনে আবিষ্কার করে ফেললুম, তাতে জীবনের ধারাটাই বদলে গেল।'

'কি আবিষ্কার করলেন?'

তিনি কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, 'একটা চশমা,—বাইনকুলারের লেন্সও বলতে পার।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'সেই চশমাই কি আপনার ব্যাগে রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ চশমাই স্যর অলিভার লজকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার, আমাকে সব বলুন, আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'লোকের কাছে বলে যে রকম হাস্যাস্পদ আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তাতে কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না। যা হোক, তুমি যখন আগ্রহ প্রকাশ করছ, তখন শোনো—

'আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক; বিজ্ঞানের রাজ্যে বাতিক খেয়াল কল্পনার স্থান নেই—সেখানে নীরস নিষ্ঠুর সত্যের কারবার। সুতরাং ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা মজ্জাগত বিরুদ্ধতা থাকবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারবে। ভেবে দেখ, নিঃসংশয়ে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করা যেতে পারে, এমন জোরালো প্রমাণ আজ পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে কি? সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া—অনিশ্চিত—বৈজ্ঞানিক কেউ কেউ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান স্বীকার করেনি। বিজ্ঞান চায় নিরেট স্থূল সত্য, আবছায়া অস্পষ্ট কিছু সে চায় না।

'তাই শিক্ষার গুণে আমিও চিরদিন ভূতপ্রেতকে ঠাট্টাই করে এসেছি—কোনন্ ডয়েল, স্যর অলিভার লজ—এদের ভ্রান্ত খেয়ালী মনে করেছি,—কখনও ভাবিনি যে, আমিই একদিন অন্যকে বিশ্বাস করাবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াব আর তারা আমাকে পাগল মনে করে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস।

'বছর দুই আগে কলেজের ল্যাবরেটরীতে আমি দূরবীণের লেন্স নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছিলুম। একটা বড় সবুজ রংয়ের ক্রিষ্ট্যাল এক দিন কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—সেইটে—কিন্তু তুমি বোধ হয় আর্টস স্টুডেণ্ট, সব কথা বুঝবে না। মোটামুটি বলে রাখি, একটা অদ্ভুত ফিকে সবুজ রংয়ের ক্রিষ্ট্যাল হাতে এসে পড়েছিল; তাই থেকে নিজের হাতে কতকগুলো লেন্স তৈরী করছিলুম। যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে হাতে করে ঘষে ঘষে লেন্স তৈরী করা সহজ কথা নয়, বিস্তর সময় লাগে, তা ছাড়া সব-সময় নির্ভুল হয় না—বাঁকাচোরা থেকে যায়। কিন্তু আমার খেয়াল হয়েছিল, তাই নিজের হাতেই তৈরী করছিলুম।

'একদিন দুপুরবেলা,—তখনও লেন্স সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি,—কেমন হচ্ছে দেখবার জন্যে আমি সেগুলোকে ফ্রেমের ওপর বসিয়ে চোখে পরলুম। চশমার দোকানে চোখ পরীক্ষা করবার সময় যে-রকম ফ্রেম চোখে পরিয়ে দিয়ে তাতে বিভিন্ন শক্তির কাচ বসিয়ে বসিয়ে পরখ করে, দেখেছ বোধ হয়?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। বিরাজবাবু বলতে লাগলেন—'দুপুরবেলা ল্যাবরেটরীতে কেউ ছিল না, আমি দোর বন্ধ করে একা কাজ করছিলুম। কিন্তু চশমা চোখে দিয়ে মুখ তুলেই দেখলুম একজন লোক ঠিক আমার সামনের চেয়ারে বসে একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা সায়েব, টকটকে গোলাপী রং, মুখে ছুঁচোলো দাড়ি। তার অদ্ভুত বেশভূষা,—মধ্যযুগে য়ুরোপীয়রা যে রকম মখমলের জাঁকাল পোষাক পরত, সেই রকম। আমি ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি চশমা খুলে ফেললুম;—দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, চেয়ার খালি।

'খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলুম না; তারপর আবার চশমা পরে দেখলুম,—লোকটা বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে চলে গেল।'

বিরাজবাবু চুপ করলেন। আমি রুদ্ধ শ্বাসে প্রশ্ন করলুম, 'তার পর?'

banglabooks.in

বিরাজবাবু বললেন, 'এমনই অভাবনীয় এই ঘটনা যে, ব্যাপারটা ভাল করে হজম করতেই কয়েক দিন কেটে গেল। শেষে বুঝলুম ভুল নয়, সত্যিই অজ্ঞাতসারে একটা অপূর্ব জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি—যার সাহায্যে সূক্ষ্ম দেহও প্রত্যক্ষ করা যায়!

'এ জিনিস নিয়ে কি করব, প্রথমটা ভেবেই পেলুম না। শেষে ঠিক করলুম আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বলব। তাঁর কাছে গেলুম, একটু উত্তেজিতভাবেই আমার আবিষ্কারের কথা বললুম। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'সেন, আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করুন।'

'নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলুম। তার পর প্রফেসরদের মধ্যে আমার অন্তরঙ্গ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললুম। তাঁরাও আমাকে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করবার উপদেশ দিলেন। আশ্চর্য আমাদের দেশের লোকের মনোভাব! কেউ একবার জিনিসটা দেখতে চাইলেন না,—একবার বললেন না, দেখি আপনার কথা সত্যি কি মিথ্যে।

'মরীয়া হয়ে আমি য়ুনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলারকে এক দরখাস্ত করলুম। তাঁকে সব কথা জানিয়ে লিখলুম যে, তিনি যদি ইচ্ছে করেন, আমি সর্বসমক্ষে ডিমন্স্ট্রেট্ করে দেখাতে রাজী আছি।

'হপ্তাখানেক পরে আমার চিঠির জবাব এল। ইতিমধ্যে বোধ হয় আমার পাগলামির কানাঘুষো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; ভাইস্-চ্যান্সেলার সাহেব বিনীতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যদি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার দরখাস্ত করি, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে।—রাগের মাথায় কাজ ছেড়ে দিলুম।

'তার পর সারা ভারতবর্ষে যত বিজ্ঞ সুধী আছেন, সকলের দোরে দোরে চশমা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি,—এমন সব লোকের কাছে গিয়েছি—যাঁদের পৃথিবী-জোড়া নাম; কিন্তু সকলের কাছেই এক উত্তর পেয়েছি। কেউ হেসেছেন, কেউ তাড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ বলেছেন সময় নেই; কিন্তু আমার কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই করে দেখবার কৌতূহল কারুর হল না।

'যখন দেখলুম, এ দেশে এই মহামূল্য আবিষ্কারের মর্ম কেউ বুঝবে না, তখন স্থির করলুম—বিলেত যাব। সেখানে অন্তত একজন লোক আছেন—যিনি প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী—যিনি আমার কথা না শুনে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

'ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বললে বিশ্বাস করবে না, চশমার ওপর নানারকম অলৌকিক উৎপাত হতে শুরু করেছিল। প্রেতলোকের যবনিকা মানুষের চোখ থেকে সরে যায়, এটা বোধ হয় তাদের অভিপ্রেত নয়, তাই রোজ চশমাটার ওপর নতুন নতুন দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনও অকারণে হাত থেকে পড়ে যায়, কখনও ট্রেনে ব্যাগসুদ্ধ হারিয়ে যায়, কখনও চোরে চুরি করতে আসে—এই ধরনের ব্যাপার। যখনই চশমা চোখে দিই, দেখি, ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, চশমাটা ভেঙে ফেলবার ইঙ্গিত করছে। একবার একটা অদৃশ্য হাত আমার চুল ধরে এমন নাড়া দিলে যে, চশমাটা চোখ থেকে ছিটকে মেঝেয় পড়ল। ভাগ্যে কার্পেট ছিল, নইলে সেই দিনই ওটা যেত। যা হোক, অনেক কষ্টে অনেক যত্নে এখন পর্যন্ত তাকে অটুট রেখেছি—জানি না, শেষ পর্যন্ত স্যর অলিভার লজের কাছে নিয়ে যেতে পারব কি না। এ হচ্ছে যাকে বলে একটা freak, এর অবিকল নকল কখনও তৈরী হবে না।'

ভদ্রলোকের অত্যাশ্চর্য কথাগুলো আমার বদ্ধমূল অবিশ্বাসের গোড়ায় যেন প্রবল নাড়া দিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, এই চশমা যে-কেউ চোখে দিলেই ভূত দেখতে পাবে?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয় পাবে;—যদিও সে পরীক্ষা করবার সুযোগ আজ পর্যন্ত পাইনি। আমি নিজে যতবার পরেছি, ততবারই দেখেছি।'

আমি আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বললুম, 'তা হলে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

banglabooks.in

'নিশ্চয় পারি।'--তিনি সানন্দে ব্যাগটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, 'দেখাবার জন্যে আমি ছটফট করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কেউ দেখছে না।'

ব্যাগ খুলে তিনি সযত্নে একটি তুলোয় মোড়া চামড়ার কেস্ বার করলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে কেসটি খুললেন। কেসের মধ্যে একটি মজবুত গোছের চশমা--ঠিক চশমা নয়, আজকাল একরকম বাইনকুলার বেরিয়েছে, অনেকটা সেইরকম দেখতে। সামনে কতক-গুলো সবুজ কাচ লাগানো—তার আশেপাশে পেতলের স্ক্রু। টর্টইজ-শেলের মোটা-মোটা আর্ম। বিরাজবাবু উঠে এসে সাবধানে আমার নাকের ওপর চশমাটি বসিয়ে দিলেন।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলুম না—কেবল সবুজ ধোঁয়া। বিরাজবাবু স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে কম্পিতস্বরে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ? এবার? এবার?'

ক্রমশ চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হতে লাগল—মনে হল যেন ধোঁয়া আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার পর বায়স্কোপের ছবির মত স্পষ্ট জিনিস দেখতে পেলুম।

ঘরে কেরোসিনের যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তাতে সামান্য আলো হচ্ছিল, কিন্তু চশমার ভেতর দিয়ে দেখলুম,—আলো ঢের বেশী; উজ্জ্বল অথচ মোলায়েম। সে রকম অলৌকিক আলো কখনও দেখিনি—কোথা থেকে আসছে বোঝা যায় না অথচ সর্বত্র সমান ভাবে পড়েছে,—কোথাও ছায়া নেই। আশ্চর্য আলো—এইটেই বোধ হয় প্রেতলোকের দীপ্তি!

কিন্তু আলোর কথা থাক! সেই আলোতে যা দেখলুম, তা ভয়াবহ কিছু না হলেও হৃৎপিণ্ডটা একবার ডিগবাজি খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেখলুম, টেবিল ঘিরে প্রত্যেক চেয়ারে একটি করে লোক বসে আছেন—তাঁদের পেছনে মাথার পর মাথা, ঘরের মধ্যে তিল ফেলবার জায়গা নেই! আর, সবাই তীব্র নির্নিমেষ চোখে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছেন।

বিরাজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখতে পাচ্ছ?'

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না, তাই উত্তর দেওয়া হল না। ডান দিকে মাথা ফিরিয়ে দেখি, আমার গা ঘেঁষে একটি প্রেত দাঁড়িয়ে মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি—ঠিক তাই। আমার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল, হৃৎপিণ্ডটা আবার সচল হয়ে গলার কাছে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

এঁদের যে কত রকম চেহারা, তা বর্ণনা করা যায় না। সাহেব আছেন, চীনাম্যান আছেন, ভারতীয় লোক আছেন, আবার নিকষকান্তি নিগ্রোও রয়েছেন—কোনও ভেদজ্ঞান নাই। একজন শীর্ণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ এবং একটি পালক-দেওয়া টুপী পরা খোলো শতাব্দীর সায়েব পাশাপাশি বসে রয়েছেন দেখলুম। সকলেরই দৃষ্টি আমার ওপর—ভাবে মনে হল, কেউ আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেন দাবী জন্মাবার আগেই আমি তাঁদের রাজ্যে ঢুকেছি বলে তাঁরা আমার ওপর ভয়ঙ্কর চটেছেন।

ক্রমে তাঁদের মধ্যে একটা আলোচনা শুরু হল দেখলুম; কানে কিছুই শুনতে পেলুম না, কিন্তু মুখ আর হাত নাড়া দেখে আন্দাজ হল যে, খুব উত্তেজিতভাবে তর্ক চলছে—এবং আমি যে এই তর্কের লক্ষ্যবস্তু তাতেও সন্দেহ রইল না। শেষে সেই পৈতে-পরা শীর্ণ ব্যক্তিটি আমার দিকে ফিরে আঙুল দেখিয়ে খুব তীব্রভাবে কি বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিনি কি বললেন আমি এক বর্ণও শুনতে পেলুম না।

অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর তিনি টেবিলের ওপর একটা নিঃশব্দ চপেটাঘাত করে চুপ করলেন। তখন আবার তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হল।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে দেখতে আমার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলিনি; বলবার দরকারও নেই। তোমরা সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারবে। চশমার ভিতর দিয়েই যে এই ভূতের রাজ্য দেখতে পাচ্ছি, চশমা খুলে ফেললে আর দেখতে পাব না, এ কথা সাফ ভুলে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল শাদা চোখেই এঁদের দেখছি। যেন নির্জন মনুষ্যহীন একটা জায়গায় একপাল ভূতের মধ্যে এসে পড়েছি, তারা আমাকে ঘিরে বসে আমার ভাগ্য বিচার করছে।

banglabooks.in

তাদের তর্কের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হল আমাকে নিয়ে এরা ভীষণ কান্ড একটা কিছু বাধাবে। আমার বুদ্ধি বিবেচনা যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল তাদের কান্ড দেখে তাও লুপ্ত হয়ে গেল। চশমাটা খুলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু তা না করে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালুম।

অমনি তারাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ল, তার পরে যেন কি একটা ভয়ঙ্কর সংকল্প করে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, বিকট চীৎকার করে চেয়ার উল্টে ফেলে দরজার দিকে দৌড় মারলুম।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দৌড়ুতে দৌড়ুতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, তারা তেমনই ভিড় করে আমার পিছনে তেড়ে আসছে। এই সময় একটা বিরাট রৈ-রৈ শব্দ কানে গেল—'খবরদার!' 'হুঁসিয়ার!' 'ট্রেন আতা হ্যায়!' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত ট্রেনের ফোঁস ফোঁস হুড়-হুড় শব্দ! ঠিক প্ল্যাটফর্মের কিনারায় পৌঁছে আমি হ্যাঁচকা মেরে নিজেকে সামলে নিলুম—গরম এঞ্জিনটা সোঁ সোঁ শব্দ করে আমার প্রায় নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁচকা দিয়ে নিজেকে সামলালুম বটে, কিন্তু ভারী চশমাটা নাকের উপর থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঠিক লাইনের ওপরে, আর গাড়ির চাকাগুলো গড়গড় করে সেটাকে গুঁড়ো করে দিয়ে চলে যেতে লাগল।

আমার হাতে পায়ে আর জোর ছিল না, অবশভাবে আমি প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই শুয়ে পড়লুম। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল—তারই মধ্যে ক্ষীণভাবে শুনতে লাগলুম, মন্দীভূত ট্রেনের চাকার আর লোহালক্কড়ের শব্দ—মনে হল, যেন এতক্ষণে সে প্রেতগুলো সবাক হয়ে আমাকে ঘিরে বিচিত্রস্বরে মহা আনন্দের হাসি হাসছে।

মিনিট কয়েক পরে সংজ্ঞা হয়ে দেখলুম, আমার চারিদিকে অসংখ্য লোকের ভিড় জমে গেছে, আর বিরাজবাবু পাগলের মত আমার দুটো নড়া ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছেন—আর বলছেন, 'কি করলে—আমার চশমা কই? আমার চশমা কই? আমার চশমা—'

মূর্ছা যাওয়াই সদ্যুক্তি বিবেচনা করে আমি আবার মূর্ছিত হয়ে শুয়ে পড়লুম।

২৬ শ্রাবণ ১৩৪০

বহুরূপী

এটা বরদার গল্প হইলে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্যাপারটা আমার চোখের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া উড়াইয়া দিবার আর পথ নাই। যদিও বরদা মূলতঃ এই ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, তবু এত

banglabooks.in

বড় ভোজবাজি তাহার মত মিথ্যাবাদীর পক্ষেও অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

গত শীতকালে বরদার মস্তকে হঠাৎ বিষয়বুদ্ধি চাগাড় দিয়া উঠিয়াছিল। শহর হইতে মাইল পনের দূরে—বেহারের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে দেহাত বলে—সেই অজ পাড়াগাঁয়ে বরদার কিছু ধান জমি ও কয়েক ঘর কায়েমী প্রজা ছিল। এতকাল ফৌজদার সিং নামক জনৈক শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত এই সকল বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু হঠাৎ বরদা শিশোদীয় রাজপুতের সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া স্বয়ং দুর্জয় শীতে ধান কাটাইবার জন্য প্রস্থান করিল। দশদিনের মধ্যে তাহার আর কোন খবরই পাওয়া গেল না।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ক্লাবে বসিয়া অনর্গল মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়, সঙ্গীহীন পাড়াগাঁয়ে তাহার এই দীর্ঘ প্রবাস কি করিয়া কাটিতেছে, এই প্রশ্ন আমাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। সেখানে বরদা কাহাকে আষাঢ়ে গল্প শুনাইতেছে? আমরা ভাবিয়াছিলাম, দু'দিন যাইতে না যাইতেই সে পলাইয়া আসিবে—কিন্তু এ কি! দশ দিন কাটিয়া গেল এখনও তাহার দেখা নাই। তাহার বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বরদা নিজের কাছারী বাড়িতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, শীঘ্র গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই; ধান কাটানো যে কিরূপ আনন্দদায়ক কার্য তাহাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া লম্বা চিঠি লিখিয়াছে। শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

অমূল্য বলিল, 'ধান-টান সব মিছে কথা, যা হয়েছে আমি বুঝেছি। বরদার বৌ ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বঙ্গ-মহিলা হলেও ধৈর্যের একটা সীমা আছে তো।'

তা সে কারণ যাহাই হোক, বরদার অভাবে ক্লাবের সান্ধ্য অধিবেশনগুলি নিঝুম ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিল। বরদা যতই মিছে কথা বলুক, সে একজন সত্যকার মজলিশি লোক তাহা ক্রমশঃ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম; এমন কি অমূল্যকে দেখিয়াও মনে হইতে লাগিল, তর্ক করিবার একজন প্রতিপক্ষের অভাবে সে ভিতরে ভিতরে বিশেষ মুষড়িয়া পড়িয়াছে।

অবশেষে চৌদ্দ দিনের দিন বরদার চিঠি আসিল; তাহার বাড়ির চাকর রঘুয়া চিঠিখানা ক্লাবে দিয়া গেল। ক্লাবের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বরদা চিঠি দিয়াছে; পাঠ করিয়া তাহার দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের যথার্থ কারণ অজ্ঞাত রহিল না। বরদা লিখিয়াছে—

বন্ধুগণ, তোমরা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস কর না; আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বানাইয়া বলি এরূপ ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে করিয়া থাক। তোমাদের মত অন্ধ নাস্তিকের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিজের চোখে ভূত দেখিতে চাও? স্বকর্ণে ভূতের কথা শুনিতে চাও? ভূতের সহিত করকম্পন করিতে চাও?

আমি এখানে আসিবার পর আমার কাছারী বাড়িতে একটি অশরীরী আত্মার সহিত পরিচয় হইয়াছে। অত্যন্ত মিশুক লোক, প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাদের গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি তোমাদের সহিত আলাপ করিতে রাজী হইয়াছেন। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, সকলে মিলিয়া এখানে চলিয়া এস। এক রাত্রি থাকিলেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

কবে আসিতেছ জানাইও। এখানে আসিতে হইলে তারাপুর পর্যন্ত বাসে আসিতে হয়, সেখান হইতে আমার আস্তানা পদব্রজে আড়াই মাইল। রাস্তাঘাট নাই বটে, কিন্তু এসময়ে কোনও কষ্ট হইবে না। তারাপুরে থানায় খোঁজ লইলে সেখানকার চৌকিদার পথ দেখাইয়া দিবে। ইতি

তোমাদের বরদা

চিঠি পড়িয়া অমূল্য বলিল, 'হুঁ, এই চৌদ্দ দিন জিরিয়ে নিয়েছে কিনা, একটা বড় রকম বুজরুকি দেখাবে।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু ভূতের সঙ্গে করকম্পনটা হবে কি করে?'

পৃথ্বী বলিল, 'সেটা যথাস্থানে পেঁৗছে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। তা হলে কবে যাওয়া স্থির করছ?'

banglabooks.in

গবেষণার পর স্থির হইল আগামী মঙ্গলবার আমি, অমূল্য, পৃথ্বী ও চুনী এই চারজন, পূর্বাহ্নে কোনও খবর না দিয়াই বরদার আড্ডায় গিয়া হানা দিব। বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে, প্রেতাত্মার সহিত করকম্পনের মহাসৌভাগ্য যদি নাও ঘটে তবু একটা আউটিং তো হইবে। ওদিকটাতে শিকারও ভাল পাওয়া যায়।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা চারিজন বৈকালে আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় বাস হইতে অবতরণ করিয়া হাঁটা পথ ধরিলাম। ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়া যাহাদের চলা অভ্যাস নাই তাহাদের পক্ষে এই পথে পদক্ষেপ সর্বদা নিরুদ্বেগ নয়,—মাঝে মাঝে অতর্কিতভাবে পথি-পার্শ্বস্থ পঙ্কশয্যায় বিশ্রাম করিবার সুযোগ ঘটিয়া যায়। কিন্তু সে যাহাই হোক, আড়াই মাইল পথ যে এত দীর্ঘ হইতে পারে, তাহা পূর্বে কখনও ভাবিতে পারি নাই! অমূল্য শ্লেষ করিয়া বলিল, মাইলগুলো সম্ভবত ভৌতিক মাইল, তাই তাহাদের আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এই অতি-প্রাকৃত আড়াই মাইলের শেষে যখন বরদার আস্তানায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে দিনের আলো আর নাই, কেবল পশ্চিম আকাশে শীর্ণ সন্ধ্যালোক মুমূর্ষুর প্রাণশক্তির মত নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে।

চারিদিকে কোথাও মানুষের বসতি নাই, আবছায়া ধানক্ষেতের মাঝখানে বিঘাখানেক পতিত জমি, তাহারই একপ্রান্তে একটি জীর্ণ ইটের ঘর—চারিপাশে অপরিসর একটু বারান্দা, মাথার উপর খড়ের ছাউনি। পতিত জমির উপর স্থানে স্থানে খড়ের স্তূপ রাখা আছে। প্রথমটা লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ঠিক স্থানে পৌঁছিয়াছি কি না সন্দেহ হইতে লাগিল। অনতিদূরে একটা শিকলে বাঁধা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, কাছে গিয়া দেখিলাম বরদার কুকুর—খোক্কস। খোক্কসের সহিত আমাদের প্রণয় ছিল, কিন্তু সে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিল না, নিদ্রালুভাবে একবার তাকাইয়া আবার থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

কিন্তু বরদা কোথায়? ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে না; এদিক ওদিক চাহিতে দেখি খড়ের একটি গাদার তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি প্রাণী বাহির হইয়া আসিতেছে। মূর্তিটি ক্রমে খাড়া হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া ফৌজী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম বুঝি বরদার শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত; কিন্তু দেখিলাম—তাহা নয়, নেপাল হইতে অবতীর্ণ চন্দ্রবংশীয় একজন ক্ষত্রিয়। সম্ভবত বরদার দেউড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিধানে খাকি পোষাক, পায়ে বুট জুতা, কোমরে কুক্রি—রীতিমত যোদ্ধৃবেশ। তাঁহাকে বরদার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি চন্দ্রবংশীয় ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

শীতে একখানি পথ হাঁটিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নির্বিকার মুখে আবার খড়ের গাদার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা যেখানে ছিলাম সেখান হইতে ঘরটি বোধ করি ত্রিশ কদম দূরে। বারান্দাসুদ্ধ ঘরের ভিত মাটি হইতে হাত দুই উঁচুতে অবস্থিত। বারান্দায় উঠিয়া সম্মুখেই ঘরের দ্বার; আমি সর্বপ্রথম উপরে উঠিয়া দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াই চমকাইয়া উঠিলাম!—অন্ধকার দরজার মুখে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পরক্ষণেই বরদা সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'এস। খবর না দিয়ে এলে যে; আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না?'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। বরদা একটা তেলের ল্যাম্প জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

অমূল্য ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল, 'ঘরেই ছিলে তো—সাড়া দিচ্ছিলে না কেন?—দেয়ালা হচ্ছিল বুঝি?'

উত্তরে বরদা কেবল হাসিল। বলিল, 'বসো সবাই। শীতে নিশ্চয় কালিয়ে গিয়েছ। চা

banglabooks.in

তৈরি আছে—দিচ্ছি।' বলিয়া প্রকাণ্ড একটা থার্মোফ্লাস্ক হইতে ধূমায়িত চা ঢালিয়া সকলকে দিতে লাগিল।

চা খাইতে খাইতে বরদার ঘরের চতুর্দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের কোথাও এতটুকু প্লাস্টার নাই, নোনাধরা লাল ইটগুলি সারি সারি দাঁত বাহির করিয়া আছে; মেঝে মাটির, গোময় দিয়া লিপ্ত! এক কোণে একটি ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর বরদার লেপ-বিছানা স্তূপীকৃত রহিয়াছে; আর এককোণে একটি বড় কাঠের সিন্দুক, তাহার উপর চায়ের সরঞ্জাম স্টোভ ইত্যাদি রাখা আছে; ঘরের মধ্যস্থলে একটি কেরোসিনকাঠের টেবিল, এবং তাহাই ঘিরিয়া কয়েকটি কঞ্চির মোড়ার উপর বসিয়া অনুজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় আমরা কয়জন চা পান করিতেছি।

খোলা দরজা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল, বরদা সেটা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিল; তৃপ্তভাবে দুই হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, 'আমার ঘরটি কেমন দেখছ? ঘর ছিল না, কেবল চারিটি পুরানো দেওয়াল দাঁড়িয়ে ছিল; আমি এসে খড়ের চাল তুলে বাসের উপযোগী করে নিয়েছি।—বেশ হয়নি?'

'খাসা হয়েছে!'

'পেয়াদা সেপাই চিরকাল বাইরে খড়ের ছাপ্পর তৈরি করে তার মধ্যে থাকে; এবারও তাই আছে। কিন্তু আমি ভাই পারলুম না। তেরপলের তলায় এক রাত্তির শুয়েছিলুম—বাপ কি শীত! ঘরের মধ্যে এক রকম ভালই আছি। আচ্ছা, ঘরটা তোমাদের বেশ ইয়ে বোধ হচ্ছে না?'

আমরা সকলেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম। 'ইয়ে' বলিয়া বরদা ঠিক কি বুঝাইতে চাহিল জানি না, কিন্তু এই ঘরে পদার্পণ করিবার পর হইতেই আমার মনের উপর কেমন একটা ছায়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, মনের সে পরিহাস-তরল ভাব আর ছিল না। কোথায় এ ঘরের কি গলদ আছে—বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অথচ অপরিচিত অন্ধকার পথে চলিবার সময় যেমন চক্ষু-কর্ণের তীক্ষ্ণতা অজ্ঞাতসারেই বাড়িয়া যায়, তেমনি একটা দুর্লক্ষ্য অবাস্তবতার সংশয় আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিশয় সতর্ক ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল।

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া অমূল্য বলিল, 'তারপর, তোমার ভূত কই?'

বরদার হাসিমুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেন কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিল, তারপর অমূল্যর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'ভয় নেই, তাঁর পরিচয় পাবে; মিছে তোমাদের এত দূর ডেকে আনিনি।'

চুনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে? তাঁর আসার সময়ের কিছু স্থিরতা আছে কি?'

বরদা বলিল, 'কিছু না। শুধু তাই নয়, কোন্ রূপে তিনি আসবেন, তারও স্থিরতা নেই।'

আমরা মোড়া টানিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিলাম। পৃথ্বী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'সেটা কি রকম!'

বরদা বলিল, 'তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে আসেন বটে, কিন্তু চেহারা সব সময়ে এক রকম হয় না।'

'তার মানে কি?'

'তার মানে—' বরদা যেন একটু ইতস্তত করিল—'অশরীরী আত্মাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে হলে কিছু জান্তব মাল-মশলার দরকার হয়, তার নাম বিজ্ঞানের ভাষায় এক্টোপ্লাজম্। এই এক্টোপ্লাজম প্রয়োজন মত না পেলে চেহারা একটু অন্যরকম হয়ে যায়।

অমূল্য বলিল, 'ও, তোমার সেই পুরাতন থিওরি! কিন্তু তোমার ইনি এক্টোপ্লাজম্ পান কোথা থেকে!'

বরদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, 'বোধ হয় খোক্কসের গা থেকে। তিনি যতক্ষণ থাকেন, কুকুরটা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে,—নড়েচড়ে না, ডাকেও না—

banglabooks.in

তবে শুধু যে এক্‌টোপ্লাজমের তারতম্যে চেহারার তারতম্য হয় তা নয়, অন্য কারণও আছে।'

'অন্য কারণটি কি?'

'ইচ্ছা। প্রেতযোনি ইচ্ছা করলেই চেহারা বদল করতে পারে; কারণ, তাদের দেহের উপাদান মানুষের দেহের উপাদানের মত কঠিন বস্তু নয়।'

এই সময়ে বরদাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। এ কয়দিনে তাহার কি একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরোক্ষ বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়াইয়া যেন সে সাক্ষাৎ উপলব্ধির দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার্কিকের যুযুৎসা একেবারেই নাই, মুখে একটা নিঃসংশয় প্রসন্নতার ভাব, ঠোঁটের কোণে একটু সকৌতুক কোমলতা ক্রীড়া করিতেছে। বরদার এই অবস্থান্তর আমার মনের ছায়াকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিল।

পৃথ্বী বলিল, 'থিওরি যাক। এখন ঘটনাগুলো বল শুনি—তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কতদূর দাঁড়িয়েছে, কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হল ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমাকে আগাগোড়া গল্পটা বলবার সুযোগ দিচ্ছি : আরম্ভ কর।'

বরদা একটু হাসিয়া বলিল, 'বেশ।' তারপর আবার যেন কান পাতিয়া কি শুনিল—'দ্যাখো, একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। যদি কোনো সময় বুঝতে পারো যে তিনি এসেছেন —ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

চারিদিকে সচকিতভাবে একবার চাহিয়া আমরা আশ্বাস দিলাম, ভয় পাইব না। বরদা তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

'প্রথম যে-রাত্রে এ ঘরে শুই, সে-রাত্রে কিছু বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয় রাত্রে হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল; শুনতে পেলুম, ঘরের মধ্যে কে খসখস করে চলে বেড়াচ্ছে। দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলুম, ভাবলুম, সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে। বালিশের তলায় টর্চ ছিল, হঠাৎ জেলে ঘরের চারিদিকে ফেললুম। কেউ কোথাও নেই।

'আবার আলো নিভিয়ে যেই শুয়েছি অমনি খসখস শব্দ আরম্ভ হল। আবার আলো জ্বাললুম। এই রকম তিন-চার বার হল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলুম। চিরজীবন এই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, তবু বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। আলো নিভিয়ে গলার স্বর যথাসাধ্য সংযত করে বললুম, 'আপনি কে আমি জানি না; কিন্তু আপনার যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলতে পারেন।'

'মনে হল, কে যেন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলুম, 'আপনি ভয় পাবেন না।'

'লেপের মধ্যে থেকেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, বললুম, 'না।'

'তিনি মৃদু কণ্ঠে একটু হাসলেন। যেন আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। হাসি শুনে আমার মনে সাহস হল; ভারি সহানুভূতিপূর্ণ নরম হাসি—একটু করুণ। আমি বললুম, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

'চোখে কিছুই দেখতে পেলুম না, অনুভবে বুঝলুম, তিনি আমার বিছানার পাশে বসলেন। তারপর নিঃশ্বাসের মত মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি এই ঘরটাতে থাকি। আপনি এসে পর্যন্ত আলাপ করবার জন্য ছটফট করছি, কিন্তু পাছে আপনি ভয় পান—তাই সাহস হচ্ছিল না।'

'আমি কি বলব ভেবে পেলুম না। তিনি বলতে লাগলেন, 'এইখানে প্রায় পঁচিশ বছর আছি। ঘরটা আমিই তৈরি করিয়েছিলুম, তারপর মৃত্যুও হল এইখানেই। প্লেগ হয়েছিল ...সৎকার করবার লোক ছিল না, মৃতদেহটাকে শেয়াল-কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করলে ...সেই থেকে এ জায়গা ছেড়ে যাবার আমার উপায় নেই...একলাই থাকি। আপনি এসেছেন দেখে ভারি আনন্দ হল; কারুর সঙ্গে তো মিশতে পারি না;—দুটো কথা কইবারও সুযোগ হয় না। সবাই ভয় পায়; অথচ আমি—আমরা কারো অনিষ্ট করতে চাই না—ক্ষমতাও নেই। —কেন বলুন দেখি সবাই ভয় পায়?'

'এ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তাই জবাব দেওয়া হল না। তিনি বললেন, 'আমি যদি

banglabooks.in

মাঝে মাঝে এসে আপনার সঙ্গে গল্পসল্প করি, আপনার কষ্ট হবে না তো?'

'আমি বললুম, 'না, বরং খুশী হব।'

'তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, 'ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাকে চোখে দেখলে কি আপনি খুব ভয় পাবেন? সত্যি বলছি আমার চেহারা বীভৎস নয়—সাধারণ মানুষের মত।'

'বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠল, কিন্তু বললুম, 'না, ভয় পাব না।'

'তিনি বললেন, 'তবে আলোটা জ্বালুন।'

'মনকে দৃঢ় করে টর্চ জ্বাললুম। মুহূর্তের জন্য তাকে দেখতে পাওয়া গেল। আমাদেরই সমবয়স্ক একটি যুবক, ময়লা রং, বড় বড় চুল—আগ্রহভরা চোখে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। নিতান্তই সহজ মানুষের চেহারা, ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু তবু বুদ্ধি-বিবেচনা কোনও কাজেই লাগল না, সমস্ত অন্তরাত্মা যেন ভয়ে আঁতকে উঠল। মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। শুনতে পেলুম, বাইরে খোক্কস কুকুরটা কান্নার মত একটা আওয়াজ করে ডেকে উঠল।'

বরদা চুপ করিল।

ফুসফুস হইতে অবরুদ্ধ বাষ্প মুক্ত করিয়া বলিলাম, 'তারপর?'

বরদা বলিল, 'তারপর—' সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্বের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, 'সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে—হ্যাঁ, তারপর ক্রমে ভয় কেটে গেল। এখন রোজই তিনি আসেন, অনেক কথাবার্তা হয়। তোমাদের সঙ্গেও দেখা করবার জন্যে তিনি খুব উৎসুক ছিলেন—কিন্তু—। আর সময় নেই—এস।' বরদা আমার দিকে প্রসারিত করতল বাড়াইয়া দিল। কিছু না বুঝিয়া তাহার সহিত শেকহ্যান্ড করিলাম। বরদার হঠাৎ হইল কি? আমাদের বিদায় করিতে চায় নাকি?

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু কই, তিনি এখনও দেখা দিলেন না?'

বরদা আবার বসিয়া পড়িল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'হয়তো দেখা দিয়েছেন—তোমরা জানতে পারনি—'

এই সময় বাহিরে দ্রুত পদধ্বনি শুনা গেল। আমরা চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। পদশব্দ বারান্দার উপরে উঠিল, তারপর বন্ধ দরজায় সজোরে ধাক্কা পড়িল। হৃদ্‌যন্ত্রটাও ওই ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিল; আমরা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম—এ সময় হঠাৎ কে আসিল? তবে কি—

বরদার মুখে একটা ম্লান হাসি ক্রীড়া করিতেছিল; সে পূর্ণ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিল, 'বুঝতে পারছ না?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম।

বরদা ব্যথিত অবসন্ন কণ্ঠে বলিল, 'এখনি বুঝতে পারবে; দোর খুলে দাও—'

দ্বার খুলিয়া দিব? কিন্তু দ্বারের ওপারে কী আছে?

আবার সজোরে ধাক্কা পড়িল; বরদা আবার চোখের নীরব ইঙ্গিতে আমাকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। আমি মোহাচ্ছন্নের মত উঠিয়া গিয়া দ্বারের হুড়কা খুলিয়া দিলাম।

অধীর হস্তে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল—বরদা!

বরদা বলিয়া উঠিল, 'আরে, তোমরা এসেছ? আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলুম—' আমাদের মুখ দেখিয়া বরদা অর্ধপথে থামিয়া গেল।

আমরা সকলে, যে মোড়ায় বরদা বসিয়াছিল সেই দিকে ফিরিয়াছিলাম। দেখিলাম, মোড়ায় যে বসিয়াছিল সে নাই—মোড়া খালি।

এই সময় বাহিরে বরদার কুকুরটা কান্নার মত একটা দীর্ঘ একটানা সুরে ডাকিয়া উঠিল।

বরদা সেই ডাক শুনিয়া তীক্ষ্ণ চক্ষে আমাদের পানে চাহিল, তারপর ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, 'অ্যাঁ! তবে কি—?'

আমি অতি কষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিলাম, 'হ্যাঁ। অতিথি-সৎকারের কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু ভাই, আজ রাত্রেই আমরা বাড়ি ফিরব।'

১২ ভাদ্র ১০৪৪

banglabooks.in

প্রতিধ্বনি

মানুষের চরিত্র যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে সে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ভাবে সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ ঘটে নাই। বরং একটানা সংগতি দেখিলেই কেমন একটা বিস্ময় জাগে, সন্দেহ হয় কোথাও বুঝি কিছু গলদ আছে।

কিন্তু যে লোকটার জীবনধারা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, সে যদি কেবল একটা বাড়ি কিনিবার ফলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবদের মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। সোমনাথ সম্বন্ধে আমরাও একটু বিশেষ রকম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম।

সোমনাথ বরদার আষাঢ়ে গল্পের আসরে বড় একটা যোগ দিত না বটে, তবু সে আমাদের সকলেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। একেবারে প্রাণখোলা লোক—অত্যন্ত মিশুকে ও আমুদে—হাসিয়া-খেলিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছিল। বাপ মৃত্যুকালে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অন্নচিন্তা ছিল না। বিবাহের তিন-চার বছরের মধ্যে স্ত্রীও মারা গিয়াছিল, কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হইয়াও সে আর বিবাহ করে নাই। প্রাণখোলা লোক হইলেও তাহার সুবুদ্ধির ধারে যে অর্গল ছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মারাত্মক রকম বদ্‌খেয়ালও তাহার কিছু ছিল না। বিহার-প্রান্তের বৈচিত্র্যহীন শহরে জীবনটা নেহাত একঘেয়ে হইয়া পড়িলে কলিকাতায় গিয়া কিছু দিন নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিয়া আসিত। তারপর আবার হৃষ্ট মনে বিলিয়ার্ড খেলায় মনোনিবেশ করিত। তাহার জীবনে একটি মাত্র নেশা ছিল—ঐ বিলিয়ার্ড খেলা। সিগারেট পর্যন্ত তাহাকে কোনও দিন খাইতে দেখি নাই; কিন্তু শহরে থাকিয়াও সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড খেলিবার জন্য ক্লাবে আসে নাই, এমন একটা দিনও মনে করিতে পারি না।

বাড়ি কেনার ব্যাপারটাও যে বিলিয়ার্ড খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পৈতৃক বাড়ি ছিল—মন্দ বাড়ি নয়—একটু সেকেলে-গোছের হইলেও ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। তবু সে সতের হাজার টাকা খরচ করিয়া আর একখানা বাড়ি কিনিয়া বসিল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এক বিলিয়ার্ড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমাদের মিউনিসিপ্যাল সীমানার এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটি পুরাতন বাড়ি ছিল এবং বাড়িতে একটি অতি পুরাতন মেম বাস করিত। বস্তুত বাড়ি অথবা বুড়ী কোন্‌টি বেশী পুরাতন এ লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক দিন তর্ক হইয়া গিয়াছে। শেষে আমাদের মধ্যে কেহ একজন গেজেটিয়ার খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, বাড়িটাই অগ্রজ। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে এক নীলকর সাহেব এই কুঠী তৈয়ার করাইয়াছিল, ক্রমে নীলের ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় উহা পারিবারিক বাসভবনে পরিণত হইয়াছিল। তারপর তিন পুরুষ ধরিয়া নীলকর সাহেবের বংশধরেরা এইখানেই বাস করিতেছে। বুড়ী শেষ উত্তরাধিকারিণী।

আমাদের তর্কের নিষ্পত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল—বাড়ি অথবা বুড়ী শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি টিকিয়া থাকিবে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বুড়ী হারিয়া গেল। একদিন শুনিলাম তাহার গঙ্গালাভ হইয়াছে।

বুড়ী চিরকুমারী, তাই সাক্ষাৎ ওয়ারিস কেহ ছিল না। অল্প দিন পরে শোনা গেল বাড়ি বিক্রয় হইবে। নেহাত খেয়ালের বশেই একদিন বৈকালে আমরা কয়েকজন দেখিতে গেলাম। সোমনাথের মোটর আছে, তাহার মোটরে চড়িয়াই অভিযান হইল।

ফাঁকা মাঠের মত বিস্তৃত গঙ্গার তীরে অনুচ্চ পাঁচিলে ঘেরা 'ভিলা'-জাতীয় বাড়ি। চতুষ্কোণ বাড়ি, চারিদিকে নীচু বারান্দা—মধ্যস্থলটা প্রায় দ্বিতলের মত উঁচু হইয়া আছে।

banglabooks.in

একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ নিতান্ত সঙ্গীহীন ভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ির পিছনে দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত; সম্মুখে ফটকের স্তম্ভে শ্বেত পাথরের ফলকের উপর নাম লেখা আছে—"Echoes"—প্রতিধ্বনি।

বাড়ির একজন মুসলমান চৌকিদার ছিল, সেও বোধ করি বুড়ীর সমসাময়িক। চাবি খুলিয়া বাড়ির ভিতরটা আমাদের দেখাইল। সুসজ্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি, চেয়ার সোফা পালঙ্ক ঘরে ঘরে যেমন ছিল তেমনি সাজানো আছে। বাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হল-ঘর। ছাদ খুব উচ্চ—বহু ঊর্ধ্বে কাচে ঢাকা স্কাই-লাইট দিয়া আলো আসার ব্যবস্থা। তবু ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন।

চৌকিদার সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, কয়েকটা বাল্ব একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল রহিয়াছে। টেবিলের উপর সবুজ আবরণে ঢাকা তিনটি বাল্ব, কেবলমাত্র টেবিলের সমতল পৃষ্ঠের উপর আলো ফেলিয়াছে। ঘরে অন্য আভরণ বিশেষ কিছু নাই। দেয়ালের ধারে দুইটি সেটি, একধারে বিলিয়ার্ড-যষ্টি রাখিবার র‍্যাক্—তাহাতে সারি সারি কয়েকটি 'ক্যু' রাখা আছে। দেয়ালের গায়ে একটি কালো রঙের মার্কিং বোর্ড, কত দিনের পুরানো বলা যায় না, তাহাতে অঙ্কের চিহ্নগুলি একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে তাকাইয়া সোমনাথ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ!'

সত্যই ঘরের আধা অন্ধকার মোলায়েম আবহাওয়া মনের উপর একটা অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করে, ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাই সোমনাথকে সমর্থন করিয়া আমিও ঐ জাতীয় একটা কিছু বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার কানের কাছে কে যেন চাপা গলায় বলিল, 'আ—ঃ!'

চমকিয়া পিছনে তাকাইলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও পিছনে তাকাইয়াছিল—কিন্তু পিছনে কেহই নাই। আমরা উদ্বিগ্নভাবে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলাম। তখন বৃদ্ধ চৌকিদার ভাঙা গলায় বুঝাইয়া দিল যে উহা প্রতিধ্বনি। এ ঘরে প্রতিধ্বনি আছে, কথা কহিলে অনেক সময় কথার ভগ্নাংশ ফিরিয়া আসে।

আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু মনে একটু খোঁকা লাগিয়া রহিল। চৌকিদার অতগুলো কথা কহিল, কই তাহার একটা কথাও তো ফিরিয়া আসিল না।

যা হোক, পরিদর্শন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে সোমনাথ একবার বলিল, 'খাসা বাড়িখানি। আর ঐ বিলিয়ার্ড-রুমটা—চমৎকার।'

বিলিয়ার্ড-রুমের চমৎকারিত্ব তাহাকে কত দূর মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম দিন-দশেক পরে, যখন শুনিলাম সে বাড়িখানি খরিদ করিয়াছে। তারপর আরও বিস্ময়কর সংবাদ, সে পৈতৃক বাড়ির বাস তুলিয়া দিয়া নবক্রীত বাড়িতে উঠিয়া গেল। গৃহপ্রবেশের দিন আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল বটে, কিন্তু কেন জানি না সমস্ত ব্যাপারটাতে আনন্দ-উৎসবের স্পর্শ লাগিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল এটা সোমনাথের চিরবিদায় ভোজ।

দাঁড়াইলও তাই। দুই মাইল দূরে উঠিয়া গেলে পুরাতন বন্ধু কিছু পর হইয়া যায় না, কিন্তু সোমনাথ যেন মনের দিক দিয়াও আমাদের অনেক দূরে সরিয়া গেল। মাঝে মাঝে সে ক্লাবে আসিত এবং আগের মত হাসিগল্প করিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু দেখিলাম তাহার মনটা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে যেমন সমস্ত গল্প কৌতুক ও খেলায় মনপ্রাণ ঢালিয়া যোগ দিতে পারিত, এখন আর তেমন পারে না। তাহার প্রাণখোলা হাসিটাও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, যে এত দিন রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল সে যেন অকস্মাৎ অবাস্তব ছায়ায় পরিণত হইয়াছে।

ক্লাবে বসিয়া সোমনাথ সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল।

পৃথ্বী বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ। বাড়িটা সোমনাথকে গিলে খেয়েছে।—কদ্দিন এদিকে

banglabooks.in

আসেনি?'

আমার হিসাব ছিল, বলিলাম, 'আমাদের 'জনা' অভিনয়ের রাত্রে তাকে শেষ দেখেছি। মাসখানেক হল।'

অমূল্য বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ-টাষাণ নয়। আসলে নিজের বিলিয়ার্ড টেবিল পেয়েছে, রাতদিন তাই খেলছে।'

বরদা এক পাশে বসিয়া ছিল, কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'হুঁ।'

অমূল্য ভ্রূ তুলিয়া তাহার দিকে ফিরিল, 'হুঁ মানে? বলতে চাও কি? তাকে ভূতে পেয়েছে?'

বরদা উত্তর দিল না, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর চক্ষু নামাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যে-রাত্রে সোমনাথ আমাদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল, সে রাত্রির কথা মনে আছে?'

'কোন্ কথা?'

'খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি আর সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলেছিলে—বোধ হয় ভোলনি। আমি বসে তোমাদের খেলা দেখছিলুম। সে সময় তোমার নিজের খেলার কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করনি?'

লক্ষ্য যে করিয়াছিলাম তাহা নিজের কাছেও এত দিন স্পষ্টভাবে স্বীকার করি নাই, অথচ বরদা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। ভাল খেলোয়াড় বলিয়া আমার অহঙ্কার নাই, কিন্তু সেদিন আমার খেলা আশ্চর্য রকম খুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক বার বল মারার সময় মনে হইয়াছিল আমি খেলিতেছি না, আর কেহ আমার হাত ধরিয়া খেলিয়া দিতেছে। আমি হয়তো 'পট রেড' মারিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলের সহিত 'ক্যু'এর সংস্পর্শ ঘটিবার পূর্ব মুহূর্তে যেন একটা অদৃশ্য হাত আমার হাতে ঈষৎ নাড়া দিয়া আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলে আমার বল 'রেড্'কে স্পর্শ করিয়া সমস্ত টেবিল ঘুরিয়া একটা অসম্ভব পকেটে প্রবেশ করিয়াছে। এমনি অনেক বার ঘটিয়াছিল। ক্রমে আমার মনে এমন একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, যন্ত্রচালিতের মত খেলিয়া গিয়াছিলাম। সোমনাথ সেদিন আমাকে হারাইতে পারে নাই।

খেলার শেষে মোহের অবস্থা কাটিয়া গেলে এই বলিয়া নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, খেলার ক্ষেত্রে দৈবাৎ এ-রকম অঘটন ঘটিয়া যায়, নিকৃষ্ট খেলোয়াড়ও হঠাৎ ভাল খেলিয়া ফেলে। কিন্তু ইহার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে, তাহা তখন ভাবি নাই। আজ বরদা স্মরণ করাইয়া দিতেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিলাম।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছি দেখিয়া বরদা বলিল, 'তাহলে লক্ষ্য করেছিলে। আমি আর একটা জিনিস শুনেছিলুম যা তোমরা কেউ শোননি। খেলায় তন্ময় ছিলে বলেই বোধ হয় শুনতে পাওনি।'

'কি?'

'হাততালির শব্দ। সোমনাথ একটা খুব সুন্দর মার মেরেছিল; তিনটে বলে ঠোকাঠুকি হয়ে তিনটেই একই পকেটে গেল। ঠিক তারপর কে যেন খুব মোলায়েম হাতে হাততালি দিয়ে উঠল।'

অমূল্য বলিল, 'ওটা প্রতিধ্বনি। যেখানে সহজ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ভূত-প্রেত টেনে আনার মানে বুঝি না।—বলে বলে ঠোকাঠুকি হওয়ার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলে সেটা হাততালির মতই মনে হয়।'

বরদা বলিল, 'আশ্চর্য বলতে হবে। বল ঠোকাঠুকি তো বরাবরই হচ্ছিল, তবে প্রতিধ্বনিটা ঠিক সেই সময়েই হল কেন?'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। 'বহুরূপী'

banglabooks.in

নাম দিয়া যে ব্যাপারটা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ঘটিবার পর হইতে বরদার গল্প সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব বেশ একটু পরিবর্তিত হইয়াছিল। সকলেরই নাস্তিকতার গোড়া একটু আলগা হইয়া গিয়াছিল। চুনী তো বিস্তর বই কিনিয়া মহা উৎসাহে প্রেততত্ত্বের চর্চা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। অমূল্য যদিও এখনও তর্ক করিতে ছাড়ে নাই, তবু তাহার ঝাঁজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

হৃষী আমাদের আলোচনাকে সিধা পথে ফিরাইয়া আনিল, বলিল, 'সে যা হোক, কথাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কি?—সোমনাথ যে বাড়ি কিনে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেল, আমাদের সংসর্গ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে, এর কারণটা তো কেউ দেখাতে পারল না। তাকে ভূতে পেয়েছে এ-কথায় শ্রদ্ধা করা যায় না। তবে হয়েছে কি তার?'

বরদা আস্তে আস্তে বলিল, 'আমার কি মনে হয় জান? সোমনাথ আমাদের চেয়ে ঢের বেশী মনের মত সঙ্গী পেয়েছে। পুরনো বাঁধনের পাশে খুব শক্ত নূতন বাঁধন পড়েছে, তাই পুরনো বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে।'

বরদার কথার ইঙ্গিতটা ভুল করিবার মত নয়, কিন্তু এতই উহা আজগুবি যে নির্বিচারে মানিয়া লওয়াও যায় না। অমূল্য আমাদের সকলের মনের ভাব যেন প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, এক দঙ্গল ভূতের সঙ্গে সোমনাথের এতই দহরম-মহরম হয়ে গেছে যে, মানুষের সঙ্গ আর তার ভাল লাগছে না?'

এবারও বরদা সোজাসুজি উত্তর দিল না, বরঞ্চ যেন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এমনি ভাবে চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল, '**Echoes**—প্রতিধ্বনি! অদ্ভুত নাম বাড়িটার। যে-লোক বাড়ি তৈরি করিয়েছিল সেই হয়তো নামকরণ করেছিল। কিংবা তার পরবর্তীরা বাড়ির আবহাওয়া দেখে নাম রেখেছিল—'প্রতিধ্বনি'!'

চুনী এতক্ষণ বসিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, কথা বলে নাই। এখন একবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'কিছু দিন থেকে একটা থিওরি আমার মাথায় ঘুরছে—'

'কিসের থিওরি?'

'এই সব হানা-বাড়ি সম্বন্ধে। এখনও থিওরিটা খুব স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেনি, তবু—'

'কি থিওরি তোমার শুনি।'

চুনী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'ঐ প্রতিধ্বনি শব্দটার মধ্যেই আমার থিওরির বীজ নিহিত রয়েছে। দেখ, শব্দের যেমন প্রতিধ্বনি আছে, তেমনি বাস্তব ঘটনারও প্রতিধ্বনি থাকতে পারে না কি? প্রতিধ্বনি না বলে তাকে প্রতিবিম্বও বলতে পার—ব্যাপারটা মূলে একই। ধ্বনির প্রতিধ্বনি সব সময় থাকে না, এই ঘরের মধ্যে তোমরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও এতটুকু প্রতিধ্বনি পাবে না। আবার এমন এক-একটা স্থান আছে যেখানে চুপি চুপি একটা কথা উচ্চারণ করলেও কোন্ অদৃশ্য প্রতিবন্ধকে ধাক্কা খেয়ে সেটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে। আমার মনে হয় হানা-বাড়িগুলোও এই জাতীয় স্থান। গ্রামোফোন রেকর্ডের মত তারা অতীতের কতকগুলো বাস্তব ঘটনা সঞ্চয় করে রাখে, তারপর সুবিধে পেলেই তার প্রতিধ্বনি করতে থাকে। বরদা, তোমার কি মনে হয়?'

থিওরিটা অভিনব বটে, কিন্তু বরদার মুখ হইতে ইহার অনুমোদন আশা করা যায় না। সে গোঁড়া ভূত-বিশ্বাসী, অথচ থিওরি সত্য হইলে ভৌতিক কাণ্ড মাত্রেই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়—প্রেতযোনির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু থাকে না।

বরদা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তাহলে তোমার মতে প্রেতযোনি নেই! যেগুলোকে ভৌতিক **phenomenon** বলে মনে হয় সেগুলো অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র?'

চুনী বলিল, 'না, তা ঠিক নয়। আমি বলতে চাই, প্রেতযোনি থাকে থাক, কিন্তু হানা-বাড়িতে সাধারণতঃ যে-সব ব্যাপার ঘটে থাকে, সেগুলো হয়তো অধিকাংশই এই প্রতিধ্বনি-জাতীয়।'

আমি বলিলাম, 'সোমনাথের বাড়িতে প্রতিধ্বনি আছে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেটা

banglabooks.in

কোন্ জাতীয়?'

চুনী বলিল, 'সেইটেই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।—তোমরা কেউ রাজী আছ?'

'কি করতে হবে?'

'আমি স্থির করেছি একদিন সোমনাথের বাড়িতে গিয়ে রাত্রি যাপন করব। সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত আবশ্যক, সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও পরীক্ষাটা তুচ্ছ হবে না; আর যদি সে এমন কিছু পেয়ে থাকে যার তুলনায় তার আজন্মের সমস্ত বন্ধন ঢিলে হয়ে গেছে, তাহলে সেই অপূর্ব বস্তুটি কি তাও আমাদের জানা দরকার।'

অমূল্য একটু মুখ বাঁকাইয়া কবিতা আবৃত্তি করিল—

'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারই খানিক
মাগি আমি নতশিরে—'

যদি সুবিধে হয় গোটাকয়েক প্রেতাত্মা বরদার জন্যে চেয়ে নিয়ে এস, আমাদের এই ক্লাব-ঘরে পুষে রাখা যাবে।'

আমি চুনীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, 'বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজী আছি। কালই চল তাহলে, শনিবার আছে।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সোমনাথের বাড়ির সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম, তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রকাণ্ড হাতার মাঝখানে বাড়িখানা যেন একেবারে জনশূন্য মনে হইল।

বাড়ির বারান্দায় উঠিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি ও চুনী পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলাম। চাকর-বাকর কেহই কি নাই? সব গেল কোথায়?

হাঁক দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ভিতর হইতে খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ভুল হইবার নয়, বিলিয়ার্ড বলের ঠোকাঠুকি লাগার শব্দ। আশ্চর্য বোধ হইল। এই ভর-সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলিতেছে! কাহার সহিত খেলিতেছে?

দু'জনে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কোনও ঘরে এখনও বাতি জ্বলে নাই, কেবল বিলিয়ার্ড-রুম হইতে আলো আসিতেছে। আমরা নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

টেবিলের উপরকার সবুজ শেড-ঢাকা বাতি তিনটি শুধু জ্বলিতেছে—তাহাদের আলোক-চক্রের বাহিরে ঘর অন্ধকার। এই আলো-অন্ধকারের সীমানায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া সোমনাথ আত্মনিমগ্ন ভাবে 'ক্যু'এর মুখাগ্রে খড়ি লাগাইতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

চুনী বলিয়া উঠিল, 'কি হে, একলাই খেলছ?'

'কে?' সোমনাথ চমকিয়া মুখ ফিরাইল। তারপর দ্রুত দ্বারের কাছে আসিয়া সুইচ্ টিপিল; ঘরের অন্য আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের দেখিয়া সে প্রথম কিছুক্ষণ নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল, যেন ভাল করিয়া চিনিতেই পারিল না। আমরাও অপ্রতিভ-ভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুঝিলাম, আমাদের সহিত তাহার মনের সংযোগ এমন পরিপূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, সহসা জোড়া লাগাইতে পারিতেছে না।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত হাসির একটি চেষ্টা করিয়া সে বলিল, 'আরে তোমরা! তারপর —হঠাৎ? কি ব্যাপার?'

সোমনাথের কণ্ঠে যে সহজ অকৃত্রিম সমাদরের সুর শুনিতে আমরা অভ্যস্ত তাহা যেন ফুটিল না। আমি সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'ব্যাপার কিছু নয়, তোমার ঘরকন্না দেখতে এলুম। —একলা বিলিয়ার্ড খেলছিলে নাকি?'

'একলা!' কথাটা বলিয়াই সে সামলাইয়া লইল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, একলাই খেলছিলুম।—এস, বাইরে বসা যাক।'

banglabooks.in

ঘরের আলো নিবাইয়া সোমনাথ আমাদের বারান্দায় লইয়া গিয়া বসাইল। এতক্ষণে বাহিরেও অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ঝাউগাছটাতে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছিল। সে বলিল, 'আলো জেবলে দেব, না অন্ধকারেই বসবে?'

চুনী বলিল, 'ক্ষতি কি, অন্ধকারেই বসা যাক।'

বেতের মোড়ায় তিনজনে চুপচাপ বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। হঠাৎ সোমনাথ বলিল, 'চা খাবে?'

চুনী উত্তর দিল, 'না, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি।'—তারপর একবার গলাটা ঝাড়িয়া বলিল, 'তুমি দিন-দিন যে-রকম ডুমুরফুল হয়ে উঠছ, ভয় হল দু-দিন বাদে হয়তো চিনতেই পারবে না। তাই আজ তোমার বাড়িতে রাত কাটাব বলে এসেছি। পুরনো বন্ধুত্ব মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হবে তো?'

এক মুহূর্ত সোমনাথ জবাব দিল না, তারপর যেন একটু বেশী মাত্রায় ঝোঁক দিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেশ তো বেশ তো। তা, দাঁড়াও—আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাবুর্চিটাকে খবর দিই, তোমাদের খানার ব্যবস্থা করুক।' সোমনাথ উঠিয়া গেল।

মনে মনে ভারি কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলাম। বন্ধুত্বের দাবীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া অপর পক্ষের মনে অনাগ্রহের আভাস পাইলে প্লানির আর অন্ত থাকে না। সোমনাথ বাহিরে হৃদ্যতার ভান করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত আমাদের সাহচর্য চায় না—তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। আগেকার অবাধ স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তা আর নাই। শুধু তাই নয়, আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহার সুনিয়ন্ত্রিত কার্যধারায় আমরা বিঘ্ন ঘটাইয়াছি। চুনী খাটো গলায় বলিল, 'কি হে, কি রকম মনে হচ্ছে?'

'সুবিধের নয়। ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল হত।'

'উঁহু—থাকতে হবে।'

চুনী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু থামিয়া গেল। পরিপূর্ণ অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, অস্পষ্ট শব্দে বুঝিলাম সোমনাথ ফিরিয়া আসিয়া মোড়ায় বসিল। মোড়ার মচমচ শব্দ যে শুনিয়াছিলাম তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

চুনী সহজ আলাপের সুরে সোমনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'তারপর, একলা থাকতে তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না?'

সোমনাথ উত্তর দিল না।

এই সময়, কেন জানি না, আমার ঘাড়ের রোঁয়া হঠাৎ শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। চুনীও হয়তো, কিছু অনুভব করিয়া থাকিবে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে হঠাৎ দেশলাই জ্বালিল: দেখিলাম সোমনাথের মোড়ায় কেহ বসিয়া নাই।

দেশলাইয়ের কাঠি শেষ পর্যন্ত জ্বলিয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল। অবরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া চুনী মৃদুস্বরে বলিল, 'প্রতিধ্বনি।'

এইবার সোমনাথের স্পষ্ট পদশব্দ শুনিতে পাইলাম. শব্দটা কাছে আসিলে চুনী বলিয়া উঠিল, 'সোমনাথ?'

'হ্যাঁ।'

'আলোটা জেবলে নাও ভাই, অন্ধকার আর ভাল লাগছে না।' কথার শেষে হাসিতে গিয়া তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিয়া সোমনাথ আসিয়া বসিল। সাদা ঢাকনির মধ্যে মৃদুশক্তি বাল্‌ব স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অন্ধকারের চেয়ে এ ভাল, তবু পরস্পর মুখ দেখা যায়।

সোমনাথ বলিল, 'বাবুর্চিকে বলে এলুম। শুধু মুর্গির কারি আর পরটা। তার বেশী কিছু যোগাড় হয়ে উঠল না।'

ইতিমধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া চুনী বলিল, 'যথেষ্ট

banglabooks.in

যথেষ্ট। অমৃতের ব্যবস্থা থাকলে পাঁচ রকম ব্যঞ্জনের দরকার হয় না—কিন্তু তুমি বাবুর্চি রেখেছ যে!'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'রাখিনি ঠিক। বাড়ির যে বুড়ো চৌকিদারটা ছিল সে-ই রেঁধে দেয়—'

'রাঁধুনী বামুন পেলে না?'

'দরকার বোধ করি না। আমি একলা মানুষ—'

'চাকরও তো দেখছি না। চাকর রাখনি কেন?'

'রেখেছিলাম একজন, কিন্তু—'

'রইল না?' চুনী মোড়া টানিয়া লইয়া সোমনাথের নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, 'আসল কথাটা কি বল তো সোমনাথ। বাড়িতে কিছু আছে—না?'

মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব আনিয়া সোমনাথ বলিল, 'কি থাকবে?'

'সেই কথাই তো জানতে চাইছি। শহরের এক টেরে এই পুরনো বাড়ি, চাকর-বামুনে থাকতে চায় না—কিছু থাকা বিচিত্র নয়।'

সোমনাথের চোখের উপর অদৃশ্য পর্দা নামিয়া আসিল। সে হাসিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, 'পাগল না ক্ষ্যাপা। ওসব কিছু নয়। শহর থেকে দূরে পড়ে তাই চাকর-বাকর থাকতে চায় না।'

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। ইচ্ছা করিলে সে অনেক কিছু বলিতে পারে তাহাও বুঝা গেল; কারণ সোমনাথ মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, মুখে চোখে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু লুকাইতে চায় কেন? যাহা সে জানিয়াছে তাহার অংশীদার রাখিতে চায় না—কৃপণের মত একা ভোগ করিতে চায়? কিংবা অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ে বলিতে চায় না?

চুনী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সোজাসুজি জেরায় ফল হইল না দেখিয়া সে অন্য পথ ধরিল। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর হানাবাড়ি সম্বন্ধে নিজের থিওরির কথা পাড়িল। বেশ ফলাও করিয়া লেকচারের ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া নিজের থিওরির সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে লাগিল। সোমনাথও দেখিলাম একমনে গালে হাত দিয়া শুনিতেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের চারিপাশে যে একটি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বোধ করি ইহারা দুজনে জানিতে পারে নাই। প্রথমটা আমিও লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু হঠাৎ এক সময় মনে হইল কাহারা নিঃশব্দে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র মনে চুনীর কথা শুনিতেছে। চোখে কিছুই দেখিলাম না, এমন কি কানে কিছু শুনিয়াছিলাম এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবু কেমন করিয়া এই অদৃশ্য আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিলাম তাহা আমার কাছে এক প্রহেলিকা। কিন্তু জানিতে যে পারিয়াছিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইহা অনুমান বা উত্তেজনাজনিত কল্পনার রূপায়ণ নয়—স্পর্শ করিবার মত অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতি। অপরিস্ফুট আলোকে তাহাদের দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু তাহারা যে আমাদের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ ভাবে চুনীর কথা শুনিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতই সত্য।

ক্রমে একটি অতিমৃদু সুগন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। তাজা ফুলের বা আতর এসেন্সের গন্ধ নয়—পপৌরির মত একটু বাসি অথচ সুমিষ্ট সৌরভ। ধীরে ধীরে গন্ধ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলাম, জিয়ানো ল্যাভেন্ডার ফুলের গন্ধ।

চুনী তখনও থিওরি ব্যাখ্যা করিতেছিল, তাই গন্ধ নাকে গেলেও সে বোধ হয় উহা লক্ষ্য করে নাই। আলোচনা শেষ করিয়া সে বলিল, 'অবশ্য এটা আমার মনগড়া কাল্পনিক থিওরি। তবু কিছু ভিত্তি কি এর নেই? তোমার কি রকম মনে হচ্ছে?'

সোমনাথ মুখ তুলিয়া বোধ করি একটা কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিল, চুনী সচকিত ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, 'গন্ধ! কিসের গন্ধ!'

আমি বলিলাম, 'পেয়েছ তাহলে। ল্যাভেন্ডারের গন্ধ।'

সোমনাথের চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া

banglabooks.in

বলিল, 'ল্যাভেন্ডারের গন্ধ! না না, ও তোমাদের ভুল। গন্ধ কই? আমি তো কিছু পাচ্ছি না।'

চুনী বলিল, 'সত্যি পাচ্ছ না?'

'না—কিছু না—' বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িল। সে যেন জোর করিয়াই গন্ধটা উড়াইয়া দিতে চায়।

কিন্তু গন্ধকে উড়াইয়া লইয়া গেল অন্য জিনিস। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বাড়ির ভিতর দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গন্ধটুকু এক নিমেষে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিস্মিতভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম; ঝাউগাছের জোনাকিমণ্ডিত বিরাট দেহ অন্ধকারে চোখে পড়িল। ঝাউগাছ একেবারে নিস্তব্ধ; অল্পমাত্র বাতাস বহিলে যে-গাছ মর্মরধ্বনি করিয়া উঠে, তাহাতে শব্দমাত্র নাই।

সোমনাথ আবার মোড়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; চুনী প্রখর জিজ্ঞাসু নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছিল। আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, 'চলে গেছে—যারা এসেছিল তারা আর নেই।—চুনী, গন্ধটাও কি প্রতিধ্বনি?'

তারপর, গরুর গাড়ি যেমন ভাঙা অসমতল পথ দিয়া চলে, তেমনি অসংলগ্ন বাধাবহুল আলোচনার ভিতর দিয়া আহারের পূর্বের ঘণ্টা-দুই সময় কাটিয়া গেল। সোমনাথ মুহ্যমান হইয়া রহিল, আমরাও মনের মধ্যে একটা নামহীন অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধারণ আর কিছু অনুভব করিলাম না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যেন আমাদের অধিকার-বহির্ভূত কৌতূহল দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে চলিয়া গিয়াছে।

নিঃশব্দে আহার শেষ হইল; বুড়া চৌকিদার পরিবেশন করিল। অনুভবে বুঝিলাম সেও আমাদের উপর খুশী নয়। তাহার সাদা ভ্রূযুগল নীরবে আমাদের ধিক্কার দিতে লাগিল। অবরোধের পর্দার ভিতর উঁকি মারিবার চেষ্টা করিয়া আমরা যেন বর্বরোচিত অশিষ্টতা করিয়াছি।

বারান্দার এক প্রান্তে তিনটি ক্যাম্প-খাট পাড়িয়া শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। কোনও মতে রাত্রিটা কাটিলে যেন বাঁচা যায়।

তিনজনে পাশাপাশি শুইয়া আছি; কথাবার্তা নাই। চুনী শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছে, অন্ধকারে তাহার সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। সোমনাথ একেবারে নিশ্চল হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটা জোনাকি আমাদের বিছানার চারিপাশে উড়িয়া উড়িয়া যেন পাহারা দিতেছে।

নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। আজ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, চুনীর থিওরির সহিত তাহা একেবারে বে-খাপ নয়। তবু যাহারা চুনীর কথা শুনিতেছিল তাহারা কি শুধুই অতীতের প্রতিবিম্ব? সোমনাথ এ-বিষয়ে এমন একগুঁয়ে ভাবে নীরব কেন? অতীতের ছায়ার সহিত বর্তমানের মানুষের এমন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘটে কি করিয়া? আর, যদি সজীব স্বতন্ত্র আত্মা হয়, তবে উহারা কাহারা? ল্যাভেন্ডার ফুলের গন্ধ কেন আসিল? সেকালে ইংরেজ মেয়েদের ল্যাভেন্ডার ফুল একটা সৌখীনতা ছিল শুনিয়াছি। সেই গন্ধ অতীতের কোন্ দেহ-সৌরভের সহিত মিশিয়া ভাসিয়া আসিল।...

বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক মুহূর্তে সমস্ত চেতনা সতর্ক হইয়া জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া রহিলাম, তারপর বাড়ির ভিতর হইতে পরিচিত খট্‌খট্ শব্দ কানে আসিল।

ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম, চুনী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। সে নিঃশব্দপদে উঠিয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, 'শুনতে পাচ্ছ?—সোমনাথ বিছানায় নেই, কখন উঠে গেছে। এস—দেখা যাক। শব্দ করো না।'

তন্দ্রার মধ্যে এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রেডিয়াম-যুক্ত হাতঘড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। রাত্রি সাড়ে এগারটা। অন্ধকারে পা টিপিয়া দুজনে বিলিয়ার্ড-ঘরের দিকে চলিলাম।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইলাম না। টেবিলের উপর তেমনি তিনটি

banglabooks.in

আলো জ্বলিতেছে—বাকি ঘর অন্ধকার। সোমনাথ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বল মারিতেছিল, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাবেলার সেই অবসাদগ্রস্ত মুহ্যমান ভাব আর নাই। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, খেলার আনন্দ প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মনে পড়িল, কয়েক মাস আগে সোমনাথ এমনিই ছিল, বাড়ি কিনিবার পর হইতে তাহার এই প্রাণখোলা আমোদে-মাতিয়া-ওঠা মূর্তি আর দেখি নাই।

বল মারিয়া সোমনাথ লঘু কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর নিজেই সচকিতে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া মৃদু স্বরে কি একটা বলিল। পরক্ষণে আর একটি সুমিষ্ট হাসির শব্দ কানে আসিল। হয়তো ইহা সোমনাথের হাসির প্রতিধ্বনি, কিন্তু পর্দায় ও মিষ্টতায় এত প্রভেদ যে, রমণীকণ্ঠের হাসি বলিয়া ভ্রম হয়।

খেলা চলিতে লাগিল। সোমনাথ একা খেলিতেছে, তবু যেন একা খেলিতেছে না; কাহারও সহিত কৌতুকপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সম্মোহিতের মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সোমনাথ খেলিতেছে, মৃদুস্বরে কাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, সন্তর্পণে গলা নামাইয়া হাসিতেছে। প্রতিধ্বনিও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে, কখনও ভারী গলায় গম্ভীর আওয়াজ হইতেছে, আবার কখনও কোমল কণ্ঠের অর্ধোচ্চারিত মৃদু-ভাষণ কানে কানে অর্থহীন কথা বলিয়া যাইতেছে।

সমস্তই যেন চুপি চুপি। লুকাইয়া লুকাইয়া আমোদ-কৌতুক চলিতেছে, তাই রঙ্গ-রস আরও গাঢ় হইয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, আমরাই এই লুকোচুরির লক্ষ্যবস্তু, আমাদের জন্যই ইহারা প্রকাশ্য মজলিশ জমাইতে পারিতেছে না। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া রস-ভঙ্গ করিয়াছিলাম, পাছে জাগিয়া উঠিয়া আবার বিঘ্ন করি তাই গভীর রাত্রে এই ত্রস্ত সতর্কতা।

আমাদের পাশ দিয়া কে একজন চলিয়া গেল। চুনী নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। চুনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সোমনাথ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলে?'

'না। চোখে দেখিনি—কিন্তু—'

'জানি। কিন্তু সেগুলো যে আমাদের মনের কল্পনা নয় তার প্রমাণ কি? সোমনাথ হয়তো পাগল হয়ে গেছে। তাই নিজের মনে হাসছে, কথা কইছে।'

'কিন্তু গন্ধ? আওয়াজ? এগুলো কি?'

'এগুলো প্রতিধ্বনি হতে পারে। হয়তো এই প্রতিধ্বনিই সোমনাথকে পাগল করে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা চোখে কিছু দেখিনি; শুধু শব্দ আর গন্ধ। অতীতের কতকগুলো শব্দ-গন্ধ এই বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তাতে দেহ-বিমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।'

প্রমাণ যে হয় তাহার পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পাইলাম। জোনাকির উল্লেখ আগে কয়েকবার করিয়াছি; এখন দেখিলাম—কয়েকটা জোনাকি আমাদের মুখের সামনে আসিয়া শূন্যে তাল পাকাইতে লাগিল। তাহাদের সঞ্চরমান নীল আলো ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া জমাট আকার ধারণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি মুখ ঐ জোনাকির আলোয় শূন্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল জানি না, কিন্তু একটি পাংশু নীলাভ নারীমুখ স্পষ্ট আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—যেন অন্ধকারের পটে জোনাকির আলো দিয়া একটি ছবি আঁকা হইতেছে! মোমে গড়া মুখোশের মত নিশ্চল মুখ, কিন্তু চোখে কটাক্ষ রহিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য একটি জীবন্ত মানুষী অস্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করিলাম।

তারপর জোনাকিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। দেহের সমস্ত পেশী শক্ত করিয়া রহিলাম, বুকের স্পন্দন দপ্ দপ্ করিয়া কণ্ঠের কাছে ধাক্কা খাইতে লাগিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল জানি না।

আমিই প্রথম কথা কহিলাম, 'চুনী, এবার চোখে দেখা হয়েছে? এও কি প্রতিধ্বনি?'

চুনী উত্তর দিল না; আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

banglabooks.in

পরদিন সকালে বিলিয়ার্ড-রুমে দাঁড়াইয়া সোমনাথের নিকট বিদায় লইলাম। চুনীর চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল; সম্ভবত আমার মুখখানাও নিশ্চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আয়নার অভাবে নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

চুনী বলিল, 'একটা রাত্রি তোমাকে খুবই জ্বালাতন করলুম। কিছু মনে করো না সোমনাথ।'

সোমনাথ বলিল, 'না না—সে কি কথা—'

চুনী বলিল, 'যা হোক, আমাদের দিক থেকে অভিযান একেবারে নিষ্ফল হয়নি, কতকগুলো নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আমাদের দুঃখ শুধু এই যে, তোমার অভিজ্ঞতা তুমি আমাদের কাছে লুকিয়েই রাখলে, প্রকাশ করলে না।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

'আমার থিওরি কাল তোমায় বলেছি, সেটা সত্যি কিনা ইচ্ছে করলেই তুমি বলতে পারতে।'

'কি—কি বলতে পারতুম?' সোমনাথ ঢোক গিলিল।

'এখনও বলতে পার। কাল রাত্রে আমরা যা যা অনুভব করেছি, সেগুলো কি এই বাড়িতে সঞ্চিত কতকগুলো স্মৃতির ছায়া, না সত্যিকার জীবন্ত কিছু আছে?'

সোমনাথ উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। উত্তর দিল প্রতিধ্বনি; কানের কাছে চুপি চুপি বলিল, 'আছে! আছে! আছে!'

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

পঞ্চভূত

মৃত্যুঞ্জয় ও শাশ্বতী—প্রেত দম্পতী। নিত্যানন্দ—জনৈক প্রেত। অবিনাশ—নবাগত প্রেত। অমরনাথ—মানুষ। স্থান—একটি পোড়ো বাড়ির এক কক্ষ। কাল—পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

কক্ষটি প্রেতলোকের নীলাভ প্রভায় আলোকিত। আলোক তীব্র নয়, অথচ সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল মেঝে হইতে এক হাত উঁচু পর্যন্ত অন্ধকার; তাই ঘরের আসবাবগুলি মনে হয় যেন অর্ধনিমজ্জিতভাবে মাথা জাগাইয়া আছে।

পিছনের দেয়ালের মাঝখানে একটি বড় জানালা। কবজা ভাঙিয়া যাওয়ার ফলে জানালার কবাট হেলিয়া খুলিয়া আছে; বাহিরে আবছায়া গাছপালার ভিতর দিয়া চন্দ্রোদয় হইতেছে। ভিতরে, জানালার দুই পাশে, খানিকটা সম্মুখ দিকে, দুইটি পুরানো ধরনের কৌচ। ঘরের

banglabooks.in

ডান দিকের দেয়ালে একটি দরজা, কালো পর্দা দিয়া ঢাকা। বাঁ দিকের দেয়ালের গায়ে সেকেলে গঠনের একটি মেহগনি রঙের ড্রেসিং টেবিল। ঘরের প্রায় মাঝখানে সম্মুখের দিকে একটি ছোট গোলটেবিল ও দুটি চেয়ার রহিয়াছে। সব আসবাবের উপরেই ধুলার প্রলেপ; মনে হয়, দীর্ঘকাল এ ঘরে মানুষে পদার্পণ করে নাই।

ডান দিকের কোচে শুইয়া শাশ্বতী ঘুমাইতেছে। শুইয়া আছে বলিয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। তাহার চেহারা মর্তলোকের কুড়ি বছর বয়সের মেয়ের মত; পরনে নীলাভ শাড়ী। সে পাশ ফিরিয়া হাঁটু গুটাইয়া গালের তলায় করতল রাখিয়া ঘুমাইতেছে।

জানালার বাহিরে একটা প্যাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—

সে থামিতেই একটা পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ—ঘুৎ—ঘুৎ!

শাশ্বতী ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল; এখন তাহার কোমর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল। সে হাই তুলিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া পিছনে জানালার ধারে তাকাইল।

শাশ্বতীঃ ওমা! কত বেলা হয়ে গেছে—চাঁদ উঠেছে! কী যে আমার ঘুম, কিছুতেই সকাল সকাল ভাঙে না। (অন্য কোচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) উনি কখন উঠে গেছেন। কি দুষ্টু! আমাকে না জাগিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে—

শাশ্বতী উঠিয়া অলসপদে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; স্ত্রী-স্বভাববশত নিজের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া আঁচলে নাকের পাশ মুছিয়া খোঁপা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

শাশ্বতীঃ না, উনি এখুনি আবার ফিরে আসবেন। আজ দু'জনে মিলে বেড়াতে যাব। কোথায় যাব! চাঁদে বেড়াতে যাব? হ্যাঁ, সেই বেশ হবে; অনেকদিন যাইনি—(সানন্দে গাহিয়া উঠিল)

আজ পূর্ণিমারই রাত রে
পাখির কূজনে আমরা দু'জনে
চাঁদের ঘাটে উঠব গিয়ে জ্যোৎস্না-সাগর সাঁৎরে—।

এই পর্যন্ত গাহিয়া বাকি গানটুকু গুন্ গুন্ করিয়া গুঞ্জন করিতে করিতে শাশ্বতী চুলের বিনুনী খুলিয়া আবার বাঁধিতে লাগিল। চাঁদ ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে।

কালো পর্দা-ঢাকা দরজা দিয়া মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ; গায়ে ধূসর রঙের পাঞ্জাবি। মুখ অত্যন্ত শুষ্ক ও বিষণ্ণ, যেন এইমাত্র কোনও গুরুতর দুঃসংবাদ শুনিয়াছে, কিন্তু শাশ্বতীকে তাহা বলিতে ভয় পাইতেছে। সে এক-পা এক-পা করিয়া শাশ্বতীর দিকে অগ্রসর হইল।

আয়নায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া শাশ্বতী সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল; খোঁপা জড়াইতে জড়াইতে বলিল—

শাশ্বতীঃ এই যে—ফিরে আসা হয়েছে। একলাটি কোথায় পালানো হয়েছিল?—আজ কিন্তু চাঁদে বেড়াতে যেতে হবে, তা বলে দিচ্ছি—

মৃত্যুঞ্জয় শাশ্বতীর পিছনে দাঁড়াইয়া একবার অধর লেহন করিল, তারপর ভগ্নস্বরে বলিল—

মৃত্যুঞ্জয়ঃ শাশ্বতী!

চমকাইয়া শাশ্বতী ফিরিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া তাহার মুখেও উৎকণ্ঠার চকিত ছায়া পড়িল; সে মৃত্যুঞ্জয়ের একেবারে কাছে সরিয়া আসিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—

শাশ্বতীঃ কী, কী হয়েছে গা?

মৃত্যুঞ্জয় শাশ্বতীর দুই কাঁধে হাত রাখিয়া একটু ম্লান হাসিল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ আর কি! ডাক এসেছে।

শাশ্বতীঃ ডাক এসেছে!

মর্মান্তিক সংবাদে শাশ্বতীর মুখখানা যেন শীর্ণ হইয়া গেল। সে বিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া

banglabooks.in

উঠিল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ (বিষণ্ণকণ্ঠে) হ্যাঁ, ডাক এসেছে—যেতে হবে। আবার সেই মানুষে জন্ম—সেই ক্ষিদে-তেষ্টা, রোগ-যন্ত্রণা, টাকার জন্যে মারামারি কাড়াকাড়ি, অন্নের জন্যে হাহাকার—

শাশ্বতীঃ বোলো না—বোলো না। (মুখ তুলিয়া) ওগো তুমি চলে যাবে, আমি একলা থাকব কি করে?

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কি করবে বল—উপায় তো নেই, নিয়তি—হয়তো তোমারও কোনদিন ডাক পড়বে, তুমি কোথাকার এক মানুষের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাবে—

শাশ্বতীঃ (অবসন্নস্বরে) হয়তো তুমি জন্মাবে বাংলা দেশে, আমি জন্মাব তিব্বতে—কেউ কাউকে দেখতে পাব না। তুমি কোন্ একটা মেয়েকে বিয়ে করবে—

মৃত্যুঞ্জয়ঃ আর তুমি কোন্ একটা তিব্বতী পরিবারে পাঁচ ভায়ের ঘরণী হয়ে বস্‌বে—উঃ! ভাবলেও অসহ্য মনে হয়।

শাশ্বতীঃ (সবেগে মাথা নাড়িয়া) না না কক্ষনো না। আমি এইখানে, এই ঘরে তোমার জন্যে পথ চেয়ে থাকব। আমি মানুষ হয়ে জন্মাতে চাই না।

মৃত্যুঞ্জয় হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ আমিই কি চাই শাশ্বতী! স্থূল শরীরের বন্ধন থেকে একবার যে মুক্তি পেয়েছে, সে কি আর ফিরে যেতে চায়! ভেবে দেখ দেখি, কি সুখে আমরা আছি। শরীরের ক্ষুধা নেই অথচ তৃপ্তি আছে; বাসনা নেই প্রেম আছে, স্বাধীনতা আছে, অগাধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। এ ছেড়ে কি আবার ঐ অন্ধকূপে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে? কিন্তু উপায় যে নেই।

শাশ্বতী পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

শাশ্বতীঃ এ জীবনের কেবল ঐ এক দুঃখ—কি জানি কবে ফিরে যেতে হবে। আমরা যেন জেলখানার পালিয়ে যাওয়া আসামী, মুক্তির মধ্যেও সদাই ভয়, কখন আবার ধরা পড়ব।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া শাশ্বতীর মুখোমুখি দাঁড়াইল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ আর ভেবে কি হবে। যেতেই যখন হবে, তখন মন শক্ত করে তৈরী হওয়াই ভাল। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না? আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

শাশ্বতীঃ ওকথা বলতে পারলে? ভুলে যাব! আমার মন দেখতে পাচ্ছ না? ভুলব না ভুলব না—যখনই ফিরে আসবে, যতদিন পরে ফিরে আসবে, তোমার শাশ্বতী তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ (শাশ্বতীর চিবুক তুলিয়া) এই ঘরে?

শাশ্বতীঃ (মৃত্যুঞ্জয়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া) হ্যাঁ—এই ঘরে। এ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। মনে আছে, এই ঘরেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ হ্যাঁ, সে আজ কতদিনের কথা। মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে শহরের বাইরে একটা নিরিবিলি আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। এই বন-বাদাড়ের মধ্যে বাড়িটা নজরে পড়ল; নেহাৎ ভাঙ্গা বাড়ি নয়, অথচ লোকজনের যাতায়াত নেই—বাড়ির মালিক বাড়িতে তালা দিয়ে বিদেশে ব্যবসা করতে চলে গেছে। দেখেশুনে বেশ পছন্দ হল। ভেতরে ঢুকেই দেখি—তুমি। ঘরও পেলুম, মনের মানুষও পেলুম।

দুজনে কিছুক্ষণ অতীতের স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া রহিল। বাহিরে পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ—ঘুৎ—। চাঁদ ইতিমধ্যে আরও একটু উপরে উঠিয়াছে।

দরজার উপর হঠাৎ ধাক্কা পড়িল; কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

কণ্ঠস্বরঃ মৃত্যুঞ্জয়দা আছেন নাকি? আসতে পারি?

তাড়াতাড়ি বাহুমুক্ত হইয়া শাশ্বতী চোখ মুছিল; মৃত্যুঞ্জয় দ্বারের দিকে ফিরিল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কে—নিত্যানন্দ? এস।

নিত্যানন্দ প্রবেশ করিল। হালকা বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পরা কুড়ি-একুশ বছরের যুবা; মুখে ছেলেমানুষী ও চটুলতা মাখানো; চটপটে দ্রুতভাষী রঙ্গপ্রিয়। সে দ্রুতপদে তাহাদের কাছে আসিয়া জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে আক্ষেপসূচক চট্‌কার করিল।

banglabooks.in

নিত্যানন্দঃ খোপের পায়রার মত দু'জনের কূজন-গুঞ্জন হচ্ছে! হরি হরি! ওদিকে যে সব গেল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কী গেল?

নিত্যানন্দঃ তোমাদের এই সাধের পায়রার খোপ—আর কি? আহা বৌদি, কত যত্ন করে বাসাটি বেঁধেছিলে—'ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে কপোত মিথুন যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে—' কিন্তু এবার বাসা ছাড়তে হল। বাজপাখী হানা দিয়েছে।

শাশ্বতীঃ ঐ তোমার দোষ, নিতাই ঠাকুরপো, হেঁয়ালীতে ছাড়া কথা কইতে পার না। সত্যি কি হয়েছে বল না ভাই।

নিত্যানন্দঃ শুনবে? তবে এক কথায় বলছি। এই বাড়ির মালিক এতদিন পরে আবার বাড়ি ফিরে আসছে।

শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয়ঃ (যুগপৎ) অ্যাঁ—বল কি!

নিত্যানন্দঃ তা নইলে আর এমন পূর্ণিমার ভর-সন্ধ্যেবেলা তোমাদের মিলন-কুঞ্জে এসে বাগড়া দিলুম! কি আর বলব বৌদি, ভারি দুঃখ হচ্ছে। কোথাকার একটা চোয়াড়ে পাষণ্ড মানুষ এসে তোমাদের এমন বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত করে দেবে। মানুষের সঙ্গে একবাড়িতে তোমরা তো আর থাকতে পারবে না।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কিন্তু তুমি এ খবর পেলে কোত্থেকে?

নিত্যানন্দঃ জানোই তো রোজ সন্ধ্যেবেলা ইস্টিশানের বাদুড় বটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যেস; গাড়ি আসে, যাত্রীরা ওঠা-নামা করে—দেখতে বেশ লাগে। আজও গিয়ে বসেছিলুম। গাড়ি এল; একটা লোক চোরের মত গাড়ি থেকে নামল! দেখেই কেমন খটকা লাগল।—ঢুকে পড়লাম তার মনের মধ্যে। ঢুকে দেখি ও বাবা, মন তো নয়, একেবারে নরককুণ্ড।

শাশ্বতীঃ কি দেখলে?

নিত্যানন্দঃ ব্যাটা এই বাড়ির মালিক। বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়েছিল, সেখানে একটা লোককে খুন করে পালিয়ে এসেছে। মতলব, এই বাড়িতে লুকিয়ে থাকবে। ব্যাটাকে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে কিনা।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কী সর্বনাশ! (শাশ্বতীর দিকে ফিরিয়া) শাশ্বতী—তুমি—

শাশ্বতীঃ না না, কক্ষনো না—আমি এ বাড়ি ছাড়ব না, আর ও লোকটার সঙ্গেও একবাড়িতে থাকতে পারব না। তোমরা যা হয় একটা উপায় কর।

নিত্যানন্দঃ কিন্তু আর সময় নেই—এতক্ষণে ব্যাটা এসে পড়ল। (কান পাতিয়া) ঐ যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না! হুঁ—এসেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ তাই তো, এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ।

শাশ্বতীঃ (দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া) আমি পারব না—পারব না—

নিত্যানন্দঃ (ক্ষণেক ঘাড় চুলকাইয়া) দ্যাখ, এক কাজ করা যাক। ক'জনে মিলে ব্যাটাকে ভয় দেখাই—তাহলে হয়তো পালাবে।

শাশ্বতীঃ (মুখ তুলিয়া সানন্দে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!—এস, ভয় দেখাই। নিশ্চয় পালাবে তাহলে—

দ্বারের কাছে খুট করিয়া শব্দ হইল। সকলে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। চাঁদ এতক্ষণে জানালার মাথায় উঠিয়াছে। পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ।

সন্তর্পণে কালো পর্দা সরাইয়া অমরনাথ মুণ্ড বাড়াইয়া চারিদিকে দেখিল। কিন্তু প্রেতলোকের দীপ্তি মানুষের নয়নগোচর নয়, সে অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। তখন একটি বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া সে ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। টর্চের আলো শাশ্বতী, মৃত্যুঞ্জয় ও নিত্যানন্দের গায়ে পড়িল, কিন্তু অমরনাথের নর-চক্ষে তাহারা ধরা পড়িল না। সে তখন আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল।

অমরনাথের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ; লম্বা-চৌড়া অথচ ভারি ধরনের চেহারা। মাংসল

banglabooks.in

মুখে বসন্তের দাগ, চুল উস্কখুস্ক; চোখের দৃষ্টি আশঙ্কা ও সতর্কতায় প্রখর। তাহার একহাতে ছোট হ্যান্ড-ব্যাগ অন্য হাতে টর্চ; পরিধানে ময়লা ধুতি ও গলাবন্ধ কালো কোট।

অমরনাথঃ যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্দি। এখানে পুলিসের বাবাও খুঁজে পাবে না; এ বাড়িটা যে আমার তাই কেউ জানে না। (ঘরের চারিদিকে টর্চের আলো ফেলিয়া) যেমনটি পনের বছর আগে রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটি আছে—(টর্চ নিভাইয়া) কি অন্ধকার! কিন্তু বেশীক্ষণ টর্চ জ্বালা চলবে না তাহলে সেল্ ফুরিয়ে যাবে। মোমবাতি বার করি!

অমরনাথ হাতড়াইয়া ঘরের মধ্যস্থিত টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল; টেবিলের নিকটবর্তী হইয়া একটি চেয়ারে হোঁচট খাইয়া পতনোন্মুখ হইল। নিত্যানন্দ সজোরে হাসিয়া উঠিল।

নিত্যানন্দঃ ব্যাটা রাতকানা—শুকেনো ডাঙায় আছাড় খাচ্ছিল।

শাশ্বতীঃ মানুষগুলো তো অমনিই হয়—চোখ থাকতে দেখতে পায় না, কান থাকতে শুনতে পায় না—তবু বড়াই কত! গুমর করে বলে ওরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব!

অমরনাথ কিন্তু হাসি, কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই। হোঁচটের তাল সামলাইয়া সে ব্যাগ ও টর্চ টেবিলের উপর রাখিল, তারপর ব্যাগ খুলিয়া একটি আধপোড়া মোমবাতি বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমরনাথঃ (টেবিলের উপর মোমবাতি বসাইয়া) জানালাটা খোলা রয়েছে—কিন্তু এ সময় এ বন-বাদাড়ে কেউ আসবে না। যদি বা আসে, ভাববে ভুতুড়ে বাড়ি—হা—হা—হা—

অদৃশ্য দর্শক তিনজনও হাসিল। অমরনাথ হাসিতে হাসিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সচকিতভাবে চারিদিকে চাহিল।

অমরনাথঃ ঠিক মনে হল কারা যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে হাসছে—বাড়িতে কেউ আছে নাকি?

নিত্যানন্দঃ নাঃ—কেউ নেই! তুমি একা রাম-রাজত্ব করছ। ক্যাবলা কোথাকার!

অমরনাথ কিছুক্ষণ শরীর শক্ত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

অমরনাথঃ না—বোধ হয় প্রতিধ্বনি। জোরে হেসেছিলুম—

বাহিরে পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—!

অমরনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

অমরনাথঃ আরে ছ্যাঃ, পাপিয়া ডাকছে—তাকেই হাসির আওয়াজ মনে করেছিলুম—হে—হে—হে—

গলার মধ্যে হাসিতে হাসিতে সে জানালার দিকে গেল; নিত্যানন্দের পাশ দিয়া যাইবার সময় নিত্যানন্দ তাহার হাসির সহিত সুর মিলাইয়া ব্যঙ্গস্বরে হাসিল—

নিত্যানন্দঃ হে হে হে—

অমরনাথ জানালার নিকট গিয়া বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিল। চাঁদ জানালার উপরে উঠিয়া গিয়াছে—আর দেখা যায় না। অমরনাথ আশ্বস্ত মনে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কোটের বোতাম খুলিতে লাগিল।

অমরনাথঃ জনমানব নেই। মিছে আঁৎকে উঠেছি। কথায় বলে, ঝোপে ঝোপে বাঘ, আমিও তাই দেখছি। না, আর ওকথা ভাবব না—একটু একটু ক্ষিধে পেতে আরম্ভ করেছে—ক্ষিধের আর অপরাধ কি? ভাগ্যে বুদ্ধি করে পাঁউরুটি এনেছি—তাই খেয়ে সোফায় লম্বা হয়ে তোফা ঘুমোনো যাবে।

শাশ্বতীঃ ওমা, কি ঘেন্না—আমার সোফায় ঘুমোবে!

অমরনাথঃ (আত্মশ্লাঘার স্বরে) বুদ্ধি থাকলে কি না হয়! এই তো খুন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়লুম, ধরতে পারলে পুলিস?

নিত্যানন্দঃ অগাধ বুদ্ধি তোমার।

শাশ্বতীঃ ঠাকুরপো, এবার আরম্ভ কর—আর সহ্য হচ্ছে না!

নিত্যানন্দঃ এই যে—

banglabooks.in

সে গিয়া ফুৎকারে মোমবাতিটা নিভাইয়া দিল। অমরনাথ টেবিলের দিকে আসিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

অমরনাথঃ এ কি! বাতি নিভে গেল যে—! (কাছে আসিয়া দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে) কিন্তু হাওয়া তো নেই! (সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া) গা ছম্‌ছম্‌ করছে। না, ওসব মনের ভুল। বোধ হয় ঘরটাতে অনেক খারাপ গ্যাস জমা হয়েছে—অনেকদিন বন্ধ আছে কিনা—! ভূত-ফুৎ আমি মানি না।

নিত্যানন্দঃ তা মানবে কেন? তোমার কত বুদ্ধি। বৌদি, তোমরাও এস, সবাই মিলে লাগো যাক—

অমরনাথ একটা চেয়ারে বসিয়া ব্যাগ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল; তিনজনে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—শাশ্বতী পিছনে, নিত্যানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয় দুই পাশে। অমরনাথ ব্যাগ হইতে একটা আস্ত পাঁউরুটি বাহির করিয়া তাহাতে কামড় দিবার উপক্রম করিল, ঠিক এই সময় শাশ্বতী তাহার ঘাড়ে ফুঁ দিল। অমরনাথ রুটি হাতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথঃ কে—! ঠিক যেন কে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেললে! এ কি—এ সব কি? ঘরটা ভাল ঠেকছে না। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে চারিদিকে কারা যেন রয়েছে। পালিয়ে যাব? কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়, বেরুলেই তো পুলিসে ধরবে। (ঘাড়ে হাত দিয়া) না—গ্যাস নিশ্চয়। কিংবা—হয়তো আমার নার্ভ খারাপ হয়ে গেছে। না না, নার্ভ খারাপ হলে চলবে না। খাই, খেলে শরীর ঠিক হবে। খালি পেটে যত আপদ এসে জোটে—

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অমরনাথ পাঁউরুটি খাইতে লাগিল।

শাশ্বতীঃ উঃ—কি বীভৎস! খাচ্ছে—খাচ্ছে—হাঁউ হাঁউ করে জানোয়ারের মত খাচ্ছে। আমি ও দেখতে পারি না—(মুখ ঢাকিল)

মৃত্যুঞ্জয়ঃ মানুষ—এই মানুষ! রাশি রাশি খাচ্ছে—আর—ছি ছি—!

নিত্যানন্দঃ যাকগে যাকগে দাদা, ওসব নোংরা কথা যেতে দিন।—এবার কি করা যায়? ব্যাটার নাক ধরে নেড়ে দিই।

অমরনাথঃ (খাইতে খাইতে) কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। কল্পনা—কল্পনা। মাথা গরম হয়েছে। খেয়েই শুয়ে পড়ি।—উঃ, শুকনো রুটি চিবিয়ে গলা কাঠ হয়ে গেছে। একটু জল পাওয়া যেত—!

নিত্যানন্দঃ জলের ভাবনা কি চাঁদু, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি—

নিত্যানন্দ দ্বারের কাছে গিয়া পর্দার ওপারে হাত বাড়াইয়া এক গ্লাস জল আনিল, তারপর জলের গ্লাসটি অমরনাথের মাথার উপর ধরিয়া অল্প অল্প জল ফেলিতে লাগিল।

অমরনাথঃ অ্যাঁ—! (ঊর্ধ্বে চাহিয়া) এ কি—জল—শূন্যে গেলাস—!

রুটি ফেলিয়া দিয়া সে পিছু হটিয়া জানালার দিকে যাইতে লাগিল; নিত্যানন্দ গ্লাস তুলিয়া তাহার পিছে পিছে চলিল। শাশ্বতী মোমবাতিটা তুলিয়া লইয়া শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয় টর্চটা লইয়া অমরনাথের ভয়বিহ্বল মূর্তির উপর আলো ফেলিল।

অমরনাথঃ অ্যাঁ—! বাতি শূন্যে ঘুরছে! টর্চ—! ওঃ!

অমরনাথের মুখ ভয়ে বিকটাকৃতি ধারণ করিল। সে হঠাৎ দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গোঙানির মত শব্দ করিতে করিতে বাঁ দিকের কৌচের পিছনদিকে পড়িয়া গেল। তাহার গোঙানি সহসা স্তব্ধ হইল।

কিছুক্ষণ তিনজনে নীরব; কেবল বাহিরে পেঁচা ডাকিল—ঘুৎ! শাশ্বতী বাতিটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল; মৃত্যুঞ্জয় টর্চ নিভাইল। নিত্যানন্দ একবার কৌচের পিছনে উঁকি মারিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া জলের গ্লাস রাখিল। তিনজনে পরস্পর মুখের পানে তাকাইল।

নিত্যানন্দঃ (একটু কাসিয়া) তাই তো! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ হুঁ। এ আবার হিতে বিপরীত হল। মানুষকে যদি বা তাড়ানো যেত এখন

banglabooks.in

আর—

সকলে একসঙ্গে পিছনদিকে তাকাইল।

অমরনাথ কৌচের পিছন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ঈষৎ টলিতে টলিতে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু ঢুলুঢুলু, যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে।

তিনজনে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; নিত্যানন্দ মৃত্যুঞ্জয়কে ইঙ্গিতপূর্ণ কনুইয়ের ঠেলা দিল।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কী! কেমন মনে হচ্ছে!

অমরনাথ হাই তুলিতে গিয়া থামিয়া গেল; তাহার চেতনা যেন সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। সে একবার সচকিতে তিনজনের দিকে তাকাইয়া ত্রস্তভাবে পিছু হটিল।

অমরনাথঃ কে—কে তোমরা?

নিত্যানন্দঃ ভয় নেই—আমরা পুলিস নয়। দেখছেন না একজন মহিলা রয়েছেন।

অমরনাথঃ তবে—তবে—কি চাই?

নিত্যানন্দঃ কিছু না। আপনাকে শুধু জানাতে চাই যে, ব্যাপারটা একটু বেশী দূর গড়িয়েছে; এতদূর গড়াবে আমরা ভাবিনি।

অমরনাথ বুঝিতে পারে নাই, এমনিভাবে তাকাইয়া রহিল; তারপর ঈষৎ আশ্বস্তভাবে এক পা আগাইয়া আসিল।

অমরনাথঃ মানে—ঠিক বুঝতে পারছি না।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ প্রথমটা অমনিই হয়। আপনি মুক্তি পেয়েছেন।

অমরনাথঃ (সাগ্রহে) মুক্তি! মুক্তি পেয়েছি।

নিত্যানন্দঃ (সহাস্যে) মানে—একেবারে মুক্তি পেয়েছেন। পটল তুলেছেন—শিঙে ফুঁকেছেন।

অমরনাথঃ পাগল না ছন্ন। কে শিঙে ফুঁকেছে?

নিত্যানন্দঃ আপনি—আপনি। এখনও ধরতে পারছেন না।—এদিকে আসুন, স্বচক্ষে না দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না দেখছি।

অমরনাথকে লইয়া গিয়া নিত্যানন্দ কৌচের পিছনটা দেখাইল। অমরনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। তাহার চেহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। সে অন্যমনস্কভাবে ফুঁ দিয়া মোমবাতিটা নিভাইয়া দিল।

নিত্যানন্দঃ কেমন? এবার বিশ্বাস হল?

অমরনাথঃ (আত্মগতভাবে) আমি মরে গেছি। লাস পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য! মরে গেছি—কিছুই তো তফাৎ বুঝতে পারছি না। না, না, বুঝতে পারছি—(তাহার মুখ উৎফুল্ল হইতে লাগিল) আর ভয় নেই—আর ভাবনা নেই—আর আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে না—(দুই বাহু আস্ফালন করিয়া) আমি মরিনি—আমি বেঁচেছি—বেঁচেছি—

অমরনাথ আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল না, এই অবকাশে আর একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার দুশমনের মত চেহারা, বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু, মাথায় চুল যেন কোনও গাঢ় তরল পদার্থের সাহায্যে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে একটা ছাই রঙের চাদর; দুই বাহু বুকের উপর আবদ্ধ।

অমরনাথের নৃত্য একটু শ্লথ হইতেই সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

আগন্তুকঃ অমরনাথ, আমাকে চিনতে পার?

অমরনাথ প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া পরে চিনিতে পারিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—

অমরনাথঃ অ্যাঁ! এ যে অবিনাশ—ওরে বাবারে—

অমরনাথ ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল; অবিনাশ তাহার পিছনে তাড়া করিল—ঘরময় দুজনের ছুটাছুটি চলিতে লাগিল। নিত্যানন্দ হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

banglabooks.in

অবিনাশঃ আমাকে খুন করেছিলে—আমার টাকা নিয়ে পালিয়েছিলে—যাবে কোথায়—কেন খুন করেছিলে—

অমরনাথঃ ওরে বাবারে—ওরে বাবারে—

এইভাবে ছুটোছুটি করিতে করিতে প্রথমে অমরনাথ ও তৎপশ্চাতে অবিনাশ দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় এতক্ষণ পাশাপাশি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, এই হুড়াহুড়িতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। নিত্যানন্দ কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছিল—সে মহোৎসাহে দ্বারের পানে যাইতে যাইতে বলিল—

নিত্যানন্দঃ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই! যাই রগড় দেখিগে—

সে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় পিছন হইতে বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—

মৃত্যুঞ্জয়ঃ নিত্যানন্দ!

নিত্যানন্দঃ (ফিরিয়া আসিয়া) কি দাদা?

মৃত্যুঞ্জয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

মৃত্যুঞ্জয়ঃ তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার ডাক এসেছে।

নিত্যানন্দের হাসিমুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেল।

নিত্যানন্দঃ ডাক এসেছে!

মৃত্যুঞ্জয়ঃ হ্যাঁ—আবার যেতে হবে। সময়ও বেশী নেই।—তোমাকে আর কি বলব, শাশ্বতী রইলো মাঝে মাঝে দেখাশুনা করো।

শাশ্বতী আঁচলে চোখ মুছিল। নিত্যানন্দ মুখে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

নিত্যানন্দঃ সে আর বলতে। তুমি কিছু ভেবো না দাদা, আমি আছি, যতদিন না ফিরে আসো আমি যক্ষের মত বৌদিকে আগলে থাকব। ভগবান করুন যেন চট্‌পট্ ফিরে আসতে পারো।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ কতদিনে ফিরব তা তো কিছু ঠিক নেই—

নিত্যানন্দঃ কিছু বলা যায় না দাদা। আজকাল হতভাগা মানুষগুলোর মধ্যে যে রকম লড়াই বেধেছে—কুরুক্ষেত্র তার কাছে ছেলেখেলা। মানুষ মরে উড়কুড় উঠে যাচ্ছে। শুধু কি যুদ্ধ—তার ওপর রকমারি রোগ—দুর্ভিক্ষ। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যাচ্ছে না। ভালয় ভালয় যদি চট্ করে টেঁসে যেতে পার, তবে আর তোমায় পায় কে!

মৃত্যুঞ্জয়ঃ ঐ যা একটু ভরসা।—আচ্ছা, তাহলে—

নিত্যানন্দঃ এস দাদা। দুর্গা দুর্গা—হাসি মুখে যেন শিগ্‌গির ফিরে আসতে পার।

মৃত্যুঞ্জয়ঃ শাশ্বতী—

নিত্যানন্দ সরিয়া গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয় ও শাশ্বতী বিদায়-বিধুর মুখে হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এই সময় অবিনাশ ও অমরনাথ হাতে হাতে জড়াজড়ি করিয়া পরম বন্ধুভাবে প্রবেশ করিল।

নিত্যানন্দঃ আরে গেল যা, ষণ্ডা দুটো আবার এসেছে। ইঃ—একেবারে গলাগলি ভাব। —বলি, ব্যাপার কি?

অমরনাথঃ আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অবিনাশকে বিনাশ করে আমি ওর কতখানি উপকার করেছি, তা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি।

অবিনাশঃ (গদ্‌গদ কণ্ঠে) অমরনাথ, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু! এখন থেকে দুজনে একসঙ্গে থাকব, তোমাকে একদণ্ড ছাড়ব না। স্যাওড়াতলার ঐ মজা কুয়োটার মধ্যে আমার আস্তানা দেখলে তো। কেমন, পছন্দ হয় না?

অমরনাথঃ পছন্দ হয় না আবার। ঐ তো স্বর্গ—হমীন অস্ত্ হমীন অস্ত্।

banglabooks.in

নিত্যানন্দঃ আচ্ছা, হয়েছে, এবার একটু থামুন। মৃত্যুঞ্জয়দার ডাক এসেছে। উনি এখুনি যাবেন।

অমরনাথ ও অবিনাশ সহানুভূতিপূর্ণ নেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

অমরনাথঃ (সনিশ্বাসে) আহা বেচারা—

তাহারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের মাঝখানে শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় পূর্ববৎ বদ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের প্রেতদীপ্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। মূর্তিগুলি অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। কিছু আর দেখা যায় না।

নিস্তব্ধ অন্ধকার। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণ একটি শব্দ ভাসিয়া আসিল—সদ্যোজাত শিশুর কান্না।

১৬ ফাল্গুন ১৩৫১

আকাশবাণী

ক্লাবের বারান্দায় আমরা কয়েকজন নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলাম। ফাল্গুন মাসের অপরূপ একটি গোধূলি যেন বাতাসে গোরোচনার স্নিগ্ধ শীকর-কণা ছড়াইতেছিল। এমন সন্ধ্যায় বরদার মুখেও ভূতের গল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে গুন গুন করিয়া একটি প্রেমের গান ভাঁজিতেছিল। 'যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি'।

এমন সময় সুধাংশু আসিয়া দেখা দিল। সুধাংশু আমাদের বন্ধু হইলেও এতদিন ক্লাবের সভ্য ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। সম্ভবত বরদার সঙ্গে ভূত-প্রেত লইয়া তর্ক করিবার মতলব লইয়াই সে ক্লাবে ঢুকিয়াছে। প্রেতযোনি সম্বন্ধে এতবড় নাস্তিক বড় একটা দেখা যায় না; বরদার সঙ্গে চোখাচোখি হইলেই তাহার মুখ লড়ায়ে মেড়ার মত যুযুৎসু ভাব ধারণ করিত। তারপর দু'জনের মধ্যে যে তর্ক আরম্ভ হইত তাহার তুলনা খুঁজিতে হইলে রামায়ণ মহাভারতের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু আজ লক্ষ্য করিলাম, সুধাংশুর সে তেজ নাই, মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাসে। মনের মধ্যে সে যেন বড় রকম ধাক্কা খাইয়াছে।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার?'

সুধাংশু উত্তর দিল না, সোজা বরদার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তদ্গতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, 'ভাই বরদা, পায়ের ধুলো দাও।' বলিয়া তাহার পায়ে হাত ঠেকাইয়া মাথায় স্পর্শ করিল।

আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম; এমন কাণ্ড জীবনে দেখি নাই। বরদাও ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল; সুধাংশুর হাত ধরিয়া পাশের চেয়ারে বসাইতেই সে বলিয়া উঠিল,

banglabooks.in

তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কালকের ঘটনার পর আর আমার প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস নেই।'

অতঃপর 'কালকের ঘটনা' শুনিবার জন্য আমরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ উন্মনাভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সুধাংশু আরম্ভ করিল—

মাসেখানেক হল আমাদের পাড়ায় একটি নতুন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসেছেন—প্রিয়তোষবাবু। ওই যে বাড়িখানা আগে মাইনর স্কুল ছিল, সেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। বাড়ির চারধারে পাঁচিল-ঘেরা ফাঁকা জমি; হলদে রঙের বাড়িখানা। দেখেছ বোধহয়।

প্রথম দিনই প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পাড়ায় নতুন বাঙ্গালী এসেছেন, তাই সাদর সম্ভাষণ করবার জন্যে নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের একটু সৌখীন গোছের ভদ্রলোক; প্রথমদিন এসেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বাড়ির মাথার ওপর রেডিওর এরিয়েল বসাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে মামুলি দু'চারটে কথা হ'ল। কাজকর্ম কিছু করেন না; পয়সা আছে। পুত্রকলত্রও কেউ নেই—বছর দশেক আগে পত্নীবিয়োগ হয়েছে। তারপর থেকে খেয়ালমত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। এর আগে বছর দেড়েক গয়ায় ছিলেন। সেখানে আর মন টিক্‌ল না তাই চলে এসেছেন।

ভদ্রলোক একলা থাকেন, অথচ এত বড় বাড়ি নিয়ে কি করবেন, এই ভেবে তখন একটু আশ্চর্য মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম আলাপেই তো ওকথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তিনি যেসব আসবাবপত্র সঙ্গে এনেছিলেন তাও বেশ দামী আর সৌখীন। দেখলুম লোকটি বিপত্নীক এবং বয়স্থ হলে কি হয়, প্রাণটা বেশ তাজা রেখেছেন।

তারপর আরও বার দুই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলুম। তাঁর চরিত্রে দু'একটি ছোটখাটো অসঙ্গতি চোখে পড়েছিল। তিনি সৌখীন লোক, কিন্তু স্বপাক আহার করেন; একটিমাত্র শুকো চাকর রেখেছেন, সে দিনের বেলায় কাজকর্ম সেরে বাড়ি চলে যায়। তাঁর বাড়িতে মেয়েমানুষের পাট নেই, অথচ বসবার ঘরটি ছবির মত সাজিয়ে রেখেছেন। পুরুষমানুষ যে এত গোছালো হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আরও লক্ষ্য করলুম, লোকটি যে পরিমাণে অমায়িক সে পরিমাণে মিশুক নয়। কথা ভারি মিষ্টি, কিন্তু কম কথা বলেন। কথা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাছাড়া আমি তিনবার তাঁর বাড়িতে গেলুম, তিনি একবারও তার পাল্টা দিলেন না। একটু বিরক্তি বোধ হল; সন্দেহ হল, তিনি হয়তো মনে করেন তাঁকে বড়লোক মনে করে আমি তাঁর মোসাহেবি করবার চেষ্টা করছি। যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। তারপর পথেঘাটে মাঝে মাঝে দেখা হত, এই পর্যন্ত।

এইভাবে হপ্তা তিনেক কেটে গেল। প্রিয়তোষবাবুর সম্বন্ধে মনটা যখন প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে এসেছে এমন সময় তাঁর নামে কয়েকটা কথা কানে এল। এসব খবর মেয়েদের কানেই আগে পৌঁছোয়; আমার স্ত্রী খবরটা দিলেন। প্রিয়তোষবাবু নাকি সুবিধের লোক নন, রাত্রি দশটার পর তাঁর বাড়িতে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়। পাড়ার কেউ কেউ শুনেছে।

এমন কিছু অসম্ভব কথা নয়, মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রিয়তোষবাবুকে যেটুকু দেখেছিলুম তাতে তাঁকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলে মনে হয়নি। তবু, কিছুই বলা যায় না। যাদের সারা জীবন ধরে দেখছি তাদেরই চিনতে পারলুম না, আর প্রিয়তোষবাবুর চরিত্র এক নজরে চিনে নেব এত অহঙ্কার আমার নেই।

তা ছাড়া, সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, এ বিষয়ে করবার কিছু নেই; করবার মধ্যে বৈঠকখানায় বসে মুখরোচক জল্পনা করতে পারি। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল।

কাল সকালবেলা পাড়ার ছোকরা দলের চাঁই ভুতো আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ভুতো ডাকাবুকো ছেলে, মনের মধ্যে মারপ্যাঁচ নেই; মেজাজ কড়া। সে এসেই প্রিয়তোষবাবুর কথা তুললে, 'শুনেছেন বোধহয়?'

দেখলুম ভুতোর মন এখনও আমাদের মত নির্লিপ্ত জল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠেনি। কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করতে হল, 'কিছু কিছু শুনেছি বৈকি।'

ভুতো টেবিলের ওপর কীল মেরে বললে, 'এ রকম লোক পাড়ায় রাখা যেতে পারে না।

banglabooks.in

ছেলেরা বলছে, একদিন ধরে দু'ঘা দেওয়া যাক, তাহলেই পালাবে।'

ভুতো আর তার দল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু মনে মনে তাদের বাহুবলকে সম্ভ্রম করি। তবু ক্ষীণ আপত্তি করে বললুম, 'শুধু কাণাঘুষোর ওপর এতটা ধাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হবে? বরং কথাটা সত্যি কিনা ভালভাবে যাচাই করে যা হয় করা উচিত।'

ভুতো বললে, 'বেশ তো, আপনিই যাচাই করুন।'

অতঃপর ভুতোর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল রাত্রে গিয়ে প্রিয়তোষবাবুর বাড়িতে আড়ি পাতা। কাজটা মোটেই রুচিকর মনে হল না; কিন্তু একটা লোককে উত্তম-মধ্যম দেবার আগে তার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া ভাল।

রাত্রি সাড়ে দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে রবার-সোল্ জুতো পায়ে দিয়ে বেরুলুম। স্ত্রীকে বলে গেলুম, 'ফিরতে হয়তো দেরি হবে। ঘুমিও না। দিল্লী থেকে 'ফিল্মি গান' দিচ্ছে, রেডিওতে তাই শোন।'

প্রিয়তোষবাবুর ফটকের সামনে ভুতোর সঙ্গে দেখা হল। ভুতোটা এমন গোঁয়ার, জুতো পরে এসেছে যার আওয়াজ দেড় মাইল দূর থেকে শোনা যায়। তাকে বললুম, 'ও জুতো পরে তোমার ভেতরে যাওয়া চলবে না। শিকার ভড়্কে যাবে।'

সে বললে, 'বেশ, আমি বাইরে পাহারায় রইলুম।'

রাস্তা তখন নির্জন হয়ে গেছে। প্রিয়তোষবাবুর বাড়ি অন্ধকার। ফটক পার হয়ে পা টিপে টিপে চললুম। বাড়ির সামনাসামনি এসে সদর দরজার মাথার ওপর খিলেনের কাচের ভিতর দিয়ে একটু আলো চোখে পড়ল।

ঘরের দরজা জানলা সবই বন্ধ, কিন্তু ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন আসছে—যেন কারা খাটো গলায় কথা কইছে। আমার বুকের মধ্যে একবার দুড়্দুড় করে উঠল—কারণ, পরের বাড়িতে গিয়ে চোরের মত আড়ি পাতার অভ্যেস কোনকালে নেই। যদি ধরা পড়ি তাহলে কী বলব, তার একটা খসড়া মনে মনে মক্শ করে রেখেছিলুম; কিন্তু স্নায়ুর কম্পন তাতে থামল না। যা হোক, অপ্রীতিকর কর্তব্য যখন করতেই হবে তখন দ্বিধা করে লাভ নেই।

বাড়ির সামনে এক ফালি খোলা বারান্দা, তারপরই বৈঠকখানা ঘর। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে বৈঠকখানার বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছিল—ফাগুন রাতের হাওয়া—ঠাণ্ডা আর মোলায়েম। এমন কিছু বুড়ো হইনি। মনে হল, এমন রাত্রে কোনও প্রণয়ীর ঘরে গুপ্তচরবৃত্তি করা একটা অপরাধ, তা হোক না সে অবৈধ প্রণয়! কিন্তু সে যাক, ওটা মনের ক্ষণিক দুর্বলতা মাত্র।

ঘরের মধ্যে দুজন লোক কথা কইছে; বেশ সহজ গলাতেই কথা কইছে। একজনের গলা চিনতে কষ্ট হল না, নিঃসংশয়ে প্রিয়তোষবাবুর গলা। অন্য গলাটি—হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরই বটে। মিষ্টি ভরা গলা—কিন্তু ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়; এস্রাজের তারের আওয়াজের মত তাতে একটা ধাতব ঝঙ্কার আছে।

কান পেতে শুনতে লাগলুম। গলার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক ধরতে পারছি না। একবার মনে হল প্রিয়তোষবাবু কবিতা আবৃত্তি করছেন—'তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখি—'......তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা অস্পষ্ট হয়ে গেল। দোরের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শোনবার চেষ্টা করলুম...কথাবার্তার সুর বদলে গেছে—মান-অভিমানের পালা চলছে। মনে হল যেন মেয়েলি গলা বলছে...'যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না... আর আস্বোও না...কেন তুমি—?'

আমার মনের মধ্যে শুধু বিস্ময়ই নয়, আতঙ্কও জমা হয়ে উঠছিল। কারণ, মেয়েলি গলাটি কেবল বাঙালী মেয়ের গলাই নয়, শিক্ষিত মার্জিত বাঙালী মহিলার গলা! মনে মনে ঘেমে উঠছিলুম আর ভাবছিলুম—কে হতে পারে?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ড আর কোনও শব্দ নেই। তারপর একটি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ-হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্ল।

banglabooks.in

হাসি থামলে স্পষ্ট স্ত্রীকণ্ঠ শুনতে পেলুম—'একটি ভদ্রলোক দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতছেন। যাও, আদর করে ঘরে এনে বসাও।'

চমকে উঠলুম। পালাব কিনা ভাবছি, এমন সময় প্রিয়তোষবাবু দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে আলো ছিল, মৃদুশক্তির একটা নীল বাল্‌ব জ্বলছিল; দেখলুম প্রিয়তোষবাবুর মুখে বিরক্তি এবং ক্ষোভ মাখানো রয়েছে বটে, কিন্তু অবৈধ প্রণয়ে ধরা পড়ার লজ্জা সেখানে লেশমাত্র নেই। তিনি বললেন, 'আসুন।'

একরকম অসাড় ভাবেই ঘরে ঢুকলুম। ঘরের মধ্যে কিন্তু আর কেউ নেই; মেয়েলি গলার অধিকারিণী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেবল ঘরের একপাশে রেডিও সেটের ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে; যেন প্রিয়তোষবাবু এতক্ষণ বসে রেডিও শুনছিলেন, যন্ত্রটা বন্ধ না করেই দরজা খুলতে এসেছেন।

প্রিয়তোষবাবু যদি আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতেন তাহলে আমিও একটু জোর পেতুম কিন্তু এতই ভদ্রভাবে আমাকে রেডিওর কাছে নিয়ে গিয়ে বসালেন যে, আমার মুখে আর কথা যোগালো না। তিনি নিজের মুখের ওপর দিয়ে একবার হাত চালিয়ে ধীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু দরকার আছে কি?'

আমি উত্তর দেবার আগেই সেই ব্যঙ্গহাসি আমার কানের কাছে আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, আওয়াজটা আসছে রেডিওর ভেতর থেকে! তারপরই কথা শুনতে পেলুম, বিদ্রূপভরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথা—'দরকার আছে বৈকি। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ তাই চুরি করে শুনতে এসেছেন!'

সভয়ে রেডিওর কাছ থেকে সরে এলুম। মাথার চুল বোধহয় খাড়া হয়ে উঠেছিল, গায়েও কাঁটা দিয়েছিল। বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কি? কে কথা কইছে, প্রিয়তোষবাবু?'

প্রিয়তোষবাবু একবার চোখ তুলে আমার পানে চাইলেন, তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

'আপনার স্ত্রী! কিন্তু—'

রেডিওর মধ্য থেকে গঞ্জনাভরা কঠিন স্বর বেরিয়ে এল, 'কিন্তু তিনি মারা গেছেন —এই না? তাতে আপনার কী? আপনি কেন আমার স্বামীকে বিরক্ত করতে এসেছেন? যান বাড়ি যান। কী রকম ভদ্রলোক আপনি? আমার স্বামীর চরিত্র তদারক করবার কী অধিকার আছে আপনার? উনি আপনাদের পাড়ায় এসে আছেন, আপনাদের পাড়া পবিত্র হয়ে গেছে জানেন তা?' তারপর হঠাৎ এই তপ্ত ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর উদ্বেগে যেন গলে গেল—'ওগো যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—নইলে শরীর খারাপ হবে। অনেক রাত হয়েছে।'

প্রিয়তোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, নেহাৎ গ্রাম্য লোকের মত বললুম, 'কিন্তু কিছু যে বুঝতে পারছি না! রেডিওর ভেতর থেকে—?'

ক্লান্ত স্বরে প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'রেডিওতে আমার স্ত্রী রোজ এই সময় আমার সঙ্গে কথা কন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এমনি হয়ে আসছে। আমার জীবনের এই এক-মাত্র সম্বল। উনিই সংসার চালান, উনিই সব কিছু করেন—আমি শুধু ওঁর কথা মত কাজ করে যাই।'

বিস্ময়ের ঘোরে মনটা তখনও অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে ছিল; বললুম, 'কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়—?'

রেডিও থেকে অধীর উত্তর এল, 'আপনি সে বুঝবেন না—বোঝবার বৃথা চেষ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বাড়ি যান—আপনার স্ত্রীর বুকের ব্যামো আছে না? ভাল চান তো শিগ্‌গির বাড়ি যান, নইলে হয়তো আর দেখতে পাবেন না।'

শেষের দিকে কথাগুলো ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেই যে সাধু ভাষায় বলে বেত্রাহত কুক্কুর, ঠিক সেইভাবে প্রিয়তোষবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িমুখো দৌড়োতে আরম্ভ করলুম। পথে জুতো বোধহয় সঙ্গ

banglabooks.in

নিয়েছিল, কিন্তু সেটা জাগ্রত চেতনার কথা নয়—আবছায়া একটা অনুভূতি মাত্র।

বাড়ি পৌঁছে দেখি, বসবার ঘরে রেডিওটা খোলা রয়েছে, কিন্তু তার ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আর মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্ত্রী পড়ে আছেন। তাঁর দু' চোখ বন্ধ; একটা হাত এমন অস্বাভাবিকভাবে ছড়ানো রয়েছে যে, মনে হয়—

মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর আছড়ে পড়লুম। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'অ্যাঁ—এলে! আমার একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—'

রেডিওর মধ্য থেকে তরল কৌতুকের হাসি এস্রাজের ধাতব মূর্ছনার মত বেরিয়ে এল। তারপর সেই গলার আওয়াজ,—'কেমন জব্দ! আর যাবেন পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে?...স্বামী-স্ত্রীর কথা চুরি করে শুনতে গিয়েছিলেন তাই একটু ভয় দেখালুম। আর কখনও এমন কাজ করবেন না...'

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

ধীরেন ঘোষের বিবাহ

শ্রীযুক্ত ধীরেন ঘোষের বয়স তিপ্পান্ন বছর। তিনি অতি সঙ্গোপনে ট্রেনে চড়িয়া কাশী যাইতেছেন। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা।

ধীরেনবাবু অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। তাঁহার প্রথম পক্ষ হইতে কয়েকটি কন্যা আছে; সকলেই বিবাহিতা ও সন্তানবতী। গত বছর ধীরেনবাবুর স্ত্রী মারা গিয়াছেন। অতঃপর এ বছর তিনি আবার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশোর্ধে হইলেও তাঁহার শরীর এখনও বেশ মজবুত আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা কেহ বুঝিতে চায় না।

তিনি বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই চারিদিকে একটা মস্ত গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে; মেয়েরা কান্নাকাটি করিবে; জামাতা বাবাজীরা মুখ ভার করিবেন; পাড়ার ছোঁড়ারা বাগড়া দিবার চেষ্টা করিবে। তাই ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে নিজের বিবাহ স্থির করিয়াছেন এবং একটিও বরযাত্রী না লইয়া চুপি চুপি কাশী যাইতেছেন। কাশীতে পাত্রী ঠিক হইয়াছে। একেবারে বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া বাড়ি ফিরিবেন। তখন যে যত পারে চেঁচামেচি করুক; কিছু আসে যায় না।

রাত্রির অন্ধকারে হু হু শব্দে ট্রেন ছুটিয়াছে। ধীরেনবাবুর কামরায় দুটি মাত্র বাঙ্ক; একটিতে তিনি শুইয়া, অন্যটি খালি। ধীরেনবাবু কল্পনাপ্রবণ লোক নয়; অতীত বিবাহিত জীবনের স্মৃতি কিম্বা আগামী বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছ না। তিনি মাঝে মাঝে ঝিমাইতেছেন, আবার জাগিয়া উঠিতেছেন। মন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ।

গভীর রাত্রে ট্রেন একটি স্টেশনে থামিল। কামরার বাহিরে কয়েকজন লোকের গলার

banglabooks.in

আওয়াজ শুনিয়া ধীরেনবাবু ঘাড় তুলিয়া দেখিলেন।

'এই যে এ গাড়িতে একটা বাঙ্ক খালি আছে—তুমি উঠে পড়—'...'আর তোমরা?'... 'আমরা অন্য গাড়ি খুঁজে নিচ্ছি'...'উলু উলু উলু—'

একটি নব যুবক গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শূন্য বাঙ্কটার উপর বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ধীরেনবাবু মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ছোকরা নিশ্চয় বিবাহ করিতে যাইতেছে। কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, বয়স আন্দাজ বাইশ-তেইশ। চেহারা মন্দ নয়।

বিছানা পাতা শেষ হইলে যুবক বিছানায় বসিয়া তরিবত করিয়া একটি সিগারেট ধরাইল।

নিরুৎসুক চক্ষে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ধীরেনবাবুর মনে হইল যুবককে তিনি পূর্বে কোথাও দেখিয়াছেন। সম্প্রতি নয়, অনেক দিন আগে। কবে কোথায় দেখিয়াছেন মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার বসিবার ভঙ্গী অঙ্গ-সঞ্চালন—সবই যেন চেনা চেনা।

ধীরেনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?' যুবক চমকিয়া তাকাইল। এতক্ষণ সে ধীরেনবাবুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই; এখন দেখিল একটা চিমসে গোছের বুড়ো শুইয়া আছে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'গয়া।'

'বিয়ে করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

ধীরেনবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুম কিন্তু সহসা আসিল না, কে এই ছোকরা? কোথায় তাহাকে দেখিয়াছেন?—আর একটা অদ্ভুত যোগা-যোগ—আজ হইতে ত্রিশ বছর পূর্বে ধীরেনবাবুও গয়ায় বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন—এমনি রাত্রির ট্রেনে চড়িয়া। তাহার প্রথম শ্বশুরবাড়ি ছিল গয়ায়।

আশ্চর্য।

নানা অসংলগ্ন কথা চিন্তা করিতে করিতে ধীরেনবাবু শেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে ধীরেনবাবুর ঘুম ভাঙিল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, যুবক নিজের বাঙ্কে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি উঠিয়া বসিয়া একদৃষ্টে যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার বুকের ভিতরটা আনচান করিতে লাগিল। চিনি চিনি করিয়াও কেন চিনিতে পারিতেছেন না? স্মৃতিশক্তি ভাল; এমন ভুল তো তাঁহার কখনও হয় না। অথচ এই যুবকের সহিত তাঁহার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে—গাঢ় পরিচয় আছে—

চলন্ত গাড়ির একটা আচম্‌কা ঝাঁকানি খাইয়া যুবকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

'পরের স্টেশন কি গয়া?'

ধীরেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

যুবক তখন স্নান-কামরায় গিয়া মুখহাত ধুইয়া আসিল; ক্ষিপ্র হস্তে বিছানা গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ধীরেনবাবু দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর অজ্ঞাত সংশয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল। এমন অস্থিরতা ও উদ্বেগ তিনি জীবনে কখনও ভোগ করেন নাই। অথচ কেন যে এই উদ্বেগ তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল একটা মানুষকে চিনিতে না পারার জন্য এতখানি ব্যাকুলতা কি সম্ভব?

গাড়ির গতি মন্থর হইল। গয়া আসিয়া পড়িয়াছে। যুবক সিগারেট ধরাইয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

ধীরেনবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, 'কাশী।'

যুবক তাঁহার প্রতি এমন একটি দৃষ্টিপাত করিল যাহার অর্থ—কাশী যাবার বয়স হয়েছে বটে।

গয়া স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল। যুবক নামিবার উপক্রম করিল।

banglabooks.in

ধীরেনবাবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নাম কি?'

যুবক বিরক্তভাবে ফিরিয়া তাকাইল।

'আমার নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।' বলিয়া সে নামিয়া গেল।

ধীরেনবাবু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘকাল তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

যে লোকটিকে তিনি কিছুতেই চিনিতে পারিতেছিলেন না, তাহাকে চিনিতে আর বাকি নাই; সে আর কেহ নয়—তিনি স্বয়ং। ত্রিশ বছর পূর্বে ধীরেনবাবু যাহা ছিলেন এই যুবকটি সেই। শুধু চেহারার সাদৃশ্য বা নামের ঐক্য নয়—সাক্ষাৎ তিনিই। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? ধীরেনবাবু স্বপ্ন দেখিতেছেন না তো? তিনি চোখ রগড়াইয়া চারিদিকে চাহিলেন। না, স্বপ্ন নয়; সূর্য উঠিয়াছে। তিনি জাগিয়াই আছেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তিও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িল, ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গাড়ির কামরায় একটি বৃদ্ধ ছিল। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—গয়া। তারপর যাহা আজ ঘটিয়াছে সমস্তই ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ শেষ মুহূর্তে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নাম শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়াছিল—

সে বৃদ্ধ কে ছিল? সেও কি যুবক ধীরেনবাবুকে দেখিয়া নিজের অতীত যৌবনকে চিনিতে পারিয়াছিল? এমনিভাবে কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে?

এই সময় তিনি ধড়মড় করিয়া গাড়ি হইতে নামিতে গেলেন। দেখিলেন গাড়ি চলিতেছে। গাড়ি আবার কখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

তাঁহার যৌবন এখন গয়ায়। আজ রাত্রে তাঁহার বিবাহ। তবে ধীরেনবাবু কোথায় যাইতেছেন? গয়ায় তাঁহার বিবাহ, তিনি কাশী চলিয়াছেন কি জন্য?

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। বিশ্বাসের যোগ্য নয়। একটা মানুষের দুইটা বিভিন্ন বয়স যুগপৎ বর্তমান থাকে কি করিয়া? কিন্তু ধীরেনবাবু সর্বান্তঃকরণে জানেন ইহাই সত্য। ঐ যুবক যে তিনিই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা অবশ্য তিনি জানেন না। কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

পরের স্টেশনে গাড়ি থামিতেই ধীরেনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন। কাশী যাইবার আর প্রয়োজন নাই; দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহেরও প্রয়োজন নাই।

আজ রাত্রে তাঁহার প্রথম পক্ষের বিবাহ।

১১ বৈশাখ, ১৩৫৬

banglabooks.in

দেহান্তর

বরদা বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে যাওয়া উচিত নয়, আমি কখনও সে চেষ্টা করি না। কেবল একবার—'

নিদাঘকাল সমুপস্থিত : মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, এই সময় সূর্য প্রচন্ড হয় এবং চন্দ্র হয় স্পৃহনীয়। সূর্যের প্রচণ্ডতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। পরন্তু চন্দ্রের স্পৃহনীয়তা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ক্লাবের কয়েকজন সভ্য সন্ধ্যার পর ক্লাবের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শতরঞ্চ পাতিয়া বসিয়াছিলাম। পূর্বকোণে বেশ একটি নধর চাঁদ গাছ-পালা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার আলোয় পরস্পর মুখ দেখিতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ সভ্যই ঊর্ধ্বদৈহিক আবরণ মোচন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ক্লাবের ভৃত্যকে ভাঙের সরবৎ তৈয়ার করিবার ফরমাস দেওয়া হইয়াছিল। চন্দ্র যতই স্পৃহনীয় হোক, সেই সঙ্গে বরফ-শীতল সরবৎ পেটে পড়িলে শরীর আরও সহজে স্নিগ্ধ হয়। আমরা সতৃষ্ণভাবে সরবতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে বরদা যখন বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না—' ইত্যাদি, তখন আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। ছুঁচের মতো সূক্ষ্মাগ্র এই প্রস্তাবনাটি যে অচিরাৎ ফাল হইয়া গল্পের আকারে দেখা দিবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। ভূতের গল্প শোনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাঁদিনী রাত্রি অনুকূল নয়, এজন্য শীতের সন্ধ্যা কিংবা বর্ষার রাত্রি প্রশস্ত। কিন্তু বরদা যখন ভণিতা করিয়াছে, তখন আর নিস্তার নাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় সরবৎ আসিয়া পড়িল। আমরা প্রত্যেকে হৃষ্টচিত্তে একটি করিয়া ঠান্ডা গেলাস তুলিয়া লইলাম। পৃথ্বী গেলাসের কাণায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল, 'আঃ! দুনিয়াটা যদি মন্ত্রবলে এই সরবতের মতো ঠান্ডা হয়ে যেতো—'

বরদা বলিল, 'দুনিয়া বলতে তুমি কি বোঝো? এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা আছে, যেখানে এখন বরফ পড়ছে। গত বছর এই সময় আমি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, দেখলুম দিব্যি শীত—'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাহাড়ে? কোন্ পাহাড়ে?'

বরদা বলিল, 'মনে কর মসুরী কিংবা নৈনিতাল। নাম বলব না, তবে সৌখীন হাওয়া বদলানোর জায়গা নয়। আমার বড় কুটুম্ব সেখানে বদলি হয়েছেন, তাঁরি নিমন্ত্রণে মাসখানেক গিয়েছিলুম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল—'

অমূল্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ঘটনা না হয় ঘটেছিল, কিন্তু পাহাড়ের নাম বলতে লজ্জা কিসের?'

বরদা বলিল, 'লজ্জা নেই। যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি তার পাত্রপাত্রী সবাই জীবিত, তাই একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে বলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন উৎকট ব্যাপার ঘটে যায় -যা হোক, গল্পটা বলি শোনো।'—

হিল্ স্টেশনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের চালচলন একটু বিলিতি ঘেঁষা হয়ে পড়ে। পুরুষেরা সচরাচর কোট-প্যান্ট পরেন। মেয়েরা অবশ্য শাড়ী ছাড়েননি, কিন্তু হাবভাব ঠিক দিশী বলা চলে না। টেবিলে বসে স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে খাওয়া, ডিনারের পর দু'এক পেগ হুইস্কি বা পোর্ট—এসব সামাজিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না - শীতের রাজ্যে শীতের নিয়ম মেনে চলাই ভাল।

শ্যালকের চিঠি পেয়ে আমি তো গিয়ে পৌঁছলুম। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই গায়ে বেশ গত্তি লাগল। আমার শ্যালকটি দারুণ মাংসাশী, বাড়িতে রোজ মুর্গি মাটনের শ্রাদ্ধ চলেছে। তার ওপর পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষিদে পায়। জায়গাটা সত্যিই চমৎকার; যেমন জল-হাওয়া, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কয়েকটি নতুন বন্ধু জুটে গেল। এখানে দশ-বারো ঘর বাঙালী আছেন, সকলেই ভারি মিশুক, নতুন লোক পেলে খুব খুশী হন। একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম

banglabooks.in

প্রমথ রায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ভাল সরকারী চাকরি করে; মনটা অতি আধুনিক হলেও উগ্র নয়। প্রায় রোজই বিকেলবেলা টেনিস খেলে ফেরবার পথে আমাদের বাসায় ঢুঁ মারত। ছোকরা অবিবাহিত; একলা থাকে। তাই আমাদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে দু'এক পেয়ালা চা কিংবা কক্‌টেল সেবন করে সন্ধ্যের পর বাসায় ফিরত।

একদিন কথায় কথায় আমার শ্যালক প্রেতযোনির কথা তুললেন; বললেন, 'ওহে প্রমথ, তোমরা তো ভূত-প্রেত কিছুই মানো না। আমাদের বরদা একজন পাকা ভূতজ্ঞানী ব্যক্তি। ভূতের প্রমাণ যদি চাও, ওর কাছে পাবে।'

প্রমথ হেসে উঠল; বলল, 'আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এইসব বিশ্বাস করেন?'

কথাটা সে হালকা ভাবে বললেও গায়ে লাগল; বললুম, 'শিক্ষিত লোকেরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করেন যা বিশ্বাস করতে অশিক্ষিত লোক লজ্জা পাবে।'

'যথা?'

'যথা ফ্রয়েডিয়ান্ সাইকো অ্যানালিসিস্ কিংবা প্যাব্‌লভের বিহেভিয়ারিজম।'

প্রমথ হাসতে লাগল। সে বুদ্ধিমান ছেলে তাই এঁড়ে তর্ক করল না। ভূতের কথা ঐখানেই চাপা পড়ল।

আমার পাহাড়ে আসার পর দু'হপ্তা কেটে গেল। দিব্যি আরামে আছি; ওজন বেড়ে যাচ্ছে। মনে চিন্তা নেই, গায়ে ঘাম নেই, বিছানায় ছারপোকা নেই; খাওয়া ঘুমোনো আর ঘুরে বেড়ানো এই তিন কাজে দিবারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না। জীবনে এরকম সুসময় কচিৎ এসে পড়ে; কিন্তু বেশী দিন থাকে না।

প্রমথ একদিন আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। আমি আর শ্যালক যথাসময়ে তার বাসায় উপস্থিত হলুম। আর কেউ নিমন্ত্রিত হয়নি জানতুম; কিন্তু গিয়ে দেখি একটি তরুণী রয়েছেন। এঁকে আগে কখনও দেখিনি। সুন্দরী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মুখে একটু বিষাদের ছায়া। সাজসজ্জায় প্রসাধনে বর্ণবাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আছে। চেহারা দেখে বয়স কুড়ি একুশ মনে হয়, হয়তো দু'এক বছর বেশী হতে পারে।

শ্যালক খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে সম্ভাষণ করলেন, 'এই যে, মিসেস দাস, কি সৌভাগ্য! আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা আশা করিনি—'

তরুণী হাসিমুখে প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'সাপ্তাহিক শপিং করতে শহরে এসেছিলুম। রাস্তায় প্রমথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, উনি ধরে নিয়ে এলেন।'

প্রমথ তখন মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইশারায় বুঝলুম, মিসেস দাস বিধবা। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে 'হর-জটা' নামে একটি উঁচু গিরিশিখর আছে; খুব ছোট জায়গা, মাত্র দশ-বারোটি বাংলো আছে। সেইখানে মিসেস দাস থাকেন। হর-জটা থেকে শহরের পথ সুগম নয়, মাঝে একটা উপত্যকা পড়ে; তাই সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে এসে আবশ্যক মতো কেনাকাটা করে নিয়ে যান।

চা-কেক সহযোগে গল্প চলতে লাগল। লক্ষ্য করলুম, মিসেস দাস একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা অন্যদিকে তেমনি শান্ত আর সংযত। তাঁর সুন্দর চেহারার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, অথচ তাঁর সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করাও চলে না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রগল্‌ভতা করবার সাহস কারুর নেই। তাঁর সুকুমারত্বই যেন বর্ম।

প্রমথকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম। এতদিন বুঝতে পারিনি যে, তার জীবনে প্রেম-ঘটিত কোনও জটিলতা আছে; এখন দেখলুম বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা অন্য সময় ঠিক থাকে; কিন্তু চুম্বকের কাছে এলে একেবারে অধীর অসংবৃত হয়ে পড়ে; প্রমথর অবস্থাও সেই রকম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করে দিচ্ছে যে ঐ মেয়েটিকে সে ভালবাসে; লোকলজ্জার খাতিরেও মনের অবস্থা লুকোবার ক্ষমতা তার নেই।

banglabooks.in

অথচ মিসেস দাস বিধবা, হোন প্রগতিশীলা আধুনিকা—তবু হিন্দু বিধবা।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় এই যে বিচিত্র রোমান্স অংকুরিত হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি কোথায়?

চায়ের পর্ব শেষ হতেই মিসেস দাস উঠে পড়লেন, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাঁকে হর-জটায় ফিরতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকে দৃষ্টির আমন্ত্রণে টেনে নিয়ে বললেন, 'একদিন হর-জটায় আসুন না। একটু নিরিবিলি এই যা, নইলে খুব সুন্দর জায়গা। এমন সূর্যোদয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আসবেন।'

আমরা গলার মধ্যে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ করলুম। তিনি চলে গেলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে আমরাও উঠলুম। অতিথি-সৎকারের যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ ক্রমাগত অনমনস্ক হয়ে পড়ছে দেখে তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যালককে জিগ্যেস করলুম, 'কি হে, ব্যাপার কি? ভেতরে কিছু কথা আছে নাকি?'

শ্যালক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, 'তুমিও লক্ষ্য করেছ দেখছি। আমি গুজব শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখলুম। প্রমথ সাবিত্রীকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।'

'ওঁর নাম বুঝি সাবিত্রী? তা উনি কি বলেন?'

'যতদূর শুনেছি, সাবিত্রীর মত নেই।'

'মত নেই কেন? হিন্দু সংস্কার? না অন্য কিছু?'

'তা ভাই ঠিক বলতে পারি না। কতকটা সংস্কার হতে পারে, আবার কতকটা মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসাও হতে পারে।'

জিগ্যেস করলুম, 'স্বামী কতদিন মারা গেছেন?'

শ্যালক বললেন, 'তা প্রায় বছর দুই হতে চলল। ভদ্রলোক রেলের বড় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন; হঠাৎ রেলে কাটা পড়লেন।

'তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল?'

'সামান্য। খুব রাশভারি জবরদস্ত লোক, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছিল। মাত্র বছরখানেক সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।'

'মিসেস দাস হর-জটায় থাকেন কেন?'

'বাড়িটা দাসের ছিল, সাবিত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাছাড়া দাস 'অন্ ডিউটি' মারা গিয়েছিলেন তাই রেলওয়ে থেকে তাঁর বিধবা একটা মাসহারা পায়। তাইতেই চলে।'

'সাবিত্রী কেমন মেয়ে তোমার মনে হয়?'

'খুব ভাল; অমন মেয়ে দেখা যায় না। এই বয়সে একলা থাকে, কিন্তু কেউ কখনও ওর নামে একটা কথা বলতে পারেনি।'

'বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?'

'এ রকম ক্ষেত্রে হওয়াই ভাল। সারা জীবন অতীতের পানে চেয়ে কাটিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ছেলেপুলে থাকলেও বা কথা ছিল। কিন্তু সাবিত্রী বোধ হয় বিয়ে করবে না।'

এই ঘটনার পর আরও দিন দশেক কেটে গেল। প্রমথ আর আসেনি। আমরা তার মনের কথা আঁচ করেছি বলেই বোধ হয় সে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমারও স্বর্গ হতে বিদায় নেবার সময় হল। আমি পাততাড়ি গুটোচ্ছি এমন সময় একদিন প্রমথ এল। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব। দু'চারটে কথার পর বলল, 'মিসেস দাস চিঠি লিখে আমাদের তিনজনকে হর-জটায় নেমন্তন্ন করেছেন, সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। যাবেন?'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্যালক আপত্তি তুললেন—'সূর্যোদয় দেখতে হলে তার আগের রাত্রে গিয়ে হর-জটায় থাকতে হয়, কিংবা রাত্রি দুটোর সময় এখান থেকে বেরুতে হয়। সে কি সুবিধে হবে?'

প্রমথ পকেট থেকে চিঠি বার করে বলল, 'তার চিঠি পড়ে দেখুন, অসুবিধে বোধ হয় হবে না।'

banglabooks.in

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন, প্রমথবাবু, দেখছি আমার সেদিনের নিমন্ত্রণ আপনারা মুখের কথা মনে করেছেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। আসুন না। রাত্রে আমার বাড়িতে থেকে সকালে সূর্যোদয় দেখবেন। কষ্ট হবে না; আমার বাড়িতে তিনজন অতিথিকে স্থান দেবার মতো জায়গা আছে।

কবে আসবেন জানাবেন। কিংবা না জানিয়ে যদি এসে উপস্থিত হন তাহলেও খুশী হব। আশা করি ভাল আছেন।

নিবেদিকা—সাবিত্রী দাস

এর পর আর শ্যালকের আপত্তি রইল না। প্রমথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ শনিবার আছে, চলুন না আজই যাওয়া যাক। পাঁচটার সময় বেরুলে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছুনো যাবে।'

তাই ঠিক করে বেরিয়ে পড়া গেল।

হর-জটা শিখরটি উপত্যকা থেকে দেখা যায়, সত্যি হর-জটা নাম সার্থক। যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠেছে; তার খাঁজে খাঁজে শাদা বাংলোগুলি ধুতরা ফুলের মতো ফুটে আছে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার রাস্তাটি অপূর্ব নয়; তিন মাইল পথ হাঁটিতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লাগল।

আমরা যখন মিসেস দাসের বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলুম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে; তবু হর-জটার কুটিল কুণ্ডলীতে সূর্যাস্তের আবীর লেগে আছে। মিসেস দাস বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে ছিলেন, উৎফুল্ল কলকাকলি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের দেখে তাঁর এই অকৃত্রিম আনন্দ বড় ভাল লাগল।

শোনা যায়, আসন্ন দুর্ঘটনা সামনে কালো ছায়া ফেলে তার আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস পাইনি। সেই পার্বত্য সন্ধ্যার গৈরিক আলো—মনে হয়েছিল, এ আলো নয়, অপরূপ এক দৈবী প্রসন্নতা। তার আড়ালে যে লেশমাত্র অশুভ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কল্পনা করাও যায় না। আমার বোধ হয় প্রমথও কিছু আভাস পায়নি।

মিসেস দাস আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে ড্রয়িং-রুমে এসে দেখি চা তৈরি। বাড়িতে পুরুষ চাকর নেই; দু'টি পাহাড়ী মেয়েমানুষ কাজকর্ম রান্নাবান্না করে এবং রাত্রে থাকে।

হর-জটায় এখনও বিদ্যুৎবাতি এসে পৌঁছয়নি। কেরোসিন ল্যাম্পের মোলায়েম আলোয় চা খেতে বসলুম। মিসেস দাস চাকরানিদের সাহায্যে আমাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ড্রয়িং-রুমের দেয়ালে একটা এন্‌লার্জ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। দূর থেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না; চা খাওয়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইনিই অকাল-মৃত মিস্টার দাস সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখলুম। চেহারা সুন্দর বলা চলে না, কিন্তু একটা দৃঢ়তা আছে; চওড়া চিবুকের মাঝখানে খাঁজ, চোখের দৃষ্টি একটু কড়া। ফটো তোলবার সময় ঠোঁটের কোণে যে হাসি আনার নিয়ম আছে সেটি অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাসি দিয়ে চরিত্রের দৃঢ় বলিষ্ঠতা ঢাকা পড়েনি।

মনে মনে এই মুখখানার সঙ্গে প্রমথর নরম মিষ্টি মুখের তুলনা করছি এমন সময় পাশে মৃদুকণ্ঠের আওয়াজ হল—আমার স্বামী।

দেখলুম মিসেস দাস আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর প্রমথও এসে দাঁড়াল। মিসেস দাস কিছুক্ষণ ফটোর দিকে তাকিয়ে থেকে চকিতে প্রমথর পানে চাইলেন। তাঁর মুখখানি শান্ত, মুখ দেখে মনের কথা ধরা যায় না; তবু সন্দেহ হল তিনিও আমারই মতো ফটোর সঙ্গে প্রমথর মুখ তুলনা করলেন।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলুম।

মেয়েমানুষের মন বোঝা সহজ নয়; বিশেষত মিসেস দাসের মতো মেয়ের মন। কারি

banglabooks.in

বলেছেন, রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনি প্রমথকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন একথা নিশ্চয় সত্যি, কিন্তু প্রমথ সম্বন্ধে তাঁর মনে কি কোনও দুর্বলতা নেই? এই যে আজ তিনি আমার মতো একজন অপরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন এটা কি শুধুই লৌকিক সহৃদয়তা? না এর অন্তরালে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কাছে পাবার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল?

প্রমথর অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন যেমন দেখেছিলুম আজও ঠিক তাই। চুম্বকাবিষ্ট কম্পাসের কাঁটা, অন্য কোনও দিকেই তার লক্ষ্য নেই।

ক্রমে রাত্রি হল। উত্তর দিক থেকে একটা খুব ঠান্ডা হাওয়া উঠে মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বইতে লাগল।

রান্নাবান্না হতে স্বভাবতই একটু দেরি হল। আমরা রাত্রির খাওয়া শেষ করে যখন উঠলুম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। মিসেস দাস বললেন, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সকাল সাড়ে তিনটের আগে কিন্তু উঠতে হবে, নইলে সূর্যোদয়ের সব সৌন্দর্য দেখতে পাবেন না।'

ভাবনা হল, এখন শুতে গেলে সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভাঙবে কি? যদি না ভাঙে আজকের অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জিগ্যেস করলুম, 'অ্যালার্ম ঘড়ি আছে কি?'

মিসেস দাস বললেন, 'না। কিন্তু সেজন্য ভাববেন না; আমি ঠিক সময়ে আপনাদের তুলে দেব।'

শ্যালক বললেন, 'কিন্তু আপনার ঘুম যে ভাঙবে তার ঠিক কি?'

মিসেস দাস একটু হেসে বললেন, 'আমি ঘুমোবো না, এই ক'ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার অভ্যেস আছে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। আমরা ঘুমোবো আর ভদ্রমহিলা সারারাত জেগে থাকবেন?

হঠাৎ প্রমথ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তাহলে আমিও জেগে থাকি।' আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

আমার মন কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিল না। আমরা দু'জন বয়স্থ ব্যক্তি ঘুমোব, আর এই দু'টি যুবক যুবতী সারারাত্রি একত্র থাকবে—

শ্যালক সমস্যা ভঞ্জন করে দিয়ে বললেন, 'তবে আমরা সকলেই জেগে থাকি না কেন? আমার আবার নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসে না; এমনিতেই হয়তো চোখ চেয়ে রাত কেটে যাবে।'

আমি বললাম, 'আমারও ঠিক তাই।'

মিসেস দাস আপত্তি করলেন, কিন্তু আমরা শুনলুম না। ড্রয়িং-রুমে বেশ জুত করে বসা গেল। চার ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। শ্যালক প্রস্তাব করলেন, তাস খেলা যাক; কিন্তু বাড়িতে তাস ছিল না বলে তা আর হল না।

প্রথমে খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গল্প চলেছে। মিসেস দাস একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে শুয়েছেন; শ্যালক সোফায় লম্বা হয়ে সিগার টানছেন; আমিও একটা গদি-মোড়া চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বেশ আরাম অনুভব করছি; কেবল প্রমথ অস্থির-ভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা ওটা নাড়ছে, আলোটা কখনও কমিয়ে দিচ্ছে কখনও বাড়িয়ে দিচ্ছে—

মিসেস দাসের শান্ত চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

বারোটা বাজল।

শ্যালক উঠে বসলেন; সিগারের দগ্ধ প্রান্তটুকু অ্যাশ্-ট্রের ওপর রেখে বললেন, 'আচ্ছা মিসেস দাস, আপনি এই বাড়িতে একলা থাকেন, আপনার ভয় করে না?'

মিসেস দাস একটু ভুরু তুলে তাকালেন, 'ভয়? কিসের ভয়?'

বাড়ির মাথার ওপর ঠান্ডা বাতাসটা সাঁই সাঁই শব্দ করে চলেছে; আমি একটা হাই চাপা দিয়ে বললুম, 'মনে করুন ভূতের ভয়।'

banglabooks.in

প্রমথ মিস্টার দাসের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাগ-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার কথা শুনে চকিতে ফিরে চাইল; তারপর আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বিদ্রূপ করে বলল, 'ভূতের ভয়! সে আবার কি? ভূত বলে কিছু আছে নাকি? বরদাবাবুর যত কুসংস্কার।'

মিসেস দাসকে জিগ্যেস করলুম, 'আপনারও কি তাই মত?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পরজন্ম আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত—কি জানি—'

প্রমথ জোর গলায় বলে উঠল, 'ভূত নেই। ভূত শব্দের যে অর্থই ধর, ভূত থাকতে পারে না। আছে শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। এই কি যথেষ্ট নয়?'

তার মুখের পানে তাকালুম; মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। প্রমথ নরম স্বভাবের মানুষ, তাকে এত বিচলিত কখনও দেখিনি। যেন সাবিত্রীকে একটা কথা বলবার জন্যে তার প্রাণে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমাদের সামনে বলতে পারছে না।

শ্যালকও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন; তিনি বললেন, 'বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে ভূতও থাকতে বাধ্য। আমাদের সকলেরই অতীত জীবন আছে—সেইটেই ভূত। তোমারও ভূত আছে প্রমথ, তাকে এড়ানো সহজ নয়। তবে মরা মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত এই যে, মরা মানুষের সবটাই ভূত; আমাদের কিছুটা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে।'

শ্যালক যে ভূত কথাটার দু'রকম অর্থ নিয়ে লোফালুফি করছেন, প্রমথ তা বুঝল না; তার তখন রোখ চেপে গেছে। সে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। মৃত্যুর পর আত্মা যে বেঁচে থাকে তা প্রমাণ করতে পারেন?'

শ্যালক হেসে বললেন, 'আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারি না। প্রেতযোনি সম্বন্ধে বরদা খবর রাখে, ওকে জিগ্যেস কর।'

আমি বললুম, 'দেখুন প্রমথবাবু, যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না; আপনিও যদি বিশ্বাস করবেন না বলে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করানো কারুর সাধ্য নয়! তবে এইটুকু বলতে পারি, অনেক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান লোক প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করেছেন; যথা—উইলিয়ম ক্রুকস, অলিভার লজ, কোনন ডয়েল—'

প্রমথ মুখ শক্ত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। যদি প্রমাণ করতে পারেন, প্রমাণ করুন, নইলে কেবল কতকগুলো বিলিতি নাম আউড়ে আমাকে কাবু করতে পারবেন না।'

একটু রাগ হল। বললুম, 'বেশ। বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মিসেস দাস, আসুন, প্ল্যাঞ্চেট করা যাক।'

তিনি একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'প্ল্যাঞ্চেট। ভূত নামাবেন?'

বললুম, 'প্রমথবাবুর অবিশ্বাস ভাঙবার আর তো কোনও উপায় দেখি না। তবে আপনার যদি ভয় করে তাহলে কাজ নেই।'

তিনি বললেন, 'না, ভয় করবে না।' চকিতে একবার প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো, করুন না। আর কিছু না হোক সময় তো কাটবে। কি চাই বলুন।'

বললুম, 'বেশী কিছু নয়, শুধু একটা তেপায়া টেবিল হলেই চলবে।'

ছোট একটা তেপায়া টেবিল ঘরেই ছিল। আমি তখন দু'চার কথায় প্ল্যাঞ্চেটের প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিলুম। তারপর আলোটা কমিয়ে দিয়ে চারজনে টেবিল ঘিরে বসা গেল।

শ্যালক প্রশ্ন করলেন, 'কাকে ডাকা হবে?'

আমি বললুম, 'যাকে ইচ্ছে ডাকা যেতে পারে। তবে এমন লোক হওয়া চাই যাকে আমরা সবাই চিনি। অন্ততঃ যার চেহারা আমাদের সকলের জানা আছে।'

আমরা যেখানে বসেছিলুম তার অল্প দূরেই মিস্টার দাসের ছবি দেয়ালে টাঙানো ছিল। প্রমথ বসেছিল ছবির দিকে পিঠ করে, আর মিসেস দাস ছিলেন তার সম্মুখে। মিসেস দাস ছবির পানে চোখ তুললেন; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখও সেই দিকে ফিরল। অল্প আলোতে ছবিটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল মুখখানা স্পষ্ট হয়ে আছে।

banglabooks.in

মিসেস দাস ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আমার পানে চাইলেন। তাঁর চোখের প্রশ্ন বুঝে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, ওঁকেই ডাকা যাক। আমি যদিও ওঁকে দেখিনি তবু ছবিতেই কাজ চলবে। সকলে চোখ বুজে মনে মনে ওঁর কথা ভাবুন।'

আঙুলে আঙুলে ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর হাত রাখা হল। তারপর আমরা চোখ বুজে মিস্টার দাসের ধ্যান শুরু করে দিলুম।

প্ল্যাঞ্চেটের টেবিলে যখন প্রেতযোনির আবির্ভাব হয় তখন টেবিলটা নড়তে থাকে; মনে হয় টেবিলের মরা কাঠে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে একটা স্পন্দন বইতে থাকে। আমরা প্রায় দশ মিনিট বসে রইলুম, কিন্তু টেবিল নড়ল না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চার হল না। তখন চোখ খুলে আর সকলের পানে তাকালুম।

প্রমথকে দেখেই বুঝলুম প্রেতের আবির্ভাব হয়েছে; টেবিলের ওপর নয়, মানুষের ওপর। এমন মাঝে মাঝে হয়, তার মুখটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে; মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে।

প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলুম, 'কেউ এসেছেন কি?'

প্রমথ আস্তে আস্তে মুখ তুলল; তারপর টকটকে রাঙা চোখ খুলে মিসেস দাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলুম। এতক্ষণে প্রমথর মুখ ভাল করে দেখা গেল। তার মুখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কঠিন হিংস্র মুখ—ক্রূর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চোখের দৃষ্টি প্রমথর দৃষ্টি নয়, যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে অন্য একজন উঁকি মারছে।

মিসেস দাস সম্মোহিতের মতো তার পানে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ প্রমথ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'সাবিত্রী!'

তার গলার আওয়াজ পর্যন্ত বদলে গেছে। মিসেস দাসের চোখ বিস্ফারিত হতে লাগল; তাঁর ঠোঁট দুটি খুলে গেল। তারপর তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাঁ! তুমি, তুমি!' এই বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর যা কাণ্ড বাধল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রমথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো; তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাকে ধরে রাখি। তার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সাবিত্রীর অজ্ঞান দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে দু' হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে গরজাতে লাগল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও? দেব না—দেব না—তুমি আমার—'

ভেবে দ্যাখো, প্রমথর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরুচ্ছে! কিন্তু আমাদের তখন ভাববার সময় নেই; আমি আর শ্যালক দু'জনে মিলে টেনে প্রমথকে আলাদা করলুম। ইতিমধ্যে পাহাড়ী চাকরানি দুটো চেঁচামেচি শুনে এসে পড়েছিল; তারা সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে কৌচের ওপর শুইয়ে দিল। আমরা প্রমথকে টেনে নিয়ে চললুম স্নানঘরের দিকে; সেখানে তাকে মেঝেয় ফেলে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলুম আর চীৎকার করে বলতে লাগলুম—'আপনি চলে যান—চলে যান—'

'না, যাব না—সাবিত্রীকে বিয়ে করতে দেব না—' দাঁত ঘষে ঘষে প্রমথ বলতে লাগল। আমরা জল ঢালতে লাগলুম। ক্রমে তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল; হাত-পা ছোঁড়াও বন্ধ হল।

আধঘণ্টা পরে দু'জনে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন তার গায়ে আর শক্তি নেই, তবু বিজ বিজ করে বকছে—'দেব না—দেব না—'

শ্যালককে তার কাছে বসিয়ে ড্রয়িং-রুমে গেলুম। দেখি মিসেস দাসের জ্ঞান হয়েছে। আমাকে দেখে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হল? বরদাবাবু, এ কী হল?'

মেয়েদের মনের অন্তরতম কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের লজ্জা আর ভয়ের অন্ত থাকে না, কান্নাই তখন তাদের একমাত্র আবরণ। আমি মিসেস দাসের পাশে বসে তাঁকে

banglabooks.in

যথাসাধ্য ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম। তারপর চাকরানিদের বললুম, 'এক পেয়ালা কড়া চা শিগ্‌গির তৈরি করে নিয়ে এস।'

সেদিন সূর্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। দুটি ঘরে দুটি রুগীর পরিচর্যা করতেই বেলা সাতটা বেজে গেল।

যা হোক, মিসেস দাস তো সামলে উঠলেন, কিন্তু প্রমথ সেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না। জোর করে ঘুম ভাঙাতেও সাহস হল না, আবার হয়তো বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড আরম্ভ করে দেবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজ ফিরে যেতেই হবে, নইলে অনেক হাঙ্গামা।

বেলা একটা পর্যন্ত যখন ঘুম ভাঙল না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। ভাগ্যক্রমে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার হর-জটায় বাস করেন, তাঁকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে, বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু আজ এঁর বিছানা থেকে ওঠা চলবে না।'

আমরা কাতর চক্ষে মিসেস দাসের পানে চাইলুম। তিনি এতক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বললেন, 'প্রমথবাবু আজ এখানেই থাকুন। আপনারা যদি নিতান্তই না থাকতে পারেন—'

শ্যালক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'দেখুন, যাওয়া খুবই দরকার কিন্তু আমরা না থাকলে আপনার যদি কোন লজ্জার কারণ হয়—'

মিসেস দাস বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না।'

বৃদ্ধ ডাক্তার আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবনার কি আছে; আমি তো কাছেই থাকি, আমি না হয় রাত্রে এসে সাবিত্রী মা'র বাড়িতে থাকব। দরকার হলে আমার স্ত্রী এসে থাকতে পারেন। আপনারা ফিরে যান।'

বৃদ্ধ ডাক্তারটি মরমী লোক; অযথা প্রশ্ন করেন না। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রমথ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই; ঘুম ভাঙলেই সে সহজ মানুষ হয়ে পড়বে।

বেরুবার সময় মিসেস দাস আমাদের একটু আড়ালে বললেন, 'কাল রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনা না হলেই ভাল হয়।'

আমরা আশ্বাস দিলুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর হর-জটা থেকে নেমে এলুম।

পরদিন সন্ধ্যের সময় খবর পেলুম প্রমথ ফিরে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না।

এদিকে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে বেরুতে হবে। ভাবলুম, যাই, আমিই প্রমথর সঙ্গে দেখা করে আসি। এইসব ব্যাপারের পর তার হয়তো আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে তার বাসায় গেলুম। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই প্রমথ এসে দোর খুলে দাঁড়ালো। তার চেহারায় কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে! সে কটমট করে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল, তারপর দড়াম্ করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

প্রমথর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাঙের নেশার জন্যই হোক বা বরদার গল্প শুনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃথ্বী প্রশ্ন করিল, 'তোমার গল্প এইখানেই শেষ? না আর কিছু আছে?'

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি এক আশ্চর্য খবর দিয়েছেন; সাবিত্রীর সঙ্গে প্রমথর

banglabooks.in

সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিয়ে অসম্ভব। প্রমথ যে শেষকালে আমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে করেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল।

'শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অদ্ভুত। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিস্টার দাসের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ দেখা দিয়েছে—'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বরদা বলিল, 'এতক্ষণ আমি সরল ভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিইনি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর—এটা কি, মিস্টার দাসের প্রেতাত্মা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হয়ে বসেছেন এবং নিজের বিধবাকে আবার বিয়ে করেছেন? কিংবা—আর কি হতে পারে?'

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আত্মাটার কী হল? কোথায় গেল সে?'

অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চীৎকারধ্বনি হইল। আমরা চমকিয়া ঊর্ধ্বে চাহিলাম; দেখিলাম, বাদুড়ের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া পাখিটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।

কণ্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

ভূত-ভবিষ্যৎ

গভীর রাত্রে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। টেবিলের এক কোণে মোমবাতিটা গলদশ্রু হইয়া জ্বলিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখি প্রেত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'আমি পারব না।'

প্রেত কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিয়া রহিল, মিনতিভরা স্বরে বলিল, 'আপনি দয়া না করলে আমার আর উপায় নেই। মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। পাড়ার ছোঁড়াগুলো তার পেছনে লেগেছে।'

প্রেতের কণ্ঠস্বর ঘষা-ঘষা; গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুরু হইবার আগে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'তা আমি কি করব? আপনি অন্য কারুর কাছে যান না।'

প্রেত বলিল, 'আর কার কাছে যাব? সবাই চোর। আপনি দয়া করুন।'

ভূতের কথায় মনটা একটু নরম হইল। সত্য বটে আমি দেনার দায়ে লুকাইয়া আছি,

banglabooks.in

কিন্তু তবু চুরি যে করিব না—এ বিশ্বাস ভূতেরও আছে। বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি ঐ মেয়েটাকে কিংবা তার বাপকে আপনার কথা বললেই পারেন, তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আমাকে কেন?'

প্রেত একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল; মোমবাতির শিখা একটু নড়িয়া উঠিল। সে বলিল, 'চেষ্টা কি করিনি? আমাকে দেখেই ভয়ে হাউমাউ করে উঠল। তারপর বাড়িতে রোজা ডেকে ঝাড়িয়েছে। ওদিকে আমার আর যাবার উপায় নেই।'

রাত্রি প্রায় বারোটা। আমি ফুৎকারে বাতি নিভাইয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। প্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তক্তপোশের পাশে বসিল, করুণস্বরে বলিল, 'দয়া করুন। আপনার কল্যাণ হবে।'

বড় বিপদে পড়িয়াছি।

আমি একজন সাহিত্যিক। বাজারে নাম হইয়াছে; কিন্তু নাম হইলেই সাহিত্য-বাজারে টাকা হয় না। ফলে, একদিন যাঁহারা বন্ধু ছিলেন তাঁহারা মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আমাকে দেখিলেই মুখ ভার করেন, কিংবা তাগাদা করেন।

বন্ধুত্বের দাক্ষিণ্য যখন একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল তখন স্থির করিলাম কলিকাতা হইতে অন্তত কিছু দিনের জন্য গা-ঢাকা দিব। ভাগ্যক্রমে একজন প্রকাশক একটি উপন্যাস লেখার বরাত দিলেন; কিছু দাদনও আদায় করিলাম। সেই দাদনের টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি শহরে জীর্ণ খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি। উপন্যাস শেষ না হইলে ফিরিব না।

আমার খোলার ঘরের জানালা ভাঙা, খাপ্‌রার ছাউনিও নিরবচ্ছিন্ন নয়। আসবাবের মধ্যে কীটদষ্ট তক্তপোশ, নড়বড়ে টেবিল ও একটি টুল। যিনি ঘরটি ভাড়া দিয়াছেন তিনি পাশেই পাঁচিল-ঘেরা মস্ত বাড়িতে থাকেন, মহাজনী কারবার আছে। এ জগতে মহাজনী কারবার কিংবা পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা না করিতে পারিলে বাঁচিয়া সুখ নাই। মহাজন নিকুঞ্জবাবুর চোখ দুটি বড় সন্দিগ্ধ; এক মাসের ভাড়া আগাম লইয়া থাকিতে দিয়াছেন। অল্প দূরে একটি সস্তা ভোজনালয় আছে, সেইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছি।

প্রথম তিনদিন বেশ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। উপন্যাস শুরু করিয়া দিয়াছি; খোলার ঘরে যে উপদেবতার যাতায়াত আছে তাহা জানিতে পারি নাই। চতুর্থ দিন রাত্রে আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। আমার অভ্যাস, বিছানায় শুইয়া একটি বিড়ি সেবন না করিলে নিদ্রা আসে না। দেশলাই জ্বালিতেই চোখে পড়িল কে একজন তক্তপোশের পাশে বসিয়া আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। দুটো আগ্রহ-ভরা চোখ—

চমকিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা মিলাইয়া গেল।

আবার দেশলাই জ্বালিলাম। কেহ নাই। ভাবিলাম ভুল দেখিয়াছি। অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিলে এমন হয়। চোখের ভ্রান্তি।

বিড়ি পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার স্নায়ু দুর্বল নয়; ভূতের ভয় করি না। ভূত থাকে থাক্, তাহাকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; ভূতের চেয়ে মানুষকেই ভয় বেশী।

পরদিন সকালে রাত্রির কথা আর মনেই রহিল না। সারাদিন উপন্যাস লিখিলাম। উপন্যাসে প্রেমের প্রগতি দেখাইতেছি। আমার হিরো একেবারে নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এক মেথর-কন্যার প্রতি অবৈধভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পৈশাচ বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। (পৈশাচ বিবাহের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে অভিধান দেখুন)। কাহিনী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

তারপর রাত্রে যথারীতি তক্তপোশে শয়ন করিয়া বিড়ি সেবনপূর্বক ঘুমাইবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু ঘুমাইতে হইল না; হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া শুনিলাম, ঘষা-ঘষা গলায় কে বলিতেছে, 'ঘুমোলেন নাকি?'

banglabooks.in

অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না; কিন্তু মনে হইল যিনি প্রশ্ন করিলেন তিনি তক্তপোশের পাশে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'আপনি কে?'

উত্তর হইল, 'কি বলে পরিচয় দিই? যখন বেঁচে ছিলাম তখন নাম ছিল নন্দদুলাল নন্দী।'

বলিলাম, 'খাসা নাম! আপনি তাহলে প্রেত?'

প্রেত বলিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। আমার কোনও বদ্ মতলব নেই।'

আমি একটা হাই তুলিয়া বলিলাম, 'বদ্ মতলব থাকলেও আপনি আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবেন না—আপনি তো হাওয়া। তবে আমি ভয় পেয়ে নিজে নিজের অনিষ্ট করতে পারি বটে।'

প্রেত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা বটে।'

মনে পড়িল দেশলায়ের বাক্সটা মাথার শিয়রেই আছে। সেই দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলাম, 'আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে কি?'

প্রেত বলিল, 'দরকার এমন কিছু নয়। কথা কইবার লোক পাই না—আপনি স্বজাতি—তাই—'

দেখিলাম প্রেতের অবস্থা আমারই মত; সম্ভবত বন্ধুদের নিকট টাকা ধার লইয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিতে উদ্যত হইয়াছি, সে বলিল, 'দেশলাই জ্বালবেন?'

'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

'হঠাৎ আলো জ্বাল্‌লে একটু অসুবিধে হয়।'

'তবে থাক্। কাল আপনার চেহারাটা লহমার জন্যে দেখেছিলাম, ভাল ঠাহর করতে পারিনি। তা থাক্।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবিলাম, বেচারা কথা কহিবার লোক পায় না, স্বজাতি পাইয়া আলাপ করিতে আসিয়াছে। আমার কিছু বলা-কহা দরকার।

'আপনি কি কাছে-পিঠে কোথাও থাকেন?'

'পাশে পাঁচিল-ঘেরা বাগানে পুরোনো নিমগাছ আছে, তাতেই থাকি।'

'তাই নাকি? আপনিও নিকুঞ্জবাবুর ভাড়াটে? কত ভাড়া দিতে হয়?'

প্রেত রসিকতা বুঝিল না, বলিল, 'বাড়ি বাগান একদিন আমারই ছিল। আমার প্রপৌত্রের কাছে নিকুঞ্জ পাল কিনেছে।'

'বটে! আপনার প্রপৌত্র বেঁচে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে—'

'প্রপৌত্র! তাহলে আপনি আন্দাজ আশী-নব্বই বছর আগে ছিলেন?'

'সিপাহী যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম। মুৎসুদ্দির কাজে পয়সা করেছিলাম; ভেবেছিলাম সাতপুরুষ বসে খাবে—কিন্তু—'

প্রেতের কথা শেষ হইল না। আমি অভ্যাসবশত অন্যমনস্কভাবে একটি বিড়ি মুখে দিয়া ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিলাম। প্রেতের ত্রস্ত-চকিত চেহারাখানা ক্ষণেকের জন্য দেখা গেল; তারপর সে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

আবার হয়তো আসিবে ভাবিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া বিড়ি টানিলাম। কিন্তু প্রেত আর আসিল না। তারপর কয়েক রাত্রি তাহার দেখা পাই নাই।

এদিকে আমার উপন্যাস দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হিরো এখন এক রজক-কন্যার কৌমার্যহানির উদ্যোগ করিতেছে। এর পর আসিবে গোপ-কন্যা। স্থির করিয়াছি, এইভাবে ধাপে ধাপে তুলিয়া হিরোকে এক চিত্রাভিনেত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ছাড়িব। উপন্যাসের নাম রাখিয়াছি—স্বর্গের সিঁড়ি।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর বাতি জ্বালিয়া লিখিতে বসিয়াছিলাম। খুব মন লাগিয়া গিয়াছিল, সময়ের হিসাব ছিল না। মনোজগতে নিরঙ্কুশ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া স্থূল জগতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখি, টেবিলের অপর পারে দাঁড়াইয়া প্রেত

banglabooks.in

মিটিমিটি হাসিতেছে।

আজ প্রেতকে প্রথম ভাল করিয়া দেখিলাম। সূক্ষ্ম মূর্তি; তবু চেহারার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নাই। গায়ে ফিতা-বাঁধা মেরজাই, মেটে-মেটে রং, সরু পাকানো গোঁফ; চোখ দুটি সজাগ ও প্রাণবন্ত। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। নিতান্তই সেকালের বাঙালী চেহারা।

প্রেত বলিল, 'কি লেখেন এত?'

বলিলাম, 'উপন্যাস।'

'সে কাকে বলে? আমাদের সময় তো ছিল না।'

উপন্যাস কী তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেত সাগ্রহে বলিল, 'ও—গোলে বকাওলির গল্প—রূপকথা! তা বলুন না শুনি।'

সংক্ষেপে গল্পটা বলিলাম। শুনিয়া ভূত বলিল, 'ছি ছি।'

বলিলাম, 'ছি ছি বললে চলবে কেন? এ না হলে বই কাটে না। যাহোক, ক'দিন আসেননি যে?'

প্রেত বলিল, 'আপনি অদ্ভুত লোক। অন্য লোক ভূত দেখলে আঁৎকে ওঠে, আপনি গ্রাহ্যই করেন না।'

বলিলাম, 'সে-রাত্রে আচমকা দেশলাই জ্বেলেছিলাম, তাই রাগ হয়েছিল বুঝি?'

'রাগ নয়—চমকে গিয়েছিলাম, চমকে গেলে আর শরীর ধারণ করা যায় না।'

খাতা টানিয়া লইয়া বলিলাম 'আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, পরিচ্ছেদটা শেষ করতে হবে। মাঝে মাঝে আসবেন, গল্পসল্প করা যাবে।'

'আচ্ছা।'—প্রেত চলিয়া গেল।

তারপর প্রেত প্রায় প্রতি রাত্রেই আসে; কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়, তারপর 'আসুন' বলিলেই হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। এ আমার শাপে বর হইয়াছে। এখানে আসিয়া মানুষ প্রতিবেশীর সহিত ইচ্ছা করিয়াই আলাপ পরিচয় করি নাই; তৎপরিবর্তে যাহা পাইয়াছি তাহা মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। প্রেতের সঙ্গে যতটুকু ইচ্ছা মেলামেশা করি, সঙ্গ-পিপাসা মিটিলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলি, সে চলিয়া যায়। মানুষ প্রতিবেশীকে এত সহজে তাড়ানো যাইত না। 'ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়।'

আমার ভূতই ভাল।

একদিন ভূত জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি সংসার করেছেন?'

বলিলাম, 'সংসার? মানে, বিয়ে? সর্বনাশ, একলা শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। ও কার্যটি আমাকে দিয়ে হবে না।'

ভূত একটু হাসিল। কিছুক্ষণ যেন অন্যমনস্ক থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে এ ক'দিন মেলামেশা করে বুঝেছি আপনি সজ্জন—চোর-ছ্যাঁচড় নয়। আমি অনেকদিন থেকে আপনার মত একজন মানুষ খুঁজছি। আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে রাখতে হবে।'

ভূত যে নিছক আমার সঙ্গ-লাভের জন্য নয়, একটা মতলব লইয়া আমার কাছে ঘোরা-ঘুরি করিতেছে তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই। বোঝা উচিত ছিল; মুচ্ছুদ্দির প্রেতাত্মা বিনা প্রয়োজনে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে, মনে করাও অন্যায়।

সতর্কভাবে বলিলাম, 'কি অনুরোধ?'

ভূত তখন টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া নিজের ও বংশের ইতিকথা বলিতে আরম্ভ করিল। আন্দাজ করিলাম কাঁকড়াবিছার ল্যাজে যেমন হুল থাকে, অনুরোধটা আছে গল্পের শেষে।

নন্দদুলাল নন্দী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া প্রচুর উপার্জন করিয়াছিল। জমিদারী বাগান ক্ষেত বালাখানা সবই হইয়াছিল। তাহার যখন তিপ্পান্ন বছর বয়স তখন সিপাহী বিদ্রোহের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। এদিকে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না; কিন্তু যাহার টাকা আছে তাহার আশঙ্কার শেষ কোথায়? একদা গভীর

banglabooks.in

রাত্রিকালে নন্দদুলাল একটি পিতলের ঘটিতে একশত মোহর পুরিয়া বাগানের নিমগাছ-তলায় পুঁতিয়া রাখিল। আর সবই যদি যায়, একশত আকব্বরী মোহর তো বাঁচিবে।

মুটিনীর হাঙ্গামা এদিকে আসিল না বটে, কিন্তু অরাজকতার সময়, হঠাৎ একদিন নন্দদুলালের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। নন্দদুলালের হৃৎযন্ত্র দুর্বল ছিল, সে বেবাক হার্টফেল করিয়া মারা গেল। ডাকাতেরা লুটপাট করিয়া চলিয়া গেল। তারপর ক্রমে দেশ ঠাণ্ডা হইল; শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

নন্দদুলাল হিসাবী লোক ছিল। তাই তাহার আমলে 'চাল' বেশী বাড়িতে পায় নাই। তাহার পুত্র যশোদাদুলালের আমলে বাবুয়ানি বাড়িল; আগে দোল-দুর্গোৎসবের সময় হরিকীর্তন কথকতা হইত, এখন বাঈ নাচ দেখা দিল। তারপর তস্য পুত্র ব্রজদুলাল আসিয়া বিলাসিতার চরম করিয়া ছাড়িয়া দিল; জুতায় মুক্তার ঝালর লাগাইয়া, বাঈজীর পল্টন পুষিয়া, একশ' টাকার নোটের ঘুড়ি উড়াইয়া সে যখন পৃথিবী হইতে বিদায় লইল তখন লক্ষ্মীও বিদায় লইয়াছেন। বাকি আছে শুধু বাগান-ঘেরা বাড়িখানা।

ব্রজদুলালের পুত্র গোপীদুলাল নিরীহ মানুষ। বাপের ভুক্তাবশিষ্ট এঁটো পাতায় যত দিন পারিল চালাইল; শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাড়ি বিক্রয় করিতে হইল। তারপর গত বিশ বছর ধরিয়া গোপীদুলাল বাড়ির বিক্রয়মূল্য লইয়া এবং সামান্য কাজকর্ম করিয়া অতি দীন ভাবে সংসার চালাইতেছে। তার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; একমাত্র কন্যার বয়স একুশ, কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ দিতে পারে নাই। উপরন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাকে দুরন্ত হাঁপানী রোগে ধরিয়াছে।

কাহিনী শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার প্রপৌত্র মানে গোপীদুলালবাবু এখানেই থাকেন?'

প্রেত বলিল, 'হ্যাঁ, বেনে পাড়ার এক ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে। তারও বেশী দিন নয়, তাকে কালে ধরেছে। আর তো কিছু নয়, গোপীদুলাল ম'লে মেয়েটা ভেসে যাবে।' বলিয়া করুণ নিশ্বাস ফেলিল।

সন্দেহ হইল প্রেত বুঝি ঘটকালি করিতেছে। মনকে দৃঢ় করিয়া বলিলাম, 'দেখুন, আমি আগেই বলেছি বিয়ে করবার মত অবস্থা আমার নয়। আপনি ও অনুরোধ করবেন না।'

প্রেত তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, ও অনুরোধ করছি না। আমি বলছিলাম, আপনি যদি দয়া করে মোহরগুলো গোপীদুলালের কাছে পৌঁছে দেন তাহলে সে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মরতে পারে।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'মোহরের ঘটি কি এখনও নিমতলায় পোঁতা আছে নাকি?'

প্রেত বলিল, 'হ্যাঁ। মরার আগে কাউকে বলে যেতে পারলাম না; যেমন পুঁতেছিলাম তেমনি পোঁতা আছে। তাই তো নিমগাছ ছাড়তে পারি না।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। আশ্চর্য এই যে, ভূতের কথায় তিলমাত্র অবিশ্বাস জন্মিল না। একশত আকব্বরী মোহর! আকব্বরী মোহরের দাম কত জানি না; কিন্তু বর্তমান কালে একশত মোহরের দাম দশ হাজার টাকার কম হইবে না।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, 'এত সোনা! এর দাম যে অনেক।'

ভূত বলিল, 'সেইজন্যেই তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে। এক আপনি ভরসা।'

চমকিয়া উঠিলাম, 'আমি! আমি কি করব?'

ভূত মিনতির স্বরে বলিল, 'ঘটিটা খুঁড়ে বার করতে হবে। বেশী খুঁড়তে হবে না, হাত খানেক খুঁড়লেই পাওয়া যাবে—'

'কিন্তু খুঁড়বে কে? আমি?'

ভূতের চক্ষু নীরবে অনুনয় জানাইল। আমি চটিয়া বলিলাম, 'বেশ ভূত তো আপনি! ও বাগান এখন নিকুঞ্জ পালের দখলে, সে আমাকে খুঁড়তে দেবে কেন? আর আমিই বা তাকে বলব কি? বলব, মশায়, আপনার বাগানে মোহর পোঁতা আছে তাই খুঁড়তে এসেছি?'

ভূত বলিল, 'না না, আপনি দিনের বেলা যাবেন কেন? দুপুর রাত্রে চুপি চুপি পাঁচিল

banglabooks.in

ডিঙিয়ে—নিমগাছটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে, বাগানের এক কোণে—রাত্রে বাগানে কেউ থাকবে না—'

আমি বিড়ি ধরাইবার উপক্রম করিয়া বলিলাম, 'মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না। রাত্রিবেলা পরের বাগানে যদি ধরা পড়ি, ঠ্যাংয়ে দড়ি পড়বে। নিকুঞ্জ পাল এমনিতেই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। আমি পারব না।'

দেশলাই জ্বালিলাম।

তারপর কয়রাত্রি উপর্যুপরি ভূতের সঙ্গে ঝুলোঝুলি চলিল। আমি অটল, ভূতও নাছোড়বান্দা। আমি যত বলি—'পারব না', ভূত ততই বলে—'দয়া করুন'! যে-রাত্রির দৃশ্য লইয়া আরম্ভ করিয়াছি, তাহার পরও কয়েক রাত্রি কাটিয়া গেল। হঠাৎ দেশলাই জ্বালিয়া ভূতকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভূতের এখন দেশলাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসে এবং কাতর কণ্ঠে বলে, 'দয়া করুন। সদ্‌বংশের মেয়ে, নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। রাত্রে ঘুম নাই; সারারাত্রি ভূতের সঙ্গে তর্ক করিতেছি। উপন্যাস লেখা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন মরীয়া হইয়া বলিলাম, 'বেশ, রাজী আছি। কিন্তু আমাকেও মোহরের ভাগ দিতে হবে।'

ভূত মুচ্ছুদ্দি; সে ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া বলিল, 'বেশ, আপনি পাঁচ পারসেন্ট দালালি পাবেন। পাঁচখানা মোহর আপনার।'

অতঃপর আর 'না' বলিবার উপায় রহিল না। পাঁচখানা মোহর, মানে পাঁচশত টাকা। পাঁচশত টাকার জন্য অতি বড় দুঃসাহসিক কাজ করিবেন না এমন সাহিত্যিক কয়জন আছেন? আমার দুঃখ এই যে বাকি পঁচানব্বইটি মোহর হজম করিতে পারিব না। পেটের দায়ে কুৎসিত উপন্যাস লিখি বটে, কিন্তু চুরি করিতে পারিব না। তাছাড়া, চুরি করিয়া যাইব কোথায়, নন্দদুলাল মুচ্ছুদ্দির হাত এড়াইব কি করিয়া?

রাত্রি আড়াইটার সময় প্রেতের অনুগামী হইয়া বাহির হইলাম। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ ছিল, তাহারই আলোয় পাঁচিল টপকাইয়া নিকুঞ্জ পালের বাগানে ঢুকিলাম। ভূত দেখিয়া যাহা হয় নাই তাহাই হইল, বুকের ভিতর দুম্‌দাম্ শব্দ হইতে লাগিল।

ভূত দেখাইয়া দিল, এক স্থানে কয়েকটা কোদাল শাবল খন্তা পড়িয়া আছে। একটা খন্তা তুলিয়া লইলাম। ভূত পথ দেখাইয়া নিমগাছ-তলায় লইয়া গেল। নিমগাছ-তলায় একটা স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভূত কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তদারক করিতে লাগিল, আমি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিকে নিশুতি, কোথাও সাড়াশব্দ নাই; মনে হইল আমিও মানুষ নই, কোন্ স্বপ্নসংকুল সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটি লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটির গায়ে সবুজ রঙের কলঙ্ক, কিন্তু ভিতরে একশত নিষ্কলঙ্ক আকব্বরী মোহর ঝক্‌মক্ করিতেছে।

ভূত আত্মাভিমানসূচক একটা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, 'কি বলেছিলাম!'

আমার গায়ে তখন কালঘাম ঝরিতেছে। ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমি একটা বিড়ি ধরাইলাম। ভূতকে বেশী আস্কারা দেওয়া ভাল নয়।

পরদিন সকালবেলা আবার ঘটি খুলিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, সত্যই একশত মোহর। তাহার মধ্য হইতে পাঁচটি সরাইয়া রাখিয়া পঁচানব্বইটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইলাম। আর দেরি নয়। সোনার মোহ বড় মোহ; বেশীক্ষণ কাছে রাখিলে হয়তো লোভ সামলাইতে পারিব না।

বেনে পাড়ার একপ্রান্তে গোপীদুলালের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। নোনাধরা চটা-ওঠা বাড়ি; তাহার সম্মুখে ঝাঁকড়া-চুলো একটি ছোকরা শিস্ দিতে দিতে পায়চারি করিতেছে। আমি দ্বারের কড়া নাড়িতেই ছোকরা আমার পানে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়িল।

একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; তারপর অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া একটু

banglabooks.in

ভিতর দিকে সরিয়া গিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইল, স্খলিত স্বরে বলিল, 'কাকে চান? বাবা বাড়ি নেই।'

বুঝিলাম গোপীদুলালের আইবুড় মেয়ে। গায়ের রঙ ফরসা, মুখখানি নরম ও সুশ্রী। সর্বাঙ্গে ভরা যৌবন। কিন্তু চোখেমুখে আতঙ্ক, যেন নিজের যৌবনের ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত-চকিত হইয়া আছে। পরিধানে বোধ করি বাপের একখানা অর্ধমলিন ধুতি; গায়ে ব্লাউজের অভাব ঢাকা দিবার জন্য আঁচলটা বুকের উপর দুইফের করিয়া জড়ানো।

আমার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিলাম, 'এটা কি গোপীদুলালবাবুর বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি বাড়ি নেই? কখন ফিরবেন?'

'হাসপাতালে গেছেন। ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে।'

'ও—' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার ছিল। আমি ওবেলা আবার আসব। তাঁকে বলে দিও।'

মেয়েটি চকিতে চোখ তুলিল!

'আচ্ছা।'

আমার খোলার ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটার পর একটা বিড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়া উঠিল; দুই বাণ্ডিল বিড়ি নিঃশেষ হইয়া গেল। ভয়-চকিত যৌবন, দুঃসহ অসহায় যৌবন, আপনার মাংস হরিণীর বৈরী—

ভূতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু ভূত দিনের বেলা আসে না।

অপরাহ্ণে আবার গেলাম। এবার দালালির মোহর পাঁচটিও লইয়া গেলাম। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল, 'বাবার শরীর বড় খারাপ, দেখা করতে পারবেন না। কী দরকার আপনার?' তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নাম কি?'

ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ তুলিয়া হ্রস্বকণ্ঠে সে বলিল, 'কমলা।'

আমি বলিলাম, 'কমলা, তোমার বাবাকে বল, আমার কাছে তাঁর কিছু টাকা পাওনা আছে, তাই দিতে এসেছি।'

দ্বারের ছায়ান্ধকার হইতে সে বিহ্বল চক্ষে আমার পানে চাহিল, তারপর ছায়ার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আসুন।'

গোপীদুলালবাবু বিছানায় অর্ধোপবিষ্ট হইয়া হাঁপাইতেছিলেন। অকালবৃদ্ধ জীর্ণ মানুষ, চোখে উৎকণ্ঠা-ভরা ক্লান্তি। আমি পাশে বসিলে বলিলেন, 'আপনাকে—? টাকা পাওনা আছে মনে পড়ে না তো।'

আমি বলিলাম, 'টাকার কথা পরে বলব। এখন আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি আপনার স্বজাতি, ভদ্রসন্তান। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

গোপীদুলাল দিশাহারা হইয়া গেলেন। আমি বিস্তারিতভাবে নিজের পরিচয় দিলাম; তাঁহার হাঁপানি যেন আরও বাড়িয়া গেল। শেষে বলিলেন, 'কমলার বিয়ে দিতে পারব এ আমার আশার অতীত। আমার তো পয়সা নেই।'

'আছে বৈকি! এই যে—' বলিয়া আমি পুঁটুলি খুলিয়া একশত মোহর তাঁহার সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম।

কমলাকে বিবাহ করিয়াছি। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু টিকিলেন না, বিবাহের পরদিনই মারা গেলেন। আকস্মিক ভাগ্যোন্নতি তাঁহার সহ্য হইল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদের ঋণ শোধ করিয়াছি; পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছি। উপন্যাসখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। এবার একখানা রোমান্স-

banglabooks.in

ভরা ভদ্র উপন্যাস ধরিব; যাহা পড়িয়া কমলা লজ্জা পাইবে না।

নন্দদুলালের সহিত আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, 'কেমন, খুশি হয়েছেন তো?'

নির্লজ্জ প্রেত চোখ টিপিয়া মুচকি হাসিয়াছিল। 'দালালি একটু বেশী নিয়েছ' বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

ভূতের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ এখন বেশ উজ্জ্বল।

১৬ বৈশাখ ১৩৫৭

নিরুত্তর

উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে আমি কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। গঙ্গার তীরে শহর। বাঙালী দুচার ঘর আছেন। আমার কিন্তু কেবল একটি বাঙালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাঁহার নাম নৃসিংহ পাল। আমার বাসার পাশেই ছোট একটি বাড়িতে বাস করিতেন।

নৃসিংহবাবুর মত এমন কদাকার চেহারা খুব কম দেখা যায়। গোরিলার মত পাশবিক একখানা মুখ, ছোট ছোট ক্রূর চক্ষু; মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, তবু শোরকুচির মত খাড়া হইয়া আছে। বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর অসুরের মত নিরেট। প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখি, আমার হৃৎপিণ্ড সত্রাসে লাফাইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার চেহারার জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, বেশী লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা ছিল না। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবার গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তা ছাড়া আর বাড়ির বাহির হইতেন না। তাঁহার বাড়িতে অন্য কাহাকেও আসিতে দেখি নাই। কেবল খোঁড়া মানিক নামক এক ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকিয়া মাঝে মাঝে আসিত।

আমি নিজের পড়াশুনা লইয়া থাকিতাম, নৃসিংহবাবুর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যাই নাই। তাঁহার চেহারা যদি তাঁহার চরিত্রের দর্পণ হয় তবে পরিচয় না হওয়াই ভাল। কিন্তু তিনি একদিন নিজে আসিয়া আলাপ করিলেন। আমার চাকর পালাইয়াছিল; আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, চাকর পালাইলে যদি এমন হাড়ির হাল হয় তবে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া কী লাভ হইল, এমন সময় নৃসিংহবাবু আসিয়া বলিলেন, 'চাকর পালিয়েছে! কিছু ভাববেন না, কালই নতুন চাকর জোগাড় করে দেব। আজ আমার চাকর এসে আপনার সব কাজ করে দিয়ে যাবে।'

নৃসিংহবাবুর কণ্ঠস্বর অতি ভরাট এবং মধুর; শানাই বাঁশীর খাদের পর্দার মত। চেহারার সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না।

অতঃপর তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন অথচ পূজার্চনা কিছুই করেন না, ধর্মের প্রসঙ্গও কখনও উত্থাপন করেন না, দেখিয়া শুনিয়া বড় আশ্চর্য

banglabooks.in

মনে হইত। তাঁহার চেহারা ক্রমশ সহ্য হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চরিত্র ভাল কি মন্দ তাহা নিঃসংশয়ভাবে ধরিতে পারিতেছিলাম না। হয়তো লুকাইয়া মদ খান, অন্য দোষও আছে; কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কখনও কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না এবং কাহারও কষ্ট দেখিলে সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেহ ছিল না, একাকী বাস করিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ভ্রমণে বাহির হইয়া বাসা হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। শীতের সন্ধ্যা, রাস্তায় লোকজন নাই; এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে তিন-চারিটা রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কোন্ রাস্তা ধরিলে বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারিব ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না, এমন সময় দেখিলাম নৃসিংহবাবু গঙ্গা-স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার পা খালি, গায়ে একটা আলোয়ান, হাতে গামছ-জড়ানো ভিজা কাপড়।

দুজনে পাশাপাশি ফিরিয়া চলিলাম। এদিকটায় পূর্বে আসি নাই, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গঙ্গার ঘাট এখান থেকে কতদূর?'

'মাইলখানেক।'

'রোজ দু'বেলা এখানে আসেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'কাছাকাছি অন্য ঘাট আছে, সেখানে যান না কেন?'

তিনি বলিলেন, 'এটা শ্মশান ঘাট। এখানে আসি।'

হঠাৎ মনে হইল, কাপালিক নাকি? কিন্তু কই, রুদ্রাক্ষের মালা, সিঁদুরের ফোঁটা, এসব তো কিছু নাই!

খানিকক্ষণ নীরবে চলিলাম। বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তার উপর পথের পাশে বড় বড় গাছ। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে, কিন্তু রাত্রির তিমির হরণ করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়।

লক্ষ্য করিলাম, নৃসিংহবাবু পথ চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে তাকাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দেখছেন?'

'দেখুন তো পেছনে কেউ আসছে কিনা!'

হঠাৎ গা ছমছম করিয়া উঠিল। পশ্চাতে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, 'কই না!'

'কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি?'

'না। কি ব্যাপার?'

'কিছু না। মাস কয়েক আগে এই জায়গায় দুটো শ্মশানের কুকুর একটা মুসলমান গুণ্ডার টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।'

মিনিট দশেক পরে লোকালয়ের এলাকায় আসিয়া পড়িলাম, আরও পাঁচ মিনিট পরে নিজের পাড়ায় পৌঁছিলাম। নৃসিংহবাবুর বাড়ি আগে; তিনি বলিলেন, 'আসুন, চা খেয়ে যান।'

তাঁহার সদর ঘরে চৌকির উপর জাজিম পাতা। দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া গরম চা পান করিতেছি। আমার মনে নৃসিংহবাবু সম্বন্ধে আজ আবার নূতন করিয়া নানা প্রশ্ন জাগিতেছে: লোকটি কেমন? বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য কতখানি? এতদিনের আলাপেও আসল মানুষটাকে চিনিতে পারিতেছি না কেন?

নৃসিংহবাবু হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসির আওয়াজ যেমন বংশী-মধুর, হাসিসঙ্গে তাঁহার মুখের ভাব হয় তেমনি দংষ্ট্রা-করাল। হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি একটা ভয়ঙ্কর পাজি লোক।'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, 'না না, সে কি কথা—'

তিনি সহজ সুরে বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন! সত্যিই আমি ভয়ানক পাজি লোক।

banglabooks.in

অন্ততঃ বছর তিনেক আগে পর্যন্ত তাই ছিলাম। এখন মনটা বোধহয় কিছু বদলেছে; কিন্তু চেহারা বদলায়নি, যা ছিল তাই রয়ে গেছে।'

নৃসিংহবাবু নির্বিকার চিত্তেই কথাগুলি বলিলেন, আমি কিন্তু বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলিয়া লজ্জা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন, 'পরমা প্রকৃতি আমার সর্বাঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের ছাপ মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বেইমানি করিনি। এমন দুষ্কর্ম নেই যা করিনি, জগাই-মাধাই আমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। এইভাবেই জীবন কেটে যাচ্ছিল, তারপর একদিন একটা সামান্য ঘটনা ঘটল, তার ফলে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ভাববেন না যে মনের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল কিংবা রাতারাতি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে পড়লাম। দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি বেশী, আসলে বদলেছে এই জলজ্যান্ত পৃথিবীটা। শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই কথাই আজ আপনাকে বলব।'

'বলুন।'

এই সময় একটু বাধা পড়িল। বাহিরের দ্বার ভেজানো ছিল, তাহা কাহারও লঘু করস্পর্শে খুলিয়া গেল এবং একটি মানুষের মুখ ভিতরে উঁকি মারিল। পশমের টুপি ঢাকা মুখখানি অস্থিসার এবং ছুঁচলো, চক্ষু দু'টি ভীরু ধূর্তামিতে ভরা। আমাকে দেখিয়াই মুখটি বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যেন একটা পথের কুকুর খাদ্যের লোভে রান্নাঘরে উঁকি মারিয়াছিল, ভিতরে লোক আছে দেখিয়া পলায়ন করিল।

আমি চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও কে?'

নৃসিংহবাবু হাসিলেন, 'ভূত-প্রেত নয়, মানুষ। ওর নাম খোঁড়া মানিক। ও একটা নিশাচর জীব। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে।'

'কিন্তু পালালো কেন?'

'আপনাকে দেখে পালালো। ও আমার কাছে আসে লুকিয়ে। শহরে একজন বড়লোক আছে, নাম রামনেহাল সিং; খোঁড়া মানিক তার মোসায়েব। রামনেহাল যদি জানতে পারে খোঁড়া মানিক আমার কাছে আসে, ওকে বেমালুম কেটে ফেলবে।—ওকথা যাক, গল্পটি বলি শুনুন।'

নৃসিংহবাবু সদর দরজায় খিল দিয়া আসিয়া বসিলেন।—

আমি পুলিশের দারোগা ছিলাম। রাইটার কনস্টেবল হয়ে ঢুকি, বড় দারোগা পর্যন্ত উঠেছিলাম। আরও উঠতে পারতাম, ইচ্ছে করে উঠিনি। ওপরে তেমন মজা নেই।

আমার মত দুর্দান্ত দারোগা পুলিশে আর ছিল না, এখনও বোধহয় নেই। যেমন কুচুটে বুদ্ধি তেমনি আইন বাঁচিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা। যাকে একবার ধরতাম, পিত্তি বার করে ছেড়ে দিতাম। চোর ছ্যাঁচড় দুষ্ট বজ্জাত লোক আমাকে যত ভয় করত, ভদ্রলোকেরা তার চেয়ে বেশী ভয় করত। যখন যে মহকুমায় বদলি হয়ে যেতাম সেখানে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠত। বড়লোকেরা গায়ে পড়ে টাকা খাইয়ে যেত, যেন তাদের পেছনে না লাগি।

এইভাবে মনের সুখে আছি। বিয়ে করিনি; আমার মত যাদের মনের ভাব তাদের বিয়ে করা বোকামি। মাইনে পাই সামান্যই কিন্তু উপরি আসে ছাপ্পর ফুঁড়ে। এখনও সেই টাকাই খাচ্ছি, আরও বিশ বছর যদি বেঁচে থাকি সে টাকা ফুরোবে না।

বাইরে বাঘের দাপট, ভেতরে মদ মাংস পঞ্চমকার। যা চাই সব পেয়েছি; মনের ফুর্তিতে আছি।

বছর আষ্টেক আগে এই শহরে বদলি হয়ে আসি, বড় থানার বড় দারোগা। শাঁসালো শহর, পয়সাওয়ালা লোক অনেক আছে। সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। চুপি চুপি ভেট আসতে লাগল; যাদের পেটে ময়লা যত বেশী তারা ঠাকুরের মন্দিরে তত বেশী পুজো পাঠালো। কেবল একজন পাঠালো না, সে ঐ রামনেহাল সিং। রামনেহাল সিংএর জমিদারী

banglabooks.in

আছে, সুদের কারবারও করে, অঢেল টাকা। সে তেউড়ে বসে রইল, কিছু দিলে না।

মাসখানেক পরে একটা মামুলি কাজের অছিলায় তার বাড়িতে গেলাম। ইশারায় জানালাম, টাকা চাই। সে স্পষ্ট মুখের ওপর বললে, 'তোমার মত দারোগা ঢের দেখেছি। যা পারো করো গিয়ে, এস পি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।'

মনে মনে বারুদ হয়ে ফিরে এলাম। দাঁড়াও যাদু, তোমাকে দেখাচ্ছি এস পি বড় না নর্সিং দারোগা বড়।

জাল বুনতে আরম্ভ করলাম। এই সব জমিদারদের আইনের ফাঁদে ফেলা শক্ত নয়, ছোটোখাটো মামলায় সহজেই ফেলা যায়। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, রামনেহাল সিংকে এমন মার দেব যে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। একেবারে শিরদাঁড়া ভেঙে দেব।

খোঁড়া মানিক—যাকে এখনি দেখলেন—সে তখনও রামনেহালের মোসায়েব ছিল, রামনেহালের যত নোংরা কাজ সে-ই করত। তাকে একদিন ধরে ফেললাম। থানায় ডাকলাম না, বাড়িতে ডেকে এনে বললাম সে যে-সব কাজ করেছে, তার জন্যে তাকে পাঁচ দফায় দশ বছর জেলে পাঠাতে পারি। খোঁড়া মানিক পা জড়িয়ে ধরল।

সেই থেকে খোঁড়া মানিক হল আমার গোয়েন্দা, গুপ্তচর। লুকিয়ে রাত্তিরে এসে আমাকে রামনেহালের হাঁড়ির খবর দিয়ে যেত। ওর মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে-ভয় ওর এখনও যায়নি। আমার এখন চাকরি নেই, কোনও ক্ষমতা নেই; কিন্তু ওর বিশ্বাস ইচ্ছে করলেই আমি ওকে জেলে পাঠাতে পারি। তাই মাঝে মাঝে আসে, খবর নিয়ে যায়।

সে যাক। দেড় বছর ধরে ধীরে ধীরে একটি মোকদ্দমা খাড়া করলাম। মোকদ্দমা নয়, একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম। রামনেহালের ছেলের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। সে বাজারের এক বেশ্যাকে খুন করেছে। সাক্ষী-সাবুদ দলিল-দস্তাবেজ একেবারে নিরেট, কোথাও বেরুবার পথ নেই।

রামনেহালের ছেলের চৌদ্দ বছর ম্যাদ হয়ে গেল। এস পি বাঁচাতে পারলেন না। কেবল কম বয়স বলে ফাঁসি হল না। সে ছেলে এখনও জেলে পচছে।

এই একটা নমুনা থেকে বুঝতে পারবেন আমি কি ধরনের লোক। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল, আমার কাজ থেকে অবসর নেবার সময় হল। অনেক টাকা করেছি, কাজ করবার দরকার নেই। এক্সটেনশন নিতে পারতাম কিন্তু নিলাম না।

এই ছোট্ট বাড়িখানা কিনেছিলাম। কাজ চুকিয়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসলাম। মনে গর্বভরা আনন্দ। যা চেয়েছি তা পেয়েছি, কারুর কাছে হার মানিনি। আর কি চাই!

সেদিন সন্ধ্যার পর এই ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসেছি; সারা রাত্রি একাই উৎসব চলবে। টোটা-ভরা পিস্তলটা হাতের কাছে আছে। শত্রু অনেক, কাজ ছেড়ে দিয়েছি বলে যদি কেউ দাদ তুলতে আসে তাকে দেখে নেব।

মশগুল হয়ে মদ খাচ্ছি। সময়ের হিসেব নেই। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি একটা বিকট চেহারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা সিড়িঙ্গে এক সন্নিসি; মাথায় জটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সারা গায়ে ছাই মাখা।

আমি অভ্যাসের বশেই খপ্ করে পিস্তলটা তুলে নিয়েছি, সন্নিসি ধমক দিয়ে উঠল—'বন্দুক রাখ্।'

কী গলার আওয়াজ, যেন তোপ দাগলো। বললে বিশ্বাস করবেন না, পিস্তল আমার হাত থেকে খসে পড়ল, আমি ভেড়ার মত তাকিয়ে রইলাম।

সন্নিসি তখন বললে, 'তোর সময় হয়েছে। রোজ দুবেলা গঙ্গাস্নান করবি। আর মা'র নাম করবি। মদ খাবি না, আর বুধবারে দাড়ি কামাবি না।'

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মদের নেশা তো ছিলই, তার ওপর—বুধবারে দাড়ি কামাব না! অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম, হাসতে হাসতে বেদম হয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, ঘরের দোর তাড়া তো বন্ধ ছিল, সন্নিসি ঢুকল কি করে? হাসি থামিয়ে

banglabooks.in

চেয়ে দেখি সন্নিসি নেই, চলে গেছে। কিন্তু দোর তাড়া ঠিক আগের মতই বন্ধ আছে।

তাই বলছিলাম আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি, বদলেছে এই পৃথিবীটা। যতসব অসম্ভব গাঁজাখুরি ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছে। যা ঘটতে পারে না, ঘটা উচিত নয়, তাই ঘটছে।

সে-রাত্রে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে সদর দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম কেউ আমার সঙ্গে বজ্জাতি করছে। তখনও মদের নেশা ভাল কাটেনি, সন্নিসির কথাও মনে নেই; আমি পিস্তল নিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে হঠাৎ দরজা খুললাম। দেখলাম দোরের কাছে কেউ নেই, কিন্তু একটা লোক রাস্তা দিয়ে হন্‌হন্‌ করে দূরে চলে যাচ্ছে।

আমার রোখ চড়ে গেল, আমি তাকে ধরবার জন্যে বার হলাম। পায়ে জুতো নেই, হাতে পিস্তল, আমি লোকটার পেছনে চললাম। ভোরের ঘোর-ঘোর আলোয় ভাল দেখা যাচ্ছে না, আমি যত জোরে চলি, সেও তত জোরে চলে; আমি দৌড়তে লাগলাম, সেও দৌড়তে শুরু করল।

তারপর অনেকদূরে দৌড়বার পর তাকে আর দেখতে পেলুম না। এতক্ষণ কোথায় যাচ্ছি তার হিসেব ছিল না, এখন চমক ভেঙে দেখি শ্মশানঘাটের কাছে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছি।

শ্মশানঘাট তখন শূন্য। সেখানে একা দাঁড়িয়ে সন্নিসির কথা মনে পড়ে গেল। সন্নিসি বলেছিল, দু'বেলা গঙ্গাস্নান করবি। তখন গরম কাল, এতখানি পথ দৌড়ে আমার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। ভাবলাম, মন্দ কি, স্নান করেই যাই।

গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরলাম।

সে দিনটা ছিল বুধবার, কিন্তু আমার তা মনে ছিল না। বেলা আটটার সময় দাড়ি কামাতে বসলাম। আমি নিজে দাড়ি কামাই, নাপিতকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ক্ষুর চালাতে গিয়ে খ্যাঁচ্‌ করে কেটে ফেললাম নিজের গাল। দর্‌দর্‌ করে রক্ত ঝরতে লাগল। তখন মনে পড়ল, আজ বুধবার; সন্নিসি বলেছিল বুধবারে দাড়ি কামাবি না।

দুত্তোর! দাড়ি না হয় একদিন না কামালাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। একটা ভিখিরি এসে আমাকে গুণ করে গেল! না, কিছুতেই না। আমি নসিং দারোগা, আমার ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়, একটা সন্নিসি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে! দেখব কেমন সন্নিসি।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সন্ধ্যের পর একটি আস্ত ব্রান্ডির বোতল নিয়ে বসতে যাব, বোতলটা হাত থেকে পিছলে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বাড়িতে আর মদ নেই, কিন্তু আমিও হার মানব না। ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে তখনি চললাম মদের দোকানে।

মদের দোকান বন্ধ। আর একটা দোকানে গেলাম, সেটাও বন্ধ। শুঁড়িরা নাকি ধর্মঘট করেছে।

গাড়িতে ফিরে এসে বসতেই গাড়োয়ান প্রশ্ন করল—'হুজুর, এবার কোথায় যাব?' উত্তর দিলাম—'চুলোয়।'

গাড়ি চলল। আমি বসে বসে রাগে ফুলতে লাগলাম। তারপর গাড়ি যখন থামল, দেখলাম শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়েছি।

স্নান করে বাড়ি ফিরলাম।

এইরকম কয়েকদিন চলল—আমার নিজের ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই; আমাকে দু'বেলা গঙ্গাস্নান করতে হবে, মদ খেতে পাব না, বুধবারে দাড়ি কামাতে পাব না। আমি স্বাধীন মানুষ নই, কেনা গোলাম; আমার অজানা মালিক আমার ঘাড় ধরে আমার মুখটা রাস্তায় ঘষে দিচ্ছে।

একদিন উত্ত্যক্ত হয়ে নিজের মনে বললাম, মা, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই, বুজরুকি মানি না। কিন্তু সন্নিসির হুকুম মানলে যদি আর গণ্ডগোল না হয় তবে তাই সই। আর মদ খাব না, দু'বেলা গঙ্গাস্নান করব, বুধবারে দাড়ি কামাব না। এতে যদি কারুর লাভ হয় তো হোক।

banglabooks.in

দু'বেলা গঙ্গাস্নান করা ক্রমে অভ্যেস হয়ে গেল, বুধবারে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মদ ছাড়া অত সহজ নয়। আরও দু'চার বার মার খেতে হল। যতবারই মদ খেতে যাই একটা না একটা বিপত্তি এসে পড়ে। একবার গেলাসে মদ ঢেলেছি, ছাদ থেকে গেলাসের মধ্যে টিকটিকি পড়ল। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। কিছুদিনের জন্যে মনে হল দুনিয়াটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

যা হোক, নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটছে। মা'র নাম করি; মানে, যখনই মনে পড়ে, মা'কে বাপ তুলে গালাগালি দিই। মা কে তা জানি না, কেন আমার পেছনে লেগেছে তাও জানি না, কিন্তু চুটিয়ে মা'কে বাপান্ত করি। মা'র বোধহয় ভাল লাগে, কারণ যতই গালাগালি দিই, আমার কোনও অনিষ্ট হয় না।

একদিন সন্ধ্যের পর খোঁড়া মানিক এল। বললে, 'নৃসিংবাবু, আপনি এ শহর ছেড়ে চলে যান। রামনেহাল সিং আপনাকে খুন করবার জন্যে গুণ্ডা লাগিয়েছে। এখানে থাকলে আপনার প্রাণ যাবে।'

রামনেহাল গুণ্ডা লাগিয়েছে। আশ্চর্য নয়। আমি তার মুখে চুনকালি দিয়েছি, তার ছেলেকে জেলে পাঠিয়েছি, সে শোধ তুলতে চায়। কিন্তু আমি নৃসিং পাল, রামনেহালের ভয়ে পালিয়ে যাব? আমি চিরকাল গুণ্ডা চরিয়ে বেড়িয়েছি, আমাকে গুণ্ডার ভয় দেখাবে! কুচ পরোয়া নেই, আসুক গুণ্ডা। দেখে নেব।

তবু সাবধান হলাম। বাইরে যখন বেরুই পিস্তল নিয়ে বেরুই, রাত্রে শোবার সময় পিস্তল বালিশের পাশে থাকে। দুপুর রাত্রে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কেউ আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না, মনে হয় সব ধাপ্পা! আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

দিন আষ্টেক পরে মানিক আবার এল। একগাল হেসে বললে, 'ধন্য আপনি, এত বুদ্ধিও ধরেন! রামনেহাল মুষড়ে পড়েছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি!'

খোঁড়া মানিক বলল, 'বাঘের মত এক জোড়া কুকুর পুষেছেন আপনি, তারা সমস্ত রাত বাড়ি পাহারা দেয়। তিনবার গুণ্ডারা এসেছিল, কুকুর দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি তারা রামনেহালকে বলছে, কুকুর নয় হুজুর, সাক্ষাৎ দুটো যমদূত।'

খোঁড়া মানিককে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে ভারি ধোঁকা লাগল। কুকুর এল কোত্থেকে? তারপর সারা রাত্রি জেগে পাহারা দিয়েছি, কখনও একটা নেড়ি কুত্তাও দেখতে পাইনি।

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। গুণ্ডারা কুকুর দেখেছে, আমি দেখতে পাই না কেন? ভাবলাম, গুণ্ডারা আমাকে তো চেনে, আমার বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায়নি, নেহালকে গল্প বানিয়ে বলেছে।

তারপর বেশ কিছুদিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আমি অদৃশ্য কুকুরের পাহারায় নিরাপদে আছি। ভয় কেটে গেল। গঙ্গাস্নানে যাই তাও পিস্তল নিয়ে যাই না। সেই সন্নিসির আর দেখা পাইনি, মনে ধর্মভাবও জাগেনি। কিন্তু নিজের মনে মা মা করি। বলি, 'মা, তুই কে? আমাকে বুঝিয়ে দে। আমার দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে পারছি না। তুই বুঝিয়ে দে।'

মা বুঝিয়ে দেন না। সর্বনাশী আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

ছ'মাস আগের কথা বলছি। খোঁড়া মানিক এল; তার মুখ শুকনো। বললে, 'আপনি নাকি সকাল সন্ধ্যে শ্মশানঘাটে নাইতে যান?'

বললাম, 'হ্যাঁ যাই।'

খোঁড়া মানিক বললে, 'ওরা জানতে পেরেছে।—হিন্দু গুণ্ডারা আপনাকে মারতে রাজী হয়নি, বলেছে আপনি নাকি কাপালিক, শ্মশানে শবসাধনা করেন। তাই রামনেহাল মুসলমান গুণ্ডা লাগিয়েছে। নাম জানেন বোধ হয়, রহিম আর করিম দুই ভাই। তারা শ্মশানের রাস্তায় আপনাকে ছুরি মারবে।'

banglabooks.in

খোঁড়া মানিক চলে যাবার পর ভাবতে বসলাম। কি করা যায়! গঙ্গাস্নান বন্ধ করা যাবে না, কারণ জানি, নিজের ইচ্ছায় না গেলে ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে। এক, পিস্তল নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কেন জানি না, পিস্তল নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতে আর ইচ্ছে হল না। দূর হোক গে, যা হবার হবে। আমার ইচ্ছেয় তো কিছুই হচ্ছে না, তবে মিছে ভেবে মরি কেন?

দু'চার দিন কিছু হল না। স্নান করতে যাই, ফিরে আসি। আমার পেছনে গুণ্ডা লেগেছে তা প্রায় ভুলেই গেলাম! তারপর একদিন—

সন্ধ্যের পর শ্মশানের দিকটা কি রকম নির্জন হয়ে যায় দেখছেন তো। ওদিকে ঘর-বাড়িও নেই, লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমি স্নান করে ফিরছি; রাত আন্দাজ আটটা। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ পিছনে একটা বিকট চীৎকার শুনে আঁতকে উঠলাম। মানুষের গলার মর্মান্তিক চীৎকার, সেই সঙ্গে কুকুরের গম্ভীর ডাক। যেন একটা ডালকুত্তা একটা মানুষের গলা কামড়ে ধরে তার চীৎকার বন্ধ করে দিলে।

আমি আর দাঁড়ালাম না, টেনে ছুট মারলাম।

পরদিন সকালবেলা খবর পাওয়া গেল, শ্মশানঘাটের রাস্তায় রহিম গুণ্ডার লাশ পাওয়া গেছে। তাকে শ্মশানের কুকুর নাকি টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছে। রহিমের হাতে একটি বর্শা ছিল, তবু সে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

রাত্তিরে খোঁড়া মানিক এল। রহিমের ভাই করিম রামনেহালকে যা বলেছে, তার কাছে শুনলাম। ওরা দু'ভাই ক'দিন ধরে আমার জন্যে ওত পেতে ছিল, রোজই দেখত এক জোড়া কালো কুকুর আমার পেছনে থাকে। কাল রহিম আর করিম রাস্তার ধারেই একটা গাছে উঠে বসে ছিল, মতলব করেছিল যেই আমি গাছতলা দিয়ে যাব অমনি বর্শা ছুঁড়ে আমায় মারবে; কুকুর তাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু বর্শা ছুঁড়তে গিয়ে রহিম নিজেই পা ফস্‌কে নীচে পড়ে গেল, আর একটা কুকুর এসে ধরল তার টুঁটি—

এই পর্যন্ত বলিয়া নৃসিংহবাবু নীরব হইলেন। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, 'এই আমার গল্প। রামনেহাল আর আমাকে ঘাঁটায়নি। সেই থেকে নির্ভয়ে আছি।

'এখন আপনি বলুন—এ সব কী? অলৌকিক বললে চলবে না, কেন অলৌকিক তা বলতে হবে। সন্ন্যাসি বলেছিল, আমার সময় হয়েছে। কিন্তু কি করে সময় হল? শুনেছি যাঁরা সাধুসজ্জন যোগী তপস্বী, ভগবান তাঁদের দয়া করেন, বিপদে রক্ষা করেন। কিন্তু এ কি! জীবনে আমি একটা ভাল কাজ করিনি, মন্দ কাজ এত করেছি যে তার সীমাসংখ্যা হয় না; তবে বেছে বেছে আমাকে দয়া করবার মানে কি? জোর করে আমাকে মদ ছাড়ানো, গঙ্গাস্নান করানো, আমাকে শত্রুর প্রতিহিংসা থেকে আগলে রাখা, এসব কেন? আপনি বিদ্বান লোক, এর উত্তর দিন। কেন? কেন? কেন?'

নৃসিংহবাবু কদাকার মুখে তীব্র জিজ্ঞাসা ভরিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, হয়তো তাঁহার এই তীব্র ব্যাকুল জিজ্ঞাসাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর।

১১ই শ্রাবণ ১৩৫৯

banglabooks.in

দেখা হবে

ভূপতির স্ত্রী স্মৃতিকণার মৃত্যুকালে আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। কেবল ডাক্তার বলিয়া নয়, ভূপতি আমার বন্ধু।

স্মৃতিকে কঠিন রোগে ধরিয়াছিল। আমি নিজের হাতে চিকিৎসার ভার রাখি নাই, কলিকাতার সব বড় বড় ডাক্তারই তাহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

মৃত্যুর রাত্রে শয্যাপার্শ্বে কেবল আমি আর ভূপতি ছিলাম। তেতলার প্রকাণ্ড শয়ন-কক্ষে দুইটি বড় বড় বৈদ্যুতিক গোলক জ্বলিতেছিল। ঘরের মাঝখানে একটি পালঙ্কের উপর শুইয়া স্মৃতি; ভূপতি আর আমি শয্যার দুই পাশে বসিয়া রোগিণীর মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

স্মৃতির গলা পর্যন্ত সিল্কের চাদর দিয়া ঢাকা, মুখখানি শুধু খোলা। মুখ দেখিয়া মনে হয় না, গত তিন মাসে নৃশংস রোগ তাহার চব্বিশ বছরের সবল সুস্থ দেহটাকে কুরিয়া কুরিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। ঢুলঢুলে মুখ, মুদিত চোখ দুটি যেন সুর্মা-আঁকা, চুলগুলি মুখখানিকে ঘিরিয়া মণ্ডল রচনা করিয়াছে। দেখিয়া বোঝা যায় না মৃত্যু আসন্ন।

স্মৃতি আজ রাত্রি দশটার পর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান নাই। আমি মাঝে মাঝে নাড়ী দেখিতেছি, নাড়ী ভাল নয়। এই অবস্থাতেই বোধহয় শেষরাত্রে কোনও সময় তাহার মৃত্যু হইবে। এখন রাত্রি একটা।

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। দশ বৎসরের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু আজ মনে হইতেছে স্মৃতির মৃত্যু যেন অন্য মৃত্যু হইতে পৃথক। তাহার কারণ বোধহয় এই যে, ভূপতি আমার প্রিয়তম বন্ধু, তাহাকে আমি অন্তরে বাহিরে চিনি। সে বড় ব্যবসায়ী, অনেক টাকার মানুষ; কিন্তু মনের মধ্যে সে একেবারে অসহায়। অপর-পক্ষে স্মৃতির মত এমন পরিপূর্ণরূপে সংসারী মেয়ে আমি আর দেখি নাই। সংসারকে সুমধুর করিয়া তুলিবার মন্ত্র সে জানিত। দুইজনে মিলিয়া সুখের নীড় রচনা করিয়াছিল; ভূপতি স্মৃতির হাতে নিজের জীবন তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তাহাদের পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনকে একটি অখণ্ড কাব্য বলা চলে, একদিনের জন্যও ছন্দপতন হয় নাই। তারপর বজ্রাঘাতের মত এই রোগ। একটা সন্তানও নাই। স্মৃতির মৃত্যুতে পৃথিবীর আর কোনও ক্ষতি হোক না হোক, ভূপতির জীবনটা ছারখার হইয়া যাইবে।

রাত্রি তিনটার সময় স্মৃতি চক্ষু মেলিল। দৃষ্টিতে জড়তা নাই, অস্পষ্টতা নাই; ভূপতির মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহজ স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিল। তাহার এই স্বর অনেকবার শুনিয়াছি, হলফ লইয়া বলিতে পারি তাহাতে বিকারজনিত প্রলাপের চিহ্নমাত্র ছিল না। সে বলিল, "একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে।"

ভূপতি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্র-বিস্মিত প্রশ্ন করিল, "কী—কী বললে?"

স্মৃতি আর কথা বলিল না, আরও কিছুক্ষণ ভূপতির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। আমি তাহার নাড়ীতে হাত দিলাম। নাড়ী কয়েকবার ক্ষীণভাবে স্ফুরিত হইয়া থামিয়া গেল।

স্মৃতি মরিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার মনে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে! ইহা মৃত্যুকালের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ নয়; মানুষ যেমন রেলের স্টেশনে ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে প্রিয়জনকে বলে—অমুক দিন আবার দেখা হবে, এ সেই ধরনের উক্তি। একশিলা নগরী বলিয়া কি কোনও স্থান আছে? কখনও নাম শুনি নাই। আবার দেখা হবে—একথার অর্থ কি? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কেহ যদি বলে, আবার দেখা হবে, তবে তাহার কী অর্থ হয়? পরলোক পুনর্জন্ম আমি মানি না। স্মৃতি আধুনিকা ছিল, কিন্তু হয়তো মনে মনে এইসব কুসংস্কার পোষণ করিত; মৃত্যুকালে মনের বাসনা

banglabooks.in

ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু স্মৃতির কণ্ঠস্বরে হৃদয়াবেগের বাষ্পটুকু ছিল না। তাছাড়া—একশিলা নগরীতে কেন? এই অশ্রুতপূর্ব নামটা স্মৃতি কোথা হইতে পাইল!

স্মৃতির মৃত্যুর পর ভূপতির সঙ্গে কয়েক মাস দেখা হয় নাই। তাহার বাড়িতে গিয়া দেখা পাই নাই। স্মৃতির কথা মন হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্যই বোধকরি সে ব্যবসায়ে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিল। বাড়িতে খুব কমই থাকিত, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। একবার শুনিলাম সে প্লেনে বিলাত গিয়াছে।

মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। শুষ্ক রুক্ষ চেহারা, রোগা হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "কোথায় ছিলি এতদিন? মড়ার মত চেহারা হয়েছে, অসুখ-বিসুখ করেনি তো?"

ভূপতি আমার প্রশ্নের জবাব দিল না; আমার স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ রঙ্গ-রসিকতা করিল, চা ও জলখাবার ফরমাস দিল। স্ত্রী প্রস্থান করিলে আমার পানে কাতরচক্ষে চাহিয়া বলিল, "ভাই, আর তো পেরে উঠছি না, একটা কিছু উপায় কর্।"

"কি উপায় করব? কিছুতেই ভুলতে পারছিসনে?"

"না। যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। তার কথা ভাববার দরকার হত না, সে-ই অষ্টপ্রহর আমার ভাবনা ভাবত। এখন—তার চিন্তা অষ্টপ্রহর আমার ঘাড়ে চেপে আছে।"

"এতে চিন্তার কি আছে? একদিন তো ভুলতেই হবে। মনকে শক্ত কর, মনের রাশ ছেড়ে দিসনে।"

"সে চেষ্টা কি করিনি? কিছুতেই কিছু হল না।—মরবার সময় কী যে একটা কথা বলে গেল—একশিলা নগরীতে দেখা হবে। তুই কিছু মানে বুঝতে পেরেছিস?"

"না। হয়তো বোঝবার মত মানে কিছু নেই। তুই ও নিয়ে মাথা ঘামাসনি।"

ভূপতি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "একশিলা নগরী। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারেনি; কিন্তু আমার বিশ্বাস কোথাও না কোথাও একশিলা নগরী আছে।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "একশিলা নগরীর নাম স্মৃতি আগে কখনও তোর কাছে করেছিল?"

"কখ্খনো না।"

অতঃপর দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্ত্রী আসিয়া চা ও জলখাবার রাখিয়া গেলেন, ভূপতি নীরবে জলযোগ সম্পন্ন করিল। আমি বলিলাম, "ভূপতি, আয় তোর শরীরটা পরীক্ষা করে দেখি। শরীরে রোগ থাকলে মনও অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

সে বলিল, "দূর! শরীর আমার দিব্যি আছে।"

বলিলাম, "তবে আবার বিয়ে কর্। স্মৃতিকে তুই কত ভালবাসিস আমি জানি, তাকে ভুলে যেতে বলছি না; কিন্তু এভাবে জীবনটা নষ্ট করে ফেলার কোনো মানে হয় না। আমার কথা শোন, আবার বিয়ে কর্।"

সে বলিল, "তুই পাগল! নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কি আমি করিনি। মদ খেয়ে দেখেছি, লোচ্চামি করবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু আমার দ্বারা হল না। তোর কথায় একটা মেয়েকে বিয়ে করে কি তার জীবন নষ্ট করে দেব?"

"তবে কি করবি?"

"তা জানি না।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল—"আচ্ছা আজ চলি, আবার দেখা হবে।"

দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া সে থামিয়া গেল, তারপর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এই দ্যাখ, আমিও বলছি আবার দেখা হবে; কিন্তু আমার বলার একটা মানে হয়। স্মৃতি কেন বলল?"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। ভূপতি চলিয়া গেল। তারপর তিন মাস আর তাহার দেখা পাইলাম না।

banglabooks.in

শীতের মাঝামাঝি ভূপতি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল; বলিল, "চল, বেড়াতে যাবি?"

"বেড়াতে! কোথায়?"

"ভারতবর্ষে বেড়াবার জায়গার অভাব! চল কাশ্মীর যাই।"

"এই শীতে কাশ্মীর!"

"তবে রাজপুতানা কিংবা দক্ষিণে যাওয়া যাক। দক্ষিণটা দেখা হয়নি। যাবি? সব খরচ আমার।"

দোনা-মনা করিয়া রাজী হইলাম। ভূপতির যেরূপ চেহারা হইয়াছে, শীতের সময় দেশে বিদেশে বেড়াইলে শরীর সারিতে পারে। মনটা বোধহয় আস্তে আস্তে সুস্থ হইয়া আসিতেছে, কারণ স্মৃতির উল্লেখ একবারও করিল না। তবু তাহাকে একলা যাইতে দেওয়া উচিত নয়, একলা থাকিলেই তাহার মন স্মৃতির কাছে ফিরিয়া যাইবে। এদিকে আমার গৃহিণী কিছুকাল যাবৎ বাপের বাড়ি যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিলেন। শীতের সময় রোগীর সংখ্যাও বেশী নয়। সুতরাং মাসখানেকের জন্য ভ্রমণে বাহির হইবার বিশেষ বাধা নাই।

সাত-আট দিনের মধ্যে গোছগাছ করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রেলের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের মত এমন আরামের ভ্রমণ আর নাই। ইহার কাছে এরোপ্লেন জেটপ্লেন তুচ্ছ।

দক্ষিণে অনেক প্রসিদ্ধ স্থান দেখিলাম—মহীশূরে বাঙ্গালোর উটি। প্রত্যেক স্থানে দুই চারি দিন বাস করিতেছি, আবার চলিতেছি। ভূপতির শরীর দ্রুত সারিয়া উঠিতেছে, মনের উপর হইতেও কালো ছায়াটা সরিয়া যাইতেছে। আশা হইতেছে ভ্রমণের শেষে সুস্থ সহজ মানুষটাকে আবার পাওয়া যাইবে।

বেজওয়াডা হইতে কাজিপেটের লাইনে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। ভূপতি হঠাৎ নামিয়া পড়িল—"আয়, এখানে যাত্রা ভঙ্গ করা যাক।"

এখানে যাত্রাভঙ্গের কোনও প্রস্তাব ছিল না; কিন্তু ভূপতি পূর্বেও দুই-একবার এরূপ করিয়াছে, অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে নামিয়া পড়িয়াছে। আপত্তি করিলাম না। আমাদের খেয়াল-খুশীর ভ্রমণ, যেখানে ইচ্ছা নামিয়া পড়িলেই হইল। নেহাত যদি এস্থানে হোটেল বা ধর্মশালা না থাকে তখন রেলের ওয়েটিং রুম আছে।

প্রস্তরফলকে স্টেশনের নাম দেখিলাম—ওরঙ্গল।

শহরটি ছোট, খুব পরিচ্ছন্ন নয়। তবে পাথুরে দেশের শহর পুরানো হইলেও সহজে নোংরা পঙ্কিল হইয়া উঠিতে পায় না। একটি হোটেল আছে, আমরা তাহাতে গিয়া উঠিলাম। হোটেলের দ্বিতল হইতে শহরের পার্বত্য পরিবেশ দেখা যায়। সমস্ত দাক্ষিণাত্য যে একটি বিপুলকায় অধিত্যকা, দক্ষিণে পদার্পণ করা অবধি তাহা ভুলিবার সুযোগ পাই নাই।

আর একটি কথা ভুলিবার উপায় নাই; বাঙালীর সর্বত্র গতি। বাঙালীর 'কুনো' বদনাম আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অতি নগণ্য অজ্ঞাতনামা স্থানে গিয়া দেখিয়াছি, দুই-একটি বাঙালী বিরাজ করিতেছে, অপরিচিত কণ্ঠে বাংলা ভাষা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি। কেহ চাকরি করিতে আসিয়াছে, কেহ ব্যবসায় উপলক্ষে। বাঙালীর অগম্য স্থান নাই।

ওরঙ্গলেও তাহার ব্যত্যয় হইল না। কোট-প্যাণ্টুলন পরা জিরাফের মত একটি লোক হোটেলে বাস করিতেছিলেন, জানা গেল তিনি বাঙালী। তিনি একজন প্রত্নবিৎ, খুব মিশুক লোক নন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক পাছে তাঁহার আবিষ্কৃত প্রত্নবিষয়ক তত্ত্ব কেহ চুরি করিয়া নিজের নামে ছাপিয়া দেয় তাই তিনি সহজে কাহারও সহিত কথা বলেন না, বলিলেও অতি সন্তর্পণে বলেন; কিন্তু সে যাক।

বৈকালে আমরা পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দর্শনীয় বিশেষ কিছু নাই, তবু যখন আসিয়াছি তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা উচিত। অবশেষে একটি মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, গঠন গতানুগতিক নয়। একটি লোককে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম মন্দিরের নাম সহস্রস্তম্ভ মন্দির। অতগুলা না হইলেও

banglabooks.in

অনেকগুলো স্তম্ভ আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিনের পুরনো মন্দির?"

লোকটি বলিল, "পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে থেকে আছে।"

খুবই পুরাতন বলিতে হইবে। ভূপতির দিকে চাহিয়া দেখি, সে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া মন্দির দেখিতেছে, চোখে বিস্ময়াহত অপলক দৃষ্টি।

বলিলাম, "কি হল?"

সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "এ মন্দির আমি আগে দেখেছি।"

"অ্যাঁ! কোথায় দেখলি?"

"তা জানি না—কিন্তু দেখেছি।"

"বোধহয় ফটো দেখেছিস।"

"ফটো—! কি জানি—।"

যখন ফিরিয়া চলিলাম তখনও তাহার চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

হোটেলে ফিরিয়া চায়ের ঘরে গেলাম। এখানে চা কেহ খায় না, কফির রেওয়াজ। দেখিলাম অদূরে বাঙালী ভদ্রলোকটি নাক সিঁটকাইয়া কফি পান করিতেছেন। আমরা ব্যথার ব্যথী, সহজেই ভাব হইয়া গেল। ভদ্রলোকের নাম সুরেশ পাকড়াশী। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। চা ও কফির আপেক্ষিক মহিমা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল্যাম, "আপনি কতদিন এখানে এসেছেন?"

পাকড়াশী বলিলেন, "তা প্রায় মাসখানেক হতে চলল।"

"কাজে এসেছেন বুঝি?"

"না—হ্যাঁ—না, কাজ এমন কিছু নয়, বেড়াতে এসেছিলাম। শহরটা প্রাচীন—হিন্দু আমলের—আগে নাম ছিল বর্ণকুল, এখন ওরঙ্গলে দাঁড়িয়েছে। ভাবলাম, দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়।"

"ও—আপনি প্রত্নবিৎ। কিছু পেলেন?"

ভদ্রলোক হঠাৎ শামুকের মত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। "কিছু না" বলিয়া সন্দিগ্ধ-ভাবে তাকাইলেন। তাঁহার বাক্যস্রোতে ভাটা পড়িল; দুই চারবার আমার কথায় হুঁ হাঁ করিয়া এক সময় উঠিয়া গেলেন। তাঁহার বিচিত্র ভাবগতিক তখন বুঝিতে পারি নাই।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখি ভূপতি শয়নঘরের জানালা খুলিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। আমিও উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলাম। সে বলিল, "দ্যাখ, উটের কুঁজের মত ওই পাহাড়টা—ওটা আমি আগে দেখেছি।"

বলিলাম, "আগে দেখেছিস মানে কি? কতদিন আগে?"

সে বলিল, "তা জানি না; কিন্তু—পাহাড়টা আগে আরও বড় ছিল। চেহারা ঠিক আছে, একটু যেন ছোট হয়ে গেছে।"

বলিলাম, "আগে ফটো দেখেছিলি। ছবিটা অবচেতন মনের মধ্যে ছিল, পাহাড় দেখে বেরিয়ে এসেছে। ও রকম হয়।"

ভূপতি কিছু বলিল না, দূরে উটের মত পাহাড়টার দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া রহিল।

তারপর ওরঙ্গলে তিন চার দিন কাটিয়া গেল। আমার মনটা উসখুস করিতে লাগিল। এখানে দ্রষ্টব্য কিছু নাই, দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার কোনও অর্থ হয় না; কিন্তু ভূপতির কী হইয়াছে জানি না, সে মোহাক্রান্ত ভাবে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে এখান হইতে গা তুলিবার কথা বলিলে শুনিতে পায় না। তাহার মনের মধ্যে রহস্যময় একটা কিছু ঘটিতেছে। আমি সবিশেষ নির্ণয় করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। তিনি যদিও আমাদের এড়াইয়া চলিতেন, তবু মাঝে মাঝে বাংলা ভাষায় কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। আমরাও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দুর্বলতা বুঝিয়াছিলাম, তাই ও

banglabooks.in

প্রসঙ্গ যথাসাধ্য বাদ দিয়া কথা বলিতাম।

আরও কয়েকদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবার পর আমি মরীয়া হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ওরঙ্গলে কি মধু পেলি তুই জানি না, কিন্তু আমি আর থাকছি না। একমাস হয়ে গেছে, আমাকে এবার ফিরতেই হবে।"

সমস্তদিন ঝুলোঝুলির পর রাত্রিকালে তাহাকে রাজী করিলাম, পরদিন বিকালের গাড়িতে দুইজন যাত্রা করিব। সে বলিল, "ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তোর যখন এত তাড়া—চল্। আমি কিন্তু আবার আসব।"

পরদিন সকালবেলা চাকর ঘরে চা দিয়া গেল, দুইজনে একত্র বসিয়া পান করিলাম। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ভূপতি ইজি-চেয়ার জানালার কাছে টানিয়া লইয়া বসিল। আমি বলিলাম, "চল না স্টেশনে খবর নিয়ে আসি, রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে কিনা।"

সে বলিল, "তুই যা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

আমি বাহির হইলাম। জীবিতাবস্থায় ভূপতির সঙ্গে এই শেষ দেখা। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলাম, তখনও সে সেই চেয়ারে বসিয়া আছে, মাথাটা পিছন দিকে হেলান দেওয়া। চোখ দুটো বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া আছে। চোখে এবং মুখে কী অনির্বচনীয় বিস্ময়ানন্দ তাহা বর্ণনা করা যায় না। যেন প্রিয়জনকে বহুদিন পরে দেখার শুভ মুহূর্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমার মানসিক অবস্থার কথা বলিব না।

ভূপতির অন্ত্যেষ্টি করিলাম। আমি বোধ হয় তাহার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়, কারণ আমার হাতের আগুন তাহার দেহটা ছাই করিয়া দিল। কাহাকেও খবর দিতে পারি নাই, ঘনিষ্ঠ আপনার জন তাহার নাই, শুনিয়াছি এক ভাগিনা উত্তরাধিকারী; কিন্তু ভাগিনার ঠিকানা জানি না।

দেশে ফিরিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে চলিয়াছেন পাকড়াশী মহাশয়। বিপদের সময় তিনি দূরেত্ব রাখেন নাই, বুক দিয়া পড়িয়া সাহায্য করিয়াছেন। তারপর একসঙ্গে ফিরিতেছি।

ভূপতির মৃত্যু সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্য মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমি ডাক্তার, আমি জানি তাহার দেহে এমন কোনও রোগ ছিল না যাহাতে সে হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারে। তবে এ কী হইল? স্মৃতির কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল। সে বলিয়াছিল—একশিলা নগরীতে দেখা হবে; কিন্তু—

পাকড়াশী মহাশয় একথা সেকথা বলিয়া আমার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ভাবিয়াছেন আমি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।

হঠাৎ একসময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুরেশবাবু, আপনি পণ্ডিত মানুষ, একশিলা নগরী কোথায় জানেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "জানি বৈকি। ওরঙ্গলের প্রাচীন নাম একশিলা।"

"অ্যাঁ—তবে যে সেদিন বলেছিলেন বর্ণকুল!"

"বর্ণকুলও একটা নাম। আর একটা নাম একশিলা। কেন বলুন দেখি?"

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম, তারপর স্মৃতির মৃত্যুকালীন কাহিনী বলিলাম। এবার পাকড়াশী মহাশয় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য তো! ইতিহাসে পড়েছি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের জীবনে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কালানল নামে এক ভারতীয় সাধু—"

তিনি সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন, কিন্তু সব কথা আমার কানে পৌঁছিল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—মৃত্যুকালে কি মানুষ ভূত-ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়? স্মৃতি অনাগত ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিল? ওরঙ্গলে ভূপতির মৃত্যু হইবে তাহা জানিতে পারিয়াছিল? আবার ওরঙ্গলের প্রাচীন নাম একশিলা তাহাও সে জানিয়াছিল? অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুই দিকেই তাহার মুমূর্ষু প্রাণ প্রসারিত হইয়াছিল? ভূপতির চোখেও ওরঙ্গল চেনা চেনা ঠেকিয়াছিল। তবে কি কোনও সুদূর অতীতে ভূপতি ও স্মৃতি একশিলা নগরীর নাগরিক নাগরিকা ছিল?

banglabooks.in

বুঝি না—কিছু বুঝি না। অগাধ অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতকণার মত বুদ্ধি-দীপ জ্বালিয়া কেবল বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

৭ ফাল্গুন ১৩৬১

গুহা

একটি গুহার অভ্যন্তর। পিছন দিকে পাথরের গায়ে আঁকাবাঁকা ফাটল রহিয়াছে, উহাই গুহার প্রবেশ-পথ। ফাটল দিয়া দেখা যায় বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘ ডাকিতেছে। গুহার ভিতরে মলিন স্যাঁতা আলোয় স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না।

পিছনের ফাটল দিয়া একটি যুবক ও একটি যুবতী ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। যুবকের হাতে একটি বড় টিফিন-বক্স, যুবতীর কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় জলের বোতল ঝুলিতেছে।

যুবতীঃ বাবা—কী বিষ্টি! কী বিষ্টি!

যুবকঃ দুর্যোগ! আকাশ ভেঙে পড়ছে—বাপ! ভাগ্যিস গুহাটা ছিল—

যুবক হাতের টিফিন-বক্স মাটিতে রাখিল, যুবতী জলের বোতল নামাইল। ইতিমধ্যে পিছনের ফাটল দিয়া তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিল। বিরাটকায় এক কুলি; মাথার উপর সুটকেস ও বিছানার হোল্‌ডল্‌, হাতে বল্লমের মত তীক্ষ্ণাগ্র একটা লাঠি। সে আসিয়া মোট নামাইল, গামছা দিয়া মুখের ও গায়ের জল মুছিতে মুছিতে ভারী গলায় বলিল—

কুলিঃ আজ রাত্তিরে বিষ্টি ছাড়বেন না কর্তা।

কুলির চেহারা ভীমদর্শন হইলেও কথা বলিবার ভঙ্গীটি বেশ সরল ও গ্রাম্য—

যুবকঃ বলিস কি রে! তাহলে উপায়?

কুলিঃ উপায় আর কি আজ্ঞে, রাত্তিরটা এখানেই কাটাতে হবে।

যুবতী শঙ্কিতভাবে গুহার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল।

যুবকঃ নাও—বোনের বিয়ে দ্যাখো এবার। এমন হতচ্ছাড়া দেশ তোমার বাপের বাড়ি যে স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে শহর। স্টেশনে একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

কুলিঃ আজ্ঞে, টেক্‌সি পাওয়া যায় কর্তা। আজ রেলগাড়ি দু'ঘণ্টা লেট ছিলেন, তাই টেক্‌সিওয়ালারা যে-যার ঘরে চলে গিয়েছেন।

যুবকঃ তখনই বলেছিলুম আজ ওয়েটিংরুমে রাত কাটানো যাক, কিন্তু তুমি বোনের বিয়ে দেখবার জন্যে একেবারে ছিঁড়ে পড়লে।

যুবতী স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, স্বামীর মুখের পানে ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—

banglabooks.in

যুবতীঃ আমি কি জানতুম রাস্তার মাঝখানে ঝড়-বিষ্টি শুরু হয়ে যাবে? বোনের বিয়েতে এসেছি, বিয়েটাই যদি না দেখতে পেলুম—

যুবকঃ যাক গে, এখন আর ভেবে লাভ কি?—হ্যাঁ রে, বিষ্টি থামবে না তুই ঠিক জানিস?

কুলিঃ আজ্ঞে, এ সময়ের বিষ্টি একবার আরম্ভ হলে সহজে ছাড়েন না কর্তা, যদি ছাড়েন তো সেই শেষ রাত্তিরের দিকে।

যুবকঃ তাহলে আর উপায় কি? এ দুর্যোগে বেরুনো যাবে না, বেরুলে হয়তো পথ হারিয়ে বাঘের মুখে পড়ব। হ্যাঁ রে, এ গুহায় বাঘ ভাল্লুক আসে না তো?

কুলিঃ না কর্তা, বাঘ ভল্লুক তো জঙ্গলে থাকেন, এখানে আসবেন কি জন্যে! আগে এই গুহায় সায়েব মেমেরা আসত চড়ুইভাতি করতে, রাত্তিরে থাকত। ভয়ের কিছু নেই আজ্ঞে। এই দেখেন না ছাই পড়ে রয়েছে, কেউ আগুন জেলেছিল।

যুবকের ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল, অনিবার্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

যুবকঃ তাহলে আমরাও আজ চড়ুইভাতি করি। (স্ত্রীকে) কি বল? বোনের বিয়ে দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো হল।

যুবতীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

যুবতীঃ আমার খুব ভাল লাগছে। সঙ্গে খাবার আছে, বিছানা আছে, কোনও কষ্ট হবে না। বরং—

যুবতী স্বামীর মুখের পানে অর্থপূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর বাহুতে হাত রাখিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

যুবতীঃ হ্যাঁ গা, কুলিটাও থাকবে নাকি?

যুবক যুবতীর মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিল, তারপর কুলিকে প্রশ্ন করিল—

যুবকঃ তুই কি ঘরে ফিরে যেতে চাস?

কুলিঃ এই ঝড়-বাদলে কোথায় যাবো কর্তা। এখানেই এক পাশে গামছা পেতে শুয়ে থাকব আজ্ঞে।

যুবকঃ তা—বেশ।

যুবক যুবতী পরস্পরের পানে চাহিয়া নিরাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিল। তারপর যুবক গুহার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—

যুবকঃ এস, গুহাটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক।—বেশ বড় গুহা। হয়তো হাজার হাজার বছর আগে এখানে বর্বর মানুষ বাস করত। কে জানে—কেমন ছিল তাদের জীবনযাত্রা—

যুবক যুবতী অসমতল গুহাগাত্রের পাশে পাশে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কুলিটা দুই হাঁটু তুলিয়া বসিয়া করতলে খৈনি ডলিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, বাঘের অন্তর্গূঢ় গর্জনের মত মেঘ ডাকিল।

যুবতীঃ ওগো, দ্যাখো দ্যাখো—

যুবক যুবতী পরস্পর হইতে একটু পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন যুবক যুবতীর কাছে গেল।

যুবকঃ আরে! এ যে একটা পাথরের পাটা, খাসা বিছানা হবে এর ওপর।

যুবতী কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন চক্ষে প্রস্তরপট্ট নিরীক্ষণ করিল।

যুবতীঃ মনে হচ্ছে যেন এই পাথরের ওপর কতবার শুয়েছি—(বিভ্রান্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া) এখন যেন সব চেনা-চেনা লাগছে—। তোমার লাগছে না?

যুবকঃ সে কি, চেনা-চেনা লাগবে কি করে, আগে তো কখনো এখানে আসিনি। তুমি হয়তো ছেলেবেলায় এসেছিলে—

যুবতীঃ না, এ গুহার কথা আমি জানতুমই না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—(হঠাৎ) দ্যাখো তো, ওই দেয়ালের খাঁজে কুলুঙ্গীর মত একটা ফুটো আছে কিনা।

banglabooks.in

যুবতী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। যুবক নির্দিষ্টস্থানে গিয়া দেখিল সত্যই দেয়ালের গায়ে একটি গর্ত আছে। সে বিস্মিত মুখে স্ত্রীর দিকে ফিরিল।

যুবক: হ্যাঁ—আছে। তুমি জানলে কি করে?

যুবতী: কি জানি।—কুলুঙ্গীর মধ্যে কিছু আছে?

যুবক: (দেখিয়া) কিছু না—

যুবতী কাছে আসিল।

যুবতী: কিছু নেই?...কি যেন একটা থাকত ওখানে...মনে করতে পারছি না—

যুবক যুবতীর কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিল।

যুবক: কী যা তা বকছ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

যুবতী এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। চোখের উপর দিয়া হাত চালাইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

যুবতী: না—না—কল্পনা! আজ তো এখানেই থাকতে হবে। তোমার খিদে পেয়েছে?

যুবক: একটু একটু পেতে আরম্ভ করেছে।

যুবতী: এস, খেয়ে নিই।

দু'জনে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। দেখিল, কুলি দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

যুবক: তুমি খাবার বের কর, আমি ততক্ষণ বিছানাটা পেতে ফেলি।

হোল্‌ডল্‌ তুলিয়া লইয়া যুবক প্রস্তরপট্টের দিকে চলিয়া গেল, যুবতী টিফিন-বক্স খুলিয়া খাবার বাহির করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যুবক বিছানা পাতিয়া ফিরিয়া আসিল। যুবতী তাহার হাতে টিফিন-বক্সের একটি বাটি দিল। যুবক খাবার মুখে তুলিতে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল—

যুবক: ওর কুলোবে তো?

যুবতী: কুলোবে।

যুবতী একটি বাটি হাতে কুলির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবতী: শুনছ? একটু খেয়ে নাও—

কুলি হাঁটু হইতে মুখ তুলিয়া আরক্ত চক্ষে যুবতীর পানে চাহিল। যুবতী হঠাৎ ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল। কুলি হাত বাড়াইল, যুবতী বাটি মাটিতে রাখিয়া পিছনে সরিয়া গেল। কুলি বাটি টানিয়া লইয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি নিরীক্ষণ করিল, তারপর খাইতে আরম্ভ করিল।

যুবতী ফিরিয়া গিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইল এবং শঙ্কিত চক্ষে কুলির দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক আহার করিতে করিতে প্রশ্ন করিল—

যুবক: কী দেখছ?

যুবতী: (চুপিচুপি) কিছু নয়...লোকটা এমনভাবে আমার পানে তাকালো যে আমার বুক কেঁপে উঠল। হ্যাঁগা, লোকটা ভাল তো? যদি রাত্তিরে—

যুবক: কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।—তুমি খেয়ে নাও।

দুইজন বাটি হাতে লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে আহার করিল। যুবতীর উদ্বিগ্ন চক্ষু কিন্তু বারংবার কুলির দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কুলির বাটিতে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মাংসের হাড় ছিল, সে সেই হাড় মুঠিতে ধরিয়া অনেকক্ষণ চিবাইল। তাহার হাড় চিবাইবার ভঙ্গীতে যেন একটা বন্য ভাব রহিয়াছে।

ক্রমে আহার শেষ হইল। যুবক বোতল হইতে জল ঢালিয়া যুবতীকে দিল, নিজে পান করিল। তারপর কুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

যুবক: তুমি জল খাবে?

কুলি: না হলেও চলে। যদি থাকে, দেন একটু।

যুবক কুলির অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিল, কুলি পান করিল। পান করিতে করিতে সে চোখ তুলিয়া যুবকের পানে চাহিতে লাগিল। দু'জনের চোখেই উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা।

banglabooks.in

শেষে কুলি মুখ মুছিয়া বলিল—

কুলিঃ এবার আপনারা শুয়ে পড়ুন আজ্ঞে। কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে বরছা আছে। আমি গুহার মুখ আগ্‌লে শুয়ে থাকব।

যুবকঃ তোমারও কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে—এই দ্যাখো।

যুবক পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল।

কুলিঃ আজ্ঞে, ওটা কী কর্তা?

যুবকঃ পিস্তল—ছোট বন্দুক। ফায়ার করব—দেখবে?

যুবক পিস্তল ঊর্ধ্বদিকে ফায়ার করিল। গুহার মধ্যে প্রতিহত শব্দ ভীষণ শুনাইল।

কুলিঃ ওরে ব্বাস্ রে!

কুলি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পিছু হটিতে হটিতে গুহার মুখের দিকে চলিয়া গেল এবং সেখানে গামছা পাতিয়া শয়নের উপক্রম করিল।

যুবক তখন যুবতীর পানে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসিল, তারপর সুটকেস তুলিয়া সেই প্রস্তরপট্টের অভিমুখে গেল। জলের বোতল ও টিফিন-বক্সের বাটিগুলি লইয়া যুবতী তাহার পিছনে গেল। দুইজনে প্রস্তরপট্টের পাশে বসিল।

যুবকঃ (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়া যাক।

যুবক কোট খুলিতে খুলিতে গুহার ঊর্ধ্বদিকে ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিল, যুবতী নিজের খোঁপাটিকে কাঁটা দিয়া শক্ত করিয়া আঁটিতে প্রবৃত্ত হইল। যুবক যুবতীর দিকে দৃষ্টি নামাইল, তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—

যুবকঃ বেশ নতুন নতুন লাগছে—না?

যুবতীঃ না।

যুবক একটু বিস্মিতভাবে চাহিল।

যুবকঃ নতুন লাগছে না?

যুবতীঃ ভাল লাগছে, কিন্তু নতুন লাগছে না। মনে হচ্ছে এই পাথরের ওপর আমরা দু'জনে কতবার শুয়েছি—

যুবকঃ তোমার মাথা গরম হয়েছে। নাও, শুয়ে পড়।

যুবকের মুখে কিন্তু বিস্ময়ের সহিত উদ্বেগ মিশ্রিত হইয়া রহিল।

গুহার মধ্যে আলো ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে সব ঢাকা পড়িয়া গেল। কেবল গুহার প্রবেশপথের ফাটল দিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমকের প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে আলো ফুটিতে আরম্ভ করিল। আলো স্পষ্ট হইলে দেখা গেল, গুহা ঠিক তেমনি আছে; কেবল বিছানা সুটকেস প্রভৃতি আধুনিক জিনিসপত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। গুহার মধ্যস্থলে খানিকটা ভস্ম পড়িয়া আছে, যুবতী নতজানু হইয়া অঙ্গার-গর্ভ ভস্মের উপর শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতেছে। যুবতীর পরিধানে হাঁটু হইতে কাঁধ পর্যন্ত পশুচর্ম মাথায় একমাথা জটিল রুক্ষ চুল। গুহায় আর কেহ নাই, পিছনের ফাটল দিয়া বাহিরের উজ্জ্বল দিবালোক দেখা যাইতেছে।

যুবতীর ফুৎকারে আগুন জ্বলিল। সে তখন উঠিয়া কুলুঙ্গীর কাছে গেল। এই কুলুঙ্গী তাহার ভাঁড়ার, তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি মুষলাকৃতি আস্ত হরিণের রাং বাহির করিয়া আনিল এবং আগুনের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেটি ঝল্‌সাইতে লাগিল। মাংস ঝল্‌সাইতে ঝল্‌সাইতে সে মাঝে মাঝে তাহা আঘ্রাণ করিয়া দেখিতে লাগিল এবং উৎসুক চক্ষে বারবার ফাটলের দিকে চাহিতে লাগিল। যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

গুহার বাহির হইতে দূরাগত মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজ আসিল—'কুউ—উ—

যুবতী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া উত্তর দিল—

যুবতীঃ কুউ—উ—

banglabooks.in

কিছুক্ষণ পরে ফাটলের ভিতর দিয়া যুবক প্রবেশ করিল, পরিধানে মৃগচর্ম, হাতে তীর-ধনুক, চক্ষে ভয়ার্ত উত্তেজনা। আগুনের কাছে আসিয়া তীরধনুক ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বহুদূর ছুটিয়া আসিয়াছে।

যুবতীর হাত হইতে অর্ধদগ্ধ রাং পড়িয়া গেল।

যুবতী: কী—কী হয়েছে?

যুবক: (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ভিল্লা জানতে পেরেছে।

যুবতী: (সংহতস্বরে) জানতে পেরেছে!

যুবক: হ্যাঁ, আমরা কোথায় লুকিয়ে আছি জানতে পেরেছে, আমাদের গুহার সন্ধান পেয়েছে—

যুবতীর মুখ হইতে একটা অবরুদ্ধ কাকুতি বাহির হইল, সে যেন তাহা রোধ করিবার জন্যই বাঁ হাতের কব্জি তীক্ষ্ণদন্তে কামড়াইয়া ধরিল।

যুবক: (অসংলগ্নভাবে) বনের মধ্যে শিকার পেয়েছিলাম—একটা হরিণের পিছু নিয়েছিলাম—কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখলাম ভিল্লাও হরিণটার পিছু নিয়েছে—ভিল্লার হাতে ছিল শুধু বর্শা—আমি তাকে দেখবার আগেই সে আমাকে দেখেছিল—বর্শার পাল্লার বাইরে ছিলাম তাই মারতে পারেনি—আমি তাকে যেই দেখতে পেয়েছি অমনি সে হা হা করে হেসে উঠল—হরিণটা পালিয়ে গেল—

যুবতী: তারপর?

যুবক: ভিল্লা হেসে বললে—'আর তুই যাবি কোথায়, আমার তিম্নিকে চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমি জানতে পেরেছি, এবার তোকে কুচি কুচি করে কাটব।' আমি ধনুকে তীর পরালাম, অমনি ভিল্লা একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি তখন ছুটে চলে এলাম।

যুবতী: (কাঁদিয়া উঠিয়া) কী হবে—কী হবে! ভিল্লা ভয়ানক কুচুটে, সে তোকে মেরে ফেলবে—তার গায়ে ভীষণ জোর—

যুবক তীরধনুক তুলিয়া লইল, তাহার চক্ষু হিংস্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

যুবক: ভিল্লা যদি আমার গুহায় আসে আমি তাকে তীর দিয়ে বিঁধে মেরে ফেলব।

যুবতী: তাকে মারতে পারবি না—সে কুচুটে—ভয়ানক ফন্দিবাজ—তার গায়ে গণ্ডারের মত জোর—আমি জানি তুই তাকে মারতে পারবি না—

যুবতী মাটিতে বসিয়া পড়িল, সম্মুখে ও পিছনে দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া বলিতে লাগিল—

যুবতী: আমি জঙ্গলের মেয়ে, নিজের জাতের মধ্যে জঙ্গলে ছিলাম—ভিল্লা ছিল সর্দারের ছেলে—সে আমাকে চাইত, ভাল্লুক মেরে আমাকে চামড়া এনে দিত—আমার তাকে ভাল লাগ্‌ত না—তুই ভিনজাতের মানুষ, তোকে ভাল লাগ্‌ল—তোর সঙ্গে তোর গুহায় পালিয়ে এলাম!—এখন কী হবে—ভিল্লা তোকে মেরে ফেলবে—সে বড় হিংসুক—

সহসা যুবতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবকের বাহু দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—

যুবতী: চল আমরা পালিয়ে যাই, গুহা ছেড়ে পালিয়ে যাই, তাহলে ভিল্লা আমাদের খুঁজে পাবে না—

যুবক: (গর্জিয়া উঠিল), না, আমার গুহা আমি ছাড়ব না—ভিল্লাকে আমার গুহা দেব না—

এই সময় বাহিরে একটা বিকট শব্দ হইল। যুবক যুবতী ক্ষণকাল স্তব্ধ একাগ্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার বিকট শব্দ হইল। যুবতী উত্তেজিত নিম্নস্বরে বলিল—

যুবতী: ভাল্লুক! ভাল্লুক ডাকছে! বোধহয় পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে এদিকে আসছে—

যুবক ত্বরিতে তীরধনুক তুলিয়া লইল।

যুবতী: তীরধনুক নিয়ে ভাল্লুকে মারতে পারবি না। দাঁড়া, আমি ভাল্লুক তাড়াচ্ছি।

banglabooks.in

আগুন দেখলেই পালাবে।

যুবতী একখণ্ড ধূমায়িত কাঠ তুলিয়া মশালের মত ঊর্ধ্বে ধরিয়া ফাটলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। যুবক ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া শক্ত সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবতী ফাটল দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার কণ্ঠের তীব্র মর্মান্তিক চীৎকার শোনা গেল। যুবক ধনুর্বাণ হাতে ফাটলের দিকে ছুটিল, তারপর থমকিয়া দাঁড়াইল।

ফাটলের ভিতর দিয়া যুবতী আসিতেছে, তাহার পিছনে ভল্লুকের মত কালো রোমশ একটা জীব। যুবতীর দুই হাত ভীতভাবে সম্মুখে প্রসারিত; ওষ্ঠাধর চীৎকারের ভঙ্গিতে উন্মুক্ত, কিন্তু কণ্ঠ দিয়া চীৎকার বাহির হইতেছে না।

যুবক: (চমকিয়া) ভিল্লা!

যুবতীর পিছনে ভাল্লুকের চামড়া পরিয়া আসিতেছিল ভিল্লা। সে বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

ভিল্লা: হ্যাঁ, ভাল্লুক নয়—আমি ভিল্লা। তীরধনুক ফেলে দে, নইলে তিন্নিকে বল্লম বিঁধে মেরে ফেল্‌ব।

ভিল্লা: ভিল্লা, ছেড়ে দে—আমার তিন্নিকে ছেড়ে দে—

ভিল্লা: তুই আগে তীরধনুক ফেলে দে।

যুবক তীরধনুক ফেলিয়া দিতেই ভিল্লা যুবতীকে সজোরে সামনে ঠেলিয়া দিল। যুবতী কয়েক পা আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভিল্লা হাতের বল্লম ছুঁড়িয়া যুবককে মারিল। যুবক আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

এতক্ষণে ভিল্লাকে দেখা গেল। সে আর কেহ নয়, পূর্বে যাহাকে কুলিরূপে দেখা গিয়াছিল সেই ভীষণাকৃতি লোকটা। সে এখন ভল্লবিদ্ধ যুবকের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার মাথাটা বারবার মাটিতে ঠুকিতে লাগিল।

যুবতী ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে ভিল্লার চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে উন্মত্তার মত বলিল—

যুবতী: ছেড়ে দে—ওকে ছেড়ে দে—রাক্ষস—

ভিল্লা উঠিয়া যুবতীর হাত পা চাপিয়া ধরিল, তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া উল্লসিত স্বরে বলিল—

ভিল্লা: মরে গেছে—ওকে মেরে ফেলেছি। এখন তুই আমার—আমার—

যুবতী হাত ছাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ভিল্লা তাহাকে আগুনের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। আগুনের পাশে অর্ধদগ্ধ অস্থি-মাংস পড়িয়াছিল, সে তাহা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া মহানন্দে হা হা হাস্য করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। যুবতী হাত ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় ফুঁপাইতে লাগিল—

যুবতী: ছেড়ে দে রাক্ষস! ছেড়ে দে আমায়—

ভিল্লা তাহার আকুতি গ্রাহ্য করিল না, বিজয়দীপ্ত চক্ষে গুহার চারিদিকে চাহিল, মাংসে কামড় দিয়া পরিপূর্ণ মুখে বলিল—

ভিল্লা: এ গুহা আমার—তুই আমার—(যুবকের মৃতদেহ দেখাইয়া) ওকে গুহার মুখের কাছে পুঁতে রাখব—ও যক্ষি হয়ে আমার গুহা পাহারা দেবে।

ভিল্লা ভুক্তাবশিষ্ট মাংস যুবতীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—

ভিল্লা: নে—খা—

যুবতী: (সতেজে) খাব না।

ভিল্লা হাড়সুদ্ধ মাংস যুবতীর মুখে গুঁজিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে বলিল—

ভিল্লা: খা—খেতে হবে। আজ থেকে তুই আমার—তোকে আমার এঁটো খেতে হবে। কী খাবি না?

ভিল্লা মুগুরের মত অস্থিখণ্ড দিয়া যুবতীর মাথায় প্রহার করিল, যুবতী মূর্ছিতা

banglabooks.in

হইয়া পড়িয়া গেল। ভিল্লা অস্থিখণ্ড ফেলিয়া দিয়া আরক্ত চক্ষে মূর্ছিতা যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল—

ভিল্লাঃ আজ খাবি না কাল খাবি না। না খেয়ে তুই যাবি কোথায়! তুই আমারে—একবার পালিয়েছিলি, আর পালাতে দেব না।

যুবকের দিকে ফিরিয়া সে তাহার দেহ হইতে বর্শা টানিয়া বাহির করিয়া লইল, কিছুক্ষণ তৃপ্তিপূর্ণ চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিল—

ভিল্লাঃ তোকে পুঁতবো—তুই আমার গুহা পাহারা দিবি—

ভিল্লা নতজানু হইল, ভল্লের অগ্রভাগ দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল...

আবার গুহার আলো ক্ষীণ হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে যুবতীর কণ্ঠের তীব্র চীৎকার শোনা গেল—তারপর দ্রুত আলো ফুটিয়া উঠিল।

দেখা গেল গুহা আবার বর্তমান কালে ফিরিয়া আসিয়াছে, প্রস্তরপট্টের শয্যায় যুবতী আলুথালুভাবে উঠিয়া বসিয়া যুবকের গা ঠেলিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে ভিল্লা মাটি খুঁড়িতেছিল সেখানে কুলি বল্লম দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। মানুষগুলির বেশবাস পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান কালের বেশবাসে পরিণত হইয়াছে।

যুবতীঃ ওগো—ওগো—

যুবক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

যুবকঃ কে?—কী—ভিল্লা কোথায়?

যুবতীঃ অ্যাঁ! তুমিও স্বপ্ন দেখেছ?

দুইজনে ব্যাকুলভাবে পরস্পরের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর যুবক শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; পিস্তলটা বিছানা হইতে তুলিয়া পকেটে রাখিল, বলিল—

যুবকঃ স্বপ্ন!—ভিল্লা কোথায় গেল?

যুবতী কুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শিথিল দেহে আবার শুইয়া পড়িল। যুবক দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, কুলি তাহাদের দিকে পিছন করিয়া বল্লম দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। যুবক বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কুলির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবকঃ এই! কি করছিস?

কুলি বল্লম ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তন্দ্রাবিষ্ট চোখে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল। যুবক তাহার গায়ে একটা মৃদু রকমের ঠেলা দিল।

যুবকঃ কি করছিস? মাটি খুঁড়ছিস কেন?

কুলি যেন চমকিয়া তন্দ্রাবেশ হইতে জাগিয়া উঠিল, চকিতে চারিদিকে চাহিয়া স্খলিতস্বরে বলিল—

কুলিঃ অ্যাঁ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আজ্ঞে—

যুবকঃ মাটি খুঁড়ছিলি কেন? মাটির তলায় কি আছে?

কুলিঃ (মাথা চুলকাইয়া) তা তো জানিনে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি যেন স্বপ্ন দেখলাম আজ্ঞে—

যুবকঃ তুইও স্বপ্ন দেখেছিস? বেশ, তবে খোঁড়্।

কুলিঃ খুঁড়ব?

যুবকঃ হ্যাঁ খোঁড়্। হয়তো কিছু আছে।

কুলিঃ আজ্ঞে।

কুলি আবার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল, যুবক কিছু দূরে সরিয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ কুলি ভীতভাবে বল্লম ফেলিয়া পিছু সরিয়া আসিল—

কুলিঃ ওরে স্বাবা।

যুবকঃ কী হল?

কুলিঃ ওখানে কি একটা রয়েছেন।

যুবকঃ কী রয়েছে?

banglabooks.in

কুলিঃ আজ্ঞে, মড়ার মাথা। আপনি দেখেন না কর্তা—মড়ার খুলি। ওরে ব্বাবারে!

যুবক গর্তের কাছে গিয়া বল্লমের চাড় দিয়া একটা নর করোটি বাহির করিল। করোটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া সে একদৃষ্টে তাহা দেখিতে লাগিল।

যুবকঃ কার করোটি...আমার?

কুলিঃ (কাছে আসিয়া) মড়ার খুলি এত কী দেখতেছেন কর্তা।

যুবকের হাত হইতে খুলিটা পড়িয়া গেল, সে কুলির দিকে প্রজ্বলিত চক্ষে চাহিল, তারপর পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া প্যাশব কণ্ঠে গর্জিয়া উঠিল—

যুবকঃ ভিক্লা! এই নে—মর্।

যুবক পিস্তল ছুঁড়িল, কুলি পড়িয়া গেল। যুবক কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর নত হইয়া কুলিকে দেখিল।

যুবকঃ মরে গেছে।—এ কি করলাম—এ কি করলাম!

৩১ শ্রাবণ ১৩৬২

শূন্য শুধু শূন্য নয়

বাংলা দেশের নরম মাটি শেষ হইয়া যেখানে ছোটনাগপুরের পাথুরে কঠিনতা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে একটি ছোট রেলের স্টেশন। স্টেশন ঘিরিয়া দুই-চারিটি লোকালয়। বেশীর ভাগ ট্রেন এখানে থামে না, হুইস্‌ল্ বাজাইয়া টিটকারি দিতে দিতে চলিয়া যায়। দুই-একটা অতি-মন্থর যাত্রী-ট্রেন থামে। আর মালগাড়ি থামে।

স্থানটির পরিবেশ অতিশয় নিঝুম। যে দুই-চারিটি মানুষ এখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহাদের প্রকৃতিও নিঝুম। লোকগুলিকে দেখিলে মনে হয় তাহারা এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছে কিংবা এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে। স্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে একটি ছোট্ট নিস্তরঙ্গ নদী আছে; সেটিও যেন ঘুমের ঘোরে চলিতে চলিতে উপলশয্যার উপর ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব বা পশ্চিম হইতে ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিলে কদাচিৎ দুই-একটি গ্রাম্য যাত্রী মোটঘাট লইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করে, তারপর মোটঘাট মাথায় তুলিয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়। স্টেশন হইতে যে পথটি অসমতল দিগন্তের পানে চলিয়া গিয়াছে, সেটির কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, এই পথে কিছুদূর চলিলেই দেখা যাইবে, পাথরের কোন এক ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া পথটি পাহাড়ী ময়াল সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর দেশ। কেবল রাজকুমারীর সন্ধান কেউ জানে না।

একদা চৈত্র মাসের অপরাহ্ণে পূর্ব দিক হইতে একটি অতি-মন্থর যাত্রী-গাড়ি আসিয়া

banglabooks.in

স্টেশনে থামিল। একটি মাত্র যাত্রী গাড়ি হইতে নামিল। ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী যুবক; সঙ্গে অনেক লটবহর—একটা তোরঙ্গ, দুইটা কাঠের বাক্স, দুইটা পরিপুষ্ট চটের বোরা, একটা স্থূল হোল্ড্-অল্, একটি ইক্‌মিক্ কুকার। গাড়ির অন্য যাত্রীদের সাহায্যে মালগুলি নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফোঁস ফোঁস শব্দে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

যুবকের চেহারা শৌখীন গোছের। লম্বা রোগা গড়ন, মাথার চুল ঢেউ খেলানো, কানের মূল পর্যন্ত জুল্‌পি নামিয়া আসিয়াছে, পাতলা গোঁফ; চোখে ধোঁয়াটে কাচের চশমা। বয়স আন্দাজ তেইশ-চব্বিশ।

যুবক এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে স্টেশন মাস্টারের প্রকোষ্ঠের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

স্টেশন মাস্টার মধ্যবয়স্ক হিন্দুস্থানী; ট্রেন পাশ করিয়া দিয়া তিনি ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া আর এক প্রস্থ ঝিমাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, যুবককে দেখিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন এবং চোখে চশমা পরিলেন। মোটা কাচের ভিতর দিয়া তাঁহার চোখের বিস্ময় আরও বিবর্ধিত আকারে দেখা দিল। এ স্টেশনে এই শ্রেণীর যাত্রী তিনি বেশী দেখেন নাই।

যুবক বলিল, 'স্টেশনে কুলি দেখছি না। কুলি কোথায়?'

স্টেশন মাস্টার উঠিয়া আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন এবং আরও কিছুক্ষণ বিবর্ধিত নেত্রে যুবককে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু যুবকের প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন না; কারণ উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, স্টেশনের একমাত্র কুলি স্টেশন মাস্টারের হুকুমে অদূরবর্তী তালগাছে চড়িয়া তাড়ির ভাঁড় পাড়িতে গিয়াছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

যুবক বলিল, 'কাছেই বাজ-পড়া বাংলা আছে—সেইখানে।'

স্টেশন মাস্টারের নয়ন বিস্ফার এবার চশমার কাচকে ছাড়াইয়া গেল। তিনি কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'বাজ-পড়া বাংলা! মোহনলাল শেঠের কুঠি! সেখানে তো কেউ নেই। তালা লাগানো।'

যুবক পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া বলিল, 'এই যে বাড়ির চাবি। মোহনলাল আমার বন্ধু, আমাকে তাঁর বাংলায় থাকতে দিয়েছেন।'

'ও—তা—' স্টেশন মাস্টারের গলায় হঠাৎ যেন ব্যাঙ ডাকিয়া উঠিল, 'আপনি ওখানে থাকবেন?'

যুবক ভ্রূ তুলিল, 'থাকব না কেন?'

স্টেশন মাস্টার ঘরের বাহিরে আসিলেন, সন্তর্পণে প্ল্যাট্‌ফর্মের চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ষড়যন্ত্রকারীর মত গাঢ় নিম্নস্বরে বলিলেন, 'ও বাংলায় যাবেন না।'

'সে কি! কেন?'

'ও বাংলায় দেও আছে।'

যুবকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল—'দেও! মানে—ভূত?'

স্টেশন মাস্টার ঘাড় নাড়িয়া সশঙ্ক সম্মতি জানাইলেন। যুবক হাসিয়া উঠিল, 'ভালই হল, একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে।'

স্টেশন মাস্টার এবার গম্ভীর হইয়া গেলেন।

যে অর্বাচীন ভূত-প্রেত লইয়া তামাসা করে, তাহাকে সদুপদেশ দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আপনার টিকিট?'

যুবক টিকিট বাহির করিয়া দিল।

স্টেশন মাস্টার টিকিট পরীক্ষা করিলেন, তারপর টিকিট পকেটে রাখিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'কুলি জরুরি কাজে বাইরে গেছে। আপনার যদি মুটে দরকার থাকে, স্টেশনের বাইরে যান। সামনেই মুদির দোকান আছে, সেখানে লোক পাবেন।'

যুবক বাহিরে গিয়া মুদির দোকান পাইল। দোকানটি একাধারে মুদির এবং ময়রার

banglabooks.in

দোকান। এক দিকে চাল ডাল মশলা, অন্য দিকে লাড্ডু মিঠাই পকৌড়ি। ময়রা দোকানে বসিয়া পকৌড়ি ভাজিতেছিল এবং দুইজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে স্তিমিত কণ্ঠে আলাপ করিতেছিল, যুবককে দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। তারপর যুবকের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাদের একেবারে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। ভূতের বাড়িতে মানুষ থাকিবে, এত বড় বুকের পাটা!

যাহোক, মোট বহনের প্রস্তাবে মুদি আপত্তি করিল না, বরং এক টাকা মজুরির লেভে সবান্ধবে প্ল্যাট্‌ফর্মে আসিয়া মোট মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবক লক্ষ্য করিল, বাজ-পড়া বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পূর্বে মুদি নিজের দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন ও তেলেভাজা পুঁটুলি করিয়া বাঁধিয়া লইল।

যুবক মোটবাহীদের সঙ্গে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'সঙ্গে খাবার নিলে যে! বাজ-পড়া বাড়ি কি অনেক দূর?'

মুদি বলিল, 'জি, না—কাছেই। খাবার নিলাম দেওকে চড়াব বলে।'

যুবক বলিল, 'ও—ভূতকে খেতে দেবে। খাসা ভূত তো, পিণ্ডি খায় না, তেলেভাজা খায়!'

'জি। আমরা সবাই পালা করে ভোগ দিই।'

'ভোগ না দিলে কী হয়?'

'তা কি বলা যায় হুজুর! ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে।'

মুদির একজন সাথী বলিল, 'ভূত আজ পর্যন্ত কারুর ঘরে আগুন লাগায়নি হুজুর, কিন্তু একদিন খাবার না পেলেই কারুর না কারুর ঘরে ঢুকে খাবার খেয়ে যায়, ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে। তাই আমরা ব্যবস্থা করেছি, যার যেদিন পালা সে সেদিন মুদিভাইকে চার পয়সা দেয়, মুদিভাই দেওকে খাবার দিয়ে আসে।'

'হুঁ। ভূতকে তোমরা কেউ দেখেছ?'

'গোড়ার দিকে কেউ কেউ ছায়ামূর্তি দেখেছিল, এখন আর দেখা যায় না।'

'ভূত বাজ-পড়া বাড়িতে থাকে জানলে কি করে?'

'বাড়িতে বাজ পড়ার কিছুদিন পর থেকেই ভূতের আবির্ভাব হয়েছে, আজ দশ বছরের কথা। যারা বজ্রাঘাতে মরেছিল তাদেরই একজন ভূত হয়ে আছে।'

২

বাজ-পড়া বাড়ির একটু ইতিহাস আছে। পনের-ষোল বছর আগে মদন শেঠ নামক একজন ধনী ব্যবসাদার অর্থোপার্জনের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য নিভৃত স্থানে এই বাড়ি করিয়াছিলেন; তিনি বছরে দুই-একবার আসিয়া বাড়িতে বাস করিতেন; বাড়ি খালি থাকিলে তাঁহার ব্যবসায়ের অংশীদার নিধিরাজ মল্লিকও মাঝে-মধ্যে আসিতেন। একবার বছর দশেক আগে নিধিরাজ আসিয়া এখানে বাস করিতেছিলেন, সঙ্গে স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যা ছিল। গ্রীষ্মকাল, একদিন কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দিল। ঝড় থামিলে দেখা গেল, বাড়ির মাথায় বজ্রপাত হইয়াছে; নিধিরাজ মল্লিক ও তাঁহার পরিবারের কেহই জীবিত নাই। খবর পাইয়া বাড়ির মালিক মদন শেঠ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন অধিকাংশ মড়া শৃগালে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। মদন শেঠ সেই যে বাড়িতে তালা লাগাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, আর বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই। তারপর মদন শেঠের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র মোহনলাল এখন বাড়ির মালিক। সেও এ পর্যন্ত বাড়িতে পদার্পণ করে নাই। কেবল বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে বাড়িতে থাকিতে দিয়াছে। আমাদের পরিচিত যুবকই সেই বন্ধু।

এই সূত্রে যুবকের অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস এখানে বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যুবকের নাম গৌরমোহন সাহা। বড় মানুষ ব্যবসাদারের একমাত্র সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও

banglabooks.in

সে যখন ছবি আঁকিতে শুরু করিল, তখন তাহার পিতৃদেব মনের দুঃখে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। বাড়িতে রহিল গৌরমোহন ও তাহার বিমাতা শশিমুখী। শশিমুখী বিমাতা হইলেও গৌরমোহনে ভালবাসিতেন, তাহার নিজের পুত্রকন্যা ছিল না। তিনি তাহাকে পৈতৃক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে ছবি আঁকিতে লাগিল। ছেলের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া শশিমুখী তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন; কারণ পুরুষের মন সংসারধর্মে আকৃষ্ট করার পক্ষে বিবাহই সর্বোৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। শশিমুখী তাঁহার ভগিনীর দেবরের কন্যার সহিত সম্বন্ধ করিলেন; কিন্তু গৌরমোহন তপোভঙ্গের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া একাগ্রমনে ছবি আঁকিয়া চলিল। সে বর্তমান যুগের অনৈসর্গিক শৈলীর চিত্রকর, মনের ছবি আঁকে, স্রেফ রঙ দিয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর রূপদান করে। তাহাকে স্থূল পিশিতপিণ্ড দিয়া প্রলুব্ধ করা সহজ নয়।

শশিমুখী কিন্তু হাল ছাড়িবার পাত্রী নয়। কন্যার রূপযৌবনের সাড়ম্বর বর্ণনা শুনিয়া যখন গৌরমোহন ঘামিল না, কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াও যখন সে অটল রহিল, তখন শশিমুখী যুক্তিতর্কের পথ ছাড়িয়া সবলতর পন্থা অবলম্বন করিলেন।

একদিন গৌরমোহনকে বলিলেন, 'পরশু রবিবারে ওরা তোমাকে আশীর্বাদ করতে আসবে। সব ঠিক হয়ে গেছে, আর দেরি করা চলবে না।'

নোটিস নয়, সমন নয়, একেবারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। গৌরমোহনের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কিন্তু সে মায়ের সঙ্গে কখনও তর্ক করে না, তাঁহার কথার অবাধ্য হইবার মত রূঢ়তাও তাহার চরিত্রে নাই। একান্ত অসহায় ভাবে সে ছুটিয়া গেল তাহার প্রাণের বন্ধু মোহনলালের কাছে। মোহনলাল গৌরমোহনের সমবয়স্ক হইলেও বিবাহিত এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন যুবা। সে গৌরমোহনকে সৎ পরামর্শ দিল; বুঝাইয়া দিল যে পলায়ন করিলে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না। কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করিলেই মাতৃদেবী ধাতস্থ হইবেন।

অতঃপর গৌরমোহন আর নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যায় নাই বাজ-পড়া বাড়ির চাবি লইয়া অজ্ঞাতবাসে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য বাড়িটার যে ভৌতিক দুর্নাম আছে, তাহা সে পূর্বাহ্নে জানিতে পারে নাই; পারিলেও বোধ করি সংকল্পচ্যুতি হইত না।...

পনের মিনিট পরে লটবহর লইয়া গৌরমোহন বাজ-পড়া বাড়ির সম্মুখীন হইল। জীর্ণ-স্খলিত পাঁচিল ঘেরা বিঘাখানেক স্থান শুষ্ক আগাছায় ভরা, তাহার মাঝখানে ছোটোখাটো একতলা একটি বাড়ি। প্রবেশ-পথের ফটক অদৃশ্য হইয়াছে; কেবল থাম দুটা দাঁড়াইয়া আছে। থামের দুই পাশের ঝাঁকড়া দুটা পাকুড় গাছ প্রবেশ-পথের উপর তোরণ রচনা করিয়াছে; এই তোরণের ভিতর দিয়া ত্রিশ-চল্লিশ গজ পিছনে বাড়িটি দেখা যায়।

ফটকে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুদি খাবারের পুঁটুলি পাকুড় গাছের ডালে টাঙাইয়া দিল। গৌরমোহন বলিল, 'ভূত বুঝি ওই গাছে বসে খানাপিনা করে?'

মুদি উত্তর দিল না। ভূতের আস্তানায় দাঁড়াইয়া ঠাট্টা ইয়ার্কি করা তাহার নিরাপদ মনে হইল না।

অতঃপর বাড়ির দিকে চলিতে চলিতে গৌরমোহন লক্ষ্য করিল, ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ি পর্যন্ত আগাছার ভিতর দিয়া অস্পষ্ট একটি পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন গিয়াছে। কঠিন মাটির উপর কোনও দাগ নাই, কেবল শুকনা আগাছা দুই পাশে একটু সরিয়া গিয়া যেন যাতায়াতের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।

'এ বাড়িতে কেউ থাকে নাকি?'

মুদি চোখ কপালে তুলিল, 'কে থাকবে হুজুর? কার এত সাহস!'

'চোর-ডাকাত?'

'এদেশে মানুষই নেই, যারা আছে তাদের পয়সা নেই। চোর-ডাকাত কি জন্যে আসবে! আমরা বিশ বছরের মধ্যে চোর-ডাকাতের নাম শুনিনি।'

গৌরমোহন ভাবিল, হয়তো শিয়াল কুকুর এদিক দিয়া যাতায়াত করে। আরও কিছুদূর

banglabooks.in

অগ্রসর হইয়া দেখিল, অস্পষ্ট পথটা বাড়ির সদরে না গিয়া বাড়ির পাশ বেড়িয়া পিছন দিকে চলিয়া গিয়াছে।

সদর দরজায় মরিচা-ধরা তালা লাগানো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর তালা খুলিয়া গেল।

গৌরমোহন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, বহুকালের অব্যবহৃত বাড়ির মেঝেয় পুরু হইয়া ধুলা জমিয়াছে। ঘরের কোণে কোণে ময়লা মাকড়সার জাল ধুলার ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কুলিদের আরও কিছু পয়সা দিয়া অন্ততঃ একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া লইবে।

কিন্তু এ কি! ঘরের মেঝে তকতক করিতেছে, কোথাও একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নাই। যেন অতিথির আগমন প্রত্যাশায় কেহ সমস্ত ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে।

গৌরমোহন অন্য ঘরগুলিতে গিয়া দেখিল। বাস করিবার জন্য গুটিচারেক ঘর, তাছাড়া রান্নাঘর স্নানের ঘর ইত্যাদি। সমস্তই ঝাড়ামোছা, ব্যবহারে সুমার্জিত।

বাড়ি বহুকাল বন্ধ থাকিলে দূষিত বায়ুর যে অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতা গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা একেবারে নাই। বরং যে গন্ধটা গৌরমোহনের নাকে আসিল, তাহা এ বাড়ির পক্ষে বড়ই বিস্ময়কর। মানুষের গন্ধ! যে বাড়িতে সর্বদা মানুষ বাস করে, সে বাড়ির বাতাসে একটি সহজ স্বাভাবিক গন্ধ আছে তাহা আমরা পাই না—রূপকথার রাক্ষসেরা বোধ হয় পায়—এ সেই গন্ধ! কিন্তু এ গন্ধ এ বাড়িতে আসিল কোথা হইতে? বাড়ির দরজায় তালা লাগানো ছিল।

গৌরমোহনের গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিল। ইহা ভয়ের রোমাঞ্চ নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। মনকে দৃঢ় করিয়া সে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মুদি ও তাহার সঙ্গী দুইজন মোটঘাট নামাইয়া অস্বচ্ছন্দ ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, গৌরমোহন তাহাদের মজুরি দিল।

মুদি বলিল, 'হুজুর, আপনার রাত্তিতে খানাপিনার কি হবে? যদি হুকুম করেন, গরম গরম পুরি তরকারি এনে দিতে পারি।'

গৌরমোহন বলিল, 'আজ রাত্তিরে কিছু দরকার হবে না, আমার সঙ্গে যা আছে তাতেই চলে যাবে। যদি কিছু দরকার হয়, কাল সকালে তোমার দোকানে যাব।'

'জি হুজুর'—

মুদি সংগীদের লইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরমোহনের মনে হইল, সে একেবারে একা! সে নিজেকে বুঝাইল, একা থাকিবার জন্যই তো সে এখানে আসিয়াছে। সে নিজে নিজের জন্য রাঁধিবে, খাইবে, ঘুমাইবে—আর মনের সুখে ছবি আঁকিবে। নিরন্তর 'বিয়ে কর, বিয়ে কর'—এই তাগাদা শুনিতে হইবে না।

সূর্যাস্তের এখনও দেরি আছে, তবে রৌদ্রের রঙ হলদে হইয়া গিয়াছে।

গৌরমোহন বাড়ির বাহিরে আসিল। এককালে বোধ হয় বাড়ি ঘিরিয়া ফুলের বাগান ছিল, এখন বাগানের চিহ্নমাত্র নাই। বর্ষার জল পাইয়া যে আগাছা প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করে, তাহাও এখন রোদে পুড়িয়া খড় হইয়া গিয়াছে। সেই খড়ের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট পায়ে-হাঁটা পথের ইশারা।

গৌরমোহন সেই ইশারা অনুসরণ করিয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিল। ওদিকটা এখনও দেখা হয় নাই।

পথটি বাড়ির পাশ দিয়া গিয়া পিছনে খিড়কির দরজার কাছে শেষ হইয়াছে। গৌর-মোহন দরজা ঠেলিয়া দেখিল ভিতর হইতে বন্ধ। তারপর সে পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

banglabooks.in

পিছন দিকে পাঁচিল নাই, তৎপরিবর্তে চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। যেখানে সিঁড়ি শেষ হইয়াছে, সেখানে স্বচ্ছ শীর্ণ একটি নদী বিরল-বাস পাহাড়ী মেয়ের মত শুইয়া আছে। ওপারে শিলাখণ্ড রচিত ঢালু পাড়।

বাড়ির পিছন দিকে লুকানো এই দৃশ্যটি দেখিয়া গৌরমোহন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। চারিদিকের শিলাসংকুল শুষ্কতার মাঝখানে দৃশ্যটি যেন আরও শ্রীমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা এই নিভৃত স্থানে বাড়ির পিছন দিকে পাথর বাঁধানো ঘাট তৈয়ার করিয়াছিল, তাহারা কাল-স্রোতে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘাটটি এখনও জীবন্ত রহিয়াছে, নূতন মানুষের পদধ্বনি শুনিবার আশায় উৎসুক চক্ষে অপেক্ষা করিতেছে।

গৌরমোহন ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার শিল্পী-চক্ষু চারিদিকে ফিরিয়া দৃশ্যটির রস গ্রহণ করিল। তারপর সে জুতা খুলিয়া ঘাটের নিম্নতম পৈঠায় গিয়া পা ডুবাইয়া দাঁড়াইল। কী ঠাণ্ডা জল! রক্তচক্ষু সূর্যের ভয়ে বাতাসের সমস্ত শীতলতা যেন এই জলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। সে নত হইয়া মুখেচোখে জল দিল, মনে মনে স্থির করিল কাল সকালে উঠিয়াই নদীতে স্নান করিবে।

ঘাট হইতে ফিরিবার পথে গৌরমোহন আবার পথের অস্পষ্ট রেখা দেখিতে পাইল।

আসিবার সময় লক্ষ্য করে নাই, ঘাট হইতে খিড়কি দরজা পর্যন্ত রেখা রহিয়াছে। সে একটু বিমনা হইল। শিয়াল-কুকুরের পায়ের দাগ শিয়াল-কুকুর সদর দরজায় আসে কেন, এবং সেখান হইতে ঘাটেই বা যায় কি জন্য?

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে গৌরমোহন আবার বাড়ির সামনের দিকে উপস্থিত হইল।

সূর্য অসম দিগন্ত-রেখা স্পর্শ করিয়াছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলিল।

ফটকের পাকুড় গাছের নিচে ছায়া-ছায়া হইয়া আসিয়াছে। যেখানে গাছের ডালে খাবারের পুঁটুলি টাঙাইয়া দিয়াছিল, গৌরমোহন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

দেখিল পুঁটুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

৩

গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের পর দিনের আলো বেশীক্ষণ থাকে না। তাই অন্ধকার হইবার আগেই গৌরমোহন গিয়া নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেল। অবশ্য সব জিনিসপত্র আজই মোট খুলিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কিছু জিনিস আজ রাত্রেই প্রয়োজন হইবে। লণ্ঠন, মোমবাতি, স্টোভ ইত্যাদি এবং বিছানা।

বাড়িতে আসবাবপত্র কিছুই ছিল না, কিন্তু গৌরমোহনের মনে পড়িল একটা ঘরে সে একটি লোহার খাট দেখিয়াছে। সে গিয়া আবার দেখিয়া আসিল, হ্যাঁ, পশ্চিম দিকের ঘরের এক কোণে একটি সরু লোহার খাট আছে। সে খাটটিকে টানিয়া জানালার সামনে আনিল। জানালায় মোটা মোটা গরাদ আছে, কিন্তু কাচ বেশীর ভাগ ভাঙা। গ্রীষ্মকালে তাহাতে কোনই অসুবিধা নাই।

গৌরমোহন হোল্ড্-অল্ টানিয়া আনিয়া বিছানা পাতিয়া ফেলিল। বিছানা বালিশ সবই নূতন, বন্ধু মোহনলাল যোগাড় করিয়া দিয়াছে।

বন্ধু বটে মোহনলাল! যেমন তার বিষয়বুদ্ধি, তেমনি তার বন্ধুপ্রীতি, এক জোড়া নূতন চটি জুতাও বিছানার মধ্যে দিতে ভুলে নাই। রাত্রে পরিবার জন্য সিল্কের পাজামা-সুট্ দিয়াছে।

গৌরমোহন জুতা খুলিয়া চটি পরিল, তারপর হৃষ্টমনে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিল। বাক্স, প্যাকিং কেস, চটের বস্তা প্রভৃতিতে কোথায় কি আছে মোহনলাল বলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু গৌরমোহনের ভাল মনে নাই। সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া প্রথমে ট্রাঙ্ক

banglabooks.in

খুলিল। ট্রাঙ্কটা মোহনলালের, তাহার ভিতরের কাপড়-জামা-তোয়ালে প্রভৃতিও মোহনলালের, বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দিয়াছে। দুই বন্ধুর শরীরের মাপ একই রকম, একের জামা অন্যে পরিলে বেমানান হয় না। উপরন্তু ট্রাঙ্কে সাবান, কেশতৈল, দাড়ি কামাইবার যন্ত্রপাতি, আয়না, চিরুনি আছে। একটি বৈদ্যুতিক টর্চও আছে।

গৌরমোহনের মন খুশি হইয়া উঠিল। নিত্যব্যবহার্য সকল বস্তুই বন্ধু দিয়াছে। সে টর্চটি লইয়া পকেটে রাখিল, তারপর ট্রাঙ্ক সরাইয়া ছোট প্যাকিং কেসটা টানিয়া লইল। ওই লম্বা প্যাকিং কেসটায় ইজেল্ ক্যাম্বিস প্রভৃতি ছবি আঁকার সরঞ্জাম আছে, সেটা আজ খুলিবার দরকার নাই; এটাতে কি আছে দেখা যাক। শূন্য বাড়িতে নূতন করিয়া সংসার পাতিবার আনন্দে গৌরমোহন মাতিয়া উঠিল।

প্যাকিং কেসের ঢাকনা চাড় দিয়া খুলিয়া দেখিল, ঘরকন্নার জিনিস। একটা ছোট্ট হ্যারিকেন লণ্ঠন, দুই বাণ্ডিল মোমবাতি, স্টোভ, স্পিরিটের বোতল; চায়ের প্যাকেট, টিনের দুধ, চিনি, কেট্‌লি, টি-পট্, পিরিচ পেয়ালা, এমন কি দুধের টিন খুলিবার যন্ত্রটা পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

গৌরমোহনের মন যেমন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল, তেমনি চায়ের পিপাসাও জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার সায়াহ্নিক চা পানের গোধূলি লগ্ন উপস্থিত; আজ যে তাহাকে স্বপাক চা খাইতে হইবে, তাহা স্মরণ ছিল না। সে হৃষ্টমনে চা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সঙ্গে বড় একটা ফ্লাস্কে জল আছে, কিন্তু নদী হইতে জল আনিয়া চা প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। গৌরমোহন কেট্‌লি হাতে লইয়া উঠিল, সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া পিছনের দরজার দিকে চলিল। বাড়ির ভিতরে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে।

পিছনের দরজাটি ভিতর দিক হইতে হুড়কা ও ছিটকিনি লাগানো। কবাট খুলিবার সময় মরিচা-ধরা কব্জায় ক্যাঁ-চ্ করিয়া একটা করুণ শব্দ হইল। কিন্তু কবাটে জাম ধরে নাই, সহজেই খুলিয়া গেল।

বাহিরে একটু আলো আছে, নদীর ছোট্ট বুকে সন্ধ্যার ছোপ ধরিয়াছে। গৌরমোহন কেট্‌লিতে জল ভরিয়া ফিরিয়া আসিল, দরজা আবার বন্ধ করিয়া দিল।

স্টোভ জ্বালিয়া সে জল চড়াইয়া দিল।

এক পেয়ালা জল গরম হইতে বেশি সময় লাগিবে না, ইতিমধ্যে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি জ্বালিল। স্টোভের ছোট্ট নীল-কমলটির পাশে পীতবর্ণ একটি বুদ্বুদ ফুটিয়া উঠিল। ঘরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, একটু একটু হালকা হইল।

পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যে চা তৈরি হইয়া গেল। গৌরমোহন তখন ইক্‌মিক্ কুকার খুলিয়া তাহার খোলের ভিতর হইতে খাবার বাহির করিল। আলাদা টিফিন-বক্স না দিয়া বন্ধু কুকারের মধ্যেই খাবার দিয়াছে। একটা খোলের মধ্যে চিংড়ি মাছের কাটলেট ও হিঙের কচুরি, অন্য খোলে কড়া পাকের সন্দেশ। তাছাড়া একটা বড় পাঁউরুটি, চীজ, মাখন ইত্যাদি আছে। প্রচুর খাবার।

গৌরমোহন দুইটি সন্দেশ বাহির করিয়া খাইতে বসিল। সঙ্গে নিশ্চয় আসন আছে, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক হাঙ্গামা। বিশেষত মেঝে বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে, ধুলা নাই।

সে তরিবত করিয়া সুগন্ধি চায়ের পেয়ালাটি মুখে তুলিতে যাইবে, এমন সময় সদর দরজায় খুট খুট শব্দ হইল।

গৌরমোহন চমকিয়া মুখ তুলিল। তারপর গলা চড়াইয়া বলিল, 'কে?'

দরজার ওপার হইতে কেহ সাড়া দিল না, কিন্তু আবার খুট খুট শব্দ হইল।

গৌরমোহন উঠিয়া গিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল, আবার প্রশ্ন করিল, 'কে?' কি চাও?'

এবারও সাড়া নাই।

গৌরমোহন একটু ইতস্তত করিল; যদি চোর-ডাকাত হয়! কিন্তু চোর-ডাকাত তাহার কী লইবে? সে সাহস করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

banglabooks.in

বাহিরে কেহ নাই, কেবল অন্ধকার।

গৌরমোহন পকেট হইতে টর্চ লইয়া বাহিরে আলো ফেলিল। আলোর সীমানার মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না। মানুষ তো নাই-ই, কুকুর বিড়ালও নাই।

গৌরমোহন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। টর্চের আলোয় যে বৃত্তাভাস রচিত হইয়াছে তাহার বাহিরে কিছু দেখা যায় না। একটা এলোমেলো বাতাস উঠিয়াছে। গৌরমোহন এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল; ভাবিল, হয়তো হাওয়ার ধাক্কায় দরজায় শব্দ হইয়াছিল। পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে।

দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সে চা খাইতে বসিল। বসিয়াই কিন্তু চমকিয়া উঠিল। প্লেটে একটি কাটলেট ও একটি সন্দেশ রহিয়াছে।

সে সচকিত ভাবে ঘরের চারিদিকে চাহিল। তবে কি বিড়াল ঢুকিয়াছিল? তাহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া কাটলেট ও সন্দেশ লইয়া পালাইয়াছে? নিশ্চয় বিড়াল। তা ছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাইবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না; সে খাবারের প্লেট এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া চায়ের পেয়ালা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে হইবে বিড়ালটা বাড়ির মধ্যে কোথাও লুকাইয়া আছে কি না।

টর্চ লইয়া গৌরমোহন প্রত্যেকটি ঘর দেখিল, কিন্তু কোথাও বিড়াল নাই। অবশ্য কাচ-ভাঙা জানালা দিয়া পলায়ন করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তবু গৌরমোহনের মনটা সংশয়-কণ্টকিত হইয়া রহিল; এতগুলো লোক যাহা বলিতেছে, তাহাই যদি সত্য হয়?

বিছানার পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গৌরমোহন ভাবিতে আরম্ভ করিল। প্রেতযোনি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে ভয় করিব কেন? ভূতে মানুষের ঘাড় মটকায় একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

মনে পড়িল, স্টেশন মাস্টারকে সে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিল—ভালই হল, একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। যদি সত্যিই এ বাড়িতে ভূত-প্রেত থাকে—যদিও এ পর্যন্ত স্পষ্ট নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই—তাহাতে ক্ষতি কি? সে তো ভূতের কোনও অনিষ্ট করে নাই, বরং ভূতই তাহার খাবার খাইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার প্রতি ভূতের কোনও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। ভূতের যদি খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লোভ থাকে, বেশ তো, ভূতের সঙ্গে সে নিজের খাবার ভাগ করিয়া খাইবে।

এইভাবে নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা গৌরমোহন মনকে দৃঢ় করিতেছে, এমন সময় বাহিরের ঘর হইতে অস্পষ্ট একটা শব্দ তাহার কানে আসিল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করিয়াছিল, বাড়ির ভিতরে কি বাহিরে, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই, ঝিঁঝির আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাইতেছে না। হাওয়া উঠিয়া যে শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাও থামিয়া গিয়াছে। তাই এত গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সামনের ঘরের সামান্য আওয়াজটা সে শুনিতে পাইল।

গৌরমোহন নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা সামনের ঘরেই ছিল, সে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া ঘরে উঁকি মারিল। কেহ নাই। তখন সে টর্চ জ্বালিয়া দ্রুত ঘরের চারিদিকে ঘুরাইল। সদর দরজা আগের মতই বন্ধ, ঘর শূন্য। কিন্তু—

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বলিয়া যে খাবারগুলি সে সরাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি নাই, প্লেট খালি।

গৌরমোহন মনে মনে মন্তব্য করিল—'পেটুক ভূত। তেলেভাজা থেকে সন্দেশ পর্যন্ত কিছু বাদ দেয় না।'

৪

গৌরমোহন হাতের ঘড়ি দেখিল—সাড়ে আটটা।

গ্রীষ্মকালের পক্ষে এমন কিছু বেশী রাত্রি নয়। কিন্তু সঙ্গীহীন অবস্থায় কাহারও

banglabooks.in

সহিত কথা না বলিয়া কতক্ষণ জাগিয়া থাকা যায়! ট্রেনের হট্টরানিতে শরীরও ক্লান্ত। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়া যাইতে পারে। কাল ভোরে উঠিয়া নদীতে স্নান করিতে হইবে।

গৌরমোহন আহার শেষ করিল। তারপর একটি কৌটায় কিছু খাবার রাখিয়া ঢাকনা বন্ধ করিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিল। বিড়াল ঢাকনা খুলিয়া খাইতে পারিবে না, কিন্তু ভূতের যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সে স্বচ্ছন্দে খাইতে পারিবে। নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

সামনের এবং পিছনের দরজা বন্ধ আছে কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সে শয়ন করিল। লণ্ঠনটা কমাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিল। টর্চ বালিশের পাশে রহিল।

খোলা জানালা দিয়া ফুরফুরে বাতাস আসিতেছে। আকাশের দক্ষিণ দিকে কয়েকটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছে। গৌরমোহন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

খাসা বাড়িটি; এতদিন শূন্য পড়িয়া আছে, কিন্তু মনে হয় না পোড়ো বাড়ি। কে বাড়িটি এমন তকতকে ঝকঝকে করিয়া রাখিয়াছে? ভূত? হয়তো আছে। কিন্তু নিরীহ ভূত, কোনও প্রকার গণ্ডগোল নাই। ভূতের সঙ্গে ভাব-সাব করিয়া কথাবার্তা বলা যায় না কি?

ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল...কলিকাতায় মাতৃদেবী বোধ করি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? ওই দুম্বো মেয়েটাকে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না...

গৌরমোহনের ঘুম ভাঙিল সকাল পাঁচটার সময়। বাহিরে দিনের আলো ঝলমল করিতেছে, সূর্য উঠিতে বিলম্ব নাই।

সে উঠিয়া বসিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল।

রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছে, এক ঘুমে রাত কাবার হইয়া গিয়াছে। ভূতের উৎপাত কিছু হয় নাই। তবু তাহার মনে হইল ঘুমের মধ্যে সে নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছে। কে যেন তাহার খাটের চারিপাশে সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, শিয়রে দাঁড়াইয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, পাখির পালকের মত নরম হাতে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু উহা স্বপ্নই। গত রাত্রে তাহার জাগ্রত মনের মধ্যে যে সংশয়গুলা ঘুরিতেছিল, তাহারাই বোধ হয় স্বপ্নে নব-কলেবর ধরিয়া দেখা দিয়াছিল।

গৌরমোহন উঠিয়া পড়িল।

সাবান তোয়ালে লইয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে ঘাটে স্নান করিতে চলিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে অবগাহন স্নান করিলে সারাদিন শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

খিড়কির দরজা খুলিতে গিয়া গৌরমোহন আজ প্রথম ধাক্কা খাইল। খিড়কির দরজা ভেজানো রহিয়াছে বটে, কিন্তু খিল ও ছিটকিনি খোলা। তাহার বুকের ভিতরটা একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কাল রাত্রে শয়নের পূর্বে সে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিল দরজা বন্ধ আছে। তবে—?

সে স্থির হইয়া চিন্তা করিল। ভূত আছে, কাল রাত্রে দরজা বন্ধ করার সময় সে বাড়ির মধ্যে ছিল, তারপর কোনও সময় দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়াছে। কিন্তু এ কি রকম ভূত? বাহিরে যাইবার জন্য দরজা খোলে কেন? প্রেতযোনি তো অশরীরী! কিন্তু না, ভয় পাইলে চলিবে না। ভূতের সঙ্গে যখন এক বাড়িতে বাস করিতে হইবে, তখন ভয় করিলে চলিবে না। বিশেষত ভূত যেমনই হোক, তাহার স্বভাবটি শান্ত-শিষ্ট। গৌরমোহন এ বাড়িতে আসাতে সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে কেন সে ভূতকে ভয় করিবে? ভূতের ভয় একটা কুসংস্কার।

নদীর ঘাটে পৌঁছিয়া গৌরমোহন দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাইল। ঘাটের মাথায় দাঁড়াইয়া সে দেখিল, ঘাটের কিনারায় নদীর শান্ত জল তোলপাড় হইতেছে। জলে কেহ নাই, অথচ মনে হইতেছে কেহ হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার কাটিতেছে। কিংবা একটা বিরাট মাছ জলের তলায় থাকিয়া ল্যাজের ঝাপটায় জল মথিত করিয়া তুলিতেছে।

গৌরমোহন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা আর একবার ধ্বক্

banglabooks.in

ধ্বক্ করিয়া উঠিল।

হঠাৎ জলের আলোড়ন শান্ত হইল। একটা চীৎকারের মত শব্দ শোনা গেল, যেন স্নাতক আগন্তুককে দেখিতে পাইয়াছে। তারপর আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। গৌর-মোহন বিস্ময়াহত চক্ষে দেখিল—জলের প্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র কম্পন রাখিয়া একজোড়া সজল চরণচিহ্ন ধাপে ধাপে উঠিয়া আসিতেছে! মানুষ নাই, কেবল মানুষের ভিজা পায়ের দাগ।

পায়ের দাগ ঘাটের পৈঠাগুলিকে অতিক্রম করিয়া মাটির ওপর অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৌরমোহন কিছুক্ষণ পায়ের দাগগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে সোপানের পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ অতিপ্রাকৃত ব্যাপার দেখিয়া বুকে ধড়ফড়ানির অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, সে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।—এ কী কাণ্ড! এ কেমন প্রেত? এ প্রেতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, দরজা খুলিয়া সে বাড়ির বাহিরে আসে, নদীর জল উদ্বেলিত করিয়া স্নান করে। সবই মানুষের মত, কেবল চোখে দেখা যায় না।

হয়তো সব প্রেতই এই রকম, মানুষ তাহাদের সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণা করিয়া বসিয়া আছে।

সজল পদচিহ্নগুলি তাহার চোখের সামনে শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ ঘাটে বসিয়া থাকিবার পর গৌরমোহন জলে নামিয়া স্নান করিল। দেহ শীতল হইল, মনও অনেকটা শান্ত হইল।

বাড়িতে ফিরিয়া সে সদর দরজা খুলিয়া দিল, তারপর চা তৈয়ার করিতে বসিল। স্টোভ ও লণ্ঠনের জন্য কেরাসিন যোগাড় করিতে হইবে। ইক্‌মিক্ কুকারের জন্য কাঠ-কয়লা দরকার।

চা প্রস্তুত হইলে পাঁউরুটিতে মাখন মাখাইয়া সে খাইতে বসিল। খাইতে বসিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, কাল রাত্রে ডিবার মধ্যে খাবার রাখিয়াছিল ভূত খায় কিনা দেখিবার জন্য। ডিবাটা ঢাকনা-ঢাকা ছিল। গৌরমোহন সেটা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিল। হুঁ।

খালি কৌটার দিকে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর শূন্যের দিকে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমি এখন কিছু খাবে?'

গৌরমোহন কান খাড়া করিয়া রহিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। প্রেত বোধ হয় কথা বলিতে পারে না। সে আর এক পেয়ালা চা ঢালিল, দু স্লাইস্ রুটিতে মাখন লাগাইয়া খানিকটা দূরে রাখিয়া আসিল।

তারপর পানাহার করিতে করিতে আড়চোখে দেখিতে লাগিল।

প্রেত কিন্তু খাইতে আসিল না, চা-রুটি যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া গৌরমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরটা বড় অগোছালো হইয়া আছে, বস্তাগুলোও খোলা হয় নাই। এইবার লাগা যাক। একটা অসুবিধা এই যে, বাড়িতে একটিও ফার্নিচার নাই। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা কাবার্ড যদি থাকিত! যা হোক, মেঝের জিনিসপত্র গুছাইয়া কাজ চালাইতে হইবে।

পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইয়া গৌরমোহন প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় খোলা দরজা দিয়া বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ফটকের কাছে একটা লোক উঁকিঝুঁকি মারিতেছে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না। বোধ হয় মুদি, গৌরমোহন বাঁচিয়া আছে কিনা দেখিতে আসিয়াছে।

গৌরমোহন দ্বারের বাহিরে আসিয়া হাতছানি দিয়া মুদিকে ডাকিল।

মুদি তখন চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, 'হুজুর, আপ জিন্দা হ্যায়!'

গৌরমোহন হাসিয়া বলিল, 'আলবৎ জিন্দা হ্যায়। তুমি কি ভেবেছিলে ভূতে আমার ঘাড় মটকেছে?'

মুদির বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে খুশি হইতে পারে নাই। ভূত যেন তাহার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়াছে।

অবশেষে মুদি বলিল, 'কিছু দেখেননি?'

banglabooks.in

'ভূত দেখিনি।'

মুদি এবার সত্য সত্যই অসন্তুষ্ট হইল, বলিল, 'আপনারা ম্লেচ্ছ, তাই দেও আপনাকে দেখা দেয়নি। কিন্তু আছে, একদিন দেখবেন।'

গৌরমোহন হাসিয়া বলিল, 'আমি তো তাকে দেখবার জন্যে চোখ পেতে আছি। কিন্তু ও-কথা থাক। আমার এক বোতল কেরাসিন আর কিছু কাঠ-কয়লা চাই। তুমি এনে দিতে পারবে?'

মুদি বলিল, 'এখন পারব না। আধ-ঘণ্টা পরে ট্রেন আসবে, এখনও আমার জিলিপি ভাজা বাকি। তবে আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, দিতে পারি।'

'বেশ, চল।'

গৌরমোহন সদর দরজায় তালা লাগাইয়া মুদির সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

ফটকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আজ ভোরবেলাই এদিকে এলে যে?'

মুদি পাকুড় গাছের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'দেওয়ের জন্যে ভোগ এনেছিলাম।'

গৌরমোহন দেখিল পাকুড় গাছের ডালে শালপাতার মোড়ক ঝুলিতেছে। সে প্রশ্ন করিল, 'তোমরা ক'বার ভূতের ভোগ চড়াও?'

'দিনে একবার চড়াই। কখনও সকালে, কখনও বিকেলে।'

'ও—তাই ভূতের পেট ভরে না!'

মুদি সচকিতে তাহার পানে চাহিল, 'পেট ভরে কিনা আপনি জানলেন কি করে?'

গৌরমোহন উত্তর দিল না, শুধু হাসিল।

৫

আধ ঘণ্টা পরে গৌরমোহন ফিরিয়া আসিল। এক হাতে গলায় দড়ি বাঁধা কেরাসিনের বোতল, অন্য হাতে কাঠ-কয়লার পুঁটুলি। ফটক পার হইবার সময় সে দেখিল, পাকুড় গাছের ডালে খাবারের মোড়ক যেমন ঝুলিতেছিল, তেমনি ঝুলিতেছে, ভূত তাহা লইয়া যায় নাই।

গৌরমোহন মনে মনে হাসিল।

ভূতের বোধহয় লাড্ডু ও পকৌড়িতে আর রুচি নাই।

তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরটি পরিষ্কার ভাবে ঝাঁট দেওয়া, কিন্তু জিনিসপত্র মোটঘাট একটিও সেখানে নাই।

গৌরমোহনের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

কেরাসিনের বোতল এবং কয়লা নামাইয়া রাখিয়া সে ছুটিয়া ভিতরে গেল। তাহার শয়নের ঘরটিও পরিষ্কৃত হইয়াছে। এবং তাহার ট্রাঙ্কটি ঘরের এক পাশে রাখা রহিয়াছে।

অতঃপর গৌরমোহন অন্য সব ঘরগুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার কোনও জিনিস খোয়া যায় নাই। যে বস্তুগুলি খোলা হয় নাই, সেগুলি অন্য একটি ঘরে রাখা হইয়াছে, ইক্‌মিক্ কুকার স্টোভ ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য রান্নাঘরে শোভা পাইতেছে। যে দুটি পেয়ালায় সে চা ঢালিয়াছিল, সে দুটি ধোয়া-মোছা অবস্থায় রান্নাঘরে রহিয়াছে। প্লেট দুটিও তাই।

গৌরমোহন প্রকাণ্ড একটি হাঁফ ছাড়িয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'তোমাকে ধন্যবাদ। আমার অনেক কাজ গুছিয়ে দিয়েছ।'

ভূতের নিকট হইতে কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। কিন্তু গৌরমোহন বেশ স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল। এমন সহৃদয় ভূতকে সঙ্গীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভূত তাহার আগমনে রাগ করে নাই, বরং খুশি হইয়াছে। গৌরমোহন কাজে লাগিয়া গেল; বস্তা, প্যাকিং কেস্ প্রভৃতি খুলিয়া জিনিসগুলি যথাযোগ্য স্থানে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। ছবি আঁকার জিনিসগুলিকে একটি ঘরে রাখিয়া আসিল; এই ঘরটি হইবে তাহার ছবি আঁকার ঘর।

banglabooks.in

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাজানো-গোছানো সম্পন্ন হইল। তখন সে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল ভূত কোন্ ফাঁকে কেরোসিনের বোতল এবং কয়লা রান্নাঘরে রাখিয়া আসিয়াছে। ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভূত, অগোছালো এলোমেলোভাব একেবারে পছন্দ করে না।

এতক্ষণে বেশ বেলা বাড়িয়াছে। গৌরমোহনের মনে পড়িল, হাতঘড়িটা রাত্রে বালিশের তলায় রাখিয়া শুইয়াছিল, আজ সকালে দম দেওয়া হয় নাই। সে শয়নঘরে গিয়া বালিশ উল্টাইয়া দেখিল ঘড়ি যথাস্থানে আছে এবং তাহাতে দম দেওয়া হইয়াছে। সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

ঘড়িতে এখনও আটটা বাজে নাই। সুতরাং রান্না চড়াইবার তাড়া নাই। ইতিমধ্যে কি করা যায়? ভূতের সঙ্গে আলাপ জমাইতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু ভূত যে কথা কয় না! এক তরফা বাক্যালাপ কতক্ষণ চালানো যায়? তবু গৌরমোহন চেষ্টার ত্রুটি করিল না, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অশরীরীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল, 'দ্যাখো, তোমার নাম জানি না, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, আমার কত কাজ করে দিয়েছ...আমার বন্ধুভাগ্য খুব ভাল, ওদিকে মোহনলাল আর এদিকে তুমি...এস না দু'জনে বসে খানিক গল্প করি...তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না—আমার চেয়ে তোমার চোখের জ্যোতি বেশী—কিন্তু তুমি কথা কও না কেন? বল না দুটো কথা, শুনি...আচ্ছা, আজ কি রান্না করব বল। আমার সঙ্গে চাল, মুগের ডাল, ময়দা, আলু পটোল, পেঁয়াজ আছে। ভাল ঘি আছে, খাঁটি সর্ষের তেল আছে। বল না কী রাঁধি, তুমি যা বলবে তাই রাঁধব! দু'জনে মিলে খাওয়া যাবে।...'

কিন্তু কোনও ফল হইল না। গৌরমোহন অনুভব করিল ভূত কাছেই আছে, তাহার কথা শুনিতেছে, তাহাকে দেখিতেছে। কিন্তু কথা কহিতেছে না। হয়তো ভূতেরা কথা বলিতে পারে না। গৌরমোহন আর কিছুক্ষণ ভূতকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

নটা বাজিলে গৌরমোহন দাড়ি কামাইতে বসিল। দাড়ি কামাইবার জরুরী প্রয়োজন ছিল না, এখানে কে-ই বা তার দাড়ি লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু সময় কাটাইবার জন্য একটা কিছু করা চাই তো। ছবি আঁকার যোগাড়-যন্ত্র করিতে পারিত, কিন্তু সকাল হইতে তাহার মন চঞ্চল হইয়া আছে, ছবি আঁকায় মন বসিবে না।

দাড়ি কামাইবার ক্ষৌর-যন্ত্রগুলি ঘাটে গিয়া পরিষ্কার করিয়া আসিতে সাড়ে ন'টা বাজিল। এবার রান্না চড়ানো যাইতে পারে। বেশী কিছু নয়, ভাত, আলুভাতে আর আলু-পটোলের ডালনা। সঙ্গে ঘি আছে, ইহাতেই এ বেলা চলিয়া যাইবে। ও বেলা না হয় ভাল করিয়া রাঁধা যাইবে। গৌরমোহন রন্ধন ব্যাপারেও একজন শিল্পী!

রান্নাঘরে গিয়া সে প্রথমে নদী হইতে এক বালতি জল লইয়া আসিল। তারপর চাল ধুইয়া এবং আলু-পটোল কুটিয়া কুকারে রান্না চড়াইয়া দিল।

দুই ঘণ্টা আর কোনও কাজ নাই। গৌরমোহন গুন গুন স্বরে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইল, ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিল, আসিবার সময় হাওড়া স্টেশনে কয়েকটি লোমহর্ষণ উপন্যাস কিনিয়াছিল, সেগুলির পাতা উল্টাইল, ভূতের সঙ্গে আর একবার ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করিল। তারপর বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পা নাড়িতে নাড়িতে কলিকাতার পরিস্থিতির কথা ভাবিতে লাগিল। মাতৃদেবী বোধ হয় এতক্ষণ কলিকাতা শহর চষিয়া ফেলিতেছেন! তিনি যদি জানিতে পারেন মোহনলাল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না, মোহনের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে।

বারোটার সময় গৌরমোহন আহার করিতে বসিল। সঙ্গে একটি মাত্র বগি থালা ছিল, সেটিতে ভূতের জন্য ভাত বাড়িল। নিজের জন্য রেকাবি লইল। আহার করিতে করিতে ভূতকে বলিল, 'তুমি খেতে বসলে পারতে, এক সঙ্গে খাওয়া চুকিয়ে নেওয়া যেত। যাহোক, তোমার যেমন ইচ্ছে। আমার সামনে খেতে যদি সঙ্কোচ হয়—'

banglabooks.in

একাকী আহার সম্পন্ন করিয়া গৌরমোহন শয়নঘরে ফিরিয়া গেল। একটি লোমহর্ষণ উপন্যাস লইয়া শয়ন করিল। দিবানিদ্রা তাহার অভ্যাস নাই, একটু ঝিম্‌কিনি দিয়া ভাতের নেশা কাটাইয়া উঠিয়া পড়িবে।

লোমহর্ষণ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল। তন্দ্রার মধ্যে সে শুনিতে পাইল খিড়কি দরজা খোলার ক্যাঁ—চ্ শব্দ হইল। বোধ হয় ভূত দরজা খুলিয়া নদীর ঘাটে গেল।...আলুভাতে আলু-পটোলের ডালনা ভূতের কেমন লাগিল কে জানে...

গৌরমোহন ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার দেহ-মনে বোধ হয় অলক্ষিতে কিছু ক্লান্তি জমা হইয়াছিল, একেবারে ঘুম ভাঙিল বেলা তিনটায়। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, মুখে-চোখে জল দিবার জন্য রান্নাঘরে গেল। দেখিল দুপুরবেলার উচ্ছিষ্ট বাসন-কোসন ভূত মাজিয়া ধুইয়া ঘরের কোণে উপুড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মনে মনে ভূতকে ধন্যবাদ জানাইয়া সে জল পান করিল, তারপর ছবি আঁকার ঘরে গিয়া ছবি আঁকিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ঘরের একটা জানালা পিছন দিকে, এই জানালা দিয়া নদী ও ঘাটের দৃশ্য দেখা যায়। বাহিরে অপরাহ্নের সঞ্চিত সূর্যতাপ নিথর বাতাসে সূক্ষ্ম বাষ্পের মত স্পন্দিত হইতেছে। গৌরমোহন জানালার কাছে ইজেল খাড়া করিল, একটা প্যাকিং কেস্ টানিয়া আনিয়া তাহার উপর বসিল। কি আঁকিবে তাহা সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। শুষ্ক প্রাণহীন শূন্যতার মাঝখানে একটি ছোট বাড়ি। বাড়িটি জীবন্ত, তাহার ছোট ছোট দরজা-জানালা যেন তাহার মুখ-চোখ। বিপুল শূন্যতার মাঝখানে বসিয়া বাড়িটি হাসিতেছে। ছবির নাম—শূন্যে শুধু শূন্য নয়।

মনে ছবির প্ল্যান ঠিক করিয়া লইয়া সে আঁকিতে আরম্ভ করিল। তেল রঙ ছবি আঁকিতে গৌরমোহনের সুবিধা হয়, সে প্যালেটে রঙ মিশাইল। প্রথমটা ধীরে ধীরে আঁকিল, তারপর মন বসিয়া গেল।

কতক্ষণ আপন মনে ছবি আঁকিতেছে তাহার জ্ঞান ছিল না। ঘাড়ের কাছে আতপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। ভূত বোধ করি ছবি আঁকা দেখিতে দেখতে তন্ময় হইয়া শিল্পীর ঘাড়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, গৌরমোহন সচকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আঁ!'

মনে হইল, যে পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল সে চট্ করিয়া পিছু হটিল। গৌরমোহন মুহূর্ত-মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'ও—তুমি! আমার ছবি আঁকা দেখছ? বেশ বেশ। তা যেটুকু এঁকেছি কেমন মনে হচ্ছে? এখন বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না, আর একটু আঁকা হলে বুঝতে পারবে।'

গৌরমোহন আবার আঁকায় মন দিল। আঁকিতে আঁকিতে ভূতের উদ্দেশে দুই-চারটি কথা বলে, আবার আঁকে। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ চলিবার পর এক সময় সে অনুভব করিল যেন ঘরের আলো কমিয়া আসিতেছে। শুধু তাই নয়, বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে তুলি ফেলিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল।

সূর্যের আলো কেমন যেন ঝালসা হইয়া গিয়াছে। তারপরই তাহার চোখ পড়িল নদীর ওপারে ঈশান কোণে ধূসর-পিঙ্গল মেঘ মাথা তুলিয়াছে। একটা দমকা হাওয়া আগাছার ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। নদীর নিস্তরঙ্গ জল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

গৌরমোহন সানন্দে বলিয়া উঠিল, 'ঝড় আসছে! ঝড় আসছে!'

চৈতালি ঝড়। নূতন কিছু নয়, প্রতি বৎসরই আসে। একবার এই বাড়ির সকলকে বজ্রাহত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

৬

দেখিতে দেখিতে বিদ্যুজ্জিহ্ব ঝড় আসিয়া পড়িল, আকাশে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ

banglabooks.in

বাঁধিয়া গেল! শন্‌শন্‌ বাতাস, চক্‌মক্‌ বিদ্যুৎ, গম্‌গম্‌ বজ্রগর্জন। বৃষ্টির মুষলধারে আকাশের কোথাও তিলমাত্র ছিদ্র রহিল না।

গৌরমোহনের মন ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিল। সে আঁকার সরঞ্জাম ঘরের একপাশে সরাইয়া রাখিয়া জানালাগুলো বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল। সব জানালা বন্ধ হইল না, ভাঙা কাচের ভিতর দিয়া বৃষ্টির ছাট আসিতে লাগিল। সে পুলকিত দেহে বাড়ির ঘরে ঘরে অকারণ সঞ্চরণ করিতে করিতে তারস্বরে গান জুড়িয়া দিল। গানটা অবশ্য সর্বাংশে স্থানকালে উপযোগী নয়, তবু বর্ষার গান বটে—

আহা রে ওই ডাকছে ডোবায় ব্যাংগুলি
মনের সুখে ছড়িয়ে তাদের ঠ্যাংগুলি।
আকাশেতে ছুটোছুটি মেঘে হাওয়ায় ঝটোপটি
ভূত-পেরেতে দাঁত্যি-দানায় খেলছে যেন ডাংগুলি।

বর্ষার মহিমাজ্ঞাপক অন্য কোনও গান জানা না থাকায় সে এই গানটিই অনেকক্ষণ ধরিয়া গাহিল।

কড়্‌ কড়্‌ শব্দ করিয়া কোথাও বাজ পড়িল।

গৌরমোহন খাটের কিনারায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার শিল্পী-মন প্রকৃতির এই উদ্দাম উন্মাদনাকে রঙের ফাঁদে ধরিবার ফন্দি আঁটিতেছে।

কড়্‌ কড়্‌ কড়াৎ! এবার যেন বাড়ির খুব কাছেই বাজ পড়িল। বিদ্যুতের ঝলক এবং বাজের আওয়াজ প্রায় একসঙ্গেই তাহার চক্ষু-কর্ণ ধাঁধিয়া দিল।

তারপরই—লোমহর্ষণ কাণ্ড!

গৌরমোহনের কানের কাছে ভাঙা ভাঙা অস্ফুট স্বরে—'আমার বড্ড ভয় করছে—' বলিয়া কে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

গৌরমোহনের হৃৎপিণ্ড একটা ডিগবাজি খাইয়া গলার কাছে ধড়ফড় করিতে লাগিল। সে দিশাহারা হইয়া অদৃশ্য জীবনের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার জন্য হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চিৎকার করিতে লাগিল—'কে? কে? ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও!'

কিন্তু সে অদৃশ্য প্রাণীর আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিল না, ধস্তাধস্তি করিতে করিতেই ভাঙা ভাঙা স্বর শুনিতে পাইল—'আমাকে ছেড়ে দিও না—আমার বড্ড ভয় করছে।'

কড়্‌ কড়্‌ কড়াৎ।

তৃতীয়বার বজ্রপাতের শব্দে বাড়িটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা! এই শব্দে গৌরমোহনের ভয়বিহ্বলতা কাটিয়া গেল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা বোধ করি অপ্রাকৃতের ভয়কে দূর করিয়া দিল। এতক্ষণ সে নিজেকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এখন কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অদৃশ্য দেহটাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল।

একটা বাহু। চোখে দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু স্পর্শানুভূতির দ্বারা জানা যাইতেছে, কোমল অথচ দৃঢ়-মাংসল বাহু। গৌরমোহন দুই হাতে অদৃশ্য দেহটাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তুমি কে? ভূত নও?'

শীর্ণ কম্পিত কণ্ঠের উত্তর আসিল, 'না, আমি মানুষ।'

'মানুষ! কিন্তু—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'আমি—আমি—' অদৃশ্য দেহটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গৌরমোহন হাত দিয়া অনুভব করিয়া চলিল। বাহু শেষ হইয়া কাঁধ আরম্ভ হইয়াছে ...কাঁধের ওপর অদৃশ্য চুলের গোছা...তারপর গলা...তারপর—

গৌরমোহন একটা খাবি খাওয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—'আঁ—তুমি মেয়ে!'

ঝড়ের দুরন্ত অভিযান দশ দিক দলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিছনে পড়িয়া আছে ভিজা মাটি এবং বাতাসের অবসন্ন নিশ্বাস।

দুইটি মানুষ খাটের কিনারায় পাশাপাশি বসিয়া আছে। একজন অদৃশ্য, একজন দৃশ্য।

banglabooks.in

থামিয়া থামিয়া কথা হইতেছে। গৌরমোহন চিরদিনই মেয়েদের কাছে মুখচোরা, আজ অভাবিত ঘটনাচক্রে এই অদর্শনা যুবতীর সংস্পর্শ লাভ করিয়া সে আরও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরমোহন বলিল, 'তোমার আর ভয় করছে না তো?'

উত্তর আসিল—'না। মেঘ ডাকলেই ভয় করে।' গলার স্বর এখন একটু স্পষ্ট হইয়াছে।

'ইয়ে—তোমার নামটা এখনও জানা হয়নি। আমার নাম গৌর।'

'আমার নাম ছায়া!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর গৌরমোহন হাতের ঘড়ি দেখিল—'সাড়ে ছ'টা বেজেছে, চায়ের সময় হল। তুমি চা খাবে তো?'

'খাব।'

'চায়ের সঙ্গে লুচি আর আলুভাজা। কি বল?'

'হুঁ।'

খাট হইতে উঠিতে গিয়া ছায়ার গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। গৌরমোহন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। অদর্শনা যুবতী যে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্রা তাহা স্মরণ হইয়া গেল।

রান্নাঘরে গিয়া গৌরমোহন স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল। তারপর ময়দা মাখিতে বসিল। দেখিল তাহার অনতিদূরে বঁটিতে আলু কোটা হইতেছে, চাকা চাকা আলু কোটা হইয়া একটি রেকাবে জমা হইল, তারপর বালতির জলে ধৌত হইয়া তাহার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

'রাত্রে খিচুড়ি রাঁধা যাবে। তুমি খিচুড়ি ভালবাসো তো?'

একটি নিশ্বাস পড়িল—'তেলেভাজা আর লাড্ডু ছাড়া সব ভালবাসি।'

তাই সে নূতন খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। গৌরমোহন সহানুভূতির সুরে বলিল, 'আহা! তেলেভাজা ফুলুরি আর লাড্ডু খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। —তুমি চায়ে ক'চামচ চিনি খাও?'

'অনেক দিন চা খাইনি। যখন খেতুম, পাঁচ চামচ চিনি খেতুম।'

চায়ের জল টি-পটে ঢালিয়া গৌরমোহন লুচি ভাজিতে বসিল।

'আমি লুচি ভাজতে জানি। তুমি সরো—আমি ভাজছি।'

'না, না। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। অনেক কষ্ট করেছ। ঘর পরিষ্কার করেছ, বাসন মেজেছ—'

'আমার ইচ্ছে কচ্ছে—' কণ্ঠস্বরে একটু আদুরে আদুরে ভাব।

'তা—আচ্ছা। তুমি ভাজো।'

গৌরমোহন সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। লুচি ও আলুভাজা প্রস্তুত হইল, রেকাবির উপর সজ্জিত হইল। স্টোভ নিভিয়া গেল।

দু'জনে খাইতে বসিল। গৌরমোহন চা ঢালিল, নিজের পেয়ালায় দু'চামচ চিনি দিল, ছায়ার পেয়ালায় পাঁচ চামচ।

খাওয়া চলিতেছে। ছায়ার রেকাবি হইতে লুচির টুকরো শূন্যে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, চায়ের পেয়ালা ক্রমে ক্রমে খালি হইয়া গেল। গৌরমোহন দেখিতেছে, তাহার বিস্ময় কিছুতেই শেষ হইতেছে না।

'তুমি হঠাৎ কথা কইলে যে! আগে তো কথা কওনি।'

'কথা কইতে ভুলে গিয়েছিলুম। বলতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। তারপর—বাজ পড়ার শব্দ হল। ভয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে গেল।'

গৌরমোহন চায়ে চুমুক দিয়া একটু সঙ্কুচিত হাসিল—'শুধু কথাই বলনি, আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে।'

'বড্ড ভয় করছিল যে!'

banglabooks.in

সরল অকপট উক্তি, লজ্জা নাই। লজ্জা বোধ করি স্ত্রীলোকের দেহচেতনার অভিব্যক্তি। যাহার দেহ দেখা যায় না, সে কিসের লজ্জা করিবে!

'আচ্ছা, কাল আমি যখন এলাম, তুমি আমাকে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। আমি তো পাকুড় গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলুম।'

'আমি যখন বাড়িতে এসে উঠলাম, তখন তোমার কি মনে হয়েছিল?'

'প্রথমটা ভয়-ভয় করছিল। তারপর তোমাকে খুব ভাল লাগল।'

গৌরমোহনের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ভয়ের দুরু দুরু নয়।...

সে-রাত্রে পেট ভরিয়া খিচুড়ি খাইবার পর গৌরমোহন নিজের খাটের পাশে আসিয়া বসিল। ছায়া তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিল। এই কয়েক ঘণ্টায় গৌরমোহনের লজ্জা-সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়াছে। তবু ছায়ার গায়ে গা ঠেকিতে তাহার শরীর একটু রোমাঞ্চিত হইল।

'আচ্ছা, তুমি—মানে—খালি গায়ে থাকতে কোনো ইয়ে হয় না।'

'অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম দু'একবার কাপড় চুরি করে পরেছিলুম, কিন্তু কাপড় পরলে শুধু কাপড়টাই দেখা যায়, আমাকে দেখা যায় না, লোকে ভয় পায়। তাই আর পরি না।'

'ভাল কথা। তুমি রাত্তিরে শোও কোথায়?'

'মেঝেয় শুই।'

'শীতকালে শীত করে না?'

'না। আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'তা হোক। আজ তোমাকে খাটে শুতে হবে। আমি তোষক পেতে মেঝেয় শোব।'

'না। আমি খাটে শোব না।'

'তুমি মেয়ে হয়ে মেঝেয় শোবে আর আমি খাটে শোব, এ হতেই পারে না।'

'আমি খাটে শোব না।' ছায়ার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

'শোবে না! তাহলে মেঝেতেই তোমার তোষক পেতে দিই। কোন ঘরে শোবে বল।'

'এই ঘরেই শোব। তুমি ওঠো। আমি তোষক পেতে নিচ্ছি।'

গৌরমোহন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'এই ঘরে? কিন্তু—মানে—'

খাটে দু'খানা তোষক ও দু'টা বালিশ ছিল। ছায়া একখানা তোষক টানিয়া খাটের পাশেই পাতিয়া ফেলিল। গৌরমোহন বলিল, 'বালিশ নাও।'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল—'বালিশ লাগবে না। তোষকেই হয়তো অস্বস্তি হবে। এবার ঘুমিয়ে পড়, তোমার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে। আলো কমিয়ে দিই?'

'দাও।'

ঘরের কোণে দেয়ালের পাশে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল, এখন কমিয়া গিয়া দেয়ালের একটু-খানি স্থান প্রভান্বিত করিল মাত্র। গৌরমোহন উদ্বেলিত হৃদয়ে অপরিসীম বিস্ময়ানন্দ লইয়া শুইয়া রহিল। এ কী অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা! বিশ্বসংসারে আর কেহ কি ইহা অনুভব করিয়াছে?

'ছায়া!'

মুহূর্তমধ্যে ছায়া তাহার গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইল—'কী?'

গৌরমোহন বলিল, 'তুমি কে, কি করে অদৃশ্য হয়ে গেলে, কিছুই তো জানা হয়নি। বলবে আমায়?'

ছায়া খাটের পাশে বসিল, গৌরমোহনের একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।—

'আমার বয়স তখন নয় কি দশ বছর।'

গৌরমোহন মনে মনে হিসাব করিল, ছায়ার বয়স এখন উনিশ কি কুড়ি।

—'বাবা, মা, আমি আর আমার ছোট ভাই নাদু এখানে বেড়াতে এসেছিলুম। আমার

banglabooks.in

বাবার নাম ছিল নিধিরাজ মল্লিক। এ বাড়ির মালিক ছিলেন মদনলাল শেঠ, তাঁকে আমরা মদন কাকা বলে ডাকতুম।

'একদিন বিকেলবেলা ঝড় উঠল। আজ যেমন ঝড় উঠেছিল তেমনি। আমরা দোর-জানালা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে বসে রইলুম। বাড়ির ওপর বার বার বাজ পড়তে লাগল। আমি এই খাটের উপর বসে ছিলাম। তারপর কি হল জানি না, আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

'যখন জ্ঞান হল দেখলুম এই ঘরের এক কোণে পড়ে আছি। নিজের হাত-পা দেখতে পাচ্ছি না। বাড়িতে কেউ নেই, সামনের দরজায় তালা লাগানো। এখন মনে হয় তিন-চার দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।

'গলার আওয়াজ একেবারে বুজে গিয়েছিল। আমি খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে বাগানে গেলুম, বাগানেও কেউ নেই। তখন ইস্টিশানের কাছে বাজারে গেলুম। সেখানে দু'তিনজন লোক মুদির দোকানে বসে গল্প করছিল। তাদের কথা শুনে বুঝতে পারলুম, আমার মা-বাবা-ভাই কেউ বেঁচে নেই। কাঁদতে কাঁদতে আবার এই বাড়িতে ফিরে এলুম।

'সেই থেকে একলা এই বাড়িতে আছি। প্রথম প্রথম ক্ষিদে পেলে মুদির দোকানে গিয়ে খাবার চুরি করে খেতুম। তারপর ওরাই এসে আমার খাবার দিয়ে যেত। এমনি করে কত বছর কেটে গেল।...তারপর তুমি এলে।'—

গৌরমোহন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি বিচিত্র এই জগৎ! বাজ পড়িয়া মানুষ অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা কি সম্ভব? গৌরমোহন বিজ্ঞান জানে না, হয়তো বিজ্ঞানী ইহার ব্যাখ্যা জানেন। যদি না জানেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বিজ্ঞানীরা কি সকল বিশ্ব-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন? এই যে অদর্শনা যুবতী তাহার হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া আছে, সে কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে?

গৌরমোহন একটি আকাঙ্ক্ষা-ভরা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ছায়া!'

৭

পরদিন সকালবেলা দেরিতে ঘুম ভাঙিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহারা গল্প করিয়াছে, ফুলশয্যার রাত্রে নূতন বর-বধূর মত। তবু কৌতূহল শেষ হয় নাই, সঙ্গ-তৃষ্ণা মিটে নাই। অবশেষে রাত্রি শেষ হয় দেখিয়া জোর করিয়া ঘুমাইয়াছিল।

সকালে ছায়া গৌরমোহনের বুকের উপর করতল রাখিয়া ডাকিল—'ওঠো, চা এনেছি।'

গৌরমোহন উঠিয়া বসিয়া শূন্যে অবস্থিত চায়ের পেয়ালা হাতে লইল, ঘুমভরা গলায় বলিল, 'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ছায়া।'

ছায়া করুণ নিশ্বাস ফেলিল—'কি করে দেখবে!'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই গৌরমোহনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, 'ছায়া, একটা কাজ করবে?'

'কী?'

'তুমি কাপড়-জামা পরো। তাহলে খানিকটা তো দেখতে পাব।'

কাপড়-জামা পরার নামে ছায়ার কণ্ঠে একটু স্ত্রী-সুলভ ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিল, 'কাপড়-জামা কোথায়?'

'আমার বাক্সে ধুতি আর গেঞ্জি আছে। তাই পরো। শাড়ি-ব্লাউজ তো নেই।'

ছায়া দ্বিধাভরে বলিল, 'আচ্ছা।'

গৌরমোহন চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া বলিল, 'আমি এখনি আসছি।' বলিয়া গোসলখানার দিকে চলিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরমোহন চমকিয়া উঠিল। খাটের পাশে

banglabooks.in

দাঁড়াইয়া আছে একটি প্রেতমূর্তি। হাত-পা নাই, মাথা নাই, সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি কবন্ধ। গৌরমোহন সত্রাসে বলিয়া উঠিল, 'ছায়া! খুলে ফ্যালো, শিগ্গির খুলে ফ্যালো। আমি দেখতে পারছি না। মনে হচ্ছে তুমি একটা পেত্নী!'

শরীরতে ধুতি-গেঞ্জি স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িল।

তারপর সারাদিন দু'জনে অশান্ত মনে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়ায়। গৌরমোহন বলে, 'ছায়া, কি করে তোমাকে দেখতে পাব? ভারি যে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

ছায়া কাঁদো-কাঁদো সুরে বলে, 'আমি কি করব?'

'তোমাকে না দেখতে পেলে জীবনই বৃথা।'

'আমারও। মানে—'

'বুঝেছি। আমি তোমাকে না দেখতে পেলে তোমার জীবন বৃথা!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখন কি করা যায়? আমি যেন অন্ধ হয়ে গেছি, সব দেখতে পাচ্ছি, কেবল তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। বিজ্ঞানে আজকাল কত কী হচ্ছে, একটা অদৃশ্য মানুষকে জলজ্যান্ত করে দিতে পারে না! ছাই বিজ্ঞান।'

সেইদিন অপরাহ্ণে গৌরমোহন বিষণ্ণ মনে ছবি আঁকিতে বসিল। কাল ছবিটা অতি সামান্যই আঁকা হইয়াছিল, একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের আমেজ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র। গৌরমোহন ভাবিতে লাগিল—এই পরিবেশের মধ্যে ছায়ার একটি কল্প-মূর্তি আঁকা যায় না কি? কাপড়-পরা অবস্থায় ছায়ার দেহের যে ইঙ্গিত সে পাইয়াছে, তাহাকেই সূত্র ধরিয়া গোটা মানুষকে আঁকা যাইতে পারে। অবশ্য মুখ-চোখের গড়ন কাল্পনিক হইবে—

'ছায়া, তোমার গায়ের রং কি রকম ছিল?'

ছায়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'ফরসা। মা বলতেন দুধে-আলতা।'

'আর মুখ-চোখ?'

'তা কি করে বোঝাব?'

'হুঁ। আচ্ছা দেখি, তুমি আমার সামনে দাঁড়াও।'

গৌরমোহন আঙুলের স্পর্শে ছায়ার মুখ চোখ অনুভব করিয়া দেখিতে লাগিল। চোখ দুটি বেশ টানা টানা মনে হইতেছে, নাকটি সরু, ঠোঁট দুটি ভারি নরম, প্রসারে একটু বড়—

গৌরমোহন বলিল, 'তুমি আমার মডেল। দাঁড়িয়ে থাকো, তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আঁকব।'

প্যালেটের উপর রঙ মিশাইয়া তুলিতে তুলিয়া সে ক্যাম্বিসের দিকে ফিরিতেছে এমন সময় একটা চোখ-ধাঁধানো আইডিয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে বিমূঢ় করিয়া দিল। তারপর সে চিৎকার করিয়া উঠিল—'ছায়া! ছায়া!'

'এই যে আমি।'

'কাছে এস। কই, তোমার মাথাটা দেখি। হ্যাঁ, এইবার চুপটি করে থাকো! এ বুদ্ধিটা এতক্ষণ মাথায় আসেনি। তোমার গায়েই তোমার ছবি আঁকব, যেমন কাচের উপর ছবি আঁকে। বুঝেছ?'

বাঁ হাতে ছায়ার মাথা ধরিয়া গৌরমোহন ডান হাতের রঙ-মাখা তুলি দিয়া তাহার গালে স্পর্শ করিল। গালের উপর পাকা ডালিমের রঙ লাগিয়া রহিল।

গৌরমোহনের ইচ্ছা হইল উঠিয়া নৃত্য করে। কিন্তু ইচ্ছা দমন করিয়া সে অতি যত্নে ছায়ার মুখে রঙ লাগাইতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে মুখখানি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ঠোঁটে একটু গোলাপী রঙ দিল, ভুরুতে কালো রঙ। কিন্তু—

চোখের মণিতে তো রঙ লাগানো যায় না, চোখ দুটি শূন্য রহিল। তবু মুখখানি চমৎকার; পান-পাতার আকৃতি, একটু কৃশ। গৌরমোহন বলিল, 'ছায়া! কি সুন্দর তুমি! দাঁড়াও, চোখের ব্যবস্থা করছি।'

সে ছুটিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে নিজের ধোঁয়া-কাচের চশমা আনিয়া ছায়ার চোখে

banglabooks.in

পরাইয়া দিল। ছায়ার মুখ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রূপকথার রাজকন্যার মত মুখ, ঘুমন্ত রাজকন্যার চোখে নিদালীর অঞ্জন।

ছায়া একটু ভঙ্গুর হাসিল

গৌরমোহনের শিল্পী-মন আর শাসন মানিল না, সে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ছায়াকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল।

তারপর নাটকীয় পরিস্থিতি।

গৌরমোহনের মাতৃদেবী শশিমুখী সহসা ঘরের দ্বারদেশে আবির্ভূতা হইলেন। এবং গৌরমোহনকে একটি দেহহীন মুণ্ডের চারিপাশে নৃত্য করিতে দেখিয়া একটি অনৈসর্গিক আর্তনাদ ছাড়িয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে গৌরমোহনের বন্ধু মোহনলাল রোমাঞ্চিত কলেবরে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

শশিমুখীর আবির্ভাব অনৈসর্গিক নয়। গৌরমোহন ফেরার হইবার পর তিনি প্রচণ্ড-বেগে তদন্ত শুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মোহনলাল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তিনি তখন মোহনলালের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। মোহনলাল বেশীক্ষণ এই কণ্ঠ-নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারে নাই; সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়া-ছিল। তখন শশিমুখী মোহনলালকে সঙ্গে লইয়া গৌরমোহনকে ধরিতে আসিয়াছিলেন।

তারপরই নাটকীয় পরিস্থিতি।

গৌরমোহন বন্ধুকে ভর্ৎসনা করিল না, বরং বলিল, 'ভালই হয়েছে।' সে মোহনলালকে সব কথা খুলিয়া বলিল।

ছায়া ইতিমধ্যে নদীতে গিয়া মুখের রঙ ধুইয়া আবার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে ভীতু মানুষ, এইসব গণ্ডগোল দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে।

শশিমুখীর জ্ঞান হইলে তিনি ভয়ার্ত চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিলেন, তারপর 'বাবা গো' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে যাত্রা করিলেন. তাঁহার গতিবেগ লক্ষ্য করিবার লোক ছিল না, থাকিলে এই দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত।

পাকুড়তলায় দাঁড়াইয়া গৌরমোহন মোহনলালকে বলিল, 'তুই মাকে নিয়ে ফিরে যা। শিগ্‌গির একটা পুরুত নিয়ে আসবি, দেরি করবিনে।'

'আচ্ছা। তখন তোর বৌকে ভাল করে দেখব।'

'আর একটা কথা। তুই তোর এই বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে দে ভাই। এখানেই বৌ নিয়ে থাকব।'

'বিক্রি করব না। বাড়িটা তোর বিয়ের যৌতুক।—আচ্ছা চললাম, কাল-পরশুর মধ্যেই পুরুত নিয়ে ফিরব। দই, সন্দেশ, মাছ, কনের গয়না, বেনারসী সব নিয়ে আসব।'

মোহনলাল চলিয়া গেল। গৌরমোহন দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতে লাগিল।

একটি বাহু আসিয়া তাহার বাহুর সহিত জড়াইয়া গেল। গৌরমোহন সেই দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চল, আর একবার। ভাল করে এখনও তোমায় দেখা হয়নি।'

৫ আশ্বিন ১৩৬৩

banglabooks.in

মধু-মালতী

যাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশে বাস করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, মারাঠীরা গান ভালবাসে, ফুল ভালবাসে এবং বাইসাইকেল চাঁড়তে ভালবাসে। পুণার অলিতে-গলিতে ফুলের দোকান, গান-বাজনার আখড়া, সাইকেলের আড্ডা। আড্ডাতে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়; এক আনা ভাড়া দিয়া এক ঘণ্টা সাইকেল চড়িয়া বেড়াও। মেয়ে-মদ্দ সবাই সাইকেল চড়ে, বিশেষত কলেজের ছেলেমেয়েরা।

এদেশে মেয়েদের আলাদা কলেজ নাই, সকলে একসঙ্গে পড়ে। কলেজের ছুটি হইলে দেখা যায়, রাস্তা দিয়া সাইকেলের নব-যৌবন জলতরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।

আমি প্রথম যেবার পুণায় আসি, সেবার শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি হোটেলে মাসখানেক ছিলাম। রাস্তার নাম টিলক রোড, অদূরে এস্ পি কলেজ; আরও একটু দূরে টিলার মাথায় পার্বতী মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

দক্ষিণ দিক ফাঁকা, দিগন্তে পাহাড়ের চক্ররেখা। এই চক্ররেখা চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিলে সিংহগড় দুর্গ চোখে পড়ে। শিবাজী মহারাজের সিংহগড়, যে সিংহগড় জয় করিবার মুহূর্তে তানাজি মালেশ্বর প্রাণ দিয়াছিলেন। সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে পড়ে আছে শুধু গড়—

শীতের শেষ। রাস্তার ধারে আমগাছে বোল ধরিয়াছে, মিষ্ট-কষায় গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আমি ডাক্তারের আদেশে পুণায় আসিয়াছি, সকাল-বিকাল পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াই। হোটেলে আমার দ্বিতলের ঘরের সম্মুখে ছোট্ট একটি ব্যাল্‌কনি আছে, সেখানে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক চলাচল দেখি। বোম্বাইয়ে থাকাকালে যে-পেট জবাব দিয়াছিল, তাহা এখন নানাবিধ স্থানীয় খাদ্য অম্লানবদনে হজম করিতেছে। দহি-বড়া, ইড্‌লি-সম্বর, দোসা—কিছুই বাদ পড়ে না। দশদিন যাইতে না যাইতে প্রাচীনা পুণ্যা নগরীকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু আমি বিভূতি বাঁড়ুয্যে নই, পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তিলমাত্র আনন্দ পাই না। অথচ ডাক্তারের হুকুম।

একদিন ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটি বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল। সামনেই রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড—বামনরাও সাইকেল মার্ট। সাইকেলের দোকান। কত লোক আসিতেছে, সাইকেল ভাড়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। আমিও সাইকেল চড়িয়া বেড়াই না কেন? অবশ্য অনেক দিন চড়ি নাই, কিন্তু সাঁতার কাটা এবং সাইকেল চড়া মানুষ ভোলে না। সুতরাং সাইকেল চড়িয়া ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিব। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

বিকেলবেলা সাইকেলের দোকানে গেলাম। দোকানদার বামনরাও খাতায় আমার নাম-ধাম লিখিয়া লইয়া সাইকেল দিল। বামনরাওয়ের চেহারা বেঁটে, মজবুত, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। দোকানের পেছনের একটি ঘরে সস্ত্রীক বাস করে।

অতঃপর রোজ দুবেলা সাইকেল চড়িয়া বেড়াই। শহর বাজার এড়াইয়া পুণার কিনারে কিনারে ঘুরি। কখনও যাই গণেশখিণ্ডের দিকে, কখনও খড়্‌গবৎসলার হ্রদের পানে? আনন্দে আছি; বামনরাওয়ের সঙ্গে প্রণয় জন্মিয়াছে। সে অল্পস্বল্প হিন্দী বলিতে পারে; নির্বান্ধব পুরীতে সেই আমার প্রথম বন্ধু।

প্রস্তাবনা শেষ করিয়া এবার আসল কথায় আসা যাক।

সে-রাত্রে যথাসময় আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বোধ হয় দিবানিদ্রা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া বই পড়িবার চেষ্টা করিলাম; তাহাতে ঘুম আসে বটে, কিন্তু বই বন্ধ করিলেই তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

রাত্রি প্রায় একটা পর্যন্ত ঝুলোঝুলি করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গায়ে বালাপোশ জড়াইয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। এক আকাশ নক্ষত্র যেন শীতের বাতাস লাগিয়া কাঁপিতেছে। রাস্তায় লোক নাই, আবছায়া পথের দুই ধারে দীপস্তম্ভগুলি সারি দিয়া এই নিশীথ

banglabooks.in

নিস্তব্ধতাকে পাহারা দিতেছে।

পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, উতপ্ত মুখে বাতাসের শীতল করস্পর্শে মন্দ লাগিতেছে না। হঠাৎ রাস্তার এক দিক হইতে কিড়িং কিড়িং শব্দ কানে আসিল। সাইকেল আসিতেছে। একটু বিস্মিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলাম। সাইকেল দেখা গেল না, এখনও দূরে আছে। কিন্তু রাস্তা নির্জন, সাইকেল চালক কাহাকে দেখিয়া ঘণ্টি বাজাইল?

তাকাইয়া রহিলাম।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, এক জোড়া সাইকেল পাশাপাশি আসিতেছে, তাদের ল্যাম্প নাই। সহসা মধুর হাসির শব্দ কানে আসিল। দুইজন একসঙ্গে হাসিতেছে, একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। কিন্তু দু'জনের হাসি এক সুরে বাঁধা। একজন উদারা, একজন মুদারা।

সাইকেল দু'টা ক্রমশ কাছে আসিতেছে, এবার তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। হঠাৎ ঘাড়ের রোঁয়া শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। সাইকেল দু'টা আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের আরোহী নাই। আরোহীর আসন শূন্য, কেবল দু'টা জড় সাইকেল পরস্পর সমান্তরালে চলিয়া আসিতেছে!

বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে, তবু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আছি। সাইকেল দু'টা স্বচ্ছন্দ গতিতে আসিতেছে, কোনও ত্বরা নাই। ঠিক আমার সামনে দিয়া যাইতে যাইতে থামিয়া গেল; মনে হইল অদৃশ্য আরোহীরা সাইকেল হইতে নামিল। নিথর বাতাসে যেন ফিসফিস কথা বলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর সাইকেল দু'টি বামনরাওয়ের দোকানের দিকে গেল। দরজা বন্ধ, সাইকেল দু'টি দরজার গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইল। কিড়িং করিয়া একবার ঘণ্টি বাজিল।

তারপর আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই।

ব্যাল্‌কনি হইতে আমি ঘরে আসিয়া বসিলাম। এ কি চোখের ভুল? কিন্তু না, শুধু চোখের ভুল হইতে পারে না; হাসি শুনিয়াছি, ঘণ্টির আওয়াজ শুনিয়াছি! তবে কি অনিদ্রা-বশতঃ আমার মস্তিষ্ক এতই উত্তপ্ত হইয়াছে যে জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি? কিংবা—

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে আমি আবার তাড়াতাড়ি ব্যাল্‌কনিতে ফিরিয়া গেলাম। বামনরাওয়ের দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ আছে, কিন্তু সাইকেল দু'টা অদৃশ্য হইয়াছে।

শেষরাত্রির দিকে ঘুমাইয়া পড়িলাম; যখন ঘুম ভাঙিল তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রাতর্ভ্রমণের আর সময় নাই; কারণ পুণায় শীতকালেও রৌদ্র বেশ কড়া। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

বামনরাওয়ের দোকান খোলা রহিয়াছে, রাস্তায় কর্মদিবসের ব্যস্ত তৎপরতা; মোটর টাঙা অটো-রিক্‌শা ও সাইকেলের ছুটাছুটি। কাল রাত্রি একটার সময় এই পথের ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতায় দু'টি স্বয়ংচল সাইকেল আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল বিশ্বাস করা কঠিন।

দুপুরবেলা বামনরাও সাইকেল মার্টে গেলাম।

সাইকেল-ভাড়াটে খদ্দেরের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, বামনরাও মোটা একটা খাতায় হিসাব লিখিতেছে। বলিল, 'কাকা, আজ তুমি বেড়াতে গেলে না?'

মারাঠীরা যাহাকে খাতির করে তাহাকে 'কাকা' বলিয়া ডাকে, কিন্তু সকলকেই তুমি বলে।

আমি একটি লোহার চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, 'না, ওবেলা যাব। বামনরাও, কাল রাত্রি একটার সময় তোমার কোনো খদ্দের সাইকেল ফেরত দিতে এসেছিল?'

বামনরাও চকিতে আমার পানে চাহিল, তারপর যেন চিন্তা করিতেছে এমনি ভাবে ঘাড় উঁচু করিয়া গাল চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'কই না তো! এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কাকা?'

banglabooks.in

বলিলাম, 'কাল রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছিল না, ব্যাল্‌কনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হল কারা দুটো সাইকেল রেখে চলে গেল।'

সাইকেলে যে আরোহী ছিল না সে কথা বলিলাম না।

বামনরাও খাতার ওপর চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি ভুল দেখেছ কাকা। অত রাত্রে কে সাইকেল ফেরত দিতে আসবে! মারাঠীরা রাত্রি দশটার মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়ে। তোমারও বেশী রাত জাগা ভাল নয়; কাহিল শরীর, আবার অসুখে পড়ে যাবে।'

দেখিলাম বামনরাও সত্য গোপন করিতেছে, নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু আছে। তাহাকে আর প্রশ্ন করিলাম না, চলিয়া আসিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ রাত্রেও পাহারা দিব।

মধ্যাহ্নে বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বৈকালে বামনরাওয়ের সাইকেল লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বামনরাও আমার পানে বক্র কটাক্ষপাত করিল। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। যদি কিছুই নয়, তবে লোকটা এমন ঘাট-চোরের মত তাকাইতেছে কেন?

রাত্রি সাড়ে ন'টার পর আহার সম্পন্ন করিয়া ঘরের আলো নিভাইলাম, ব্যাল্‌কনিতে চেয়ার লইয়া বসিলাম। এমন ভাবে বসিলাম যাহাতে আমাকে বাহির হইতে দেখা না যায়, অথচ আমি সাইকেলের দোকান দেখিতে পাই। বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম নগর ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। দোকানগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বিরল হইয়া থামিয়া গেল।

বামনরাও প্রায় সাড়ে দশটার সময় দোকান বন্ধ করিল, দু'টি সাইকেল বাহিরে পড়িয়া রহিল। দরজা লাগাইবার সময় সে উৎকণ্ঠিত চক্ষে আমার ব্যাল্‌কনির দিকে তাকাইল।

আমি ঘাপটি মারিয়া রহিলাম।

নগর-গুঞ্জন ক্ষান্ত; রাত্রির গাঢ়তা ঘনীভূত হইতে লাগিল। পথের দীপস্তম্ভমালা নিষ্পলক চাহিয়া আছে। আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র মৃগশিরাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না।

ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। গায়ে বালাপোশ সত্ত্বেও বেশ কাঁপুনি ধরিয়াছে। আমি সঙ্গে একটি মঙ্কি-ক্যাপ আনিয়াছি। সেটি মাথায় পরিলে কান দিয়া ঠাণ্ডা ঢুকিতে পারিবে না। বামনরাওয়ের দোকানের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বন্ধ দরজার সামনে সাইকেল দু'টি পরস্পর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চট্‌ করিয়া ঘরে গিয়া মঙ্কি-ক্যাপ পরিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বোধ হয় আধ মিনিটও সময় লাগে নাই। কিন্তু এ কি! ইহারই মধ্যে সাইকেল দু'টি অদৃশ্য হইয়াছে।

বোকার মত চাহিয়া রহিলাম।

দূরে টিং টিং করিয়া সাইকেলের ঘণ্টি বাজিল, একটু মিষ্ট হাসির আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। উহারা কি ওত পাতিয়া ছিল? আমি যে পাহারা দিতেছি তাহা জানিতে পারিয়াছে? আমার ঘাড়ের রোঁয়া আবার কাঁটা দিয়া উঠিল।

কিন্তু ছাড়িব না। একবার বোকা বনিয়াছি, দ্বিতীয়বার বোকা বনিব না। যখন সাইকেল লইয়া গিয়াছে তখন নিশ্চয় ফিরাইয়া দিতে আসিবে।

বামনরাওয়ের দরজার ওপর চোখ রাখিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা বাজিল। একটু সজাগ হইয়া বসিলাম। দু'টা বাজিল। এখনও সাইকেলের দেখা নাই। মাঝে মাঝে মনটা খালি হইয়া যাইতেছে, চোখ দু'টা জুড়িয়া আসিতেছে—

চোখে কিছু দেখিলাম না, কানেও কিছু শুনিলাম না, হঠাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় সতর্ক ভাবে সজাগ হইয়া উঠিল।

সাইকেল দুটা চুপিচুপি বামনরাওয়ের দ্বারের দিকে যাইতেছে। নিঃশব্দে তাহারা পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইল; টুং করিয়া একবার ঘণ্টির মৃদু শব্দ হইল। তারপর

banglabooks.in

আর কোনও সাড়াশব্দ নাই। যাহারা সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল।

তন্দ্রাবেশ ছুটিয়া গিয়াছে, নিষ্পলক চক্ষে সাইকেল মার্টের পানে চাহিয়া আছি...খুট করিয়া শব্দ হইল। দরজা একটু খুলিয়া বামনরাও গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিল, তারপর একে একে সাইকেল দুটি তুলিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

দরজা আবার বন্ধ হইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সাইকেল মার্টে গেলাম। বামনরাও একলা ছিল। তাহাকে বলিলাম, 'বামনরাও, কাল রাত্রে আমি সব দেখেছি।'

বামনরাওয়ের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, 'কী! কি দেখেছ কাকা?'

বলিলাম, 'যতটুকু চোখে দেখা যায় দেখেছি। অশরীরী ওরা কারা? আমি জানতে চাই।'

বামনরাও ভীত স্বরে বলিল, 'কাকা, একথা কাউকে বোলো না। জানাজানি হলে ওরা আর আসবে না। ওরা ভারি পয়মন্ত, ওরা যদি না আসে, আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বেশ, কাউকে বলব না। কিন্তু ব্যাপার আমাকে বলতে হবে।'

বামনরাও কিছুক্ষণ ঘাড় নিচু করিয়া ভাবিল। শেষে অনিচ্ছাভরে বলিল, 'আজ রাত্রে দোকান বন্ধ করবার পর তুমি এসো। তখন বলব।'

সে-রাত্রে বন্ধ দোকানঘরে বসিয়া বামনরাওয়ের কাহিনী শুনিলাম। কাহিনীতে চমকপ্রদ নূতনত্ব কিছু নাই, কালে কালে দেশে দেশে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে; যৌবনের কাছে মানুষের সংঘবদ্ধ বিষয়বুদ্ধি পরাভূত হইয়াছে। আমরা যখন মানুষের দুঃখদুর্দশা দীনতার কথা চিন্তা করি তখন ভুলিয়া যাই, মানুষ কোনও দিন জীবনের কাছে মাথা হেঁট করে নাই, সে চিরদিন অপরাজিত।

বামনরাও বলিল, 'বছর তিনেক আগেকার কথা। আমি তখন এখানে নতুন দোকান খুলেছি। সাইকেলের দোকানের পক্ষে জায়গাটা ভাল। কাছেই এস্ পি কলেজ, অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে। বেশীর ভাগ তারাই সাইকেল ভাড়া নিয়ে আমার দোকান চালু রেখেছে—'

এই পর্যন্ত বলিয়া বামনরাও থামিল, উৎকর্ণ হইয়া যেন কি শুনিল। তারপর বলিল, 'একটু বসো, আমি আসছি—'

সে দরজা খুলিয়া দুইটি সাইকেল বাহিরে রাখিয়া আসিল; একটি মেয়েদের সাইকেল, একটি পুরুষদের।

বাহিরে তখন নিশুতি হইয়া গিয়াছে।

বামনরাও ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার স্ত্রী দুই বাটি গরম চা রাখিয়া গেল। একটি বাটি আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া এবং অন্যটি নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বামনরাও আবার বলিতে শুরু করিল—

'এস্ পি কলেজে একটি ছেলে পড়ত, তার নাম মধুকর। বোধ হয় উঁচু কেলাসে পড়ত, আমি যখন তাকে দেখি তখন তার বয়স একুশ-বাইশ। চমৎকার চেহারা, টক্‌টকে রঙ, লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। মারাঠীদের মধ্যে এমন দেখা যায় না, যেন ময়ূর-বাহন কার্তিক। খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারত।

'আমি দোকান খোলবার পর মধুকর প্রায়ই আসত। তার নিজের সাইকেল ছিল না, হেঁটে কলেজে আসত। কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হলে আমার কাছ থেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে যেত। কত ছেলেই তো আসে, কিন্তু মধুকরের চেহারায় এমন একটি মিষ্টতা ছিল, ব্যবহারে এমন শান্ত ছেলেমানুষী ছিল যা সচরাচর চোখে পড়ে না। বড় বংশের ছেলে, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, কিন্তু শরীরে এতটুকু অহঙ্কার ছিল না।

'একদিন মধুকরের সঙ্গে একটি মেয়ে এল। সম্প্রতি স্কুল থেকে পাস করে কলেজে

banglabooks.in

ঢুকেছে। ছোটখাটো মেয়েটি, বয়স বড়জোর সতের; মধুকরের মত সুন্দর নয়, কিন্তু ভারি মিষ্টি নরম চেহারা। নাম মালতী।

'মধু আর মালতী দু'টি সাইকেল নিয়ে চলে গেল। এদেশে মেয়েদের পর্দা নেই, কোনো দিন ছিল না; উত্তর ভারতের ওই ম্লেচ্ছ বর্বরতা মারাঠাদেশ কখনো স্বীকার করে নেয়নি। আমাদের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ে, একসঙ্গে খেলাধুলো করে। এখানে ছেলেমেয়েরা চোখাচোখি হলেই প্রেমে পড়ে না; কিন্তু যখন সত্যিই প্রেমে পড়ে তখন মা-বাপকে গিয়ে বলে, মা-বাপ বিয়ে দেন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে কেউ কিছু মনে করে না, টিপ্পনিও কাটে না।

'যাহোক, মধু আর মালতী মাঝে মাঝে আসে, সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, আবার সন্ধ্যার পরেই সাইকেল ফেরত দিয়ে যায়। অন্য ছেলেমেয়েরাও আসে। কাছেপিঠে অনেক খোলা জায়গা আছে; যেখানে একটু সবুজ ঘাসের টুকরো পায় সেখানে বসে দু'দণ্ড গল্প-সল্প করে, তারপর যে-যার ঘরে ফিরে যায়।'

বামনরাও চুপ করিল, উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর নিম্নস্বরে বলিল, 'ওরা সাইকেল নিয়ে গেল—'

আমার কৌতূহল হইল; দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিলাম। সাইকেল দু'টা সত্যই অদৃশ্য হইয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া বসিলে বামনরাও বলিল, 'যাহোক, তারপর শোন—একদিন অন্য দু'টি কলেজের ছেলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে শুনতে পেলাম। মালতীও খুব বনেদী ঘরের মেয়ে, কিন্তু দুই বংশে ভীষণ শত্রুতা। আজকের শত্রুতা নয়, সেই পেশোয়াদের আমল থেকে চলে আসছে। সেকালে দুই পক্ষের রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে ছোরাছুরি চলত, এখন দু'পক্ষ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। তারা যদি জানতে পারে মধু আর মালতী একসঙ্গে সাইকেল চড়ে বেড়াতে যায়, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

'কিছু দিন পরে দেখলাম মধু আর মালতী সাবধান হয়েছে। একসঙ্গে দোকানে আসে না; সন্ধ্যের পর মধু দু'খানা সাইকেল নিয়ে যায়, মালতী বোধ হয় আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থাকে। তারপর সকলের চোখ এড়িয়ে দুজনে বেরোয়। ওদের বাড়ির লোকেরা বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছিল।

'একদিন রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তারা সাইকেল ফেরত দিতে এসেছে। দু'জনের মুখ তৃপ্তিতে ভরা। মালতী একবার মধুকরের মুখের পানে তাকাল। সেই চাউনি দেখে বুঝতে পারলাম, এ শুধু যুবক-যুবতীর মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব নয়, মালতীর বুক মধুতে ভরে উঠেছে।

—'কাকা, আমার বয়স হয়েছে, ভালবাসাবাসির ব্যাপার অনেক দেখেছি। দু'টি ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভালবাসা হল, তারপর যখন তারা দেখল বিয়ে হবার নয়, তখন দুচার দিন কান্নাকাটি করল, মন খারাপ করে রইল। ক্রমে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। এ কিন্তু সে জিনিস নয়। এ একেবারে জীবন-মরণের ব্যাপার। মধু আর মালতী প্রাণ দেবে তবু পরস্পরকে ছাড়বে না।

'হঠাৎ একদিন ওদের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেল। দশ দিন আর মধুর দেখা নেই। তারপর একদিন দুপুরবেলা মধু এল, বলল, একটা সাইকেল দাও একটু ঘুরে আসি।

'দেখলাম, তার মুখ-চোখ শুকনো, চুল রুক্ষ, যেন কতদিন স্নান করেনি, খায়নি।

'আমি বললাম, একটা সাইকেল?

'সে বলল, হ্যাঁ, মালতীকে ওরা কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।

'মধু দুই হাত মুঠি করে কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইল, তারপর সাইকেল না নিয়েই চলে গেল।

'তিন-চারদিন পরে বর্ষার বৃষ্টি নেমেছে। পুণার বৃষ্টি মুষলধারে বড় হয় না। রিম ঝিম্, রিম ঝিম্; চারিদিক ঠাণ্ডা। আমার দোকানে রাত্রি ন'টার মধ্যেই খদ্দের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় আমি দোকান বন্ধ করে শুতে যাচ্ছি, দরজায়

banglabooks.in

ঠক্ ঠক্ টোকা পড়ল। দোর খুলে দেখি—মধু আর মালতী।

'দু'জনের জামা-কাপড় ভিজে, চোখে মুখে বাঁধন-ছেঁড়া উল্লাস। মধু বলে উঠল, বামনরাও, মালতীকে দোতলার ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। ও ব্যাল্‌কনি থেকে বিছানার চাদর ঝুলিয়ে নেমে এসেছে।

'কী ডাকাত মেয়ে! মালতীর দিকে চেয়ে দেখলাম, তার মাথার চুল ভিজে, মুখে বিন্দু বিন্দু জলের ছিটে লেগেছে, কাপড়-চোপড় একটু এলোমেলো। সে মুখ টিপে হাসছে।

'আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, পালিয়ে এসেছে! তারপর?

'মধু বলল, তারপর আর কী? একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আবার নিজের ঘরে উঠে শুয়ে থাকবে, কেউ জানতে পারবে না। মধু জোরে হেসে উঠল—দাও, দাও, শিগ্‌গির সাইকেল দাও।

'অ্যাঁ! এই বর্ষার রাতে বেড়াতে বেরুবে!

'বর্ষা কই? এর নাম কী বর্ষা! দাও সাইকেল।

'দু'জনে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল আমিও ওদের প্রেমের ষড়যন্ত্রে শরিক হয়ে পড়েছি।

'তারপর বার তিনেক ওরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। আমি দোকান বন্ধ করবার পর এসে দোরে টোকা দিত, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেত; ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে সাইকেল রেখে বাড়ি ফিরে যেত।

'আমি ওদের দেখতাম আর ভাবতাম—কী দুঃসাহসী ওরা! একবার যদি ধরা পড়ে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। এ রকম ব্যাপারে মেয়ে-পক্ষেরই অপমান বেশী, ওরা যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে মধুকে প্রাণে বাঁচতে হবে না।

'হলও তাই। এ ব্যাপার বেশীদিন চলল না। একদিন রাত্রি এগারোটার সময় আমার দোরে ধাক্কা পড়ল। দোর খুলে দেখি মধু আর মালতী—দুজনেরই দিশাহারা অবস্থা।

'মধু বলল, বামনরাও, শিগ্‌গির সাইকেল দাও, ওরা জানতে পেরেছে।

'বললাম, সে কি! এত রাত্রে তোমরা কোথায় যাবে?

'তা জানি না—

'এই সময় দূরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শোনা গেল। মালতী চমকে উঠে বলল, ওই দাদা আসছে!

'ওরা আর দাঁড়াল না, দুটো সাইকেল নিয়ে বিদ্যুতের মত বেরিয়ে গেল।

'আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই মোটর-বাইক এসে দোকানের সামনে থামল। আরোহী চড়া গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল—একটা মেয়ে আর একটা ছেলে এখান থেকে সাইকেল নিয়ে গেছে?

'আমি ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

'সে প্রশ্ন করল, কোন্ দিকে গেছে?

'বললাম, তা দেখিনি।

'লোকটা লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

'তার কোমরে একটা খাপসুদ্ধ ছোরা গোঁজা রয়েছে। ভারি জোয়ান চেহারা কিন্তু মুখের আদল থেকে চেনা যায়, মালতীর দাদা। সে আমাকে ধমক দিয়ে বলল—তুই নিশ্চয় জানিস। বল্ তারা কোথায় গেছে।

'কাকা, আমি মারাঠী, মিষ্টি কথার গোলাম; কিন্তু চোখ রাঙিয়ে আমাকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না। আমি একটা স্প্যানার তুলে নিয়ে বললাম, যাও আমার দোকান থেকে, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব।

'এই সময় আর একটা মোটর-বাইক এসে দাঁড়াল। তার আরোহী ডেকে বলল, জয়ন্ত! খবর পেয়েছি, ওরা সিংহগড়ের দিকে গেছে।

'মালতীর ভাই একলাফে গিয়ে নিজের মোটর-বাইকে বসল।

banglabooks.in

'দুটো মোটর-বাইক গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'সে-রাত্রে আমি আর কিছু দেখিনি।

'পরে জানতে পেরেছিলাম, মধু আর মালতী সিংহগড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা যখন খড়্গবৎসলার হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় পিছনে মোটর-বাইকের গর্জন শুনতে পায়, তারা সাইকেলসুদ্ধ হ্রদে লাফিয়ে পড়েছিল।'—

বামনরাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ভাবিতে লাগিলাম, এ ছাড়া এ গল্পের অন্য পরিণতি কি ছিল না? যাহারা পরস্পরকে একান্ত ভাবে চায় তাহারা ব্যর্থ হইয়া আত্মহত্যা করে কেন? প্রেম কি তবে একটা সাময়িক উন্মাদনা? কিংবা সংসার এত প্রেম পছন্দ করে না তাই তাহার এই পরিণাম?

কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয় নাই। বলিলাম, 'তারপর?'

বামনরাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ তুলিল।

'তারপর দিন দশেক কেটে গেল। ওদের মৃত্যু নিয়ে শহরে বেশ হৈচৈ হয়েছিল, তাও ক্রমে নিভে এল। দুটি অপরিণত-বুদ্ধি ছেলেমেয়ের হঠকারিতার কথা কে বেশীদিন মনে করে রাখে! দৈনিক কাগজে খানিক লেখালেখি হল, সাপ্তাহিক পত্রিকায় কবিতা বেরুল, তারপর সব চুপচাপ।

'একদিন বেশ বর্ষা নেমেছে, আমি দশটার মধ্যেই দোকানপাট বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি। তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় দোরে খুট খুট শব্দ হল। তন্দ্রা ছুটে গেল, আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঠিক মধু যেভাবে টোকা দিত সেই টোকা। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় বসে রইলাম। আবার টোকা পড়ল। তখন উঠে দরজা খুললাম।

'বাইরে কেউ নেই। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, জনমানুষ নেই। দরজা বন্ধ করে যেই পিছু ফিরেছি অমনি আবার টোকা পড়ল। আবার দরজা খুললাম...কেউ নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'এইরকম বার পাঁচেক হবার পর বুঝতে পারলাম। ওরা এসেছে, সাইকেল চায়। দুটো সাইকেল বাইরে রেখে দোর বন্ধ করে দিলাম। আর টোকা পড়ল না। দশ মিনিট পরে দরজা খুলে সন্তর্পণে গলা বাড়ালাম, সাইকেল অদৃশ্য হয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে কিড়িং শব্দ হল।

'দোর খুললাম। সাইকেল ফিরে এসেছে।

'সেই থেকে প্রায় রোজ এই ব্যাপার চলছে। তুমি নিজের চোখে দেখে ফেলেছ, তোমার কাছে লুকোবার চেষ্টা বৃথা। আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না। ওরা ভারি পয়মন্ত, দু'দিন না এলে আমার খদ্দের কমে যায়। কাকা, তুমি কাউকে বলো না।'

'বলব না', বলিয়া আমি উঠিলাম।

এই সময় বাহিরে সাইকেলের মৃদু ঘণ্টি বাজিল—কিড়িং।

আমি বামনরাওয়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। সে গিয়া দ্বার খুলিল। দেখিলাম, সাইকেল দু'টি পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

১০ বৈশাখ ১৩৬৪

banglabooks.in

চিরঞ্জীব

লোকটিকে দেখিয়া আড়াই শত বৎসর বয়স বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, বড় জোর ষাট-বাষট্টি। লম্বা-চওড়া গড়ন, পাকা কাশীর পেয়ারার মত গায়ের রঙ, গোঁফ ও গালপাট্টা বেশীর ভাগ পাকিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক নাটকে পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায় লোকটিকে বেশ মানাইত। বৃদ্ধ বটে, কিন্তু কোথাও স্থবিরতার চিহ্ন নাই। প্রথম তাহাকে দেখিবামাত্র দুইটি কথা আমার মনে আসিয়াছিল : এক, লোকটি অনেক দূর হইতে আসিতেছে : দুই, লোকটির দেহ অত্যন্ত কঠিন স্থায়ী ধাতুতে নির্মিত। একবার দেখিয়া কেন এমন ধারণা হইয়াছিল জানি না—

কিন্তু গোড়া হইতে এই বিচিত্র মানুষটির কথা বলি।

পুণায় সিদ্ধিবিনায়ক গণপতির একটি প্রাচীন মন্দির আছে। পূর্বকালে মন্দিরের চারি-পাশে প্রকান্ড দিঘি ছিল, পেশোয়ারা নৌকায় চড়িয়া দেব-দর্শনে আসিতেন। এখন দিঘি শুকাইয়া গিয়াছে, শুষ্ক খাদ পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। আমি পুণায় আসিয়া ডেরাডান্ডা ফেলিবার পর হইতে প্রতি চতুর্থী তিথিতে নিয়মিত গিয়া গণপতিকে প্রণাম করিয়া আসি। বড় জাগ্রত দেবতা।

এবার আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে অপরাহ্নকালে মন্দিরে প্রণাম করিতে গিয়াছি, হঠাৎ সবেগে বৃষ্টি নামিল। ছাতা আনি নাই, পুণায় বর্ষাকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়, ছাতার দরকার হয় না। কিন্তু আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে বজ্র বিদ্যুৎ ও বর্ষণের সমারোহ লাগিয়া গেল।

মন্দিরে আট্‌কা পড়িলাম। মন্দির-সংলগ্ন টিনের চালার নীচে বেঞ্চিতে বসিয়া বৃষ্টি ধরণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

চালার নীচে আরও কয়েকজন লোক আছে। অধিকাংশ স্ত্রীলোক; বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুজব করিতেছে।

একটি পুরুষ চালার এক কোণে বসিয়া ছিল, এতক্ষণ তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগিতেছিল বলিয়াই বোধহয় সে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে বেঞ্চিতে বসিল। তাহার চেহারার বর্ণনা আগেই করিয়াছি; হাতে মোটা একটা লাঠি, পরিধানে খাটো ধুতি ও পুরা আস্তিনের মেরজাই, কাঁধে একটা মোটা কালো কম্বল; মস্তক নিরাবরণ। লোকটির কাপড়-চোপড় যদি গৈরিক রঙের হইত তাহা হইলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মনে করিতাম।

টিনের চালার উপর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ সমানে চলিয়াছে, ভিতরে অপরিচ্ছন্ন ময়লা আলো।

লোকটি কয়েকবার আমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া হঠাৎ মোটা গলায় প্রশ্ন করিল, 'আপুনি কি বাঙালী বটে?'

বোধহয় আমার পাঞ্জাবি ও ধুতির কোঁচা দেখিয়া বুঝিয়াছে। বলিলাম, 'হ্যাঁ। আপনি?'

সে বলিল, হ্যাঁ, আমিও বাঙালী। আপুনি কি পুণার বাসিন্দা বটে?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি পরিব্রাজক, ইতি-উতি ঘুরে বেড়াই।' সে আমার দিকে ঝুঁকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'এখানে বিরিঞ্চি বর্মা নামে কাউকে আপুনি চিনেন নাকি?'

'বিরিঞ্চি বর্মা! না, কখনো নাম শুনিনি। কে তিনি?'

'দেখেন নাই? যখের মত কালো লম্বা চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, একটা কান বড়, অন্য কানটা ছোট, বাঁ গালে কাটা ঘায়ের মত লালচে একটা জড়ুল! দেখেন নাই তাকে?'

লোকটির কথা বলিবার ভঙ্গী একটু সেকেলে ধরনের, মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা শুনিতেছি। বলিলাম, 'না, বিরিঞ্চি বাবা—থুড়ি—বিরিঞ্চি বর্মাকে আমি দেখিনি। আপনার আত্মীয়?'

banglabooks.in

লোকটার চক্ষু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—'আত্মীয়! সে আমার ঘোর শত্রু, সর্বদা আমার সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে'—তারপর সুর বদলাইয়া বলিল, 'এটা ১৮৭৯ শকাব্দ বটে?'

সম্প্রতি শকাব্দ লইয়া জ্যোতির্বিদ মহলে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, 'হ্যাঁ, ১৮৭৯ শকাব্দ বটে। কেন বলুন দেখি?'

সে বলিল, 'তাহলে নিশ্চয় তার দেখা পাব। এই বছরে সে আসে। কোথাও না কোথাও আছে, এবার দেখা হলে আর ছাড়ছি না।'

কেমন ধোঁকা লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শেষবার কত দিন আগে তাকে দেখেছেন?'

লোকটি বলিল, '১৭৭৯ শকাব্দে। সিপাহী যুদ্ধের সময়।'

কিছুক্ষণের জন্য গুম হইয়া গেলাম। মনের মধ্যে একটি আশঙ্কা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল—পাগল নয় তো? আড়চোখে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলাম। বেশভূষা একটু অসাধারণ বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। শুনিলাম সে কতকটা আপন মনেই বলিয়া চলিল—'তখন আমি কাশীতে। একজন সিদ্ধপুরুষকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চতুর্দিকে আগুন জ্বলে উঠল। দাবানলের মত।—আপনি দাবানল দেখেছেন?'

'না।'

'বনে আগুন লাগে। গ্রীষ্মকালে শুকনো গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে, তারপর আগুন এক গাছ থেকে লাফিয়ে অন্য গাছে যায়; সারা বন জ্বলে ওঠে। কাঁচা গাছও পুড়ে ছাই হয়ে যায়—'

'মাফ করবেন, আপনার নামটি কি?'

'নাম? চিরঞ্জীব সিংহ।'

'নিবাস?'

'আদি নিবাস রাঢ় দেশ।'

'বয়স কত?'

চিরঞ্জীব সিংহ এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'বয়স? কে জানে ...অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জন্ম...আমার জন্মদিনে একটা বট গাছ পোঁতা হয়েছিল, সেটা এখন দু'বিঘে জমির ওপর ছড়িয়ে গেছে—'

'আপনার আত্মীয়স্বজন?'

'কেউ নেই, সব মরে গেছে।'

'যাক। তা কাশীর কথা কি বলছিলেন?'

'হ্যাঁ—কাশীর কথা।'—

চিরঞ্জীব ক্ষণেক চিন্তা করিল—'কাশীতে অনেক বনেদী বেশ্যা আছে।'

লোকটির কথা বলিবার বিচিত্র ভঙ্গী, এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা বলিতে আরম্ভ করে।

বলিলাম, 'কাশীতে বনেদী বেশ্যা থাকতে পারে, আমি জানি না। কিন্তু আপনি বলছিলেন, সিদ্ধপুরুষের খোঁজে কাশী গিয়েছিলেন, হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল।'

'হ্যাঁ—আগুন জ্বলে উঠল, লড়াইয়ের আগুন। মারামারি কাটাকাটি। কোম্পানীর লোক সিপাহীদের মারে, সিপাহীরা কোম্পানীর লোকদের মারে। দিল্লী আগ্রা কাশী গয়া মির্জাপুর, সব শহরেই রক্তারক্তি কাণ্ড। তখন জানতাম না যে বিরিঞ্চি এর মধ্যে আছে। জানলে কি আর হাতিয়ার না নিয়ে রাস্তায় বেরুতাম!'

'বিরিঞ্চি লোকটা কে?'

'লোকটা শয়তান, সাক্ষাৎ পাপের অবতার। যেখানে গণ্ডগোল, যেখানে ঝগড়া বিবাদ, যেখানে বেইমানি বিশ্বাসঘাতকতা, সেখানে সে আছে। মানুষের দুঃখ নিয়ে তার কারবার, মানুষের দুর্গতি নিয়ে তার ব্যবসা। মূর্তিমান শনি, মূর্তিমান রাহু।'

চিরঞ্জীব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, 'তারপর কাশীতে কি হল?'

সে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'বিকালবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।

banglabooks.in

হঠাৎ দেখি সামনে একদল কোম্পানীর পল্টন আসছে। সঙ্গে দুটো লালমুখো গোরা—আর বিরিঞ্চি। বিরিঞ্চির পরনে ফৌজী পোষাক।

'আমাকে দেখে বিরিঞ্চি চিৎকার করে উঠল, গোরা দুটোকে খাটো গলায় কি বলল, তারপর তলোয়ার উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল।

'গোটা চার-পাঁচ সিপাহীও তার সঙ্গে হা-রে-রে-রে করে তেড়ে এল। আমার হাতে হাতিয়ার নেই, কি করি? পাশে একটা সরু গলি ছিল, ঢুকে পড়লাম।

'জানতাম না যে গলিটা কানা গলি, দু'পাশে বেশ্যাদের বাড়ি। বিরিঞ্চি আর সিপাহীরা পিছনে হৈ হৈ শব্দে ছুটে আসছে। বাড়িগুলোর দরজা জানলা পটাপট্ বন্ধ হয়ে গেল।

'সবশেষে যে বাড়িটা গলির মুখ বন্ধ করে রেখেছে, তার সদর দরজার মাথার ওপর বারান্দা বেরিয়ে আছে, বাঈজী সেখানে বসে বেসাতি করে। আমার আর পালাবার রাস্তা নেই, আমি বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম।

'গলি এত সরু যে দু'জন লোকের বেশী পাশাপাশি আসতে পারে না। দেখলাম আগে আগে বিরিঞ্চি আর একজন সিপাহী ছুটে আসছে, তাদের পিছনে আরও তিন-চার জন।

'একটা সুবিধা, ওরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে মারতে পারবে না। কিন্তু ওদের হাতে তলোয়ার, আমার হাত খালি। খালি হাতে তলোয়ারের সঙ্গে কে লড়তে পারে?

'ওরা যখন প্রায় আমার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন ওপরের বারান্দা থেকে একটা মেয়ে সামনে ঝুঁকে চিৎকার করে বলল, "এই নাও তলোয়ার, বিদেশী কুত্তাগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দাও।"

'তলোয়ার লুফে নিলাম। তখন আর আমাকে মারে কে?

'বিরিঞ্চি আর সিপাহীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর সাবধানে এগিয়ে আসতে লাগল। বিরিঞ্চি হিংস্র জন্তুর মত দাঁত বার করে রইল।

'লড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমি একা। ওরা সামনের দু'জন পিছু হটে তো আর দু'জন এগিয়ে আসে। ক্রমে আমার হাতের তলোয়ার বোঝার মত ভারী হয়ে উঠল।

'এই সময় হঠাৎ পিছনের দরজা খুলে গেল। আমি দরজায় পিঠ দিয়ে হাঁপাচ্ছিলাম, ভিতরে পড়ে গেলাম। অমনি দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'বেশ্যা মেয়েটা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিল।

'বিরিঞ্চি আর সিপাহীরা দরজা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। শেষ পর্যন্ত গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল।'

এই পর্যন্ত বলিয়া চিরঞ্জীব চুপ করিল।

বৃষ্টির বেগ যেন একটু কমিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার কমে নাই; মেঘের অন্তর পথে সূর্যাস্ত হইয়াছে।

আমি বলিলাম, 'তারপর?'

চিরঞ্জীব বলিল, 'তারপর বিরিঞ্চির আর দেখা পাইনি।'

প্রশ্ন করিলাম, 'আপনাকে যে তলোয়ার দিয়েছিল সে কে?'

'সে ও বাড়ির বেশ্যা...তার নাম ছিল শিউ মোহিনী...চার বছর তার সঙ্গে ছিলাম। সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর সে মরে গেল। আমিও আবার বেরিয়ে পড়লাম।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি যা বললেন তা থেকে মনে হয়, একশো বছর আগে সিপাহী যুদ্ধের সময় আপনি বেঁচে ছিলেন; এখনো দিব্যি বেঁচে আছেন। মাঝের এই একশো বছর আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?'

আমার প্রশ্নের মধ্যে যে স্পষ্ট শ্লেষ ছিল তাহা সে ধরিতেই পারিল না, সহজ ভাবে বলিল, 'নেপালে গুরুর আশ্রমে থাকতাম আর ইতি-উতি ঘুরে বেড়াতাম। কত রদ-বদল দেখলাম। মোগল গেল, লালমুখো ফিরিঙ্গি এল; এখন আবার ফিরিঙ্গি গিয়ে কালো চামড়া

banglabooks.in

এসেছে। কিন্তু বিরিঞ্চিকে খ‍ুঁজে পাচ্ছি না।'

'বিরিঞ্চি হয়তো মরে গেছে।'

চিরঞ্জীব মাথা নাড়িল, 'না, সে আছে। সে না থাকলে মন্বন্তর আসবে কোথা থেকে? ব‍ুঝতে পারছেন না, সে শয়তান। একশো বছর অন্তর ভারতে মহাদ‍ুর্যোগ আসে, তখন সে মাথা তোলে। এই ভারতেই কোথাও সে পাপের বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এবার আমি তৈরি আছি, এবার তাকে ছাড়ছি না।' বলিয়া কালো মোটা লাঠিটা তুলিয়া ধরিল।

'লাঠি দিয়ে বিরিঞ্চিকে ঠেঙিয়ে মারবেন?'

'কেবল লাঠি নয়। এই দেখ‍ুন—' চিরঞ্জীব লাঠির ম‍ুঠ ধরিয়া ঘ‍ুরাইল। ভিতরে লিক-লিকে লম্বা তলোয়ার রহিয়াছে। গ‍ুপ্তি লাঠি।

'লোকটা সদ্য মান‍ুষ কিংবা পাগল কিংবা গঞ্জিকা-বীর ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। যদি গঞ্জিকা-বীর হয়, আমাকে বোকা বানাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে! দেখি, জেরা করিয়া যদি ফাঁদে ফেলিতে পারি।

বলিলাম, 'সিপাহী য‍ুদ্ধের সময় যখন বিরিঞ্চির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন তাকে দেখেই চিনেছিলেন! তার মানে, আগে থাকতেই তাকে চিনতেন!'

সে বলিল, 'চিনতাম বৈকি। বিরিঞ্চিকে কি আজ থেকে চিনি!'

'তার আগে কবে তাকে দেখেছিলেন?'

'কেন, ১৬৭৯ শকাব্দে, পলাশীর য‍ুদ্ধের সময়। বিরিঞ্চি ছিল ক্লাইভের তেলেঙ্গি সিপাহীদের দলে। আর আমি—'

উঠিয়া পড়িলাম।

চিরঞ্জীবকে ফাঁদে ফেলা আমার কর্ম নয়, এইভাবে পিছাইয়া পিছাইয়া হয়তো ক‍ুর‍ুক্ষেত্র য‍ুদ্ধে গিয়া ঠেকিবে।

এদিকে ব‍ৃষ্টিও থামিয়া আসিয়াছে। চলিয়া আসিবার সময় একটি শ্লেষ-বাণ নিক্ষেপ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—'আচ্ছা, আজ আসি। আবার ১৯৭৯ শকে দেখা হবে।'

চিরঞ্জীবকে গঞ্জিকা-বীর বলিয়া মন হইতে সরাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি একট‍ু গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে। কিছ‍ু ব‍ুঝিতে পারিতেছি না। সত্যই কি—?

প‍ুণা ভারতের একটি সামরিক কেন্দ্র। এখানে যেসব রথী মহারথী আছেন, তন্মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খ‍ুব অল্প নয়। আমি প‍ুণায় আসার পর তাঁহাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে।

চিরঞ্জীবের সহিত দেখা হইবার মাসখানেক পরে মেজর গাঙ্গ‍ুলীর বাড়িতে চায়ের জলসা ছিল। বিকালবেলা গিয়াছি। দেখিলাম ত্রিশ-চল্লিশ জন সপত্নীক অফিসার সমবেত হইয়াছেন। কয়েকজন অবাঙালীও আছেন।

একটি লোককে দেখিয়া স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। গ‍ৃহস্বামিনী শীলা দেবী পরিচয় করাইয়া দিলেন—'ইনি কর্নেল ভর্মা, কয়েকদিনের জন্যে কাশ্মীর থেকে এসেছেন।'

যখের মত কালো লম্বা চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, একটা কান ছোট একটা কান বড়, বাঁ গালে কাটা ঘায়ের মত রক্তাভ জড়‍ুল। পরিধানে ফৌজী পোষাক নয়, সাধারণ বিলাতী পোষাক। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ।

আমার ম‍ুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'আপনার নাম কি বিরিঞ্চি বর্মা?'

কর্নেল ভর্মা ঈষৎ ভ্র‍ু তুলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

বলিলাম, 'চিরঞ্জীব সিংহের ম‍ুখে আপনার নাম শ‍ুনেছি।'

কর্নেল ভর্মার ম‍ুখে দ্র‍ুত একটা পরিবর্তন হইল; ভদ্রতার ম‍ুখোশ ছাড়িয়া দাঁতগ‍ুলো হিংস্রভাবে বাহির হইয়া আসিল, চোখ দ‍ুটাতে গরিলার মত নিষ্ঠ‍ুর ক‍ুটিলতা ফ‍ুটিয়া

banglabooks.in

উঠিল। তিনি একবার চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি ফিরাইয়া চাপা কর্কশ স্বরে বলিলেন, 'চিরঞ্জীব! কোথায় সে?'

বলিলাম, 'এখানে নেই, মাসখানেক আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।'

কর্নেল ভর্মা ক্রূর মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ পিছু ফিরিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

আমি মোহাচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চমক ভাঙিলে মনে হইল কর্নেল ভর্মাকে আরও দু' একটা প্রশ্ন করিলে ভাল হইত। অতিথিদের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না।

মেজর গাঙ্গুলী বলিলেন, 'কর্নেল ভর্মা এইমাত্র চলে গেলেন। তাঁকে আজ রাত্রেই কাশ্মীর ফিরে যেতে হবে।'

১৯ বৈশাখ ১৩৬৪

মায়া কুরঙ্গী

জংলীবাবা যে সত্যকার একজন সাধুলোক, ঠক-দাগাবাজ নন, তাহার দুইটি প্রমাণ পাইয়াছিলাম। প্রথমত, অনুরাগী ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিতেছে দেখিলেই তিনি তারস্বরে এমন অশ্লীল গালিগালাজ শুরু করিতেন যে, রীতিমত গণ্ডারের চামড়া না হইলে কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিত না। দ্বিতীয়ত, তিনি এক মুষ্টি যবের ছাতু ছাড়া আর কিছু ভিক্ষা লইতেন না। প্রভাতে সর্বাগ্রে যে ভিক্ষা দিত তাহার ভিক্ষা লইতেন, আর কাহারও ভিক্ষা লইতেন না।

মহারাষ্ট্র দেশে বহু সাধু-সন্ত জন্মিয়াছেন; জ্ঞানেশ্বর একনাথ রামদাস তুকারাম সাঁইবাবা। বর্তমানেও বহু সাধু-সন্ত আছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সহজে দেখা দেন না। মানুষের বর্তমান জীবনধারা যে-পথে চলিয়াছে সাধু-সজ্জনেরা সে-পথ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। আর আমরা, যাহারা প্রতীচ্য-সভ্যতার কৃপায় সিনেমা পাইয়াছি, টেলিভিশন পাইয়াছি, হাইড্রোজেন বোমা পাইয়াছি, নেংটি-পরা সাধুতে আমাদের কি প্রয়োজন?

আমি নিতান্তই সংসারী মানুষ; জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। তবু সাধু-সন্ন্যাসীর খবর পাইলে মনটা চঞ্চল হয়। একদিন শুনিলাম শহরের উপকণ্ঠে এক সাধু আসিয়াছেন, নাম জংলীবাবা; প্রকৃতি নামের অনুরূপ অর্থাৎ একেবারে বন্য। জংলীবাবাকে দর্শন করিবার জন্য মন উশখুশ করিতে লাগিল। জানি, সাধু-সন্ন্যাসীকে দর্শন করিলেই ইষ্টলাভ

banglabooks.in

হয় না; কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েরাও তো জানে, সিনেমার দেবদেবীদের দর্শন করিলে চতুর্বর্গ লাভ হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় কি? ওটা একটা বায়ুঘটিত রোগ।

একদিন অপরাহ্লে সাধু-দর্শনে বাহির হইলাম। পুণা হইতে যে পথটি শোলাপুরের দিকে গিয়াছে সেই পথের ধারে নির্জন প্রান্তে সাধুর আস্তানা। মাইল দেড়েক গিয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারে কয়েকটি দামী এবং চকচকে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরের আরোহীরা—সকলেই মেদপুষ্ট মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি—রাস্তার এক ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। বুঝিলাম, তাঁহারা যেদিকে তাকাইয়া আছেন সেইদিকেই সাধুর আড্ডা। তাঁহারা এ-পর্যন্ত আসিয়া বাকী পথটুকু অতিক্রম করিতে সাহস করিতেছেন না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম সাধুর ঢিল ছোঁড়া অভ্যাস আছে।

যাহা হউক, এতদূর যখন আসিয়াছি তখন ভয় করিয়া লাভ নাই। রাস্তা হইতে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে একটি খর্জুরকুঞ্জ। মোটরওয়ালাদের পিছনে ফেলিয়া সেই দিকে চলিলাম। চারিদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো খর্জুরকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মাঝখানে কয়েকটি পাথরের চাঙড় মিলিত হইয়া কুলুঙ্গির মত একটি কোটর রচনা করিয়াছে; সেই কোটরের মধ্যে ঘিয়ে-ভাজা ডালকুত্তার মত রক্তচক্ষু লোলিহজিহ্ব জংলীবাবা বসিয়া আছেন।

বাবাকে দেখিলে ভক্তির চেয়ে ভয় বেশী হয়। আমি নত হইয়া প্রণাম করিলাম।

বাবা রাষ্ট্রভাষায় আমাকে বড়কুটুম্ব সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কী চাস? কবে নোবেল প্রাইজ পাবি তাই জানতে এসেছিস?"

অবাক হইয়া বাবার পানে চাহিলাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা তো সংসারের কোনও খবরই রাখেন না, বাবা নোবেল প্রাইজের কথাও জানেন!

আমি কোটরের বাহিরে উপবেশন করিয়া জোড়হস্তে বলিলাম, "না বাবা, আমি ও-সব কিছু জানতে চাই না। আমি শুধু শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি।"

বাবা বলিলেন, "কবে তোর বৌ মরবে, কবে নতুন বিয়ে করবি তাও জানতে চাস না?"

"না বাবা।"

বাবা ঘোর বিস্ময়ে আমাকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ঘাড় তুলিয়া দূরস্থিত ভক্তদের উদ্দেশে অকথ্য মুখখিস্তি করিলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন, "শ্রীচরণদর্শন তো হয়েছে, এবার যা, দূর হ।"

কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, "বাবা, আপনি সিদ্ধপুরুষ, অন্তর্যামী, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। আমিও নেহাত বোকা নই, বুঝতে পেরেছি আপনার অগ্নিশর্মারূপ একটা ছদ্মবেশ, আমার মত হতভাগ্য সংসারীদের দূরে রাখতে চান।"

বাবা মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন, "তুই দেখছি একটা বিচ্ছু। কী চাস বল।" বাবার কণ্ঠস্বর যেন একটু নরম হইয়াছে।

বলিলাম, "বাবা, সারাজীবন ধরে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। কোথাও উত্তর পাইনি। আপনি কৃপা করে অধমের অজ্ঞানমসী দূর করুন।"

"ভণিতা ছাড়, কী প্রশ্ন বল।"

"বাবা, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সকলের ভিত্তি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ; অর্থাৎ আত্মা অমর, দেহের বিনাশ হলেও আত্মা বেঁচে থাকে। এই জন্মান্তরবাদ বা আত্মার অমরত্ব যদি সত্যি না হয়, তাহলে কোনো ধর্মেরই কিছু থাকে না। এখন কথা হচ্ছে, আত্মা যে বেঁচে থাকে তার কোনো প্রমাণ আছে কি?"

"কী প্রমাণ চাস?"

"শাস্ত্রে দু' রকম প্রমাণের উল্লেখ আছে, প্রত্যক্ষ আর অনুমান। এর যেটা হোক একটা পেলেই সব সন্দেহ দূর হবে।"

banglabooks.in

বাবা বলিলেন, "হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রে আর একটা প্রমাণ আছে, তাকে বলে আপ্তবাক্য।"

সক্ষোভে বলিলাম, "আজকাল আপ্তবাক্যে কেউ বিশ্বাস করে না বাবা, হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, বুদ্ধদেব যীশুখ্রীষ্ট সবাই গাঁজা খেতেন। তবে কি বাবা, সত্যিকার প্রমাণ কিছু নেই?"

জংলীবাবা কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "প্রমাণ আছে। কিন্তু তোরা অন্ধ, দেখাব কী করে?"

বলিলাম, "আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়া আপনি যদি অন্ধের চক্ষুরুন্মীলন না করেন, তবে কে করবে?"

বাবা আবার তেরিয়া হইয়া উঠিলেন, পাঁচ মিনিট ধরিয়া আমার চৌদ্দ পুরুষান্ত করিয়া শেষে বলিলেন, "নিজের পূর্বজন্ম স্বচক্ষে দেখলে তোর বিশ্বাস হবে?"

জোড়হস্তে বলিলাম, "হবে বাবা।"

"তবে যা, রাত্রিবেলা ঘরে দোর দিয়ে বসবি, একটা মোমবাতি জেবলে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকবি। যতক্ষণ মোমবাতি পুড়ে শেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ চেয়ে থাকবি। এমনি রোজ করবি। যদি বাপের পুণ্যি থাকে একদিন দেখতে পাবি!—যা, এখন বেরো।"

আমি উঠিবার উপক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মোমবাতির দিকে চেয়ে থাকবার সময় কী ভাবব বাবা?"

"কিছু ভাববি না, মন শূন্য করে ফেলবি। যা ভাগ।"

সেই দিনই সন্ধ্যার পর এক বাণ্ডিল মোমবাতি কিনিয়া আনিলাম এবং আমার লেখা-পড়ার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া গেলাম। বাড়ির সবাই জানে এ-সময়ে আমি একান্ত মনে লেখাপড়া করি, তাই কেহ বিরক্ত করে না।

জ্বলন্ত মোমবাতির পানে চাহিয়া বসিয়া থাকা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, কিন্তু মনকে নির্বিষয় করাই প্রাণান্তকর।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ। গীতা বলেন, মনকে আত্মসংস্থ করিয়া ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। কথাগুলি জানা আছে। সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু মন প্রমাথী এবং বলবদ্দৃঢ়। একদিক পরিষ্কার করি তো অন্যদিক হইতে পঙ্গপালের মত চিন্তা ঢুকিয়া পড়ে। ঝাঁটা হস্তে মনের এদিক হইতে ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোনও ফল হইতেছে না। এ-যেন মশক-পরিবৃত স্থানে কেবল চড়-চাপড় চালাইয়া মশা তাড়াইবার চেষ্টা।

প্রথম দিন বৃথা গেল, দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও তাই। মোমবাতি পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার পূর্বজন্মের 'আমি'র দেখা পাইতেছি না।

ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার মন বোধ হয় শূন্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আমি জানিতে পারি নাই।

পঞ্চম দিনে ফল পাইলাম।

মোমবাতি জ্বালিয়া সবেমাত্র বসিয়াছি, মনটা নিস্তরঙ্গ হইয়া আসিতেছে, দেখিলাম মোমবাতির শিখা ঘিরিয়া অভঙ্গ রামধনুর মত একটি সপ্তবর্ণের মণ্ডল রচিত হইয়াছে। ক্রমে মণ্ডলের ভিতর দিয়া ঘরের যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল, শুধু মণ্ডলের মধ্যবর্তী মোমবাতির পীতাভ স্নিগ্ধ শিখাটি রহিল...তারপর শিখাটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। মণ্ডলের মধ্যে রহিল অচ্ছাভ শূন্যতা।

এইবার ধীরে ধীরে মণ্ডলমধ্যবর্তী শূন্যতা চিহ্নিত হইতে লাগিল। একটা মুখ ছায়া-ছবির পটের উপর আলোকচিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল। জীবন্ত মুখ; চোখের দৃষ্টিতে প্রাণপূর্ণ সজীবতা। পুরুষের মুখ; মস্তক এবং মুখ মুণ্ডিত, একটু শীর্ণ অস্থিসার গঠন, কণ্ঠের অস্থি উচ্চ। মুখখানা যেন চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরের কিছু দেখিতেছে না, নিজের মনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আছে।

banglabooks.in

এই মুখখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত উদ্বেগ বদ্ধ কক্ষে ধূম্রকুণ্ডলীর মত তাল পাকাইতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনে হইল ওই মুখখানা আমারই মুখ, ওই মুখের অন্তরালে যে চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা আমারই চিন্তা; জানি না কতকাল পূর্বে কোথায় বসিয়া আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম। ক্রমে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল; আমার বর্তমান সত্তা ধীরে ধীরে ওই অতীত সত্তার সহিত মিশিয়া অভিন্ন হইয়া গেল।—

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। বর্তমানে আমি আয়নায় নিজের যে-মুখ দেখিতে পাই তাহার সহিত ওই মুখের বিশেষ সাদৃশ্য নাই; কিন্তু একেবারে বিসদৃশও নয়। ভ্রূর হাড় উঁচু, কান বড়, চিবুক ছোট; এই রকম সাধারণ মিল আছে। একই বংশের দুইজন মানুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

আমি কে, কোথায় আছি, কী করিতেছি তাহা জানি। কিন্তু কত দিন আগেকার কথা তাহা জানি না। অব্দ সম্বতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এইটুকু বলিতে পারি, অজন্তায় মাত্র পাঁচটি গুহা তখন খোদিত হইয়াছিল।

অজন্তার একটি গুহার মধ্যে আমি বসিয়া আছি। গভীর রাত্রি। আমার দুই জানুর পাশে দুইটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোতে গুহা-প্রাচীরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। আমি একাকী বসিয়া ছবি আঁকিতেছি।

গুহায় আর কেহ নাই, আমি একা।

দিনের বেলা অনেক ভিক্ষু শ্রমণ এখানে কাজ করে। কেহ পর্বতগাত্র কাটিয়া গুহা রচনা করে, কেহ মূর্তি গড়ে, কেহ গুহা-প্রাচীরে চিত্র আঁকে। সন্ধ্যার সময় তাহারা পর্বতপৃষ্ঠ হইতে উপত্যকায় নামিয়া যায়।

দুই সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝখান দিয়া উপলবন্ধুর অগভীর জলপ্রবাহ গিয়াছে, সেই নির্ঝরিণীর কূলে আমাদের মৃৎকুটির। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে আমরা আবার উপরে উঠিয়া আসি, সারাদিন কাজ করি। ইহাই আমাদের জীবন। সংসারের একান্তে গিরি-সঙ্কটের নির্জনতায় গোপন স্বর্লোক রচনা করিতেছি, ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক মহিমার শিল্প-কায়া গঠন করিতেছি। আমরা যখন থাকিব না, আমাদের অনামা কীর্তি তখনও অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

আমার নাম পুণ্ডরীক। কলিঙ্গ দেশে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিবাসী ছিলাম। কিন্তু স্বদেশে আমার সহজ শিল্প-কৃতিত্বের আদর হইল না। কুড়ি বৎসর বয়সে আমি সংসার ছাড়িয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলাম।

বুদ্ধের সঙ্ঘ-বিহারে শিল্পের আদর আছে। শীঘ্রই আমার শিল্পক্রিয়া গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিল্পাচার্য গোতমশ্রী আমাকে শিষ্য করিয়া লইলেন।

তারপর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে।

গুরুর সঙ্গে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি, বহু সংঘারাম স্তূপ চৈত্য অলঙ্কৃত করিয়াছি।

নিভৃত গিরিসঙ্কুল প্রদেশের পর্বতগাত্রে গুহা খোদিত করিয়া শিল্প-মন্দির রচনার রীতি দাক্ষিণাত্যের রাজারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া এই রীতি প্রচলিত আছে। রাজারা অর্থদান করেন, শিল্পীরা পাষাণপটে তথাগতের অলৌকিক জীবনকথার রূপদান করে।

গত তিন বৎসর আমরা অজন্তায় কাজ করিতেছি। আচার্য গোতমশ্রীর সঙ্গে আমরা দশজন প্রতিমা-শিল্পী ও দশজন চিত্রশিল্পী আছি। আমি চিত্রশিল্পী। আরও অনেক শ্রমণ আছে, তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করে।

আজ গভীর রাত্রে অন্ধকারে গুহামধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া আমি চিত্র আঁকিতেছি। চিত্র

banglabooks.in

প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে একটু রঙের স্পর্শ, একটু ব্যঞ্জনার সংস্কার করিতে হইবে। কাল মহারাজ বাণদেব চিত্র পরিদর্শন করিতে আসিবেন। তৎপূর্বেই চিত্র প্রস্তুত থাকা চাই।

প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া চিত্রটিকে পরীক্ষা করিলাম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারি হস্ত পরিমাণ চিত্র। আশেপাশে উপরে জাতক হইতে অন্য চিত্র আঁকিয়াছি, সকলের মধ্যস্থলে এই চিত্রটি। চিত্রের বিষয়বস্তু—সিদ্ধার্থ ও গোপার বিবাহ। চারিদিকে বহু পরিজন, কেন্দ্রস্থলে গোপার পাণিগ্রহণ করিয়া বরবেশী সিদ্ধার্থ।

চিত্রটি শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী হইয়াছে, আচার্য গোতমশ্রী দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। সামান্য অঙ্কনের ত্রুটি যেটুকু আছে তাহা আজ রাত্রেই সংশোধন করিব।

কিন্তু—এই চিত্রের মূলে যে বিপুল প্রতারণা আছে তাহা কেবল আমি জানি; আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। গোপার যে-মূর্তি আঁকিয়াছি তাহা দেবীমূর্তি নয়, আমার কামনার রসে নিষিক্ত লালসাময়ী স্ত্রীমূর্তি।

আমি ভিক্ষু, আমার জীবন নারীহীন। কিন্তু নারীর জন্য কোনও দিন তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি নাই। আমার শিল্পই আমার জীবন।

বহু নারীচিত্র আঁকিয়াছি—দেবী মানবী অপ্সরী কিন্নরী গন্ধর্ববধূ, নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তেই আঁকিয়াছি। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে। তারপর সহসা আজ হইতে তিন মাস পূর্বে আমার অন্তর্লোকে বিপ্লব ঘটিয়া গেল।—

তিন মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠান নগর হইতে পরমসৌগত শ্রীমন্মহারাজ বাণদেব আসিয়াছিলেন; সঙ্গে ছিলেন রানী কুরঙ্গিকা।

নবীন রাজা নবীনা রানী।

একটি গুহায় উচ্চ পাষাণ-চৈত্য আছে, রাজারানী সেই চৈত্যমূলে স্বর্ণমুষ্টি রাখিয়া পূজা দিলেন। তারপর রাজা আচার্য গোতমশ্রীকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা একটি গুহা-প্রাচীরে সিদ্ধার্থ ও গোপার পরিণয়-দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়।"

গোতমশ্রী দেখিলেন, রাজা ও রানীর নূতন বিবাহ হইয়াছে, নব-অনুরাগের মাদক রসে উভয়ের মন মজ্জিত হইয়া আছে; তাই সিদ্ধার্থ ও গোপা বিবাহ-চিত্র অঙ্কিত করাইতে তাঁহাদের এত আগ্রহ।

গোতমশ্রী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার প্রধান শিষ্য, রাজাদিষ্ট চিত্র আমিই আঁকিব।

সেই রানী কুরঙ্গিকাকে প্রথম দেখিলাম।

রাজা বাণদেবও অতিশয় সুপুরুষ; যৌবন-ভাস্বর দেহ, বুদ্ধি-দীপ্ত প্রসন্ন মুখমণ্ডল। কিন্তু আমি যেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার পাশে, একটু পিছনে রানী কুরঙ্গিকা নতমুখে লীলাকমলের দল নখে বিদ্ধ করিতেছিলেন; আমি কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম।

রানী কুরঙ্গিকার রূপের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিল্পীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া আমি তাঁহার রূপ দেখি নাই, দেখিয়াছিলাম অন্ধ আবেগের আশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া। মুহূর্তমধ্যে আমার দেহ-মন উন্মথিত করিয়া এক মদান্ধ রসোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল।

আমার চৌত্রিশ বছর বয়স হইয়াছে। আমি জানি, আমার অন্তরে যে রসোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে তাহা অমৃতের উৎস নয়, তীব্র গরলের ধারা। আমার মনের গরলের সহিত রানী কুরঙ্গিকার কোনও সংস্রব নাই, ইহা একান্তভাবে আমার মনের গরল। কোথায় এতদিন লুক্কায়িত ছিল, দেহের কোন গূঢ়-গহন গুহায় আত্মগোপন করিয়াছিল; আজ সহসা অগ্ন্যুৎপাতের মত বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বাহির হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবুও বাহিরে উহার প্রকাশ কেহ লক্ষ্য করে

banglabooks.in

নাই।

গোতমশ্রী কিছু জানিতে পারেন নাই, রাজাও না। আশ্চর্য মানুষের মুখ! আমরা শিল্পী, মানুষের মুখ আঁকিয়া মানুষের মনের কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তবজীবনে মুখ দেখিয়া মনের কথা কতটুকু জানা যায়? মানুষের মনে অনেক পাপ। তাই ছদ্ম-সাধুতা তাহার সহজাত সংস্কার।

গোতমশ্রী রাজার প্রস্তাব আমাকে শুনাইলেন।

আমি চিত্র আঁকিতে সম্মত হইলাম।

প্রাচীরের কোন্ স্থানে চিত্র অঙ্কিত হইবে তাহা স্থির হইল। নূতন গুহার প্রাচীরে অধিকাংশ স্থান এখনও শূন্য; মনোমত স্থান নির্বাচনের অসুবিধা নাই। পুরাতন গুহা-গুলির সকল স্থান ভরিয়া গিয়াছে।

অজন্তার নিকট দিয়া প্রতিষ্ঠান নগর হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত দীর্ঘ বাণিজ্যপথ আছে, সেই পথে বহু সার্থবাহ মহার্ঘ পণ্য লইয়া যাতায়াত করে। তাহারা দৈবতুষ্টির জন্য চৈত্যে পূজা দিয়া যায়, গুহা-প্রাচীরে আপন মনোমত চিত্র আঁকাইয়া লয়। এইভাবে গুহাগুলি একে একে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা বাণদেব অঞ্জলি ভরিয়া নানা বর্ণের রত্ন আমার সম্মুখে ধরিলেন, বলিলেন, "ভিক্ষু, এই রত্নগুলি আপনি নিন। এদের চূর্ণ করে যে বর্ণ হবে সেই বর্ণ দিয়ে চিত্র আঁকবেন। যেন যুগ-যুগান্তরেও চিত্রের বর্ণ মলিন না হয়।"

রাজা বাণদেব কবি এবং প্রেমিক।

আমার চক্ষু তাঁহার মুখ হইতে দেবী কুরঙ্গিকার দিকে ফিরিল। তিনি আমার পানে কুরঙ্গ-নয়ন তুলিয়া মৃদু হাসিলেন। যেন স্বামীর নির্বন্ধের সহিত নিজের আগ্রহ যোগ করিয়া দিলেন।

আমার অন্তরের মধ্যে একটা আর্ত আকুতি চীৎকার করিয়া উঠিল—'দেবি, আমার মনকে ক্ষমা কর, আমার মনের পঙ্ক যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে।'

রত্নগুলি নিজ অঞ্জলিতে লইয়া মহারাজ বাণদেবকে বলিলাম, "তাই হবে আর্য।"

বিদায় গ্রহণের পূর্বে বাণদেব আমাকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, শিল্পীকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু দেবদেবীর আলেখ্য রচনার সময় মানুষী মূর্তিরই আশ্রয় নিতে হয়।"

ইঙ্গিতের তাৎপর্য—আমি যেন রাজা বাণদেব ও রানী কুরঙ্গিকার আদর্শে সিদ্ধার্থ এবং গোপার চিত্র অঙ্কন করি।

বলিলাম, "অবশ্য। আমার স্মরণ থাকবে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিনে চিত্র প্রস্তুত হবে।"

বলিলাম, "তিন মাস লাগবে!"

তিনি বলিলেন, "ভাল। তিন মাস পরে এই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে আবার আসব, আপনার শিল্পকলা দেখে যাব।"

তারপর রত্নগুলির বর্ণানুসারে পৃথক্‌ভাবে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অন্য রসায়ন মিশাইয়া রঙ প্রস্তুত করিয়াছি, গুহা-প্রাচীরের গাত্র মসৃণ করিয়া করিয়া তাহার উপর চিত্র আঁকিয়াছি।

সিদ্ধার্থের চিত্রে কালায়ত লোকসিদ্ধ আকৃতির সহিত বাণদেবের আকৃতি মিশাইয়াছি। আর গোপাকে আঁকিয়াছি রানী কুরঙ্গিকার প্রতিচ্ছবি করিয়া। নীলকান্ত মণির চূর্ণ দিয়া তাঁহার কেশ আঁকিয়াছি, ভ্রূ আঁকিয়াছি, নেত্রতারা আঁকিয়াছি। পদ্মরাগের গুঁড়া দিয়া আঁকিয়াছি তাঁহার অধর। পীত পুষ্পরাগ-চূর্ণের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশাইয়া রচিয়াছি তাঁহার দেহবর্ণ। আর—তাঁহার সমস্ত দেহে লেপিয়া দিয়াছি আমার মনের গলিত-তপ্ত লালসা।

কেন এমন হইল?

যাহাকে চিনিতাম না, জানিতাম না, যাহার মনের পরিচয় পাই নাই, তাহার দেহটা

banglabooks.in

এমন করিয়া কেন আমার মন জুড়িয়া বসিল! আমি নারী-লোলুপ লম্পট নই, শুদ্ধাচারী ভিক্ষু। যৌবনের সীমান্তে আসিয়া আমার এ কী হইল?

গোপার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে আমি যে দুরন্ত হৃদয়াবেগ অনুভব করিয়াছি তাহা পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই। কখনও অলৌকিক উল্লাসে মন ভরিয়া উঠিয়াছে; কখনও মনের অশুচিতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে। এত আনন্দ এবং এত কলুষ যে আমার মধ্যে ছিল, তাহা আমি নিজেই জানিতাম না!

চিত্র শেষ হইয়াছে, আমার সঙ্গে চিত্রের সম্বন্ধও ফুরাইয়া আসিতেছে। কাল রাজা বাণদেবের নিকট এই চিত্র সমর্পণ করিয়া আমি নিষ্কৃতি পাইব।

আমার গুরু এবং সতীর্থগণ চিত্র দেখিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন, আমি লজ্জায় অন্তরের মধ্যে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছি। কেবল একটি সান্ত্বনা আমার আছে—আমার মনের কথা কেহ জানিতে পারে নাই। গোপার মুখে যে দেবীভাব না ফুটিয়া মানুষী ভাব ফুটিয়াছে তাহা রসজ্ঞের চক্ষে বিবাহকালীন বিভ্রমের স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শিল্পীর মনের লালসা-কলুষ যে চিত্রিতার অঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে তাহা কেহ ধরিতে পারে নাই।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। গুহার মুখের কাছে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের আভা ফুটিয়াছে।

আমি প্রদীপ ধরিয়া গোপার আলেখ্য তিল তিল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। অধরে আরও একটু লালিমা যোগ করিয়া দিলাম, কটিতে ত্রিবলীর রেখা নীল বর্ণ দিয়া একটু স্পষ্ট করিলাম। তারপর দীপ নিভাইয়া গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে গুহা হইতে গুহান্তরে যাইবার সংকীর্ণ পথ, তাহার অন্য ধারে গভীর উপত্যকার খাদ। উপত্যকার পরপারে রোমশ পাহাড়ের মাথায় ভাঙা চাঁদ মুখ তুলিয়াছে।

চারিদিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

বাহিঃপ্রকৃতির বিপুল স্তব্ধতার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল আজিকার রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি; আমার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।—

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে রাজা বাণদেব আসিলেন। কিন্তু রানী কুরঙ্গিকা তাঁহার সঙ্গে আসেন নাই, রাজা বাণদেব একাকীই আসিয়াছেন।

চিত্রের সম্মুখে সারি সারি দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ দিবাভাগেও গুহার অভ্যন্তর ছায়াচ্ছন্ন।

রাজা বাণদেব দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া চিত্রটি দেখিলেন। তাঁহার মুখে নানা ভাবের ব্যঞ্জনা পর্যায়ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কখনও সংবৃত গাম্ভীর্য, কখনও ভঙ্গুর হাস্য। রসিক ব্যক্তি পরম রসবস্তু পাইলে এমনই আত্মসমাহিত হইয়া যায়।

অবশেষে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমার পানে চক্ষু ফিরাইলেন।

তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া আমার অঙ্গ সহসা হিম হইয়া গেল। তিনি বুঝিয়াছেন; আর কেহ যাহা অনুমান করিতে পারে নাই, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি শুধু চিত্রই দেখেন নাই, চিত্রকরের অন্তরও দেখিয়াছেন।

প্রেমের চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, তাই এই তরুণ যুবকের চক্ষে আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

বাণদেব মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভিক্ষু, ধন্য আপনার প্রতিভা।—একবার এদিকে আসুন, আপনাকে আড়ালে দুটি কথা বলতে চাই।"

গোতমশ্রী ও অন্য শিল্পীরা গুহামধ্যে রহিলেন, রাজা গুহার বাহিরে গেলেন। আমি তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই অতলস্পর্শ খাদ; তাহার তলদেশে উপলচপলা নির্ঝরিণী রবিকরে ঝিকমিক করিতেছে।

রাজা কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, আপনার কলানৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছি।

banglabooks.in

কিন্তু—"

কম্পিতস্বরে বলিলাম, "কিন্তু কী আর্য?"

রাজা বলিলেন, "বুদ্ধের সংঘ আপনার প্রকৃত স্থান নয়। আপনার অন্তরের তৃষ্ণা এখনো দূর হয়নি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে, সংসারে ফিরে চলুন—"

রাজা বাণদেব যদি তরবারি দিয়া আমার শিরচ্ছেদ করিতেন তাহা হইলে পলকমধ্যে আমার লজ্জার অবসান ঘটিত। কিন্তু তাঁহার শান্ত সংযত বাক্যে সমস্ত পৃথিবী আমার চক্ষে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না।

বাণদেব বলিয়া চলিলেন, "ভোগেরও সার্থকতা আছে। সংযত ভোগে ধাতু শুদ্ধ হয়, শিল্পীর পক্ষে ভোগের প্রয়োজন আছে। যে-শিল্পীর ধাতু প্রসন্ন হয়নি সে রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, আমার সভায় প্রধান শিল্পীর আসন অলংকৃত করবেন—"

আর সহ্য হইল না। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "মহারাজ, আমি ধর্মভ্রষ্ট ভিক্ষু, আদর্শভ্রষ্ট শিল্পী—পৃথিবীতে আমার স্থান নাই।"

উন্মত্তের মত আমি খাদে লাফাইয়া পড়িলাম।

আত্মস্থ হইয়া দেখিলাম, মোমবাতিটা দপ্‌দপ্‌ করিয়া নিভিয়া যাইতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই জংলীবাবার আস্তানায় গেলাম। দেখি কোটর শূন্য, বাবা অন্তর্হিত হইয়াছেন।—

আমার জীবনে এই যে একটা আষাঢ়ে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, এই লইয়া মাঝে মাঝে চিন্তা করি। যখনই চিন্তা করি, মনের মধ্যে দুইটি প্রতিপক্ষ মাথা তোলে। এক পক্ষ নির্বিচারে বিশ্বাস করে, সে-রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আমার পূর্বজন্মেরই একটি দৃশ্য। যদি কোনও দিন অজন্তা দেখিতে যাই, নিশ্চয়ই নিজের হাতে আঁকা ছবি দেখিতে পাইব। অন্য পক্ষ বলে, জংলীবাবা সম্মোহন বিদ্যা দেখাইয়াছেন।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, আবার মোমবাতি জ্বালাইয়া বসি। কিন্তু ভয় হয়। যে তীব্র মনঃপীড়া একবার পাইয়াছি তাহা আর দ্বিতীয়বার অনুভব করিতে চাই না।

তবে একটা লাভ হইয়াছে। আমি যে ছবি আঁকিতে পারি তাহা এতদিন জানিতাম না, চেষ্টাও করি নাই। এখন চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, ছবি আঁকা আমার পক্ষে সহজ। সুদূর অতীত কালের একটি কুরঙ্গনয়না যুবতীর মুখ ইচ্ছা করিলেই আঁকিতে পারি।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

banglabooks.in

সতী

লোকটি হাত দেখিতে জানে, ঠিকুজি-কোষ্ঠী গণনা করিতে জানে, এবং গল্প বলিতে পারে। পেশা কিন্তু বীমার দালালি। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ; গম্ভীর, মোটা এবং ধড়িবাজ। এই জাতীয় লোককে আমি সর্বদাই এড়াইয়া চলি, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না তাহার খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। দশ হাজার টাকা জীবনবীমা করিয়া ভবিষ্যতের পায়ে বর্তমানকে বন্ধক রাখিয়া চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতেছিলাম।

কিন্তু সে যাক। নিজের দুঃখের কথা এখানে বলিতেছি না। লোকটি তাহার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার যে কাহিনী শুনাইয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বীমা-দালালের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। তাঁহারা হয়তো অহরহ সত্য কথাই বলিয়া থাকেন; কিন্তু এই কাহিনীর সত্যাসত্য বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও আমি অক্ষম। যেমন শুনিয়াছিলাম তেমনি লিখিতেছি।

আমি তখন বোম্বাই প্রবাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের দিকে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি। সে কোনও দিন সকালে, কোনও দিন বিকালে আমার বাসায় আসিত। আমার হাত দেখিয়া এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়াছিল যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

লোকটির গল্প বলিবার ভঙ্গী নাটুকে নয়, বরঞ্চ তাহার বিপরীত। সামান্য সূত্র ধরিয়া সে গল্প আরম্ভ করিত, ধীর মন্থর কণ্ঠে বলিয়া যাইত; সে যে গল্প বলিতেছে তাহা প্রথমে ধরা যাইত না। তারপর কখন অলক্ষিতে গল্প জমিয়া উঠিত, আফিমের নেশার মত ধীরে ধীরে মনকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

একদিন সন্ধ্যার পর সে আসিয়া জুটিয়াছিল। সেদিন আর কেহ আসে নাই। আমি আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া গড়গড়া টানিতেছিলাম, সে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া দীর্ঘ সিগার ধরাইয়াছিল। বাহিরে রিমঝিম বৃষ্টি চলিয়াছে। বোম্বাই বৃষ্টি, বজ্রহীন বিদ্যুৎহীন উদ্বেগহীন বৃষ্টি। এ বৃষ্টিতে শুধু বহিরঙ্গ নয়, মনও ভিজিয়া ভারি হইয়া ওঠে।

সে সন্তর্পণে অ্যাশ-ট্রেতে সিগারের ছাই ঝাড়িয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, 'আজকাল সীতা সাবিত্রী খুব বেশী দেখা যায় না বটে, কিন্তু সতীসাধ্বী মেয়ে একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না।'

কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কোনও পূর্বসংযোগ নাই। আমি ভ্রূ বাঁকাইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'তাই নাকি! হঠাৎ এ কথা কেন?'

সে সিগার দাঁতে চাপিয়া দু'তিনটা মৃদু টান দিল। বলিল, 'বৃষ্টি দেখে মনে পড়ে গেল। গত বছর গ্রীষ্মের শেষে আমি গুজরাতে গিয়েছিলাম, একেবারে গুজরাতের অন্দর মহলে। সেখানে একটা ব্যাপার দেখিলাম—'

'কী—সতীদাহ? ওদিকে এখনও মাঝে মাঝে হয় শুনেছি।'

'না। সতীদাহ নয়'—একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল:

কাকুভাই দেশাই আমার বন্ধু, এক কোম্পানীতে কাজ করি। গুজরাতের কয়েকটা তসিল নিয়ে তার এলাকা; সেখানেই থাকে, মাঝে মাঝে বোম্বাইয়ের হেড্ অফিসে আসে। গত বছর কাকুভাই হেড্ অফিসে এসেছে, আমাকে বলল, 'চল না গুজরাত বেড়িয়ে আসবে। আমার অফিসে অনেক কাজ জমে গেছে, তোমাকে পেলে সামলে নিতে পারব।'

কর্তার অনুমতি নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। আমি সুরাট আমেদাবাদে কয়েকবার গেছি বটে, কিন্তু অজ গুজরাতে কখনও ঢুকিনি। দেশটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। ভারতবর্ষে যত জাত আছে তার মধ্যে গুজরাতিরাই বোধহয় সবচেয়ে বড়মানুষ। টাকা রোজগারের এত ধান্দা মাড়বারিরাও জানে না। ভাবলাম, দেখে আসি কোন্ গোলার চাল খেয়ে ওদের এত বিষয়বুদ্ধি!

banglabooks.in

সারা গুজরাতে বোধহয় দু'চার শ' রাজ্য আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে রাজ্য, ক্ষুদে রাজা, ক্ষুদে রাজধানী। শহরগুলির জীর্ণ অবস্থা; সরু সরু গলি, বাড়িগুলো গলে খসে পড়েছে। মৌচাকের মধু নিঙড়ে নিয়ে শুকনো ভাঙ্গা মৌচাকটা যেন কে ফেলে দিয়েছে। আসল গুজরাতের এই চেহারা। বেশ বোঝা যায়, গুজরাতিদের ঘরে কিছু নেই, মাড়ুবারিদের মত ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা মধুসঞ্চয় করে। যে জাতের ঘরে খাবার আছে তারা বাইরে যায় না, বাঙালীর মত ঘরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। মধু সঞ্চয় করতে পারে না।

যাহোক, আমরা তো গিয়ে পৌঁছুলাম। শ্রীহীন শহর, দেখবার কিছু নেই। তার ওপর পচা গরম। আকাশে মেঘ ঘোরাঘুরি করছে, দু'চার দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। তার আগে গ্রীষ্মঋতু অন্তিম কামড় দিয়ে যাচ্ছে।

কাকুভাইয়ের বাসাতেই আছি। তার ঘরে বউ আর দু'টি মেয়ে। মহাত্মাজীর কল্যাণে গুজরাতী মেয়েরা পর্দা থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু তাদের মন এখনও রান্নাঘরের চৌকাঠ পার হতে পারেনি। বড় বেশী সংসারী গুজরাতী মেয়েরা, সংসার নিয়েই আছে। নিজেরা রাঁধে, জল তোলে, কাপড় কাচে, বাজার করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাছ-মাংসের পাট নেই; তবে খুব দুধ খায়, কথায় কথায় দুধ খায়। বাড়িতে কেউ এলে তাকে চায়ের বদলে দুধ দেয়। কাকুভাইয়ের বৌ সুশীলা বেন ভারি শান্ত প্রকৃতির মহিলা, আমাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করলেন। তবু মনে হল তিনি যদি একটু কম সংসারী হতেন তাহলে বোধহয় ভাল হত। কিন্তু কী করবেন উনি; গুজরাতী জাতের ধাতই ওই। চড়ুইপাখি যেমন বেশী উঁচুতে উড়তে পারে না, ওদের মন তেমনি মাটি থেকে বেশী উঁচুতে ওঠে না।

তাই বলে কি ব্যতিক্রম নেই? আছে বৈ কি! মহাত্মাজীই তো মস্ত একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম ব্যতিক্রম বড় বেশী চোখে পড়ে না। আদর্শ নিয়ে ওদের বেশী মাথাব্যথা নেই; তাই বোধহয় মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে বিরাট আদর্শবাদী মানুষ জন্মগ্রহণ করে জাতটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিন-চার দিন কেটে গেল। কাকুভাই আমাকে তার অফিসে নিয়ে যায়, সেখানে তার কাজকর্মে তাকে সাহায্য করি, অফিসের কাজকর্ম এগিয়ে দিই। অনেক লোক আসে অফিসে। বীমা কোম্পানীর অফিসে আড্ডা দেবার জায়গা; কেউ আড্ডা দিতে আসে, কেউ বীমা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে আসে; সাব-এজেন্টরা কেস নিয়ে আসে। কাকুভাইয়ের মুখে তারা যখন শোনে আমি হাত দেখতে জানি, সবাই আমাকে ঘিরে ধরে। সকলের মুখে এক প্রশ্ন—কবে আমার টাকা হবে?

একদিন বিকেলবেলা কাকুভাই বলল, 'চল, তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। শহরটা তো একবার দেখলেও না।'

বললাম, 'কি আছে তোমার শহরে?'

সে বলিল, 'কিছুই না। তবু নদীর ধারটা মন্দ নয়। চল, সেইদিকেই যাওয়া যাক।'

দু'জনে বেরুলাম। আকাশে মেঘ বেশ গাঢ় হয়েছে; বাতাস নেই। ঘরে বসে বসে দম বন্ধ হয়ে আসে, তার চেয়ে বাইরে ভাল। বোধহয় আজ রাত্রেই বর্ষা নামবে।

গলির পর গলি পার হয়ে নদীর দিকে চলেছি। এক সময় কাকুভাই বলল, 'চল, চম্পক-ভাইকে একবার দেখে যাই, অনেকদিন খোঁজ পাইনি। কাছেই তার বাড়ি।'

আর একটা গলিতে ঢুকলাম—'চম্পকভাই কে?'

কাকুভাই বলল, 'চম্পকভাই পাটেল, আমার পরিচিত একটি ছোকরা। সাব-এজেন্টের কাজ করত, মাঝে মাঝে দু'একটি কেস আনত। বড় গরীব। কয়েক মাস হল টি. বি. ধরেছে।'

গলিটা সরু হয়ে যেখানে পাশাপাশি দু'জন হাঁটার অযোগ্য হয়ে পড়েছে সেখানে একটা ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির গা থেকে খাবলা খাবলা প্ল্যাস্টার উঠে গেছে, বন্ধ দরজার রঙ মাছের আঁশের মত ছেড়ে ছেড়ে আসছে। জরাজীর্ণ বাড়িটায় মানুষ আছে বলে মনে হয় না, যেন পোড়ো বাড়ি। কাকুভাই দরজায় ধাক্কা দিল।

banglabooks.in

কিছুক্ষণ পরে একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। কাকুভাই জিজ্ঞেস করল, 'চম্পকভাই কেমন আছে, রমাবেন?'

এক নজর দেখে মনে হয় মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তারপর বুঝতে পারা যায়, অপূর্ব সুন্দরী নয়, অপূর্ব তার লাবণ্য। মুখে আর সারা গায়ে লাবণ্য ফেটে পড়ছে। বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ; রঙ ফরসা, টানা-টানা চোখ, ঠোঁট দুটি পাকা তেলাকুচোর মত টুকটুকে লাল; কিন্তু মুখে রুজ পাউডার নেই। গুজরাতী মেয়েরা সিঁথেয় সিঁদুর পরে না, তাই সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না, তবু বুঝতে কষ্ট হল না যে, রমাবেন চম্পকভাইয়ের বউ।

কাকুভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে রমাবেন একটু ঘাড় নাড়ল। তার টানা-টানা চোখের মধ্যে কি যেন রয়েছে ঠিক ধরা যায় না; যেন তার মন ইহলোক ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। যেন সে পৃথিবীর মানুষ নয়। এটা তার স্বাভাবিক ভঙ্গী কিনা, প্রথমবার তাকে দেখে বুঝতে পারলাম না।

ঘরের ভিতর থেকে অবসন্ন কাশির আওয়াজ এল।

কাকুভাই বলল, 'এসেছি যখন, চম্পকভাইকে একবার দেখে যাই।'

রমাবেন একবার আমার মুখের পানে তাকাল, একবার কাকুভাইয়ের পানে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ—না।

কাকুভাই তৎক্ষণাৎ বলল, 'আচ্ছা থাক। আমার এই বন্ধুটি বোম্বাই থেকে এসেছেন, তাই ক'দিন খবর নিতে পারিনি। আমি কাল আবার আসব।'

রমাবেনের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, তারপর চৌ-ওঠা দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ফিরে চললাম। যেতে যেতে কাকুভাই বলল, 'চম্পকভাই বোধ হয় বাঁচবে না। যদি না বাঁচে রমাবেনের কি হবে তাই ভাবছি। ওদের কারুর তিন কুলে কেউ নেই। চম্পকভাইকে বলেছিলাম অন্তত হাজার টাকার একটা পলিসি নাও। তা শুনল না—'

রমাবেনের লাবণ্যভরা মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। যার স্বামী টি. বি.-তে মরছে তার এত লাবণ্য! কী রকম মেয়ে রমাবেন? মুমূর্ষু স্বামীর সেবা করে না?

আরও কয়েকটা গলিঘুঁজি পেরিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছুলাম। মেঘলা আকাশ থমথম করছে, মেঘের আড়ালে সূর্যাস্ত হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

নদী খুব চওড়া নয়, বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ, তাও জল শুকিয়ে বালি আর পাথরের ঢেলা বেরিয়ে পড়েছে, খাদের মাঝখান দিয়ে জলের একটা সরু নালা বয়ে যাচ্ছে। দু'ধারে উঁচু পাথুরে পাড়, বর্ষা নামলে নিশ্চয় কানায় কানায় জল ভরে ওঠে।

আমরা একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। এখানটা বেশ নিরিবিলি, নদীর ঘাট এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমি সিগার ধরালাম। কাকুভাই সিগারেট বের করল। গুমট ভেঙে পশ্চিম থেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত দিনের আকাট গরমের পর ভারি মিষ্টি লাগল।

নদীর এপাশে শহর, ওপারে জনবসতি নেই। ওদিকে পাড়ের ওপর একসারি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশটা। সবগুলো এক মাপের, ছ'ফুট কি সাত ফুট উঁচু। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওগুলো কিসের মন্দির?'

কাকুভাই একবার সেদিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল, বলল, 'ওগুলো সতী মন্দির।'

সতী মন্দির! সে কাকে বলে? কেষ্টবিষ্টুর মন্দির, গণপতি মহালক্ষ্মীর মন্দির, জগন্নাথ মা-কালীর মন্দির জানি। কিন্তু সতী মন্দিরের নাম কখনও শুনিনি। বললাম, 'সে কাকে বলে?'

কাকুভাই তখন গল্প ফেঁদে বসল। বলল, 'আজকের কথা নয়, প্রায় হাজার বছর ধরে চলে আসছে। যখনি এই শহরে কোনও সতী নারীর মৃত্যু হয়েছে তখনই শহরের লোকেরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে নদীর ধারে একটি করে মন্দির তৈরি করেছে। সবসুদ্ধ চব্বিশটি

banglabooks.in

মন্দির আছে। শেষ মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ষাট-সত্তর বছর আগে। তারপর আর হয়নি। প্রতি পূর্ণিমায় শহরের মেয়েরা মন্দিরে গিয়ে ফুল জল দিয়ে আসে। কামনা করে, তারাও যেন সতী হতে পারে। মন্দিরগুলি আমাদের শহরের মস্ত গৌরব।'

আমি বললাম, ঠিক বুঝলাম না। তুমি বলছ এক হাজার বছরে মাত্র চব্বিশটি সতী পাওয়া গেছে। আর বাকী সব মেয়েরা কি অসতী ছিল? কে সতী কে অসতী তার বিচার হয় কি করে?'

কাকুভাই একটু চুপ করে থেকে বলল, 'গোড়ার দিকে কি হয়েছিল জানি না, কিন্তু গত দেড়শ দু'শ বছরে যা হয়েছে তা বলতে পারি। শহরের বুড়ো বুড়িদের মুখে শুনেছি, এক অলৌকিক ব্যাপার হয়। যেদিন শহরে কোনও সতী নারীর মৃত্যু হয় সেদিন সন্ধ্যার পর ওই মন্দিরগুলোতে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, তারপর প্রদীপ হাতে নিয়ে সতী নারীরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন, তাঁরা দল বেঁধে মন্দিরগুলোকে প্রদক্ষিণ করেন, তারপর আবার মন্দিরে অদৃশ্য হয়ে যান; শহরের লোকেরা তাই দেখে বুঝতে পারে; তখন তারা নতুন মন্দির তৈরি করে।'

অলৌকিক ব্যাপারে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না; আবার সংস্কারের বিরুদ্ধে তর্ক করাও চলে না, তাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়। আমি চুপ করে রইলাম।

এতক্ষণে চারিদিক ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে, বাতাসে একটা ভিজে ভিজে স্পর্শ, যেন কাছেই কোথাও বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে কুয়াশার মত একটা আবছায়া পর্দা এগিয়ে আসছে। কাকুভাই উঠে পড়ল, 'চল, ফেরা যাক।'

নিভে যাওয়া সিগারটা ফেলে দিয়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। কুয়াশার পর্দা তখন ওপারের মন্দিরগুলোর ওপর এসে পড়েছে, কিন্তু মন্দিরগুলো একেবারে ঢাকা পড়ে যায়নি। হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। মন্দিরগুলোর মধ্যে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল, যেন কেউ সুইচ টিপে সবগুলো মন্দিরের আলো একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিলে।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাকুভাইও দেখতে পেয়েছিল। সে দু'হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'জয় সতী-মা! জয় সতী-মা!' তার গলা থরথর করে কাঁপছে।

আমি ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মন্দিরগুলোতে ইলেকট্রিক লাইট আছে নাকি?'

সে চাপা গলায় বলল, 'ইলেকট্রিক কোথায়! জয় সতী-মা! কত পুণ্যে আমি এ দৃশ্য দেখলাম! জয় সতী-মা।'

ওদিকে আলোর সারি নড়তে আরম্ভ করেছে। এত দূর থেকে স্পষ্ট মানুষের মূর্তি দেখতে পেলাম না, তবু মনে হল এক দল মেয়ে প্রদীপ হাতে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু করেছে। আলোর সারি সাপের মত মন্দির প্রদক্ষিণ করে ফিরে এল। তারপর প্রদীপগুলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে নিভে গেল।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মুখে লাগছে; যাকে কুয়াশা মনে করেছিলাম তা আসলে বৃষ্টির সূত্রপাত। কাকুভাই তখনও তদ্গতভাবে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'চল, এবার ফেরা যাক!'

কাকুভাই চমকে উঠল। তারপর বলল, 'কোন্ সতীর দেহান্ত হয়েছে কে জানে। চল, শহরে খবর নিই।'

ফিরে চললাম। শহরের দোকানপাটে আলো জ্বলছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি বাতিগুলোকে ঘিরে রঙ ফলাচ্ছে। কিছুক্ষণ চলবার পর দেখলাম কোট-প্যাণ্ট পরা একজন লোক হাতে ব্যাগ নিয়ে হনহন করে আসছে। কাকুভাইকে দেখে থমকে দাঁড়াল; বলল, 'কে, কাকুভাই?'

কাকুভাই বলল, 'হ্যাঁ। কি খবর ডাক্তার সামন্ত? কোথায় চলেছ?'

ডাক্তারকে চিনতে পারলাম, আমাদের কোম্পানীর স্থানীয় ডাক্তার। সে বলল, 'শোননি চম্পকলাল মারা গেছে?'

banglabooks.in

দু'জনেই চমকে উঠলাম। কাকুভাই বলে উঠল, 'মারা গেছে! এই ঘণ্টাখানেক আগে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম, তার বৌ রমাবেন—'

ডাক্তার বলল, 'রমাবেনও নাকি মারা গেছে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। কিছু বুঝতে পারছি না। আসবে তো এস।' বলে ডাক্তার হনহন করে চলল।

আমরা আচ্ছন্নের মত তার পিছু পিছু চললাম। যাকে এক ঘণ্টা আগে সহজ সুস্থ মানুষ দেখেছি, যার অপরূপ লাবণ্য চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে, সে মরে গেছে! চম্পকভাইকে দেখিনি, তার হয়তো মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল—কিন্তু—

ডাক্তার চলতে চলতে বলল, 'চম্পকলালকে আমিই দেখছিলাম, সে দু'এক দিনের মধ্যে যাবে জানতাম। কিন্তু রমাবেনের স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই ছিল। কে জানে হয়তো স্বামীর মৃত্যুর শক্ সহ্য করতে পারেনি, কিংবা হয়তো বিষ-টিষ কিছু—'

চম্পকভাইয়ের বাড়ির দরজা খোলা, সামনে কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে। আমরা ডাক্তারের পিছনে পিছনে ভিতরে গেলাম।

একটি ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানার উপর শুয়ে আছে কঙ্কালসার একটি মৃত-দেহ, আর তার পাশে তার একটা হাত দু'হাতে বুকের ওপর চেপে ধরে রমাবেন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে কোনো বিকৃতি নেই, যেন পরম নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার দু'জনকে পরীক্ষা করল, তারপর মুখ তুলে বলল, 'দু'জনেই মৃত!'

আমি আর কাকুভাই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে অন্ধকারে তখনও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জোর বেড়েছে; আমরা ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরে চললাম।

হঠাৎ কাকুভাই আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'ভাই! সতী নারীরা কেন আজ প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন এখন বুঝতে পারলে? রমাবেনকে আমি হাজার বার দেখেছি, কিন্তু সে যে এতবড় সতী তা একবারও মনে হয়নি।'

রমাবেন বিষ খেয়েছিল কিনা আমরা জানতে পারিনি। ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, দু'জনের দেহ এক চিতায় দাহ হয়েছিল। সতীত্ব বলতে ঠিক কি বোঝায়, আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। কায়মনোবাক্যে একটি পুরুষকে যে-মেয়ে ভালবাসে তাকেই আমরা সতী বলি। রমাবেন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। মাত্র একবার দু'মিনিটের জন্য তাকে দেখেছিলাম; কিন্তু সে যে মহাসতী ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই! স্বামীর হাত বুকে নিয়ে মহানিদ্রায় ডুবে যাওয়ার সে দৃশ্য যে দেখেছে সেই বুঝেছে রমাবেনের মন কী ধাতুতে তৈরি ছিল।—তাই বলছিলাম আজকালকার দিনেও সতী নারী একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না।

২৫ পৌষ ১৩৬৪

banglabooks.in

নীলকর

সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন সভ্য ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম—আমি, বরদা এবং একজন নূতন সভ্য, হিরণ্ময়বাবু। ইনি সম্প্রতি সিগারেট ফ্যাক্টরিতে চাকরি লইয়া এখানে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা কাটাইবার জন্য ক্লাবের সভ্য হইয়াছেন। বেশ মিশুক ও রসিক লোক।

ফাল্গুন মাস। খোলা জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া টেবিলের উপর পাট-করা খবরের কাগজখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, মাথার উপর বিদ্যুৎবাতিটা প্রখরভাবে জ্বলিতেছে। আমরা দুই-চারিটা অনাবশ্যক কথা বলিয়া নীরব হইয়া পড়িয়াছি। বরদা কড়িকাঠের দিকে তন্ময় চক্ষু তুলিয়া বোধকরি নূতন ভৌতিক গল্প উদ্ভাবন করিতেছে। হিরণ্ময়বাবু লম্বা একটা হোল্ডারে সিগারেট জুড়িয়া টানিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া বরদার দিকে কটাক্ষ-পাত করিতেছেন। আমি ভাবিতেছি—

হঠাৎ হিরণ্ময়বাবু বলিলেন, 'বরদাবাবু, আপনি নাকি ভূত দেখেছেন?'

চমকিয়া মুখ তুলিলাম। বরদাকে এই প্রশ্ন করা আর পাগলকে সাঁকো নাড়িতে বারণ করা একই কথা। হিরণ্ময়বাবু নূতন লোক, বরদাকে এখনও ভাল করিয়া চেনেন নাই। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম।

বরদা কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে হিরণ্ময়বাবুর পানে চাহিল। এবং ঠিক এই সময় বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনায় হিরণ্ময়বাবু হেঁচকি তোলার মত একটা শব্দ করিলেন।

হিরণ্ময়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে আলো নিবিয়া যাওয়ার কোনও অনৈসর্গিক সংযোগ আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিছুদিন হইতে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, হঠাৎ আলো নিবিয়া সমস্ত পাড়াটাই নিরালোক হইয়া যাইতেছিল। বৈদ্যুতিক কর্তারা বলিতেছিলেন লাইনের দোষ হইয়াছে। কিন্তু দোষ ধরিতে পারিতেছিলেন না। আজও তাহাই হইয়াছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আলো জ্বলিবে না।

অন্ধকারে বসিয়া আছি। প্রথম কথা কহিল বরদা, তাহার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু পরিতৃপ্তির সুর ধরা পড়িল। যেন তাহার গল্পের পরিবেশ রচনার জন্যই আলো নিবিয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'ভূত আমি অনেক দেখেছি, হিরণ্ময়বাবু! দিশী ভূত, বিলিতি ভূত, ভালমানুষ ভূত, দুর্দান্ত ভূত। মানুষ যেমন হরেক রকমের আছে ভূতও তেমনি। কিন্তু গত পৌষ মাসে যে-ভূতটিকে দেখেছিলাম, তার মত অশ্লীল ভূত জীবনে দেখিনি।'

বরদার গল্প ফাঁদিবার টেকনিক আমাদের জানা আছে। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলিয়া শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, তারপর শ্রোতারা সামলাইয়া উঠিবার আগেই গল্প শুরু করে। তখন আর তাহাকে থামাইবার উপায় থাকে না। উপরন্তু আজ হিরণ্ময়বাবু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন, বলিলেন, 'অশ্লীল ভূত কী রকম! কাপড়-চোপড় পরে না?'

বরদা বলিল, 'ঠিক ওরকম নয়। ভূতকে অশ্লীল কেন বলছি তা বুঝতে হলে গল্পটা শোনা দরকার। গত পৌষ মাসে আমি মজঃফরপুরে গিয়েছিলাম—'

গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। অন্ধকারে হিরণ্ময়বাবুর সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি থাকিয়া থাকিয়া স্ফুরিত হইতেছে, দক্ষিণা বাতাস খবরের কাগজ লইয়া ফর্ ফর্ শব্দে খেলা করিতেছে, তাহার মধ্যে বরদার নিরালম্ব কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিঃ

"মজঃফরপুর জেলায় আমাদের সামান্য জমিজমা আছে। জায়গাটার নাম নীলমহল। আগে সাহেবরা নীলের চাষ করত। তারপর নীলের চাষ যখন উঠে গেল তখন আমার ঠাকুরদা ওটা কিনেছিলেন। এখন সেখানে ধান হয়, আখ হয়, আম-লিচুর বাগানও আছে। দু-চার ঘর প্রজা আছে। আমাদের সাবেক নায়েব শিবসদয় দাস সেখানে থেকে সম্পত্তি দেখা-শোনা করেন। দাদা শীতকালে গিয়ে তদারক করে আসেন।

"এ বছর দাদা লম্বেগো নিয়ে বিছানায় শুলেন। কী করা যায়? ধান-কাটার সময়,

banglabooks.in

আখও তৈরি হয়েছে। এ সময় মালিকদের একবার যাওয়া দরকার। শিবসদয়বাবু অবশ্য লোক ভালই, বিপত্নীক নিঃসন্তান মানুষ, চুরি-চামারি করেন না। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাড়ি এবং অন্যান্য ব্যাপারে বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছেন, কাজকর্ম ভাল দেখতে পারেন না, প্রজারা লুটেপুটে খায়। সুতরাং আমাকেই যেতে হল।

"ছেলেবেলায় দু-একবার নীলমহলে গিয়েছি, তারপর আর যাইনি। মজঃফরপুর শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে; সাম্পানী নামে একরকম বলদ-টানা গাড়ি আছে, তাতেই চড়ে যেতে হয়। পৌষের মাঝামাঝি একদিন বিকেলবেলা গিয়ে পৌঁছলাম। ওদিকে তখন প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

"আগে খবর দিয়ে যাইনি, আগে খবর দিয়ে গেলে জমিদারির প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না, কর্মচারীরা ধোঁকার টাটি তৈরি করে রাখে। গিয়ে দেখি কাছারি-বাড়ির সামনে তক্তপোশ পেতে শিবসদয়বাবু রোদ্দুরে বসে বৃহৎতন্ত্রসার পড়ছেন, তাঁর সামনে এক কলসী তাড়ি। রোদ্দুরে তাড়ি গেঁজিয়ে কলসীর গা বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

"আমাকে দেখে শিবসদয় বড়ই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, তারপর এসে পায়ের ধুলো নিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু আমি মালিক, তার উপর ব্রাহ্মণ। পায়ের ধুলো নিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'আগে খবর দিলেন না কেন? খবর পেলে আমি ইস্টিশনে গিয়ে—'

"মনে মনে ভাবলাম, খবর দিলে তাড়ির কলসী দেখতে পেতাম না। ন্যাকা সেজে বললাম, 'দাদা আসতে পারলেন না, তাঁর কোমরে বাত হয়েছে। হঠাৎ আমার আসা স্থির হল।' তারপর কলসীর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

"শিবসদয় এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন, বললেন, 'আজ্ঞে, তালের রস। শীতটা চেপে পড়েছে, এ-সময় তালের রসে শরীর গরম থাকে। একটু হবে নাকি?'

"বললাম, 'না। অনেকদিন বেহারে আছি কিন্তু তাড়ি এখনও ধরিনি। আমার জন্যে বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন।'

"শিবসদয় 'হলধর' বলে হাঁক দিলেন। কাছারি-বাড়ির পিছন দিক থেকে হলধর এসে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হলধরকে চিনি, মাঝে মাঝে ধান বিক্রির টাকা নিয়ে মুঙ্গেরে আসে। বুড়ো লোক, জাতে কাহার কিংবা ধানুক, চোখ দুটো ভারি ধূর্ত। কাছারিতে চাকরের কাজ করে আর বিনা খাজনায় দু-তিন বিঘে জমি চাষ করে।

"শিবসদয় বললেন, 'ছোটবাবুর জন্যে চা আর জলখাবার তৈরি কর।'

"হলধর বলল, 'চা-জলখাবার! আজ্ঞে—তা—আমি কবুতরীকে এখুনি ডেকে আনছি। সে সব জানে।'

"হলধর ব্যস্তসমস্তভাবে বাইরে চলে গেল, বোধহয় গ্রামে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবুতরী কে?'

"শিবসদয় একটু থমকে বললেন, 'কবুতরী—হলধরের নাতনী।'

"শিবসদয় আমাকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কাছারি পাকা বাড়ি নয়, পাশা-পাশি তিনটে মেটে ঘর, সামনে টানা বারান্দা, মাথায় খড়ের চাল। ভিত বেশ উঁচু, কিন্তু অনাদরে অবহেলায় মাটি খসে খসে পড়ছে। চালের অবস্থাও তথৈবচ, কতদিন ছাওয়া হয়নি তার ঠিক নেই। তিনটে ঘরের একটাতে দপ্তর, মাঝের ঘরটা শিবসদয়বাবুর শোবার ঘর, তার পাশে রান্নাঘর। তিনটে ঘরের অবস্থাই সমান; মেঝেয় ধুলো উড়ছে, চালে ফুটো। শিবসদয়ের উপর মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। তাড়ি খেয়ে খেয়ে লোকটা একেবারে অপদার্থ হয়ে পড়েছে। নেহাত পুরনো চাকর, নইলে দূর করে দিতাম।

"শিবসদয় বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আমার বড় চুক হয়ে গেছে। আপনি আসবেন জানলে সব ফিটফাট করে রাখতাম। নিজের জন্যে কে অত করে! যা হোক, এবার ধান কাটা হলেই চালটা ছাইয়ে ফেলব।'

banglabooks.in

"মনটা একটু নরম হল। কাছারি থেকে নেমে বললাম, 'চায়ের দেরি আছে, আমি ততক্ষণ চারদিক ঘুরে দেখি। ছেলেবেলায় দেখেছি, ভাল মনে নেই।'

"শিবসদয় বললেন, 'চলুন আমি দেখাচ্ছি।'

"দুজনে বেরুলাম। সত্তর-আশী বিঘে চাষের জমি, তার মাঝখানে বিঘে চারেক উঁচু জায়গা; এদেশে বলে ভিঠজমি। এই উঁচু জায়গাটার উপর আমাদের কাছারি। আগে এখানে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। মাঝখানে মস্ত একটা পুকুর; এই পুকুরে নীলের ঝাড় পচিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ায় সেদ্ধ করে নীলের ক্বাথ বার করত। এখন পুকুর মজে গেছে, যেটুকু জল আছে তা পদ্ম আর কলমির দামে ভরা। পুকুরের উঁচু পাড়ের একধারে সারি সারি সাহেবদের কুঠি ছিল, এখন ইটের স্তূপ। পুকুরের আর এক পাড়ে কাতার দিয়ে এক সারি বিরাট উনুন; উনুনের গাঁথুনি পাকা, তাদের ওপরে এখনও কয়েকটা লোহার কড়া বসানো রয়েছে। এই সব কড়ায় নীল সেদ্ধ হত, এখন মরচে ধরে ফুটো হয়ে গেছে। তবু অছে, সাহেবরা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে।

"এই চার-বিঘে জোড়া ভগ্নস্তূপের চারদিকে ঝোপঝাড় জন্মেছে। বড় বড় গাছ গজিয়েছে। একটা বিশাল সূচীপর্ণ ঝাউগাছ হাত-পা মেলে পুকুরের ঈশান কোণটাকে আড়াল করে রেখেছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে মনে হয়, সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে পাথুরে দ্বীপের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ধানের খেত, আখের খেত, আম-লিচুর বাগান; বিকেলবেলায় পড়ন্ত রৌদ্রে তার উপর বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আম-লিচুর বাগানের কোলে প্রজাদের গ্রাম, মোট কুড়ি-পঁচিশটা খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। বড় সুন্দর দেখতে।

"কিন্তু দেখতে যতই সুন্দর হোক, ওখানকার আবহাওয়া ভাল নয়। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের অগোচরেই একটা কাঁটা আমার মনে বিঁধতে লাগল। কোথায় যেন একটা বিকৃত পচা অশুচিতা লুকিয়ে আছে, ঢাকা নর্দমার চাপা দুর্গন্ধের মত। নীলকর সাহেবরা শুধু অত্যাচারী ছিল না, পাপী ছিল। এমন পাপ নেই যা তারা করত না। তাদের পাপের ছাপ যেন এখনও ও-জায়গা থেকে মুছে যায়নি। মনে পড়ল, দাদা বলেছিলেন—নীলমহলের বাতাসে ম্যালেরিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ আছে; ওখানে বেশীদিন থাকলে মানুষ অধঃপাতে যায়, অমানুষ হয়ে যায়।

"ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ চোখে পড়ল, ঝাউগাছটার আড়ালে একটা পাকা ঘর। আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওটা কী?'

"শিবসদয় বললেন, 'ওটা কোৎঘর।'

"'কোৎঘর! সে কাকে বলে?'

"'নীলকরদের আমলের ঘর। প্রজারা বজ্জাতি করলে সাহেবরা তাদের ধরে এনে ওই কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত। খুব মজবুত ঘর গড়েছিল, যেন লখীন্দরের লোহার ঘর।'

"'চলুন তো দেখি।'

"গিয়ে দেখি ঝাউগাছের আওতায় ছোট একটি ঘর। খুব উঁচু নয়, বেঁটে নিরেট চৌকশ, জগদ্দল পাথরের মত মজবুত ঘর। চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল, মোটা মোটা গরাদ লাগানো জানালার লোহার কবাট খোলা রয়েছে, দরজার লোহার কবাটও খোলা। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম; ইট কাঠ দরজা জানালা কিছুই নষ্ট হয়নি, ষাট-সত্তর বছর ধরে দিব্যি অটুট রয়েছে।

"মনে হল, কোৎঘর কিনা, তাই অটুট আছে। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, তার জায়গায় অন্য শাসনতন্ত্র আসে, কিন্তু কারাগার ঠিক খাড়া থাকে। মানুষ যখন সমাজ গড়েছিল তখন কারাগারও গড়েছিল—যতদিন একটা আছে ততদিন অন্যটাও থাকবে।

"দোরের কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলাম। মেঝে শান-বাঁধানো, দেওয়ালের চুন-কাম এখনও বোঝা যায়। আমি শিবসদয়কে বললাম, 'ঘরটা তো বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। ব্যবহার করেন না কেন? দরজা জানালা কি জাম হয়ে গেছে?'

"শিবসদয় 'আজ্ঞে—' বলে থেমে গেলেন। আমি দরজার কবাট ধরে টানলাম, মরচে-

banglabooks.in

খরা হাঁসকলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল বটে, কিন্তু বেশ খানিকটা নড়ল। আমি শিবসদয়ের পানে তাকালাম। তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে এল, চলুন এবার ফেরা যাক।'

"সূর্যাস্ত হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু ঝাউগাছতলায় ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। কাছারি-বাড়ি এখান থেকে বড় জোর এক শ' গজ। আমি দরজা ছেড়ে পা বাড়ালাম। ঠিক এই সময় আমার কানের কাছে কে যেন খিসখিস শব্দ করে হেসে উঠল। আমি চমকে ফিরে তাকালাম। কেউ নেই। উপর দিকে চোখ তুলে দেখলাম, ঝাউগাছের ডালগুলো একটা দমকা হাওয়া গেলে নড়ে উঠেছে। তারই শব্দ। কিন্তু ঠিক মনে হল যেন চাপা গলার হাসি।

"পুকুরের পাড় দিয়ে অর্ধেক পথ এসেছি, শিবসদয় একটু কেশে কেশে বললেন, 'কোণঘরের জানালা দরজা বন্ধ করা যায়, কিন্তু বন্ধ থাকে না। আপনা-আপনি খুলে যায়।'

"তার মানে?' আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"শিবসদয় বললেন, 'সেই জন্যেই ঘরটা ব্যবহার করা যায় না। ওতে সাহেব থাকে।'

"সাহেব থাকে! কোন্ সাহেব?'

"আজ্ঞে, আছে একজন।' শিবসদয় একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন, বললেন, 'এখন চলুন, রাত্রে বলব।'

"একটু বিরক্ত হলাম। লোকটা কি আমাকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাতে চায় নাকি! পীরের কাছে মামদোবাজি!

"যা হোক, কাছারিতে ফিরে এসে দেখলাম, পূর্ণকুম্ভটি স্থানান্তরিত হয়েছে; তক্তপোশের উপর কম্বল পাতা, তার উপর ফরাস, তা উপর মোটা তাকিয়া। গদিয়ান হয়ে বসলাম। পশ্চিম আকাশে তখনও বেশ আলো রয়েছে, কিন্তু বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শিবসদয় ঘরে গিয়ে একটা বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে চৌকির কোণে এসে বসলেন। বোধহয় এই ফাঁকে শরীর-গরম করা সঞ্জীবনী-সুধা সেবন করে এলেন।

"এই সময় একটা মেয়ে রান্নাঘর থেকে নেমে এল দু' হাতে বড় কাঁসার থালার উপর চায়ের পেয়ালা আর জলখাবারের রেকাবি নিয়ে। চলনের ভঙ্গীতে বেশ একটু ঠমক আছে, হিন্দীতে যাকে বলে লচক্। উচক্কা বয়স, নিটোল পুরুন্ত গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা বটে, মুখখানাও সুন্দর বলা চলে না। পুরু ঠোঁট, চোয়ালের হাড় চওড়া, চোখের দৃষ্টি নরম নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা দুরন্ত আকর্ষণ আছে—

"হলধরের নাতনী কবুতরী।

"আমার সামনে থালা রেখে আমার মুখের পানে চেয়ে হাসল, সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। সহজ ঘনিষ্ঠ প্রগল্‌ভতার সুরে বললে, 'ছোট মালিককে এই প্রথম দেখলাম।'

"আমি উত্তর দিলাম না। শিবসদয়ের দিকে তাকালাম। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি চা খাবেন না?'

"শিবসদয় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আমি খাই না।'

"কবুতরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'ছোট মালিক, দেখুন না চায়ে মিষ্টি হয়েছে কি না।' গলায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

"চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

"কবুতরী বলল, 'আর নিমকি? খেয়ে দেখুন না!'

"আমি নিমকিতে কামড় দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

"কবুতরী তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি তার দিকে একবার তাকালাম, সে আমার পানে অপলক চোখ মেলে চেয়ে আছে। মুখে ঘনিষ্ঠ নির্লজ্জ হাসি।

"শিবসদয় তার দিকে না তাকিয়েই একটু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'কবুতরী, দাঁড়িয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি রান্নার কাজ সেরে নাও। বাবু ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বেন।'

"কবুতরী আরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অনিচ্ছাভরে রান্নাঘরের দিকে চলে

banglabooks.in

গেল।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার রান্না কি কবুতরীই করে?'

"হ্যাঁ।'

"ওর ঘরে কে কে আছে?'

"একটু চুপ করে থেকে শিবসদয় ম্রিয়মাণ স্বরে বললেন, 'ও হলধরের কাছেই থাকে। একটা স্বামী ছিল, বছরখানেক আগে ওকে ত্যাগ করে চলে গেছে।'

"শিবসদয়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ যা চোখে পড়েনি হঠাৎ তাই দেখতে পেলাম। তাঁর শীর্ণ চেহারা, নিষ্প্রভ চোখ, ঝুলে-পড়া আলগা ঠোঁট—তার সাম্প্রতিক জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস যেন ওই মুখে লেখা রয়েছে। বুড়ো বয়সে তিনি শুধু তাল-রসেরই রসিক হননি, অন্য রসেও মজেছেন। পরকীয়া রস। কবুতরী ছোট ঘরের স্বৈরিণী মেয়ে, সে তাঁকে গ্রাস করেছে। কিন্তু কবুতরী শিকারী মেয়ে, বড় শিকার সামনে পেয়ে সে ছোট শিকারের পানে তাকাবে কেন? কবুতরীর ভাবভঙ্গী থেকে শিবসদয় তা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁর মনে সুখ নেই।

"অথচ যখন বয়স কম ছিল, শিবসদয় তখন সচ্চরিত্র ছিলেন। লেখাপড়া বেশী না জানলেও মনটা ভদ্র ছিল। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত তিনি আমাদের মুঙ্গেরের জমিজমা দেখতেন। কাজকর্মে দক্ষতা ছিল, অবৈধ লাভের লোভ ছিল না। আর আজ নীলমহলে এসে তাঁর এই অবস্থা। এটা কি স্থান-মাহাত্ম্য? ম্যালেরিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ তাঁর রক্ত দূষিত করে দিয়েছে?

"চা-জলখাবার শেষ করে বললাম, 'চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক। বাইরে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

"হলধর ঘরে ঘরে লণ্ঠন জেবলে দিয়েছে। আমরা দপ্তরের মেঝেয় পাতা গদির ওপর গিয়ে বসলাম। শিবসদয় মচ্ছিভঙ্গ হয়ে আছেন, মাঝে মাঝে চোখ বেঁকিয়ে আমার পানে চাইছেন; বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করছেন কবুতরীর দিকে কতটা আকৃষ্ট হয়েছি।

"জিজ্ঞেস করলাম, 'রাত্রে শোবার ব্যবস্থা কী রকম? আমার সঙ্গে লেপ বিছানা সব আছে।'

"শিবসদয় বললেন, 'শোবার ঘরে আপনার বিছানা পেতে দিয়েছি। আমি এই গদির ওপরেই রাত কাটিয়ে দেব।'

"সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলাম। বললাম, 'এবার কোৎঘরের সাহেবের গল্প বলুন।'

"একটু বসুন, আমি রান্নার খবরটা নিয়ে আসি।' বলে শিবসদয় উঠে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এসে বসলেন। গন্ধ পেয়ে বুঝলুম, শুধু রান্না পরিদর্শন নয়, শীতের অমোঘ মুষ্টিযোগও বেশ খানিকটা টেনেছেন। তাঁর চোখে মুখে সজীবতা ফিরে এসেছে।

"বললেন, 'আপনি কি সাহেবের কথা কিছু জানেন না?'

—"কিছু না। কেউ কিছু বলেনি।'

"শিবসদয় তখন আরম্ভ করলেন—আমারও শোনা কথা। হলধর আর গাঁয়ের পাঁচজনের মুখে যা শুনেছি তাই বলছি।—আশী-নব্বুই বছর আগেকার ঘটনা। তখন নীলকর সাহেবদের ব্যবসা গুটিয়ে আসছে, জার্মানির কারখানায় নকল নীল তৈরি হয়েছে। সেই সময় এখানে যে-সব সাহেব থাকত তাদের মধ্যে একটা ছোঁড়া ছিল ভয়ঙ্কর পাজি। এখানকার নীলচাষীরা তার নাম দিয়েছিল 'বিল্লি-সাহেব'। প্রজারা কিছু করলে তাদের ধরে এনে হাসতে হাসতে যে-সব যন্ত্রণা দিত, তা শুনলে এখনও গা শিউরে ওঠে। গ্রীষ্মকালে হাত-পা বেঁধে রোদ্দুরে সারা দিন ফেলে রেখে দিত, শীতের রাত্তিরে পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। আঙুলের নখের উপর পেরেক ঠুকে দিত। আর, কমবয়েসী মেয়েমানুষ দেখলে তো রক্ষে নেই। অন্য সাহেবরাও দরকার হলে প্রজাদের উপর অত্যাচার করত, ধরে

banglabooks.in

এনে কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত; কিন্তু বিল্লি-সাহেবের তুলনায় সে কিছুই নয়। বিল্লি-সাহেব রোজ নতুন নতুন যন্ত্রণা দেবার ফন্দি বার করত। অন্য সাহেবরা তাকে সামলাবার চেষ্টা করত, কিন্তু পেরে উঠত না।

"একবার একটা প্রজা দাদনের টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল, সাহেবরা তার সোমত্ত বউকে ধরে এনে কোৎঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। বউটার উপর অত্যাচার করার মতলব তাদের ছিল না। প্রজাটাকে জব্দ করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিল্লি-সাহেব মনে মনে অন্য ফন্দি এঁটেছিল। দুপুর-রাত্রে অন্য সাহেবরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে কোৎঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল।

"বউটার কাছে ছোরাছুরি ছিল না। কিন্তু তার দু'হাতে ছিল ভারী ভারী রুপোর বালা, এদেশে যাকে বলে কাঙনা। তাই দিয়ে সে মারল বিল্লি-সাহেবের রগে। সাহেব সেইখানে পড়ে মরে গেল। বউটা পালাল।

"অন্য সাহেবরা জেগে উঠেছিল; তারা ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল। তখন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ বেরিয়েছে, লং সাহেব তার তর্জমা করে জেলে গেছে; এ সময় যদি এই ব্যাপার জানাজানি হয়, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। সাহেবরা সেই রাত্রেই কোৎঘরের মেঝে খুঁড়ে বিল্লি-সাহেবকে কবর দিলে। তারপর মেঝে আবার শান বাঁধিয়ে ফেললে। বাইরে রটিয়ে দিলে, বিল্লি-সাহেব দেশে ফিরে গেছে।

"এই ঘটনার দু-তিন বছরের মধ্যেই নীলের ব্যবসা উঠে গেল, সাহেবরা জমিদারি বিক্রি করে দেশে চলে গেল। আপনার ঠাকুরদা নীলমহল কিনলেন।

"কোৎঘরটা সেই থেকে পড়ে আছে। শুনেছি, গোড়ার দিকে ঘরটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, ওর দরজা-জানালা বন্ধ রাখা যায় না, যতবার বন্ধ করা হয় ততবার খুলে যায়। এমন কি দরজায় তালা লাগালেও ফল হয় না, তালা আপনা-আপনি খুলে যায়। তাই সকলের বিশ্বাস, বিল্লি-সাহেব ওখানে আছে।

"শিবসদয় চুপ করলেন। আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'বিল্লি-সাহেবের ভূতকে কেউ দেখেছে?'

"আজ্ঞে না, কেউ কিছু চোখে দেখেনি।'

"আপনিও দেখেননি?'

"না—কিন্তু অনুভব করেছি। একটা দুষ্ট প্রেতাত্মা আছে।' বলে শিবসদয় চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন।

"আপনি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন? মানে, ভূত মানেন?'

"আজ্ঞে, সে কী কথা! প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করব না! আত্মা যদি থাকে প্রেতাত্মাও আছে।'

"তা বটে।'

"যাঁরা আত্মার অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না তাঁদের কাছে এ যুক্তির কোনো মূল্য নেই। কিন্তু বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে।'

"কোৎঘরের ব্যাপারটা হয়তো একেবারে বুজরুকি নয়। ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে। ভাবলাম, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বিল্লি-সাহেব যদি সত্যি থাকে, অজ্ঞ চাষাভুষোর অলীক কুসংস্কার না হয়, তা হলে সেটা জানা দরকার।

"রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে নিলাম। শিবসদয়ও আমার সঙ্গে বসলেন। রান্না বেশী নয়; ফুলকা রুটির সঙ্গে বেগুনপোড়া, হিঙ দিয়ে ঘন অড়র ডাল, মাংস, পুদিনার চাটনি আর ক্ষীর। মাংস কোথায় পেল কে জানে, হয়তো আমার জন্যেই পাঁঠা কেটেছিল। কিন্তু কবুতরী মাংসটা রেঁধেছিল বড় ভাল। এ-দিশী রান্না; একটু ঝাল বেশী, তার সঙ্গে আদা পেঁয়াজ রসুন-বাটা আর আস্ত গোলমরিচ। খাওয়া একটু বেশী হয়ে গেল।

"খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতেই শীত ধরে গেল। আর বসলাম না, একেবারে শোবার ঘরে গেলাম। শিবসদয়ও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

banglabooks.in

"একটা তক্তপোশের উপর পুরু বিছানা পাতা হয়েছে, ঘরের কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। আমি সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক টর্চ এনেছিলাম, সেটা সুটকেস থেকে বার করে বালিশের পাশে রাখলাম। তারপর বিছানায় বসে সিগারেট বার করলাম। ঠাণ্ডায় আঙুলগুলো কালিয়ে গেছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে।

"শিবসদয় আমার অবস্থা দেখে একটু কেশে বললেন, 'এখানকার ঠাণ্ডা আপনার অভ্যেস নেই, লেপে শীত ভাঙবে না। কিন্তু—'

"'কিন্তু কী?'

"যদি এক পেয়ালা গরম তালের রস খেয়ে শোন, তা হলে আর শীত করবে না।'

"একটু কড়া সুরেই বললাম, 'না।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে আপনার খাতা-পত্তর দেখব।'

"শিবসদয় আর কিছু বললেন না, আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

"আমিও আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি। নানা রকম চিন্তা মনে আসছে...শিবসদয় আমাকে তাড়ি ধরাবার চেষ্টা করছেন... কবুতরী চেষ্টা করছে বড় শিকার ধরবার...যদি বেশী দিন এখানে থাকি আমার মনের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে?...বিল্লি-সাহেব—উঃ, নীলকর সাহেবগুলো কী শয়তানই ছিল...

"লেপের মধ্যে শরীর গরম হয়ে আসছে, সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে শুয়ে আছি। এত তাড়াতাড়ি ঘুমনো অভ্যেস নেই, তবু একটু তন্দ্রা আসছে—

"হঠাৎ চোখ খুলে গেল। দেখি, কবুতরী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কমানো লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে দেখে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এল; কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে জানতে পারিনি।

"আমি চোখ খুলেছি দেখে কবুতরী আমার মুখের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, "ছোট মালিক, আপনি জেগে আছেন, আপনার পা টিপে দিই?'

"ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম: 'না, দরকার নেই। তুমি যাও।'

"কবুতরী মোটেই অপ্রস্তুত হল না, সহজভাবে বলল, 'আচ্ছা। কাল ভোরে আমি আপনার চা তৈরি করে আনব। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।' সে ছায়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর উঠে দরজা বন্ধ করতে গেলাম। দরজায় হুড়কো থাকবার কথা, কিন্তু হুড়কো নেই। বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। কী করা যায়? দরজাটা ভাল করে চেপে দিয়ে এসে শুলাম।

"আমি সাধু-সন্ন্যাসি নই, আবার লুচ্চো-লম্পটও নই। নিজেকে ভদ্রলোক বলে মনে করি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। জীবনে প্রলোভন এসেছে, কিন্তু প্রলোভন যে এমন দুর্নিবার হতে পারে তা কখনও কল্পনা করিনি। মনের মধ্যে যে-সব চিন্তা আসতে লাগল সেগুলোকে ভদ্র চিন্তা বলতে পারি না। এ যেন নর্দমার পাঁক নিয়ে নোংরামির হোলিখেলা। সঙ্গে সঙ্গে কবুতরীর ওপর রাগও হতে লাগল; রাগ হতে লাগল তার চুম্বকের মত আকর্ষণ করার শক্তির ওপর। ছোটলোকের মেয়ে! নির্লজ্জ নষ্ট মেয়েমানুষ! পুরুষ-হ্যাংলা রক্তচোষা সুর্পনখার জাত।

"কণ্টকশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল একেবারে শেষরাত্রে। দেখি লেপের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে গেছি। বাইরে একটা হাড়কাঁপানো হাওয়া উঠেছে; সে হাওয়া কুলকুল করে ঘরে ঢুকছে কোথা দিয়ে? টর্চ জেবলে চারদিকে ঘোরালাম। মাথার দিকে একটা ছোট জানালা আছে বটে, কিন্তু সেটা বন্ধ। দরজাও চাপা রয়েছে। মাটির দেয়ালে আলো ফেলে দেখলাম কোথাও ফাটোফাটা আছে কি না। কিন্তু নেই। তারপর টর্চের আলো গিয়ে পড়ল চালের নীচে। সেখানে একটি মস্ত ফুটো। শেষ-রাত্রের হাওয়া সেই ফুটো দিয়ে ঢুকছে।

banglabooks.in

"নিরুপায়, চালের ফুটো বন্ধ করা যাবে না। আগাপাস্তলা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম; কিন্তু হাড়ের কাঁপুনি গেল না। মনে হল, এই সময় শিবসদয়বাবুর তালের রস পেলে কাজ হত। হাত-ঘড়িটা দেখলাম, পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী আছে। এখনও সকাল হতে দেড় ঘণ্টা। বিছানায় উঠে বসে সিগারেট ধরালাম।

"গোটা তিনেক সিগারেট পর-পর টানলাম, কিছু হল না। ল্যাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না। ভাবছি এবার কী করব, লণ্ঠনটাকে কোলে নিয়ে বসলে কেমন হয়। এমন সময় দোর ঠেলে কবুতরী ঘরে ঢুকল। তার হাতে চায়ের পেয়ালা ধোঁয়াচ্ছে। বাক্যব্যয় না করে পেয়ালা হাতে নিলাম। এক চুমুক দিতেই জিভটা যেন পুড়ে গেল। কিন্তু শরীরের মধ্যে তৃপ্তি ভরে উঠতে লাগল। রক্ত গরম হওয়ার তৃপ্তি।

"কবুতরী হেসে বলল, সিগারেটের গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, ছোট মালিকের ঘুম ভেঙেছে।'

"বললাম, 'তুমি কি বাড়ি যাওনি?'

"সে বলল, 'না। রান্নাঘরে উনুনের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি। নইলে মালিকের চা তৈরি করতাম কী করে?'

"চা শেষ করে পেয়ালা তার হাতে দিলাম, বললাম, 'আর এক পেয়ালা নিয়ে এস।'

"সে একগাল হেসে ছুটে চলে গেল। আশ্চর্য মেয়ে! কী অসম্ভব খাটতে পারে, শরীরে ক্লান্তি নেই। ভোরবেলা মালিকের চা তৈরি করে দেবার জন্যে সারা রাত উনুনের পাশে শুয়ে থাকতে পারে। অথচ অন্য দিকে আবার—

"দ্বিতীয় পেয়ালা চা এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যাই, রাত্তিরের এঁটো বাসনগুলো এই বেলা মেজে ফেলি। দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন কিন্তু—অ্যাঁ?' ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে কবুতরী চলে গেল।

"সেদিন বেলা ন'টার সময় দপ্তরে গিয়ে বসলাম, শিবসদয়কে বললাম, 'ওঘরে আর আমি শোব না। আজ থেকে কোৎঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করুন।'

"শিবসদয় ঘাবড়ে গেলেন: 'কোৎঘরে! কিন্তু—'

"আমি বললাম, 'কিন্তু কী? বিল্লি-সাহেব? বিল্লি-সাহেবের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব, আপনার ভাবনা নেই।'

"তারপর প্রায় সারা দিনটাই কাজকর্মে কেটে গেল। হিসেব-নিকেশ, জমা-খরচ, আম-লিচুর বাগান জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, ধান কাটা এবং বিক্রির ব্যবস্থা। প্রজারা খবর পেয়েছিল আমি এসেছি, তারা এসে সেলাম করে গেল। কেউ এক টাকা, কেউ আট আনা সেলামি দিলে।

"দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে আমার নতুন শোবার ঘর তদারক করতে গেলাম। দুপুরের আলোয় জায়গাটা মোটেই ভূতুড়ে বলে মনে হয় না। দিব্যি ঝরঝরে। হলধর ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখেছে, একটা তক্তপোশ ঢুকিয়েছে। দেখে-শুনে ফিরে এলাম। কোৎঘরে ভূত থাকে থাক, ছাদে ফুটো নেই।

"বিকেলবেলাটাও কাজে-কর্মে কাটল। যত সন্ধ্যে হয়ে আসতে লাগল, শিবসদয় ততই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে রাত্রে খেতে বসে বললেন, 'দেখুন, আমার ভয় করছে। যদি কিছু ঘটে—'

"বললাম, 'কিছু ঘটবে না। বরং এ ঘরে শুলেই নিউমোনিয়া ঘটবার সম্ভাবনা আছে।'

"কবুতরী পরিবেষণ করছিল, খিল খিল করে হেসে উঠল। ও যখন থেকে শুনেছে আমি কোৎঘরে শোব, তখন থেকে ওর মুখে চোখে বিদ্যুৎ খেলছে। মনে মনে কী বুঝেছে কে জানে! কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় ভূত-টুত ও বিশ্বাস করে না। হয়তো ভেবেছে—

"শিবসদয় কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'মালিকের সামনে হাসছিস! তোর সহবৎ নেই?'

"কবুতরী হাসি থামাল বটে, কিন্তু তার চোখে-মুখে চাপা কৌতুক উপচে পড়তে লাগল।

banglabooks.in

"রাত্রি সাড়ে আটটার সময় কাছারি-বাড়ি থেকে বেরুলাম। কবুতরী দাঁড়িয়ে রইল, শিবসদয় লণ্ঠন নিয়ে আমার আগে আগে চললেন, হলধর আর একটি লণ্ঠন নিয়ে পিছনে চলল। আকাশে এক ফালি চাঁদ আছে। কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু হাওয়া নেই।

"কোৎঘরে পৌঁছলাম। দরজা জানালা খোলা রয়েছে; ঘরে বোধহয় ধুপধুনো দিয়েছিল, এখনও একটু গন্ধ লেগে আছে। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, লেপ বালিশ সব আছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজো।

"হলধর ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে বাবু?' বুড়োটা সব জানে, সব বোঝে, কিন্তু বেশী কথা কয় না।

"টর্চ, সিগারেটের টিন, হাত-ঘড়ি বালিশের পাশে রাখলাম, ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'সব ঠিক আছে। তোমরা এবার যাও! জানালাটা আপাতত খোলা থাক। পরে বন্ধ করব। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো।'

"শিবসদয় একটু খুঁতখুঁত করলেন, তারপর লণ্ঠন নিয়ে বাইরে গেলেন। হলধর নিজের হাতে লণ্ঠনটি একটু উস্কে দিয়ে তক্তপোশের শিয়রের কাছে রাখল, ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে যেন ইশারা করল, তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে লোহার দরজা ভেজিয়ে দিলে। মরচে-ধরা হাঁসকলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। আমি একা।

"জানালাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে চৌকশ খানিকটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমি গিয়ে জানালাটা পরীক্ষা করলাম। জানালায় ছিটকিনি আছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। পাল্লা দুটো নেড়ে দেখলাম, সচল আছে, দরকার হলে বন্ধ করা যাবে।

"ফিরে এসে বিছানায় বসলাম। তরিবত করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, আলোটা আস্তে আস্তে নিবে আসছে। তেল ফুরিয়ে গেল নাকি? কিন্তু তা তো হবার কথা নয়, সমস্ত রাত জ্বলবে বলে হলধর লণ্ঠনে তেল ভরে দিয়েছে। তবে—?

"আলোটা দপ্‌দপ্ করল না, কমতে কমতে নীল হয়ে নিবে গেল, যেন কেউ কল ঘুরিয়ে নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে কেবল বাইরের ফিকে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। আমি মনটাকে শক্ত করে নিয়ে আবার সিগারেট ধরাতে গেলাম। ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ হল; চোখ তুলে দেখি, লোহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

"তারপর কানের কাছে শুনতে পেলাম খিসখিস হাসির শব্দ। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাসি কিন্তু বন্ধ হল না, কানের কাছে খিসখিস শব্দ চলতে লাগল। এবার আর ঝাউপাতার শব্দ বলে ভুল করবার উপায় নেই। হাসিই বটে। একটা অসভ্য অশ্লীল হাসি।

"হাসি অনেক রকম আছে। প্রাণখোলা হাসি, বিদ্রূপের প্যাঁচানো হাসি, মুরুব্বিয়ানার গাম্ভারী হাসি। কাষ্ঠ হাসি। এ হাসি ও ধরনের নয়। এ হাসির বর্ণনা করা শক্ত, এ হাসি শুনলে মনে হয় এর পিছনে অকথ্য নোংরামি লুকিয়ে আছে, যে হাসছে তার মনের পাঁক শ্রোতার গায়ে লেগে যায়। গা ঘিনঘিন করে।

"আমার গা ঘিনঘিন তো করলই, উপরন্তু শিরদাঁড়া সিরসির করে উঠল। কতটা ভয় কতটা ঘেন্না বলতে পারব না। তবে ভূত আছে, বিল্লি-সাহেব চাষাদের অলীক কল্পনা নয়।

"ভূতের সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি আমার নতুন নয়। জানি, ভয় পেলেই বিপদ। আমি জের করে নিজেকে শক্ত করে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরালাম। নিবে-যাওয়া লণ্ঠনটা নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল ভরা রয়েছে।

"লণ্ঠন আবার জ্বালালাম। লোহার দরজা টেনে আবার বন্ধ করলাম; তারপর খোলা জানালাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। দেখি এবার কী হয়!

"ইতিমধ্যে হাসি থেমে গিয়েছিল। আমি বিছানায় এসে বসলাম। লণ্ঠন আর নিবল না। কিছুক্ষণ পরে আর এক রকমের শব্দ কানে আসতে লাগল। এ শব্দও খুব মৃদু; যেন একটা কুকুর নিশ্বাস টেনে টেনে কী শুঁকছে আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধঘরে সিগারেটের ধোঁয়া তাল পাকাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, প্রেতটা সেই গন্ধ শুঁকছে নাকি? হয়তো যখন বেঁচে ছিল খুব সিগারেট খেত—

banglabooks.in

"একটা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির অতৃপ্ত ক্ষুধিত প্রেতাত্মা এখানে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেতাত্মাদের শরীর ধারণ করবার ক্ষমতা থাকলেও দৈহিক অনিষ্ট করবার ক্ষমতা বেশী নেই। পাশ্চাত্য দেশে poltergeist নামে একরকম বিদেহাত্মার কথা জানা আছে, যারা শূন্য ঘরে বাসনকোসন ভাঙে, টেবিলের উপর থেকে জিনিস ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়, আরও নানা রকম ছোটখাটো উৎপাত করে, কিন্তু এর বেশী কিছু করতে পারে না। বিল্লি-সাহেব বোধ হয় সেই জাতের ভূত।

"সিগারেট শেষ করে ফেলে দিলাম। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বেজে গেছে। এই পরিবেশের মধ্যে ঘুম যদিও সুদূরপরাহত, তবু লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

"খুট্! ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, জানালার ছিটকিনি খুলে গেছে। পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কপাটও। উঠে বসলাম। অমনি কানের কাছে খিসখিস হাসি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

"টর্চ হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গেলাম। দোরের সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। কী করা যায়? জানালা দরজা বন্ধ করে লাভ নেই, যতবার বন্ধ করব ততবার খুলে যাবে। সারা রাত দরজা জানালা খোলা থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া কিংবা প্লুরিসি। ফিরে যাব? কিন্তু ফিরে গেলে শিবসদয় মাথা নেড়ে বলবেন, আমি আগেই বলেছিলাম। কবুতরী খিলখিল করে হাসবে। না, তার চেয়ে যেমন করে হোক এই ঘরেই রাত কাটাতে হবে। যাক প্রাণ থাক মান।

"ঘরে গিয়ে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছি, ঘরের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার খসখস পায়ের শব্দ। কখনও কানের কাছে জঘন্য অশ্লীল হাসি। একবার গব্ গব্ শব্দ শুনে মুন্ডু বার করে দেখি, ঘরের কোণে কুঁজোটা কাত হয়ে পড়েছে, গব্ গব্ শব্দে জল বেরুচ্ছে। আমি আবার লেপ মুড়ি দিলাম।

"ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভূতের সংসর্গ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে এসেছে, এইভাবে যদি রাতটা কেটে যায় মন্দ হবে না। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

"ছোট মালিক!"

"মাথা বার করে দেখি, কবুতরী। এতক্ষণ ভূতের কার্যকলাপ দেখে যা হয়নি এবার তাই হল, বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বললাম: 'তুমি! তোমার এখানে কী দরকার?'

"লণ্ঠনের আলোয় কবুতরীর দাঁত ঝকঝক করে উঠল, সে বলল, 'ছোট মালিককে দেখতে এলাম।'

"আমার গলাটা বুজে এল, বললাম, 'তোমার কি ভূতের ভয় নেই?'

"কবুতরী খিলখিল করে হাসল। এখানে চাপা সুরে কথা বলার দরকার নেই, বলল, 'মালিক কাছে থাকলে ভূতের ভয় কিসের?'

"এই সময় চোখে পড়ল, কবুতরীর পিছনে ঘরের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

"ও কী! ও কী!' বলে আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম।

"তারপর—এক বিশ্রী কাণ্ড।

"কবুতরী হঠাৎ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। আমি সম্মোহিত হয়ে দেখছি, সে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। প্রাণপণে শুধু চেঁচাচ্ছে। যেন একটা অদৃশ্য মূর্তির সঙ্গে সে ধস্তাধস্তি করছে। তার গায়ের কাপড় আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

"আমি আর থাকতে পারলাম না। এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল জানি না, কিন্তু আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। দরজা তখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। পাছে বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়েই বোধ হয় পালিয়ে এলাম।

"বাইরে এসে দেখি, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। হলধর! কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, কবুতরীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। হলধর এখানে কেন, এ প্রশ্ন তখন মনে আসেনি; পরে বুঝেছিলাম, হলধর কবুতরীকে কোৎঘরে পৌঁছে দিতে এসেছিল,

banglabooks.in

তারপর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাছে বসে অপেক্ষা করছিল।

"কী হয়েছে—কী হয়েছে বাবু?" হলধর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। আমি কি বলব, দরজার দিকে শুধু আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'কবুতরী!'

"দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতর থেকে কবুতরীর চিৎকার আর গোঙানির শব্দ আসছে।

"হলধর দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও গেলাম। যে দরজা বন্ধ রাখা যেত না, সে দরজা এখন আর খোলা যায় না। দুজনে ধরে টানতে লাগলাম; অতি কষ্টে একটু একটু করে দরজা খুলল। দেখি লণ্ঠনটা উল্টে গিয়ে দপ্‌দপ্‌ করছে। কবুতরী লণ্ঠনের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আমরা ঢুকতেই সে যেন ছাড়া পেল। তার চুল এলোমেলো, কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পাগলের মত চেহারা। সে উঠে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। হলধর তার পিছনে পিছনে ছুটল। আমি কি করব ভাবছি, কানের কাছে সেই অসভ্য বেয়াড়া হাসি শুনতে পেলাম। আমিও ছুটলাম—"

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি কয়েকবার চিড়িক মারিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর তীব্র আলোকে বরদার মুখ ফ্যাকাসে দেখাইল। সে আলোর দিকে একবার চোখ তুলিয়া নীরস স্বরে বলিল, 'এই গল্প। দু'দিন পরে আমি নীলমহল থেকে চলে এলাম। বেশী দিন থাকতে সাহস হল না। নীলকর সাহেবরা গিয়েও যায়নি; তাদের মনের পাপ প্রেতমূর্তি ধরে এখনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবুতরী সেই যে কোৎঘর থেকে পালিয়েছিল, আর তাকে দেখিনি, সে-রাত্রে সে কী অনুভব করেছিল তা জানা হয়নি। তবে যতটুকু চোখে দেখেছিলাম তা থেকে অনুমান করা শক্ত নয়।' হিরন্ময়বাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, 'অশ্লীল ভূত কেন বলেছিলাম বুঝতে পেরেছেন?'

হিরন্ময়বাবু আমাদের একটি করিয়া সিগারেট দিলেন, নিজে একটি ধরাইলেন। বলিলেন, 'খাসা গল্প। শুধু ভূত নয়, রসও আছে। তবে আলো নিবে না গেলে এতটা জমত কি না বলা যায় না।' বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

১৮ আষাঢ় ১৩৬৫

কালো মোরগ

লজিকের প্রফেসর গোকুলবাবুর শিকারের নেশা ছিল। শীতকালে কলেজের ছুটি-ছাটা পাইলেই তিনি বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। বাঘ ভালুক শিকারের দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না; ঘুঘু, বন-পায়রা, হরিয়াল, বড় জোর খরগোশ হত্যা করিয়া তাঁহার

banglabooks.in

রক্তপিপাসা চরিতার্থ হইত।

ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক গোকুলবাবুর মনটি ছিল অতিশয় যুক্তিপরায়ণ। অমোঘ যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তিনি বিবাহ করেন নাই; একটি স্ত্রীলোককে কেন তিনি সারা জীবন ধরিয়া ভরণপোষণ করিবেন ইহার কোনও যুক্তিসম্মত কারণই তিনি খুঁজিয়া পান নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবও কেহ ছিল না। তাঁহার কাছে এই সকল সম্পর্কের কোনও মানে হয় না। বস্তুত এই 'মানে হয় না' কথাটা তাঁহার মনের এবং কথার মাত্রা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূত ভগবান প্রেম আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি কথা শুনিলে তিনি একটু মুখ বাঁকাইয়া বলিতেন —'মানে হয় না।' নিজের শিকার-প্রীতিরও তিনি একটি মানে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জীবমাত্রেই হিংসাপরায়ণ, হিংসাবৃত্তি মানুষের স্বধর্ম; মাঝে মাঝে রক্তপাত না করিলে মনের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। তাই শিকার করা আবশ্যক।

তিনি একাকী শিকারে যাইতেন। তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে কাহারও শিকারের নেশা ছিল না, তাছাড়া গোকুলবাবুর মতে দল বাঁধিয়া শিকার করিতে যাওয়ার মানে হয় না। তাঁহার একটি সাইকেল ছিল; একনলা বন্দুকটি সাইকেলের রডে বাঁধিয়া তিনি বাহির হইতেন। শহরের আট-দশ মাইল বাহিরে লোকাল বোর্ডের রাস্তার ধারে একটি মাঝারি গোছের জঙ্গল আছে; শীতকালে যখন বট ও অশ্বত্থের ফল পাকিতে আরম্ভ করে, তখন পারাবত জাতীয় পাখিরা সেখানে ভিড় করে। গোকুলবাবু প্রতি বৎসর সেই জঙ্গলে শিকার সন্ধানে যান।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি এক মধ্যাহ্নে গোকুলবাবু সাইকেল চড়িয়া যাত্রা করিলেন। মন্দ-মন্থর চরণে সাইকেল চালাইয়া বনের কিনারায় উপস্থিত হইলেন। বনের কিনারায় একটি গ্রাম; গ্রামে এক মুদির দোকানে সাইকেল রাখিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বনটি আকারে প্রায় গোলাকৃতি, ব্যাস অনুমান তিন মাইল; ইহার নেমিবৃত্ত ঘিরিয়া কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম; কোনও গ্রাম হিন্দুপ্রধান, কোনও গ্রাম মুসলমানপ্রধান। গ্রামীণেরা সকলেই চাষী। জঙ্গলের চারিপাশে গ্রামগুলির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় যেন জঙ্গলকে পাহারা দিবার জন্য থানা বসিয়াছে। বনটি খাসমহলের সম্পত্তি হইলেও গ্রামবাসীরা এখানে গরু মোষ চরায়।

গোকুলবাবু বন্দুক কাঁধে লইয়া বনের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর, সূর্য একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে; শষ্পাকীর্ণ ভূমির এখানে ওখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলা একক দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা কয়েকটা গাছ একত্র হইয়া ঘোঁট পাকাইতেছে। বটগাছগুলা ফলে ফলে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য! কোথাও একটি পাখি নাই। এই সময় গাছে গাছে ফলাশী পাখির ভিড় লাগিয়া থাকে, আজ পাখিগুলা গেল কোথায়? গোকুলবাবু একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন। ঘুঘুর উদাস বিলাপ, বন-কপোতের ফট্ ফট্ পাখার আওয়াজ কিছুই শোনা যায় না। তিনি চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন; কই, গরু ভেড়াও তো চরিতেছে না। বনের সকল পশুপক্ষী সলা-পরামর্শ করিয়া একসঙ্গে অদৃশ্য হইয়াছে নাকি? বিরক্ত হইয়া তিনি মনে মনে মন্তব্য করিলেন—মানে হয় না।

তবু তিনি অগ্রসর হইলেন। কাল হয়তো একদল শিকারী আসিয়াছিল; দমাদ্দম বন্দুক ছুঁড়িয়া পাখিগুলাকে বনছাড়া করিয়াছে। কিংবা হয়তো বনের অন্য প্রান্তে তাহারা জড়ো হইয়াছে।

গোকুলবাবু বড় বড় গাছগুলার তলা দিয়া চলিতে চলিতে ঊর্ধ্বে গাছের ঘন ডাল-পালার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হরিয়াল পাখিগুলা বর্ণচোরা, তাহারা যখন আকাশে ওড়ে, তাহাদের সবুজ রঙ সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু একবার গাছে বসিলে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়; গাছের পাতার সঙ্গে তাহাদের গায়ের রঙ এমন বেমালুম মিশিয়া যায় যে, তাহাদের আর দেখা যায় না। গাছের তলা হইতে শিকারীরা অভিজ্ঞ চক্ষু তাহাদের সিলুয়েট দেখিয়া চিনিতে পারে। গোকুলবাবু দেখিতে দেখিতে চলিলেন, কিন্তু একটিও

banglabooks.in

হরিয়াল দেখিতে পাইলেন না।

বনের কেন্দ্রস্থলে আট-দশটা বড় বড় গাছ একত্র হইয়া নিম্নে ঘন ছায়া রচনা করিয়াছিল। গোকুলবাবু কাঁধ হইতে বন্দুক নামাইয়া একটি গাছের গুঁড়িতে হেলাইয়া দিলেন, একটু নিরাশভাবে গাছতলায় বসিলেন। যে-পুকুরে মাছ নাই সে-পুকুরে মাছ ধরা এবং যে-বনে পাখি নাই সে-বনে পাখি মারিতে আসা একই কথা, মানে হয় না। তিনি পকেট হইতে কুচা সুপারি লইয়া কিছুক্ষণ চিবাইলেন। তারপর মন একটু চাঙ্গা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উঠিয়া দাঁড়াতেই কে যেন তাঁহার পিছন হইতে গরম পাঞ্জাবির ছুট ধরিয়া টান দিল। গোকুলবাবু চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিল।

ভয়ের কিছু নয়, গাছের গোড়ায় একটা কাঁটালতা ছিল, তাহারই কাঁটায় পাঞ্জাবির প্রান্ত আটকাইয়া গিয়াছিল। গোকুলবাবু ধাতস্থ হইলেন। কিন্তু গত বৎসরের একটি ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি গাছটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। হ্যাঁ, এই গাছটাই বটে। গত বৎসর এই সময় এই গাছতলায় একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

গত বৎসর এমনি একটি দ্বিপ্রহরে গোকুলবাবু এই বনে পাখি মারিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পুলিস বন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একজন ডি এস পি, দুজন দারোগা, পাঁচ-ছয় জন ছোট দারোগা এবং অসংখ্য কনস্টেবল। সকলেই সশস্ত্র। কী ব্যাপার? একজন ছোট দারোগার সঙ্গে গোকুলবাবুর সামান্য আলাপ ছিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? আপনারাও পাখি শিকার করবেন নাকি?'

'পাখি নয়, আরও বড় শিকার।' ছোট দারোগা বলিল, আবদুল্লা নামে একটা দুর্দান্ত খুনী আসামী এই বনে লুকাইয়া আছে। আবদুল্লা একজন বড় গুণ্ডা, বিপক্ষ দলের একটা গুণ্ডাকে খুন করিয়া সে ধরা পড়িয়া যায়। বিচারে তাহার ফাঁসির আজ্ঞা হয়। বিচারের পর আদালত হইতে জেলখানায় যাইবার সময় সে দুইজন রক্ষীকে গুরুতর আহত করিয়া দড়ি-দড়া ছিঁড়িয়া পলাইয়াছিল। এই বনের কিনারায় একটি গ্রামে আবদুল্লার আত্মীয়স্বজন বাস করে; পুলিস সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছে সে এই বনে লুকাইয়া আছে, আত্মীয়স্বজনেরা তাহার খাদ্য সরবরাহ করে। তাই পুলিস আজ এই বনে হানা দিয়াছে, আবদুল্লাকে ধরিবে।

শুনিয়া গোকুলবাবু বলিলেন, 'তাহলে আমি ফিরে যাই, আজ আর শিকার হল না। আমি বৃথাই এতদূর এলাম। মানে হয় না।'

ছোট দারোগা বলিল, 'আপনি তো প্রায়ই এ জঙ্গলে শিকার করতে আসেন। জঙ্গলের ঘাৎঘোঁৎ সব জানা আছে!'

'তা আছে!'

'আসুন আমার সঙ্গে—'

ছোট দারোগা গোকুলবাবুকে ডি এস পি'র কাছে লইয়া গেল। ডি এস পি গোকুলবাবুর পরিচয় শুনিয়া এবং জঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ঠতার কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'বেশ তো। আপনিও খুঁজুন না। আপনার সঙ্গে বন্দুক আছে, ভয়ের কিছু নেই। যদি ধরতে পারেন, নামও হবে।'

গোকুলবাবু বনে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন, পাখির বদলে মানুষ মৃগয়া মন্দ কি! একটা নূতন অভিজ্ঞতা। বনের মধ্যে আরও অনেক পুলিসের লোক খোঁজাখুঁজি করিতেছে, ঝোপঝাড় ঠেঙাইয়া বিবিধভাবে বনের কিনারা হইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। গোকুলবাবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর দিকে চলিলেন।

তাঁহার দৃষ্টি গাছের মাথার দিকে। পুলিস ঝোপঝাড় ঠেঙাইতেছে, ঠেঙাক, গোকুলবাবুর যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি বলিতেছে আসামী যদি বুদ্ধিমান হয় সে গাছের নীচে থাকিবে না, উপরে থাকিবে।

ঘণ্টা দুই এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে গোকুলবাবু একাকী এই গাছটির তলায়

banglabooks.in

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড গাছ, একেবারে মহীরুহ; গুঁড়িটা তিনজন মানুষে জড়াইয়া ধরিতে পারে না, ডালগুলা অতিকায় হাতীর শুঁড়ের মতো জড়াজড়ি করিয়া বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে; ঘন পাতার আবরণের মধ্যে গোধূলির অন্ধকার।

গোকুলবাবু গাছের নিচে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঊর্ধ্ব মুখে দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ পড়িল, মাটি হইতে আন্দাজ বিশ হাত উচ্চে একটা মোটা ডালকে গিরগিটির মতো জড়াইয়া আছে একটা মনুষ্যদেহ। অভিজ্ঞ চক্ষু নহিলে মনুষ্যদেহ ঠাহর করা যায় না, মনে হয় গাছেরই একটা শাখা।

গোকুলবাবুর বন্দুকে টোটো ভরাই ছিল, তিনি ডাকিলেন, 'এই, নেমে আয়!'

উপর হইতে সাড়াশব্দ আসিল না, গিরগিটির মতো আকৃতিটা নিশ্চল রইল। তিনি তখন বলিলেন, 'আমি তোকে দেখতে পেয়েছি। ভাল চাস তো নেমে আয়, নইলে গুলি করবো।'

এবারও আকৃতিটা নিশ্চল। গোকুলবাবুর ইচ্ছা ছিল আসামীকে নিজেই ধরিবেন এবং বন্দুকের আগায় লইয়া গিয়া ডি এস পি-র হাতে সমর্পণ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি গলা চড়াইয়া হাঁক দিলেন, 'আসামীকে দেখেছি! শিগ্‌গির এস—জলদি—!

মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশজন লোক আসিয়া গাছ ঘিরিয়া ফেলিল।

আসামী তবু গাছ হইতে নামিতে চায় না। ডি এস পি তখন কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বলিলেন, 'আবদুল্লা, যদি স্বেচ্ছায় নেমে না আসো, তোমাকে গাছের ওপরেই গুলি করে মারব।'

অবশেষে আবদুল্লা নামিয়া আসিল। কয়লার মতো কালো লিকলিকে একটা লোক, পরনে শুধু একটা নীল রঙের লুঙ্গি। পুলিস তাহার হাতে হাতকড়া পরাইল, সে বাধা দিল না। কেবল তাহার বিষাক্ত হিংস্র দৃষ্টি গোকুলবাবুর উপর স্থির হইয়া রহিল।

পুলিস আবদুল্লাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে গোকুলবাবু খবর পাইলেন আবদুল্লার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

ইহা এক বছর আগের ঘটনা।

বন্দুক কাঁধে তুলিয়া গোকুলবাবু আর একবার গাছটিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। হ্যাঁ, এই গাছ হইতেই তিনি আবদুল্লাকে ধরিয়াছিলেন; ওই যে ডালটা, যাহার গায়ে তাহার কালো দেহটা গিরগিটির মতো জড়াইয়া ছিল। কিন্তু আজ পিছনে অতর্কিতে টান পড়ায় তাঁহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিল কেন? তাঁহার মনে কুসংস্কার নাই, লজিকের ফাঁদে যাহা ধরা যায় না তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে? নিশ্চয় গত বৎসরের ঘটনাটা তাঁহার অবচেতন মনে সঞ্চিত হইয়াছিল। মনের অনাবশ্যক জঞ্জাল। মানে হয় না।

তিনি আবার চলিলেন। শীতের সূর্য আর একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে, রৌদ্রের রঙ পীতাভ হইয়াছে। গোকুলবাবু দ্রুত পা চালাইলেন; বনের ওদিকটা দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে। বনের মধ্যে রাত্রি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আরও মাইলখানেক গিয়া গোকুলবাবু দাঁড়াইলেন। দুত্তোর! আর টো টো করিয়া কি হইবে? সব পাখি পালাইয়াছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গেলেই ভাল। গোকুলবাবু অসংখ্যবার শিকারে আসিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ফল যাত্রা কখনও হয় নাই।

তিনি ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময়—

কোঁকর কোঁ!

গোকুলবাবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় পাশের দিকে ফিরিলেন।

পাশের দিকে লম্বা খানিকটা খোলা জমি, গাছপালা নাই। তাহার অপর প্রান্তে প্রায়

banglabooks.in

দুইশত গজ দূরে একটা শুষ্ক মৃত শেওড়া গাছ নিষ্পত্র ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এত দূর হইতে স্পষ্ট দেখা না গেলেও শেওড়া গাছের মাথায় হাঁড়ির মতো কি একটা রহিয়াছে। গোকুলবাবু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মোরগই মনে হইতেছে। বন-মোরগ! শিকারীর কাছে বন-মোরগের মতো লোভনীয় পাখি আর নাই। গোকুলবাবু জানিতেন এ বনে মোরগ আছে, কিন্তু কোনও দিন মারিতে পারেন নাই।

এই সময় গাছের চূড়ায় হাঁড়িটা গলা উঁচু করিয়া আবার ডাকিয়া উঠিল—কোঁকর কোঁ।

আর সন্দেহ রহিল না। একটা চাপা উত্তেজনা গোকুলবাবুর স্নায়ুমণ্ডলীকে ধনুর্গুণের মতো টান করিয়া দিল। তিনি দূরে বৃক্ষশীর্ষে দৃষ্টি রাখিয়া কাঁধ হইতে বন্দুক নামাইলেন, পকেট হইতে চার নম্বরের একটি টোটা লইয়া বন্দুকে ভরিলেন; তারপর বন্দুক হস্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইলেন।

একশো গজের মধ্যে পৌঁছিয়া তিনি মোরগটাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। প্রকাণ্ড মোরগ, যেন একটা ময়ূর। কুচকুচে কালো গায়ের পালক, তাহার উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে, পুচ্ছের ময়ূরকণ্ঠী পালকগুলি বক্রভাবে উদ্যত হইয়া আছে। মোরগ সগর্বে গলা উঁচু করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। গোকুলবাবুর শরীরের ভিতর উত্তেজনার একটা শিহরণ খেলিয়া গেল।

তাঁহার বন্দুকের পাল্লা একশো গজ, মোরগটা পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু গোকুলবাবু সাবধানী লোক, একশো গজ দূর হইতে ছর্‌রা এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হয়, লক্ষ্যে না লাগিতে পারে। তিনি অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইলেন। কাছে-পিঠে গাছ থাকিলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু গাছ নাই; তাঁহাকে খোলা মাঠ দিয়া অগ্রসর হইতে হইল।

আরও পঁচিশ গজ গিয়া তিনি থামিলেন। এইবার বেশ পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে, আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই। তিনি ধীরে ধীরে বন্দুক তুলিলেন।

কিন্তু টিপ করিয়া ঘোড়া টিপিবার আগেই মোরগটা ফর্‌ফর্ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল।

মোরগ জাতীয় পাখি ভাল উড়িতে পারে না, তাহাদের ওজনের তুলনায় পাখনা ছোট। কিন্তু উঁচু হইতে লাফাইয়া পাখনার সাহায্যে অক্ষত দেহে মাটিতে নামিতে পারে। মোরগটা পাখনা নাড়িতে নাড়িতে মাটিতে নামিয়া কোঁক কোঁক শব্দ করিতে করিতে একদিকে ছুটিল। গোকুলবাবু দেখিলেন, প্রায় একশো গজ গিয়া মোরগটা একটা গাছের তলায় দাঁড়াইল, তারপর যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে গাছের নিচু ডালে উঠিয়া ডাকিল—কোঁকর কোঁ।

গাছের তলায় ছায়া-ছায়া, তবু মোরগটাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। গোকুলবাবু বিড়াল পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় ওই পাখিটির উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি আবার তাহার পাল্লার মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু এবারও বন্দুক তোলার সঙ্গে সঙ্গে মোরগ উড়িয়া গেল। বেশী দূরে গেল না, ঠিক পাল্লার বাহিরে গিয়া একটা ঝোপের পাশে দাঁড়াইল। গলা উঁচু করিয়া ব্যঙ্গভরে ডাকিল, কোঁকর কোঁ।

গোকুলবাবু আবার চলিলেন, নিয়তির চুম্বক তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমে সূর্য বনের আড়ালে ঢাকা পড়িল, চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল। গোকুলবাবুর সেদিকে লক্ষ্য নাই, তিনি মোহগ্রস্তের মতো মোরগের পিছনে চলিয়াছেন।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি মোরগটাকে মারিতে পারিলেন না। যতবার পাল্লার মধ্যে আসেন ততবার বন্দুক তোলার সঙ্গে সঙ্গে মোরগ পলাইয়া যায়। তাহার অনুসরণ করিয়া তিনি কোন দিকে চলিয়াছেন তাহাও তাঁহার লক্ষ্য নাই। কেবল একাগ্র ব্যগ্রতায় পাখির পিছনে চলিয়াছেন।

একবার তাঁহার মনে হইল গাছপালার ওপারে ধোঁয়া উঠিতেছে, তাহার মনের উপর অস্পষ্ট ছায়া পড়িল, বনের কিনারে কোনও গ্রামের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। দিনের আলো দ্রুত নিভিয়া আসিতেছে, চারিদিকের গাছপালা আবছায়া হইয়া গিয়াছে। তবু কালো

banglabooks.in

মোরগটাকে পরিষ্কার দেখা যায়—

হঠাৎ মোরগটা থামের মতো একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া তীব্রকণ্ঠে ডাক দিল। গোকুলবাবু দেখিলেন, একটা গোরস্থান। গ্রাম্য গোরস্থান, অধিকাংশ কবরই মাটির, ইটের কবর যে দুই-চারিটা আছে তাহাও চুন-সুরকি খসিয়া জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একটা গোর নূতন, তাহার গায়ের চুনকাম সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। সেই গোরের শিরঃস্তম্ভের উপর মোরগটা গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে।

গোকুলবাবু শীর্ণ একটা নিশ্বাস টানিলেন। অন্ধকারে পাল্লা বোঝা যায় না, তবু ষাট সত্তর গজের বেশী নয়। গোকুলবাবুর বুক উত্তেজনায় দুরুদুরু করিয়া উঠিল। এবার ফস্কাইলে আর মোরগ মারা যাইবে না।

সামনে বাঁ পাশে একটা বড় ফণী-মনসার ঝোপ। সেটার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে—

গোকুলবাবু কোণাচে ভাবে ফণী-মনসার ঝোপের দিকে চলিলেন, দৃষ্টি মোরগের দিকে। তারপর হঠাৎ ঝোপের দিক হইতে একটা সর্‌সর্ শব্দ শুনিয়া মোরগের উপর হইতে তাঁহার দৃষ্টি সরিয়া গিয়া ঝোপের উপর পড়িল।

ঝোপের ভিতর হইতে একটা কালো মানুষের মুখ বাহির হইয়া আসিতেছে। নিষ্ক্রান্ত দন্ত, চক্ষু দুটা অপার্থিব হিংসায় জ্বলিতেছে। দুই হাতে ফণী-মনসার কাঁটা সরাইয়া মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। কয়লার মতো কালো গায়ের রঙ, পরনে নীল রঙের লুঙ্গি।

নরঘাতক আবদুল্লা! তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ নাই। গোকুলবাবু দ্বিধা করিলেন না, বন্দুক তুলিয়া ফায়ার করিলেন আবদুল্লার মুখে।

কিন্তু কিছুই হইল না। আবদুল্লা অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। গোকুলবাবু ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তারপর যে কথাটা সঙ্কটকালে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িয়া গেল। আবদুল্লার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, সে বাঁচিয়া নাই!

গোকুলবাবুর হৃৎপিণ্ডটা একবার উন্মত্তভাবে লাফাইয়া উঠিল। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মস্তিষ্কে শেষবারের জন্য চিন্তার ছাপ পড়িল—মানে হয় না।

২৬ ভাদ্র ১৩৬৫

নখদর্পণ

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল পঁচিশ বছর আগে, বিহার প্রদেশের একটি ছোট শহরে। আমার বাল্যবন্ধু শম্ভুনাথের পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। বরযাত্রী যাইবার কথা ছিল কিন্তু কাজের চাপে যাইতে পারি নাই; তাই বৌভাতের ভোজ খাইতে স্ত্রী ও ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে লইয়া এক রাত্রির জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম।

banglabooks.in

আমার কর্মস্থল হইতে শম্ভুর বাসস্থান ট্রেনযোগে বেশী দূরে নয়, আন্দাজ আশী মাইল। শনিবার দুপুরবেলা যাত্রা করিয়া ভাবিয়াছিলাম বেলা থাকিতে থাকিতে অকুস্থলে পৌঁছিব, কিন্তু ট্রেন দেরি করিয়া ফেলিল। যখন পৌঁছিলাম তখন শীতের রাত্রি নামিয়াছে।

স্টেশনে নামিয়া দেখি শম্ভু উপস্থিত। আশী মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বহুকাল শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমার মনের মধ্যে তাহার চেহারার যে চিত্রটি ছিল তাহার সহিত বর্তমান চেহারার তফাৎ হইয়াছে, গোঁফ ও জুলফিতে পাক ধরিয়াছে; গাল শীর্ণ, বুঝিলাম দাঁত পড়িয়াছে। সেও বোধকরি আমার চেহারার অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। বলিবার আছে কি? যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলি তো আর ফিরিবে না!

শম্ভু গাড়ি আনিয়াছিল। সে সম্পন্ন গৃহস্থ, নিজের মোটর আছে; আমাদের মোটরে তুলিয়া নিজে মোটর চালাইয়া লইয়া চলিল। আমি বলিলাম, 'তোর নিজের বাড়িতে আজ যজ্ঞি, তুই নিজে এলি কেন? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।'

শম্ভু বলিল, 'আমি বরকর্তা, আমার আর কাজ কি? তাই চলে এলাম।'

বলিলাম, 'বলিস কি, বরকর্তার কাজ নেই! কত লোক নেমন্তন্ন করেছিস?'

'তা বাঙালী বেহারী মিলিয়ে শ'তিনেক হবে।'

'তবে! বাড়ি ফিরে দেখবি, অতিথিতে ঘর ভরে গেছে।'

শম্ভু একটু হাসিয়া বলিল, 'তা হোক। নটবর আছে।'

'নটবর! সে কে?'

'তুই চিনবি না। নটবর মল্লিক, কয়েক বছর হল এখানে এসেছে। চৌকশ লোক, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব জানে। নিজের কাজ ফেলে পরের কাজ করে বেড়ায়। কারুর বাড়িতে বিয়ে পৈতে থাকলে নটবর সেখানে আছেই। নটবর না হলে কাজ কারুর চলে না।'

এই জাতীয় সেবক পৃথিবীতে আছে শুনিয়াছি, যাহারা পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, যাহাদের অফুরন্ত কর্মস্পৃহা কেবল নিজের কাজ করিয়া নিঃশেষিত হয় না। আমার ভাগ্যদোষে আমি এ পর্যন্ত এরূপ মানুষের সাক্ষাৎ পাই নাই। শম্ভুকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে।

শম্ভুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। গ্যাস-লাইট আলো। শানাইয়ের বাজনায় বাড়ি সরগরম। শম্ভুর বাড়িটি একতলা, কিন্তু বেশ বড়; চারিদিকে আম কাঁঠালের বাগান, মাঝখানে বাড়ি। সম্মুখে খোলা জমির উপর শামিয়ানা পড়িয়াছে।

শম্ভুর স্ত্রী আসিয়া আমার স্ত্রীকে ও নিদ্রালু ছেলেমেয়ে দুটিকে ভিতরে লইয়া গেলেন, শম্ভু আমাকে লইয়া গিয়া শামিয়ানার আসরে বসাইল। কয়েকজন বাঙালী ও বেহারী অতিথি ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পান সিগারেট চলিতেছে। শম্ভু কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিল। অতিথিদের মধ্যে বাঙালীই বেশী, কয়েকজন বেহারী হিন্দু মুসলমান আছেন।

এইখানে নটবরকে দেখিলাম। দোহারা মজবুত চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ; এই শীতেও হাতকাটা ফতুয়া পরিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় সমান অধিকার। চাকরদের হুকুম করিতেছে, অতিথিদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছে, আতর-দান সামনে ধরিয়া খাতির করিতেছে। আবার অন্দরে গিয়া ফুলশয্যার ফুলের কি ব্যবস্থা হইল তাহার তদারক করিয়া আসিতেছে। লুচি ভাজা কখন আরম্ভ করিলে গরম গরম লুচি অতিথিদের পাতে পড়িবে অথচ লুচিতে টান পড়িবে না, সে-হিসাবও তাহার মাথার মধ্যে আছে। নটবরের তত্ত্বাবধানে কোথাও এতটুকু ত্রুটি হইবার যো নাই। সত্যই দারুণ কাজের লোক।

রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল, অতিথিরা পান চিবাইতে চিবাইতে বিদায় লইলেন। তারপর বর-বধূকে ফুলশয্যায় শয়ন করাইয়া মেয়েদের আড়ি পাতার পালা শেষ হইতে মধ্যরাত্রি হইল।

banglabooks.in

ক্লান্ত দেহে শুইতে যাইতেছি, শুনিলাম বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া নটবর শম্ভুকে বলিতেছে, 'দাদা, আজ তাহলে চলি। আবার ভোরবেলাই আসতাম, এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, শামিয়ানা ফেরত দিতে হবে, গ্যাস-লাইটের দাম চুকোতে হবে—কিন্তু বৌটার শরীর ভাল নয়, ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। ক'দিন ওদিকে মন দিতে পারিনি; সকালে তাকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না, সাড়ে দশটার মধ্যেই আমি এসে হাজির হব। আপনার বাড়ির কাজ তুলে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।'

ধন্য নটবর!

যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাটি এই কাহিনীর বিষয়বস্তু তাহার পরিবেশ রচনা করিতে গিয়া দেখিতেছি অনেক বাজে কথা বলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর নয়, সরাসরি মূল কাহিনী আরম্ভ করি।

বিয়ে বাড়িতে যেমন হইয়া থাকে, রাত্রে যে যেখানে পাইল শয়ন করিল। মেয়েরা শিশুদের লইয়া অন্দরে রহিলেন, পুরুষেরা বার-বাড়িতে। আমি ও শম্ভু বৈঠকখানা ঘরের চৌকির উপর শয়ন করিলাম।

পরদিন সকালবেলা আমার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র নীলু আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, গায়ে ঠেলা দিতে দিতে উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'বাবা, ওঠ ওঠ, চোর এসেছে।'

ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। আমার কন্যা নবমবর্ষীয়া বুলা উপস্থিত ছিল, সে নীলুকে বিরক্তভাবে সরাইয়া দিয়া বলিল, 'যা, তুই কিছু জানিস না। বাবা, কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল, নতুন বৌয়ের সব গয়না নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

দেখিলাম শম্ভু আগেই উঠিয়া গিয়াছে। চারদিক হইতে উৎকণ্ঠিত উত্তেজনার গুঞ্জন আসিতেছে। আমিও উঠিয়া পড়িলাম।

খবরটা মিথ্যা নয়।

বর-বধূ রাত্রে যে-ঘরে ফুলশয্যা করিয়াছিল তাহার লাগাও একটা কুঠুরিতে কনে-বৌয়ের যাবতীয় গহনা একটি স্টীলের ট্রাঙ্কে রাখা হইয়াছিল। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। রাত্রে চোর আসিয়া বাহিরের জানালার শিক বাঁকাইয়া প্রবেশ করিয়াছে ও গহনার বাক্সটি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। পাশের ঘরে বর-বধূ কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা।

খবরটা বাড়ির মধ্যেই আবদ্ধ নাই, পাড়াতেও রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে; অনেক পড়শী আসিয়া জুটিয়াছে। পুলিসেও খবর পাঠানো হইয়াছে। আমরা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুলতান করিতেছি। শম্ভু অত্যন্ত বিচলিত। দশ হাজার টাকার গহনা—

একটা চাকর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল, বাড়ির পিছনদিকে আম বাগানের মধ্যে গহনার বাক্সটা ভাঙা অবস্থায় পড়িয়া আছে। সকলে সেই দিকে ছুটিল, ছোট ছেলে-মেয়েরা আগে আগে, বয়স্থরা পিছনে। দল বড় কম নয়; পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোক তো আছেই, দু'একজন ভদ্রশ্রেণীর লোকও আছেন। মোসীন সাহেব নামক এক মুসলমান ভদ্র-লোকের সহিত কাল রাত্রে শম্ভু আলাপ করাইয়া দিয়াছিল; পাড়াতেই থাকেন, গম্ভীর প্রকৃতির প্রৌঢ় ব্যক্তি; মুখে ছাঁটা দাড়ি, চোখে সুরমা। সাহেব তালিমের লোক, ইংরেজী লেখাপড়া অল্পই জানেন। তিনি খবর পাইয়া আসিয়াছেন।

বাড়ির পিছনদিকে বাগানের কিনারায় আমগাছের তলায় ভাঙা ট্রাঙ্কটা পড়িয়া আছে। আমরা গিয়া ঘিরিয়া ধরিলাম। ট্রাঙ্কের তলা চাড় দিয়া ভাঙা হইয়াছে; বধূর কয়েকটা আট-পৌরে শাড়ী সেমিজ আশেপাশে ছড়ানো, কিন্তু গহনা ও দামী কাপড়-চোপড় অদৃশ্য হইয়াছে। চোর অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি, খেলো জিনিস লইয়া নিজেকে ভারাক্রান্ত করে নাই।

পুলিস আসিয়া পড়িল। একজন ছোট দারোগা, সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল। আমাদের দেশের পুলিসের কর্মতৎপরতার কথা কাহারও অবিদিত নাই। যাহার বাড়িতে চুরি হইয়াছে পুলিসের জেরার ঠেলায় সে চোর বনিয়া যায়; তারপর কথায় কথায় থানায় দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে গৃহস্থের কালঘাম ছুটিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চোর অবশ্য ধরা পড়ে না

banglabooks.in

এবং চোরাই মাল কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপনীত হয় তাহা নির্ণয় করা শিবেরও অসাধ্য।

বর্তমান ক্ষেত্রেও ছোট দারোগা অশেষ তৎপরতা দেখাইলেন। শম্ভু শহরের গণ্যমান্য লোক। তাহাকে হুমকি দেওয়া চলে না কিন্তু তিনি বাড়িসুদ্ধ লোককে জেরা করিলেন, সকলের নাম ধাম লিখিয়া লইলেন, চাকরদের ধমকাইলেন, চোরাই মালের ফিরিস্তি তৈরি করিলেন। ঘণ্টা দুই এইভাবে কাটাইয়া তিনি একজন কনস্টেবলকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া অন্য কনস্টেবলকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। শম্ভুকে আশ্বাস দিয়া গেলেন—'বাড়ির লোকের কাজ বলেই মনে হচ্ছে।—আপনি চিন্তা করবেন না, চোর ধরা পড়বে।'

আমরা কয়জন বিমর্ষভাবে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। মোসীন সাহেব আমাদের সকলের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না। চোরকে ধরে যদি ওদের সামনে হাজির করা যেত, তাহলে ওরা তাকে বেঁধে নিয়ে যেত। তার বেশী ওরা পারবে না।'

শম্ভু বলিল, 'তা কি জানি না? কিন্তু উপায় কি বলুন? কাউকে সন্দেহ করাও যাচ্ছে না। চাকরদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে আমার বিশ্বাস হয় না। এ পেশাদার চোরের কাজ।'

কিছুক্ষণ এই লইয়া আলোচনা হইল। যদি পেশাদার চোর হয় তাহা হইলে বমাল ফেরত পাইবার কোনও আশাই নাই; এতক্ষণে গহনাগুলো চোরা-স্যাকরার কাছে গিয়া সোনার তালে পরিণত হইয়াছে।

হঠাৎ মোসীন সাহেব বলিলেন, 'আপনারা যে মন্ত্রতন্ত্র মানেন না, নইলে চেষ্টা করে দেখা যেত।'

শম্ভু চকিত হইয়া বলিল, 'মন্ত্রতন্ত্র! সে কি রকম?'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'আছে। হিন্দুদের মধ্যেও আগে ছিল। আমাদের মধ্যেও আছে। যে চুরি করেছে তার চেহারা দেখা যায়, চেনা লোক হলে সনাক্ত করা যায়; কি ভাবে চুরি করেছে, কোন পথে গিয়ে কোথায় চোরাই মাল লুকিয়ে রেখেছে তাও দেখা যায়। কিন্তু আপনারা কি এসব বুজরুকি বিশ্বাস করবেন?'

বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বিপাকে পড়িলে বাঘ ফড়িং খায়। শম্ভু কয়েকবার ঘাড় চুলকাইয়া আমার দিকে আড়চোখে চাহিয়া বলিল, 'তা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? হাত কোলে করে বসে থাকার চেয়ে ভাল। কী করতে হবে মোসীন সাহেব?'

মোসীন সাহেব উঠিয়া বলিলেন, 'আপনাদের কিছুই করতে হবে না, যা করবার আমি করব। বসুন, আমি এখনি আসছি।'

তিনি নিজের বাড়িতে চলিয়া গেলেন। পনেরো কুড়ি মিনিট পরে ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাথায় পশমের রোমশ টুপি, গায়ে দামী শেরোয়ানি। আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ডান হাতের মুঠি খুলিয়া দেখাইলেন; হাতের তেলোয় একটি আংটি রহিয়াছে।

আংটিটি বোধ হয় চাঁদির, বেশ ভারী গড়নের। তাহাতে বসানো রহিয়াছে একটি আধুলির মত গোল কালো পাথর। চক্‌চকে কালো সমতল পাথর। আংটি দেখিয়া খুব দামী বলিয়া মনে হয় না।

শম্ভু বলিল, 'আংটি দেখছি। কী হবে আংটি?'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'মন্ত্রপূত আংটি। প্রায় চারশো বছর এই আংটি আমাদের বংশে আছে। আকবর বাদশার সময় দিল্লীর এক ফকির আমার পূর্বপুরুষকে দিয়েছিলেন। এর গুণ এখনি দেখতে পাবেন।—একটু তেল আনান।'

'তেল!'

'হাঁ, যে কোন তেল। এক ফোঁটা হলেই চলবে।'

ইতিমধ্যে বাড়ির কাচকাচা ছেলেমেয়েরা আসিয়া বৈঠকখানায় জমা হইয়াছিল; শম্ভুর ইঙ্গিতে একটি মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং এক শিশি কেশতৈল লইয়া উপস্থিত হইল।

banglabooks.in

মোসীন সাহেব শিশির মুখে আঙুল ভিজাইয়া আংটির সমতল পাথরের উপর মাখাইয়া দিলেন; মসৃণ কালো পাথরটা আয়নার মত চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, 'আসুন, খোলা জায়গায় যাওয়া যাক।'

বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় ছেলেবুড়ো সকলে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ছেলে মেয়ে নীলু ও বুলা বাচ্চাদের দলে আছে এবং খুবই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। একে তো চোর সম্বন্ধে তাহাদের মনে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নাই, তার উপর চোর ধরিবার এই অভিনব প্রক্রিয়া তাহাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে । আমরাও কম আকৃষ্ট হই নাই; বাটি-চালা, বাঁশ-চালা প্রভৃতির কথা শোনা ছিল; সেকালে নখদর্পণ ছিল। মোসীন সাহেবের আংটি বোধ করি তাহারই মুসলমানী সংস্করণ। কিন্তু সত্যই কি ইহার দ্বারা কিছু জানা যায়? না স্রেফ বুজরুকি?

মোসীন সাহেব শিশুর দলকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'দুটি বাচ্চা দরকার।' বলিয়া বুলা ও নীলুকে কাছে ডাকিলেন।

বুলা ও নীলু একটু ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম; তাহাদের দিয়া কিরূপ প্রক্রিয়া করাইবেন? বলিলাম, 'বয়স্ক লোক দিয়ে কি হবে না?'

মোসীন সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। মন সরল এবং নিষ্পাপ হওয়া চাই।'

আর কিছু বলিলাম না। মোসীন সাহেব আংটিটি বুলার হাতে দিয়া বলিলেন, 'তোমরা দু'জনে এই আংটি ধর, পাথরের দিকে চেয়ে থাকো। যদি কিছু দেখতে পাও বোলো।'

বুলা ও নীলু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আংটি ধরিল, বুলা বাঁ হাতে এবং নীলু ডান হাতে ধরিল, একাগ্র চক্ষে আংটির পাথরের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোসীন সাহেব দুই পা পিছনে সরিয়া আসিলেন, চোখের উপর করতল আড়াল করিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

প্রায় দশ মিনিট। বয়স্থ ব্যক্তিরা সকলেই একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। তারপর বুলা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'একটা মুখ—একটু মুখ দেখতে পাচ্ছি।' নীলুও মুখে একটা সমর্থনসূচক শব্দ করিল, দু'জনেই দেখিয়াছে।

আমরা সকলে তাহাদের পানে ছুটিয়া গেলাম। কিন্তু মোসীন সাহেব দুই হাত তুলিয়া আমাদের নিবারণ করিলেন, বলিলেন, 'আপনারা কেউ দেখবেন না, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমরা থমকিয়া গেলাম। তিনি নীলু ও বুলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার মুখ দেখছ? চেনা লোক?'

তাহারা দু'জনেই মাথা নাড়িল, 'না, চিনতে পারছি না।'

মোসীন সাহেব আবার অনুচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, 'এবার কি দেখছ?'

বুলা বলিল, 'মুখটা মিলিয়ে যাচ্ছে।'

নীলু বলিল, 'যাঃ, অন্ধকার হয়ে গেল।'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'চেয়ে থাকো। কী দেখতে পাও বলো।' তিনি আবার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বুলা একটি তীক্ষ্ণ নিশ্বাস টানিয়া বলিল, 'অন্ধকার কেটে যাচ্ছে... একটা বাড়ির জানালা...যে লোকটার মুখ দেখেছিলুম সে জানালার গরাদ খুলে ভেতরে ঢুকছে...ওই আবার বেরিয়ে আসছে...হাতে একটা কী রয়েছে...তোরঙ্গ!'

নীলু ভীতকণ্ঠে বলিল, 'দিদি, পালিয়ে আয় দেখতে পাবে!'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'ভয় নেই, ও তোমাদের দেখতে পাবে না। এখন কী হচ্ছে বলো।'

বুলা বলিল, 'চলে যাচ্ছে। তোরঙ্গ কাঁধে তুলে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে যাচ্ছে।'

banglabooks.in

মোসাহেব সাহেব বলিলেন, 'তোমরাও ওর সঙ্গে যাও, দেখ কোথায় যাচ্ছে।'

বুলা ও নীলু আংটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিল। মোসাহেব সাহেব তাহাদের অনুসরণ করিলেন, আমরা চলিলাম তাঁহার আশেপাশে। বিচিত্র শোভা-যাত্রা। সকলের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। আমি চুপি চুপি শম্ভুকে প্রশ্ন করিলাম, 'কিরে, ব্যাপার কি?' সে অবোধের মত হাত উল্টাইল।

গরাদ-ভাঙা জানালার পাশ দিয়া বুলা ও নীলু বাড়ির পিছনের আমগাছতলায় উপস্থিত হইল। বুলা বলিল, 'গজাল দিয়ে তোরঙ্গের তালা ভাঙছে...ডালা খুলে গেল...পুঁটলি বাঁধছে...পুঁটলি বগলে করে চলে যাচ্ছে।'

'তোমরাও যাও।'

বুলা ও নীলু আবার চলিল। কাছেই বাগানের একটা আগড় ছিল; আগড়ের ওপারে খোলা ময়দান, ঝোপঝাড়। বুলা ও নীলু আগড় পার হইয়া ময়দানের ভিতর দিয়া চলিল। কিছুদূর যাইবার পর একটা ঝোপের কাছে আসিয়া বলিল, 'এইখানে চোরের পুঁটলি থেকে কি একটা পড়ে গেল—চক্‌চকে জিনিস—'

আমরা আসিয়া দেখিলাম ঝোপের নীচে ঘন ঘাসের মধ্যে একটা সোনালী দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে। শম্ভু সেটা তুলিয়া লইল, বলিল, 'নতুন বৌয়ের কানের দুল।'

আমাদের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, চোর যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই আমরা চলিয়াছি। মোসাহেব সাহেবের আংটি বুজরুকি নয়। এ কী লোমহর্ষণ কাণ্ড!

বুলা ও নীলু কিন্তু দাঁড়ায় নাই, গতি একটু শ্লথ করিয়া আবার চলিয়াছিল। আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে চলিলাম। অদৃশ্য চোর যেন পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।...আশ্চর্য! জীবনে কিছুই কি নষ্ট হয় না, লুপ্ত হয় না? কোন অদৃশ্য লোকে সঞ্চিত হইয়া থাকে? আমরা যত গোপনেই দুষ্কার্য করি ধরিত্রীর বুকে সেই দুষ্কৃতির পদাঙ্ক অঙ্কিত হইয়া যায়, চর্মচক্ষে দেখা না গেলেও সে দাগ আর মোছে না।

ময়দানের ওপারে ডাইনে-বাঁয়ে একটা রাস্তা। বুলা ও নীলু রাস্তায় পড়িয়া বাঁ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। এখানে রাস্তা নির্জন, পাশে ঘরবাড়ি নাই। বাঁ দিকে ফিরিবার পর আমাদের একজন সহযাত্রী খাটো গলায় বলিল, 'বাজারের দিকে যাচ্ছে। শহুরে চোর।'

ক্রমে রাস্তার ধারে ঘর বাড়ি দেখা দিতে লাগিল। দুই চারিজন লোক আমাদের শোভা-যাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া দলে ভিড়িয়া পড়িল। যতই শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি ভিড় তত বাড়িতেছে। শেষে আমাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দল এক বৃহৎ মিছিলে পরিণত হইল।

শহরের এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তা ঘুরিয়া মিছিল চলিয়াছে। আগে আগে বুলা ও নীলু আংটির উপর চক্ষু রাখিয়া যেন স্বপ্নলোকে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাদের পিছনে মোসাহেব সাহেব ও আমরা, এবং আমাদের পিছনে কলকোলাহলরত উত্তেজিত জনতা। সকলেই ব্যাপার বুঝিয়াছে। তাই এত উত্তেজনা। বেলা আন্দাজ দশটা; শীতের রৌদ্র খর হইয়াছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

শহরের বড় রাস্তা হইতে একটি অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা বাহির হইয়াছে, বুলা ও নীলু তাহাতে প্রবেশ করিল। তাহারা এখন আর কথা বলিতেছে না, নিঃশব্দে চলিয়াছে। অনুমান করা যায়, যে-বায়বীয় মূর্তিকে তাহারা অনুসরণ করিতেছে তাহার কার্যকলাপে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা কিছুই নাই।

এ রাস্তাটায় নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর বসতি। অধিকাংশই খোলার চাল, দুই চারিটি পতনশীল পাকা বাড়ি আছে। শম্ভু এই সময় আমার একটা বাহু মুঠি করিয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম তাহার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে; যেন রাস্তার উপর তাহার পরিচিত কেহ থাকে, আংটির অমোঘ নির্দেশে সেইদিকে আমরা চলিয়াছি। আমি মুখ না তুলিয়া শম্ভুকে প্রশ্ন করিলাম, সে শঙ্কিতভাবে হাত উল্টাইয়া উত্তর দিল।

একটা ছোট পাকা বাড়ি, জীর্ণ এবং গলিত ত্বক; সদর দরজা বন্ধ। এই বাড়ির সম্মুখে আসিয়া বুলা ও নীলু থামিয়া গেল। বুলা সংহতস্বরে বলিল, 'লোকটা দোরের সামনে

banglabooks.in

এসে দাঁড়িয়েছে...দোরে ধাক্কা দিচ্ছে...দোর খুলে গেল...লোকটা পুঁটলি নিয়ে ভেতরে চলে গেল...দোর আবার বন্ধ হয়ে গেল...'

আমি জানি না এ কাহার বাড়ি। শম্ভুর পানে চাহিয়া ছিলাম; তাহার মুখ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভিড়ের মধ্য হইতে এক একজন চেঁচাইয়া উঠিল, 'ধাক্কা মারো—ভেঙে ফেল দরজা।'

কিছুক্ষণ সকলে নিশ্চল রহিল। তারপর আমি দৃঢ়পদে সম্মুখে গিয়া দরজায় টোকা দিলাম।

দরজা খুলিয়া গেল। যে দরজা খুলিল তাহাকে আমি চিনি, কাল রাত্রেই দেখিয়াছি। সে ঘুম-ভরা চোখে হতচকিত দৃষ্টি লইয়া জনতার পানে চাহিল।

নীলু ভয়ার্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা—'

বুলাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'ওই—ওই চোর!'

নটবর মল্লিক সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কাল রাত্রে বুলা ও নীলু তাহাকে দেখে নাই। তাই আজ আংটিতে তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। এখন আসল মানুষটাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছে।

পুলিস আসিয়া পরম পরোপকারী নটবর মল্লিককে ধরিল, তাহার বাড়ি হইতে চোরাই বস্ত্রালঙ্কার সমস্তই পাওয়া গেল।

আমি সেইদিনই সপরিবারে ফিরিয়া আসিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম, আদালতে বিচার-কালে হাকিম পুলিস-তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজের আমল। সাহেব হাকিম নখদর্পণ জাতীয় বর্বরোচিত কুসংস্কার বিশ্বাস করেন নাই।

১৫ আশ্বিন ১৩৬৫

প্রত্নকেতকী

কুকুরছানাটা বোধকরি অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়াই সেদিন রাস্তায় নামিয়াছিল।

সুবীর সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে লইয়া মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। মাথা-খোলা জাগুয়ার গাড়িটা আস্তে চলিতে জানে না, সামনে সার্দান অ্যাভিনিউএর খোলা রাস্তা পাইয়া উল্কার বেগে ছুটিয়াছিল।

কুকুরছানা সময় বুঝিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় অবতরণ করিল। তারপর মন্থরপদে রাস্তা পার হইয়া চলিল। তাহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, গায়ের রঙ নোংরা হলুদবর্ণ। সুবীর প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই; যখন দেখিতে পাইল তখন কুকুরছানা ও মৃত্যুর মাঝখানে

banglabooks.in

বিশ গজের ব্যবধান। সুবীর সবেগে ব্রেক কষিল।

স্বামীর পাশে বসিয়া অরুণা এই বেগ-সংহতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার কপাল ড্যাশ্‌বোর্ডের গায়ে সজোরে ঠুকিয়া গেল। কপাল কাটিল না বটে, কিন্তু অরুণা একটি ক্ষীণ কাকুতি উচ্চারণ করিয়া সুবীরের গায়ে হেলিয়া পড়িল।

কুকুরছানা চাপা পড়ে নাই, অক্ষত ছিল; সে গুটিগুটি ফিরিয়া গিয়া আবার ফুটপাথে উঠিল। সুবীর দেখিল অরুণা মূর্ছা গিয়াছে। সে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল—'অরুণা! অরুণা!'

অরুণা সাড়া দিল না। সুবীরের বুকের মধ্যে একবার ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল; তারপর সে মোটর ঘুরাইয়া তীরবেগে চলিল। মাইল খানেক দূরে একটা নার্সিং হোম আছে, সেখানকার ডাক্তার তাহার পরিচিত।—

সুবীর অবস্থাপন্ন বনেদী ঘরের ছেলে। শান্ত শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক, তাহার চরিত্রে একটি অচপল দৃঢ়তা আছে। মাত্র ছয় মাস হইল অরুণার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। অরুণা উজ্জ্বল রূপবতী। আধুনিক আদর্শে কৃশাঙ্গী তন্বী নয়। কিন্তু কালিদাস ও জয়দেবের চোখে বোধকরি ভাল লাগিত; তাহাকে দেখিলে গীতগোবিন্দ ও মেঘদূতের কথা মনে পড়িয়া যায়।

ছয় মাসের বিবাহিত জীবনে তাহারা মনের দিক দিয়া খানিকটা কাছাকাছি আসিয়াছে, কিন্তু একেবারে মিশিয়া গলিয়া একাকার হইয়া যায় নাই। সুবীর নিজের মন-প্রাণ অরুণার কোলে ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু অরুণার মনের আড়াল এখনও পুরাপুরি ঘুচিয়া যায় নাই। বিবাহ এমন একটি অনুষ্ঠান যাহার ফলে দুইটি যুবক-যুবতী অকস্মাৎ পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ঘটিলেই যে মনের ঘনিষ্ঠতা ঘটিবে এমন কোনও কথা নাই। কাহারও কাহারও মনের কবাট আস্তে আস্তে খোলে, খুলিতে বিলম্ব হয়।—

নার্সিং হোমের ডাক্তার অরুণাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ভয়ের কিছু নেই, সামান্য কংকাশন (concussion) হয়েছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান হবে।'

অরুণার যখন জ্ঞান হইল সুবীর তখন তাহার শয্যাপাশে বসিয়া একাগ্র চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। অরুণার চোখে কিন্তু মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি, সে ক্ষণকাল শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'কেয়ার গন্ধ!'

ডাক্তার বলিলেন—'সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তিন-চার দিন লাগবে।'

অরুণা নার্সিং হোমেই রহিল। তিন দিন পরে সুবীর অরুণাকে গৃহে লইয়া আসিল। অরুণা এখন সারিয়া উঠিয়াছে, সেই আচ্ছন্ন ভাব আর নাই। তবু, তাহার মুখের হাসি চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হয় সে যেন অন্তরের কোন্‌ সুদূর-লোকে প্রবেশ করিয়াছে, বহির্লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক কমিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সান্নিধ্য নিবিড় হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল তাহা আবার শিথিল হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়া সুবীর নার্সিং হোমের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিল। ডাক্তার শুনিয়া বলিলেন—'ও কিছু নয়, দু'চার দিনে ঠিক হয়ে যাবে। এক কাজ করুন না, ওঁকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। চেঞ্জ্‌ লাগলে শিগ্‌গির আরাম হয়ে যাবেন।'

সুবীর বলিল—'কোথায় যাব? শীত এসে পড়ল, এখন তো পাহাড়ে যাওয়া চলবে না।'

ডাক্তার বলিলেন—'নাই বা গেলেন পাহাড়ে। অত বড় রাজস্থানের মরুভূমি পড়ে রয়েছে, সেখানে যান।'

রাজস্থানের মরুভূমি! সুবীরের মনে পড়িয়া গেল, তাহার এক দূর-সম্পর্কের ভগিনী-পতি মস্তবড় প্রত্নতাত্ত্বিক, তিনি বর্তমানে রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে খননকার্য চালাইতেছেন। ভালই হইয়াছে, সুবীর অরুণাকে লইয়া রাজস্থানের মরুভূমিতেই যাইবে। নূতন দেশ, নূতন পরিবেশ, অরুণা অচিরাৎ সারিয়া উঠিবে।

সে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া অরুণার কাছে প্রস্তাব করিল। অরুণা বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইল না, কিন্তু রাজী হইয়া গেল।

banglabooks.in

তারপর দিন দশেকের মধ্যে রাজস্থানে ভগিনীপতিকে চিঠি লিখিয়া সব রকম ব্যবস্থা করিয়া সুবীর অরুণাকে লইয়া রাজস্থানের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কলিকাতা হইতে রাজস্থানের অপরান্ত সামান্য পথ নয়, দিল্লীতে ট্রেন বদল করিয়া যাইতে তিন দিন লাগে। মেল ট্রেনের একটি কুপে কামরায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে অরুণার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, চোখেমুখে উৎসুক আগ্রহ দেখা দিল। সে এ-জানালা হইতে ও-জানালায় ছুটাছুটি করিয়া, সুবীরকে নানা বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অরুণার এই পরিবর্তনে সুবীর পরম আহ্লাদিত হইল, তাহাকে কাছে টানিয়া গদ্‌গদ সুরে বলিল—'ভাল লাগছে?'

অরুণা কাকলিকলিত স্বরে বলিল—'খুব ভাল লাগছে। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে অনেক দিন বিদেশে থাকার পর নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।'

তারপর একদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে তাহারা রাজস্থানের একটি ছোট স্টেশনে অবতরণ করিল। তাহারা প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই স্টেশনের বাহিরের শুষ্ক প্রান্তর হইতে বালি-মাখা আতপ্ত বাতাসের একটা তরঙ্গ তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গেল। অরুণা চকিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—'গন্ধ পাচ্ছ? কেয়া ফুলের গন্ধ?'

অরুণা পূর্বেও একবার অর্ধচেতন অবস্থায় কেয়া ফুলের উল্লেখ করিয়াছিল, সুবীরের মনে পড়িল। সে দীর্ঘ ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল—'কেয়া ফুলের গন্ধ? কই, না। ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার গন্ধ পাচ্ছি।'

এই সময় কোট-প্যান্ট সোলা-হ্যাট-পরা প্রৌঢ়বিৎ বিরাজমোহনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রৌদ্রতাম্র শীর্ণাঙ্গ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বাংলা ইংরেজি হিন্দী সংস্কৃত মিশাইয়া কথা বলেন। সুবীর তাঁহাকে প্রণাম করিল, দেখাদেখি অরুণাও প্রণাম করিল। বিরাজমোহনবাবু ইতিপূর্বে অরুণাকে দেখেন নাই, সপ্রশংস হাসিয়া বলিলেন—'বাঃ, খাসা শ্যালবধূ তো!'

সুবীর অবাক হইয়া বলিল—'শ্যালবধূ!'

বিরাজবাবু বলিলেন—'শ্যালবধূ বুঝলে না? তুমি হলে আমার শ্যাল, মানে শ্যালক; ও হল গিয়ে তোমার বধূ, সুতরাং শ্যালবধূ।—এস, জীপ এনেছি, স্টেশন থেকে পনরো মাইল যেতে হবে।'

জীপে মালপত্র তুলিয়া তিনজনে গাড়িতে উঠিলেন, বিরাজবাবু গাড়ি চালাইলেন। স্টেশন হইতে আধ মাইল যাইবার পর আর লোকালয় দেখা যায় না; চারিদিকে ধূ ধূ বালি; দুই-চারিটা কঙ্কালসার বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়, দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢিবি, তাহার মধ্যে দিয়া অস্পষ্ট পাথুরে পথের চিহ্ন চলিয়াছে।

জীপ চালাইতে চালাইতে বিরাজবাবু কথা বলিতে লাগিলেন।—এ দেশটা এখন প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু দু'হাজার বছর আগে এমন ছিল না, উর্বর দেশ ছিল। তখন এখানে একটি রাজ্য ছিল; মরুভূমির উপান্তে ছোট্ট একটি রাজ্য। তারপর প্রকৃতি এবং মানুষ একসঙ্গে এই রাজ্যের পিছনে লাগিল। ইতিহাসে যাদের Parthian বলা হইয়াছে সেই পারদ জাতি এদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। কিন্তু বেশী দিন রাজ্য ভোগ করিতে পারিল না। দুই শত বছরের মধ্যে মরুভূমি আসিয়া রাজ্যটিকে গ্রাস করিয়া লইল। এখন এদেশে মানুষের বসতি নাই বলিলেই চলে, পুরাতন ঘরবাড়িও ভূমিসাৎ হইয়াছে; কেবল প্রস্তরনির্মিত রাজপ্রাসাদটি এখনও মরুভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বালুর মধ্যে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় মাথা জাগাইয়া আছে।

'এই রাজপ্রাসাদ এখন আমাদের স্কন্ধাবার, মানে হেড্ কোয়ার্টার্স। তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

সুবীর বলিল—'সেখানেই খোঁড়াখুঁড়ি করছেন নাকি?'

বিরাজবাবু হাসিলেন—'আরে না না, ও প্রাসাদ তো মাত্র দেড় হাজার কি দু'হাজার বছরের পুরনো। আমাদের দৃষ্টি আরো গভীরে। রাজপ্রাসাদ থেকে মাইল তিনেক দূরে এক জায়গায় সিন্ধু সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে

banglabooks.in

ওখানে ব্রোঞ্জ যুগের একটা সভ্যতা ছিল, এখন বালি চাপা পড়েছে। আমরা তাই খুঁড়ে বার করছি।'

বিরাজবাবু শুধু প্রত্নপণ্ডিত নন, প্রত্নপাগল; তিনি উৎসাহভরে খননকার্য বিষয়ে আরও অনেক তথ্য বলিয়া চলিলেন। সুবীরের পুরাতত্ত্বের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, সে নীরবে শুনিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা চলিবার পর সম্মুখে মাইল দুয়েক দূরে একটা উঁচু পাথরের ঢিবি দৃশ্যমান হইল; যেন বালু ফুঁড়িয়া একটা ত্রিকোণ পাথরের চাঙর মাথা তুলিয়াছে। বিরাজবাবু বলিলেন—'ওই দেখ রাজপ্রাসাদ, যেখানে তোমরা থাকবে।'

অরুণা উৎসুক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সুবীর বলিল—'আপনিও তো ওখানেই থাকেন।'

বিরাজবাবু বলিলেন—'ওখানে আমার অফিস আছে বটে, কিন্তু আমি বেশীর ভাগ তাঁবুতেই থাকি। যেখানে এক্স্‌কাভেশন হচ্ছে সেখানে হরদম না থাকলে অসুবিধা হয়। আমার সহকারীরা এবং কুলিরাও সরজমিনে থাকে। রাজপ্রাসাদটা তোমাদের দু'জনের জন্যে রিজার্ভ থাকবে।'

সুবীর ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'কেবল আমরা দু'জন একলা থাকব?'

বিরাজবাবু বলিলেন—'একেবারে একলা নয়, অফিসের একজন পাহারাদার আছে, সে প্রাসাদেই থাকে। তার বৌকেও আনিয়ে রেখেছি। ওরা স্থানীয় লোক। দু'জনে মিলে তোমাদের খবরদারি করবে।'

জীপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের সামনে থামিল। একজোড়া স্ত্রীপুরুষ প্রাসাদের ছায়ায়, বালুর উপর মুখোমুখি বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। পুরুষের মাথায় ধামার মত প্রকাণ্ড পাগড়ি, পাগড়ির নীচে গোঁফ ও দোপাট্টা দাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। স্ত্রীলোকটির নাকে নথ, সীমন্তে রূপার ঘুন্টি।

বিরাজবাবু বলিলেন—'গিরধর সিং, এঁরা এসেছেন, তোমরা এঁদের দেখভাল্ করবে। রুক্‌মিণী, রান্নার ব্যবস্থা করেছ তো? বেশ, আমি এখন যাচ্ছি, 'চিরাগ-বাত্তি'র সময় ফিরব। তোমরা এঁদের সামান্ ভিতরে নিয়ে যাও।' সুবীরকে বলিলেন—'আজ রাত্তিরটা আমি এখানেই থাকব, তোমাদের ঘর-বসত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।—আচ্ছা।'

বিরাজবাবু জীপ চালাইয়া প্রস্থান করিলেন।

গিরধর সিং ও রুক্‌মিণী লটবহর লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুবীর ও অরুণা প্রাসাদের সম্মুখে বালুর উপর পায়চারি করিতে করিতে চারিদিক দেখিতে লাগিল। প্রাসাদের সদর আন্দাজ পঞ্চাশ গজ চওড়া, আগাগোড়া গেরুয়া রঙের পাথর দিয়া তৈয়ারি। নীচের তলা বালুস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট দুইতল মিলিয়া এখনও প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ। তৃতীয়তল পিরামিডের ন্যায় কোণাকৃতি। স্থানে স্থানে পাথর খসিয়া গিয়া প্রাসাদের গায়ে ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর অটুট আছে।

সুবীর দেখিতে দেখিতে বলিল—'এত পুরনো বাড়ি, দেখে কিন্তু মনে হয় না। এই বাড়িতে দেড় হাজার দু'হাজার বছর আগে রাজা-রানী থাকত, লো-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত গম্‌গম্ করত, কল্পনা করা যায় না। তুমি কল্পনা করতে পার?'

স্বপ্নাতুর চক্ষে চাহিয়া অরুণা বলিল—'পারি।'

গিরধর আসিয়া জানাইল, সামান্ যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে, এখন মালিক ও মাল্‌কিণী গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন। সুবীর ও অরুণা ঢালু বালির পাড় আরোহণ করিয়া একেবারে দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হইল। বারান্দাটি প্রশস্ত, তাহার প্রান্ত হইতে ঘরের সারি আরম্ভ হইয়াছে; কক্ষের পর কক্ষ, অসংখ্য কক্ষ। কোনোটি আকারে আয়তনে সভাগৃহের ন্যায় বৃহৎ, কোনোটি কোটরাকৃতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সব মিলিয়া একটি বিশাল মধুচক্র বলিয়া ভ্রম হয়।

অট্টালিকার নিম্নতল হইতে পাথরের সিঁড়ি বিবর-নির্গত অজগরের মত দ্বিতলের

banglabooks.in

বারান্দায় উঠিয়াছে। তারপর পাক খাইয়া ত্রিতলের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

গিরধর সিং বলিল, 'আপনাদের মহল তিনতলায়। আসুন।'

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা কোথায় থাকো?'

গিরধর সোপান-গহ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—'নীচে দুটো ঘর পরিষ্কার করে নিয়েছি, সেখানে থাকি। রান্নাঘরও সেখানেই। ভারি চমৎকার জায়গা হুজুর। ঠাণ্ডা নেই, গরম নেই; একটু অন্ধকার, এই যা।'

সুবীর বলিল- 'আর অফিস কোথায়?'

গিরধর বলিল—'ঐ যে ওদিকের ঘরগুলো, ওখানে অফিস।'

সুবীর একটা বড় ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, অনেকগুলো টেবিল রহিয়াছে; টেবিলের উপর নানা আকৃতির পাথরের টুক্‌রো। অফিসের স্বাভাবিক সরঞ্জাম, কাগজপত্র, টাইপ-রাইটার, কিছুই নাই।

সুবীর বলিল—'চল, এবার আমাদের মহল দেখি।'

ত্রিতলটা চন্দ্রশালা, অর্থাৎ চিলেকোঠা। পাশাপাশি তিনটি ঘর; বাকি ছাদ উন্মুক্ত, মাঠ ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত। ছাদ ঘিরিয়া পাথরের কারুকর্মখচিত আলিসা। মেঝের উপর বালুকার পুরু পলি পড়িয়াছে।

ঘর তিনটি কিন্তু পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, ধুলোবালির চিহ্ন নাই। মাঝের ঘরে একটি বড় খাট, এক পাশের ঘরে একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার দিয়া বৈঠকের আকারে সাজানো হইয়াছে; অন্য পাশের ঘরে স্নানাদির ব্যবস্থা। বিরাজবাবু প্রস্থ-লোকবাসী হইলেও বর্ত-মানকালের শ্যালক ও শ্যালবধূর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ভালই করিয়াছেন।

এই ঘরগুলির একটা অসুবিধা, দ্বারের কপাট নাই। পূর্বকালে নিশ্চয় কাঠের কপাট চৌকাঠ সবই ছিল, এখন ঘুণ-চর্বিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যাহোক, বিরাজবাবু দ্বারে পর্দা টাঙাইয়া দিয়া যথাসম্ভব আব্রু রক্ষা করিয়াছেন।

গিরধর সিং বলিল—'হুজুর, আপনারা আরাম করুন, আমি চায় নিয়ে আসি।'

গিরধর সিং চলিয়া গেল। সুবীর ও অরুণা ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সুবীরের মুখে চোখে নূতনত্বের ঔৎসুক্য, অরুণার চোখে অবাস্তবের কুহক। সুবীর বলিল—'কেমন লাগছে?'

অরুণা অস্ফুট আত্মগত স্বরে বলিল—'এসব আসবাব এখানে কেন!'

সুবীর চকিত হইয়া বলিল—'সেকালের বাড়িতে একালের আসবাব বেমানান্ ঠেকছে—না! কিন্তু উপায় কি? গজদন্ত পালঙ্ক অস্নেহদীপিকা সুবর্ণভৃঙ্গার, এসব কোথায় পাওয়া যাবে!'

গিরধর সিং একটি বড় থালার উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া উপস্থিত হইল। দু'টি পাথরের বাটিতে মশলাদার চা; সঙ্গে ডালের ভাজিয়া, ঝাল মটর, পাঁপড় ভাজা ইত্যাদি টুকিটাকি খাবার। দু'জনেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহারা সাগ্রহে খাইতে বসিল।

চায়ের স্বাদ ঠিক স্বাভাবিক চায়ের মত নয়, তবু মন্দ লাগিল না। ভাজাভুজিতে ঝাল একটু বেশী, কিন্তু অত্যন্ত মুখরোচক। দু'জনে হুস্‌হাস্ করিতে করিতে সব খাইয়া ফেলিল। তারপর ঘরের বাহিরে ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইল।

প্রাসাদের পিছন দিকে বালুপ্রান্তরের পরপারে সূর্য অস্ত যাইতেছে। আতপ্ত বাতাসের গায়ে একটু শৈত্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। দু'জনে আলিসার পাশ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পশ্চিম দিকে গিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা আয়ত চক্ষু মেলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। সুবীর নীচের দিকে উঁকি মারিল। শ' হাত নীচে অলগ্না বালির ঢালু বাঁধ প্রাসাদের নিতম্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সে বলিল—'চারিদিকে বালির সমুদ্র, মাঝখানে এই প্রাসাদ যেন একটি পাথরের দ্বীপ।'

অরুণা উত্তর দিল না, একাগ্র চক্ষে অস্তমান সূর্যের পানে চাহিয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গেল। নিম্নে বালুর উপর ঈষৎ আলোড়ন তুলিয়া শুষ্ক শীতল বায়ু

banglabooks.in

তাহাদের মুখে আসিয়া লাগিল। অরুণা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। সুবীর কাছে আসিয়া তাহার স্কন্ধ জড়াইয়া লইল, বলিল—'ঠাণ্ডা লাগছে! চল, ঘরে যাই। ভারি মজার দেশ রাজস্থান; দিনে গ্রীষ্মকাল, আবার সূর্যাস্ত হতে না হতেই শীতকাল।'

দুজনে ঘরে ফিরিয়া গেল। সুবীর লক্ষ্য করিল না, অরুণার চোখে শঙ্কা-ছোঁয়া উত্তেজনা। সে যে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল শীতল বায়ুর স্পর্শ নয়, তাহার মনেও যেন কোন্ অভাবনীয় ভবিতব্যতার স্পর্শ লাগিয়াছে।

ঘরে একটি অর্ধ-গোলাকৃতি গবাক্ষ আছে, বর্তমানে তাহার উপর পর্দা ঢাকা। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে সুবীর ও অরুণা দুইটি চেয়ারে পাশাপাশি বসিল; সুবীর অরুণার একটা হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল—'নতুন জায়গায় এসে তোমার বেশ ভাল লাগছে?'

অরুণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'ভাল লাগছে। আবার একটু ভয়-ভয় করছে।'

সুবীর অনুভব করিল, অরুণার হাতের আঙুলগুলি ঠাণ্ডা, সে আঙুলের সহিত আঙুল জড়াইয়া লইয়া বলিল—'ভয়ের কী আছে। বাড়িটা মান্ধাতার আমলের, লোকজনও বেশী নেই, তাই একটু ভূতুড়ে-ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। দু'দিন থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

অরুণা দ্বিধাভরে বলিল—'হ্যাঁ।'

দ্বারের কাছে আলো দেখা গেল। রুক্মিণী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি রেকাবির উপর কয়েকটি জ্বলন্ত মোমবাতি। এই দীপান্বিতা রমণীকে দেখিয়া সুবীরের চোখে একটা বিভ্রম জন্মিল; রুক্মিণী যেন বর্তমানকালের মেয়ে নয়, তাহার বেশভূষা স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী সবই যেন সুদূর অতীতের স্পর্শবহ। রুক্মিণী সুন্দরী নয়, যুবতীও নয়। তাহার বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে, তামাটে গৌরবর্ণ দেহে কঠিন স্বাস্থ্য, নথ-পরা মুখখানিতে আভিজাত্যের দীপ্তি। প্রকৃতির বিচিত্র বিধানে রাজস্থানের উচ্চ নীচ সকল জাতির মেয়ের দেহে রাজকন্যাসুলভ মর্যাদা রহিয়া গিয়াছে।

রুক্মিণীর হাসিটা মিষ্ট, কণ্ঠস্বরও বিনম্র। একটি মোমবাতি টেবিলের উপর রাখিয়া সে অরুণার পানে চোখ তুলিল, ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলিল—'বাঈ, সব ঘরে বাতি দিয়ে আসি?'

অরুণা বলিল—'এস।' অরুণার বাপের বাড়ি বিহার প্রদেশে, সেও অল্পবিস্তর হিন্দী বলিতে পারে।

রুক্মিণী চলিয়া গেল; অন্য ঘর দুটোতে বাতি দিয়া আসিয়া অরুণার পাশে দাঁড়াইল—'বাঈ, এবার তোমার চুল বেঁধে দিই?'

অরুণা তাহার পানে স্মিত মুখ ফিরাইল, নিজের চুলে একবার আঙুল বুলাইয়া বলিল—'আজ থাক। আজ শুধু মুখ-হাত ধুয়ে নেব।'

'আচ্ছা। আমি তাহলে যাই, রসুই করতে হবে।'

'যাও।'

রুক্মিণী অরুণার প্রতি একটি সুস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। সুবীর বলিল—'রুক্মিণীর দেখছি তোমাকে ভাল লেগেছে।'

অরুণা একটু অন্যমনস্ক হাসিল।

দু'জনে মোমবাতির আলোয় নীরবে বসিয়া রহিল। অরুণার দিকে চাহিয়া সুবীরের মনে হইল, এই অস্পষ্ট আলোতে অরুণা যেন আরও অবাস্তব হইয়া গিয়াছে।

নীচে জীপের শব্দ হইল। বিরাজবাবু ফিরিয়াছেন। অরুণা উঠিয়া পড়িল। স্যুটকেস হইতে কাপড়, জামা, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিরাজবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে এক মুঠি ধূপের কাঠি। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'কি হে, কেমন অট্টালিকা? শ্যালবধূ কোথায়?'

সুবীর বলিল—'বাথরুমে গেছে। চমৎকার অট্টালিকা! আপনি কোথায় শোবেন?'

বিরাজবাবু বলিলেন—'ভয় নেই, আড়ি পাতব না। আমার শয়নকক্ষ দোতলায়।—স্টেশনে এক আঁটি ধূপকাঠি কিনেছিলাম, জীপেই পড়ে ছিল।' বলিয়া তিনি কয়েকটা

banglabooks.in

ধূপ জ্বালিয়া দিয়া চেয়ারে বসিলেন—'এ ঘরগুলোতে ধূপ-ধুনো দেওয়া দরকার, অনেক দিন শূন্য পড়ে আছে।'

ধীরে ধীরে ঘরটি ধূপের গন্ধে ভরিয়া উঠিল।

সুবীর বলিল—'চা খাবেন না?'

বিরাজবাবু বলিলেন—'তাঁবু থেকে চা খেয়ে এসেছি। এখানে কেবল রাত্রে ভোজন এবং শয়ন। তারপর সূর্যোদয়ের আগেই প্রস্থান।'

সুবীর বলিল—'এখানকার জল-হাওয়া খুব ভাল—না?'

বিরাজবাবু সোৎসাহে বলিলেন—'মরুভূমির মত জায়গা আছে! রোগের বীজাণু এখানে টিকতে পারে না, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। তাছাড়া এমন রাত্রি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এ দেশটা রাজস্থানের অন্তর্গত হলেও আসলে মালব দেশ। মুসলমানেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে ওরা লক্ষ্য করেছিল, অযোধ্যার সন্ধ্যা, রাজোয়াড়ার সকাল আর মালবের রাত্রি জগতে অতুলনীয়। মুসলমানী ভাষায় বয়েৎ আছে।'

মালবের রাত্রি! বাক্যটির রোমান্টিক স্বাদ সুবীর মনে মনে গ্রহণ করিতেছে এমন সময় অরুণা শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে স্নিগ্ধ-শিখা মোমবাতি। সুবীরের মাথায় কবিতা গুঞ্জরিয়া উঠিল—হেন কালে হাতে দীপশিখা, ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা!

প্রবেশ করিয়াই অরুণা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, চকিত কটাক্ষে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—'কেয়া ফুলের গন্ধ!'

বিরাজবাবু হাসিয়া উঠিলেন—'কেয়া ফুল নয়, অম্বুরী ধূপের গন্ধ। কেয়া ফুল এদেশে কোথায়! তাছাড়া এটা কেয়া ফুলের সময় নয়।—এস শ্যালবধূ।'

দ্বিধামন্থর পদে অরুণা আসিয়া টেবিলের উপর মোমবাতি রাখিল, একটু অপ্রতিভ হাসিয়া বিরাজবাবুর পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার মনের মধ্যে যেন বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সুবীরের মনে উদ্বিগ্ন বিস্ময় পাক খাইতে লাগিল—অরুণা বার বার কেয়া ফুলের গন্ধ পাইতেছে! কী ব্যাপার?

বিরাজবাবু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটু বেশী কথা বলেন, কিন্তু কথাগুলি নীরস নয়। নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা মিশাইয়া দুই ঘণ্টাকাল কাটাইয়া দিলেন।

গিরধর ও রুক্মিণী রাত্রির আহার লইয়া আসিল। আহার্য দ্রব্যগুলি টেবিলে রাখিয়া গিরধর আরও কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়া দিল। তিনজনে টেবিলের ধারে চেয়ার টানিয়া খাইতে বসিলেন।

খাদ্যবস্তু সংখ্যায় এবং পরিমাণে প্রচুর। শাক-সবজিই বেশী, তার সঙ্গে ঘৃতপক্ক অন্ন ও চাপাতি, অল্প মাংস, মালাই এবং বরফি।

খাইতে খাইতে সুবীর বলিল—'এই মরুভূমির মাঝখানে তাজা শাক-সবজি পান কোত্থেকে?'

বিরাজবাবু বলিলেন—'মাইল দুই দূরে আভীরদের একটা গ্রাম আছে, তারাই দুধ আর শাক-সবজি যোগায়। মাঝে মাঝে ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না। মরুভূমিতে জল কোথায় যে মাছ আসবে!'

সুবীর জলের গেলাসে চুমুক দিয়া বলিল—'ভারি সুস্বাদু জল। এ জল কোথায় পান?'

বিরাজবাবু বলিলেন—'নীচের তলায় একটা ঘরের মেঝেয় ইঁদারা আছে। সেই দু'-হাজার বছরের পুরনো ইঁদারা! কিন্তু কী জল! বরফের মত ঠাণ্ডা, শরবতের মত মিষ্টি।'

অরুণা পুরুষদের বাক্যালাপে যোগ দিল না, একটু নিঝুম ভাবে আহার করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বিরাজবাবু বলিলেন, 'শ্যালবৌ, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, শুয়ে

banglabooks.in

পড়ে গিয়ে, আমরা আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। কাল ভোরেই আমি চলে যাব, হয়তো দু'তিন দিন আসতে পারব না।'

অরুণা একটু ঘাড় হেলাইয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। তারপর দু'জনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করিতে করিতে ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। বিরাজবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন—'বৌকে কিছু বোলো না, কিন্তু গিরধরের মুখে শুনেছি এ বাড়িতে নাকি আছে।'

'কী আছে—ভূত-প্রেত! আপনি বিশ্বাস করেন?'

বিরাজবাবু হাসিলেন—'আমি বিজ্ঞানী, যার প্রমাণ পেয়েছি তা বিশ্বাস না করে উপায় কি? বিজ্ঞানী আর অ-বিজ্ঞানীর মধ্যে ঐখানেই তফাত, বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলে বিশ্বাস করে, অ-বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস করে না, উল্টে নানা রকম কু-ব্যাখ্যা শুরু করে দেয়।'

'আপনি তাহলে প্রমাণ পেয়েছেন?'

'দ্যাখো, ভূত-কাল নিয়েই আমার কারবার। ভূত-কালের সন্ধানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এমন কিছু পেয়েছি যাকে বাস্তব বলা যায় না। সে গল্প আর-একদিন বলব। তবে এ বাড়িতে আমি নিজে কিছু প্রত্যক্ষ করিনি। যা শুনেছি চাকর-বাকরের মুখে।'

'ওরা কী বলে?'

'ওরা বলে একটা আত্মা আছে। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়, তাজা ফুলের গন্ধ চারিদিকে ভুর্ ভুর্ করতে থাকে—।

সুবীর চমকিয়া বলিল—'কোন্ ফুল! কেয়া?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন—'তা জানি না। আজ তোমার বৌ কেয়ার গন্ধ পেয়েছিল...তাই তো, এটা আমার খেয়াল হয়নি—'

সুবীর বলিল—'অরুণার এই দুর্ঘটনা হবার পর থেকে সে তিনবার কেয়া ফুলের গন্ধ পেয়েছে; কোথাও কেয়া ফুল নেই, তবু গন্ধ পেয়েছে। এর মানে আপনি বলতে পারেন?' বলিয়া সুবীর মোটর দুর্ঘটনার পর হইতে ব্যাপার বিবৃত করিল।

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'এখানে আসার আগে যদি গন্ধ পেয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক কাণ্ড না হতেও পারে। হয়তো মাথায় চোট লাগার ফলে olfactory nerves বিগড়ে গিয়েছে। স্নায়ু বড় বিচিত্র যন্ত্র। যা হোক, ভাবনার কিছু নেই, আস্তে আস্তে normal হয়ে যাবে।'

তারপর, রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া তিনি ত্রিতলে শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। সুবীর শয়নকক্ষে যাইবার আগে একবার বহির্দ্বারের পর্দা সরাইয়া ছাদের দিকে উঁকি মারিল। বাহিরে মধুর শীতলতা; চাঁদ আকাশের মাঝখানে উঠিয়াছে, বালু-ঢাকা প্রকাণ্ড ছাদ চন্দ্রকিরণে কিংখাবের মত ঝিকমিক করিতেছে। তন্দ্রাজড়িত স্বপ্নসমাকুল দৃশ্য। মালবের রাত্রি। সুবীর একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। অরুণা যদি সুস্থ থাকিত, দু'জনে মিলিয়া তাহারা মালবের এই অপরূপ রাত্রি উপভোগ করিতে পারিত।

সুবীর শয়নকক্ষে গেল। বৃহৎ কক্ষের মাঝখানে বিস্তীর্ণ পালঙ্ক, অরুণা শয্যার এক পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুবীর পালঙ্কের পাশে ঝুঁকিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—'অরুণা!'

অরুণা জাগিল না। তাহার দেহ এমন শিথিল ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে যে মনে হয়, শুধু ঘুম নয়, ঘুমের চেয়েও দুরবগাহ অবচেতনার মধ্যে তাহার সংজ্ঞা ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ শঙ্কিত হইয়া সুবীর তাহার বুকের উপর করতল রাখিল। না, হৃৎস্পন্দন মন্থর বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সচল আছে। সুবীর সযত্নে অরুণার গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিল, অপলক চক্ষে তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মাথার শিয়রে নিঃশেষিত মোমবাতিটা নিব-নিব হইয়া আসিয়াছিল, নির্বাপিত হইবার পূর্বে দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল। সুবীর তখন সন্তর্পণে অরুণার পাশে শয়ন করিল।

পরদিন সকাল হইতে তাহার প্রকৃত প্রবাস-জীবন আরম্ভ হইল। নির্জন প্রবাসে জীবন-যাত্রার সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। পরিচিত মানুষের অভাব কখনও সুবিধা কখনও

banglabooks.in

অসুবিধা বলিয়া মনে হয়। কাজকর্ম নাই, খবরের কাগজ নাই, এরূপ অবস্থা কাহারও পক্ষে সুখকর, কাহারও পক্ষে অসুখকর। কিন্তু যেখানে দু'টি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের বন্ধন আছে সেখানে প্রবাসের নির্জনতা মধুময় হইয়া ওঠে।

সুবীরের মন এই নিবিড় রসানুভূতির জন্য উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু অরুণার দিক হইতে তাহার প্রতিফলন আসিল না। বরং মনে হইল অরুণা সুবীরকে এড়াইয়া চলিতেছে। একসঙ্গে ওঠাবসা করিয়াও দু'জন মানুষ মনে মনে পরস্পরকে এড়াইয়া চলিতে পারে। অরুণা স্বভাবত সরল ও সিধা প্রকৃতির মেয়ে; কিন্তু এখন দেখা গেল অরুণার চোখে গোপনতার কটাক্ষ, সে যেন সুবীরের নিকট হইতে নিজের মানসিক অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার মনের মধ্যে এমন কিছু ঘটিতেছে যাহা সে সুবীরকে জানিতে দিতে চায় না।

রুক্‌মিণী প্রথম দর্শনেই অরুণাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সে নিজের কাজ হইতে ছুটি পাইলেই উপরে আসিয়া অরুণার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। অযাচিত ভাবে তাহার সেবা করে, চুলে তেল মাখাইয়া চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়, আর অনর্গল গল্প করে। অরুণাও তাহার সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। মেয়েদের ঐ একটি গুণ আছে, তাহারা উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল জাতের মেয়ের সঙ্গে মিশিতে পারে। পুরুষের সে গুণ নাই, থাকিলে সুবীরের ভারি সুবিধা হইত, গিরধর সিংএর সঙ্গে গল্প জমাইয়া সময় কাটাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে যেন একটু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে যে-কয়টা বই আনিয়াছে তাহা মাঝে মাঝে খুলিয়া বসে। কিন্তু বই-এ মন বসে না। তখন সে উঠিয়া প্রাসাদের দ্বিতলে অগণিত কক্ষগুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘরগুলি পরিষ্কৃত নয়; কোথাও দেওয়াল হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ছাদের কোণে চামচিক বাসা বাঁধিয়াছে। সব মিলিয়া পরিত্যক্ত লোকালয়ের প্রাণহীন কঙ্কালসার শুষ্কতা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সুবীর ত্রিতলের খোলা ছাদে একাকী পরিক্রমণ করিতেছিল। আলিসার কিনারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে ভূত-প্রেতের চিন্তাও তাহার মনে আসিতেছিল। বিরাজবাবু বৈজ্ঞানিক হইলেও অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করেন। এ বাড়িটাতে বাজনার শব্দ শোনা যায়, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়; হয়তো কিছু আছে। হানা-বাড়ির কত গল্পই তো শোনা যায়, সবই কি মিথ্যা? এই বাড়িটা দু'হাজার বছর ধরিয়া মরুভূমির মাঝখানে পড়িয়া আছে; হয়তো জীবিত অবস্থায় যাহারা এখানে বাস করিত তাহাদেরই কেহ বাড়ির মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই, দু'হাজার বছর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে কে জানে। এই রাজস্থানেই নাকি কোথায় একটা রাজপ্রাসাদ আছে, সেখানে রাত্রিকালে প্রেতাত্মা 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।—

আজও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। ঠান্ডা বাতাসে সুবীরের গা শীত-শীত করিয়া উঠিল। সে ঘরে ফিরিয়া গেল।

বসিবার ঘরে কেহ নাই, কিন্তু শয়নকক্ষ হইতে রুক্‌মিণীর কলকণ্ঠ আসিতেছে। সুবীর শয়নকক্ষের পর্দা সরাইয়া দেখিল, সেখানে দু'টি মানুষের মজলিশ্ বসিয়া গিয়াছে। মেঝেয় পাটি পাতিয়া অরুণা ও রুক্‌মিণী মুখোমুখি বসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে একটি আগুনের ছোট আংটা; রুক্‌মিণী খোসাসুদ্ধ চীনাবাদাম আগুনে ঝল্‌সাইয়া খোসা ছাড়াইয়া অরুণাকে দিতেছে, অরুণা পরম সুখে নুন ও লঙ্কার গুঁড়া মাখাইয়া খাইতেছে।

সুবীরকে দ্বারের কাছে দেখিয়া রুক্‌মিণীর বাক্যস্রোত সংহত হইল, অরুণাও মুখ তুলিয়া চাহিল। সুবীর তাহাদের কাছে আসিয়া বসিল, হাসিমুখে বলিল—'কি গল্প হচ্ছে? আমিও গল্প শুনতে এলাম।'

অরুণা একটু বিব্রত হইয়া বলিল—'মেয়েলি গল্প কি তোমার ভাল লাগবে।'

সুবীর বলিল—'ভাল না লাগে উঠে যাব। অন্তত চীনেবাদাম ভাজা তো ভাল লাগবে।' সে কয়েক দানা চীনাবাদাম মুখে দিয়া বলিল—'আচ্ছা রুক্‌মিণী, তোমরা এ বাড়িতে ফুলের

banglabooks.in

গন্ধ পেয়েছ?'

সুবীরের আগমনে রুক্মিণী একটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল—'জি মালিক, পেয়েছি। তাছাড়া গভীর রাত্রে বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়, সিতারের আওয়াজ শোনা যায়।'

'কোন্ ফুলের গন্ধ পেয়েছ- -আতর গুলাব ধূপ-ধুনোর গন্ধ নয়?'

'জি না, তাজা ফুলের গন্ধ। জাই জুঁহি চম্পা—এই সব।'

'কেয়া ফুলের গন্ধ কখনো পেয়েছ?'

অরুণা সুবীরের প্রতি একবার চকিত ভ্রূক্ষেপ করিল। রুক্মিণী উৎসুক স্বরে বলিল—'কেওড়া ফুলের গন্ধ! না বাবুজি, কেওড়া ফুলের গন্ধ কেমন হয় আমি জানি না, কেওড়া ফুল কখনো দেখিনি। তবে কেওড়া ফুলের গল্প জানি।'

'কেওড়া ফুলের গল্প!'

'হ্যাঁ বাবুজি, ভারি চমৎকার গল্প। আমি আমার দাদি'র কাছে শুনেছিলাম. আমার দাদি আবার তার দাদি'র কাছে শুনেছিল। বহুকাল ধরে এ-গল্প চলে আসছে। এই মহল নিয়েই গল্প।'

'তাই নাকি! কী গল্প বল তো শুনি।'

তখন রুক্মিণী চীনাবাদাম পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প আরম্ভ করিল—

'অনেক অনেক দিন আগে এখানে একটি রাজা ছিল। মরুভূমির কিনারের রাজ্য; ছোট রাজ্য হলেও বড় সুখের রাজ্য। শত্রুর উৎপাত নেই, অন্নাভাব নেই, মারী-মহামারী নেই; প্রজারা অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে মনের আনন্দে বাস করে।

'রাজার নাম বিজয়কেতু। তরুণ রাজা, সম্প্রতি দাক্ষিণ দেশের এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন। অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা; যেমন তাঁর রূপ, তেমনি মধুর স্বভাব। নাম অরুণাবতী।'

সুবীর চমকিয়া প্রশ্ন করিল—'কি নাম বললে?'

রুক্মিণী বলিল—'অরুণাবতী। এ গল্পের নাম রানী অরুণাবতীর গল্প।'

সুবীর ও অরুণা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিল. তারপর অরুণা চক্ষু সরাইয়া লইল। সুবীর বলিল—'আচ্ছা, তারপর বল—'

রুক্মিণী বলিতে লাগিল।—

রাজা আর রানীর মধ্যে গভীর ভালবাসা; কেউ কাউকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারেন না। রাজা যখন সভায় বসে মন্ত্রিদের সঙ্গে রাজকার্য করেন, রানী তখন অলিন্দ থেকে উঁকি মেরে দেখে যান। রাজাও রাজকার্য করতে করতে হঠাৎ উঠে গিয়ে রানীকে দেখে আসেন। রাজা আর রানী যেন জোড়ের পায়রা।

রানীর মনে কিন্তু একটি দুঃখ আছে। তাঁর বাপের বাড়ির দেশে যেমন ঋতুতে ঋতুতে নতুন ফুল ফোটে—বসন্তে অশোক নবমল্লিকা জাতী যূথী, গ্রীষ্মে চম্পক বকুল পিয়াল, বর্ষায় গোকর্ণ কদম্ব কেতকী—এদেশে তেমন ফুল ফোটে না।

একদিন সায়াহ্নে রাজা-রানী চন্দ্রশালিকার বিস্তীর্ণ ছাদে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিলেন, দেখলেন পশ্চিমের আকাশে মেঘ উঠেছে। দু'জনের মনে খুব আহ্লাদ হল। এদেশে বৃষ্টি কম, মেঘ বেশী আসে না। রানী কাজল-কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন—'রাজা, অনেক দিন কেতকী ফুলের গন্ধ পাইনি। এদেশে কি কেয়া ফুল পাওয়া যায় না?'

বিজয়কেতু বলিলেন—'না। পশ্চিমে লাট দেশ, সেখানে বনেজঙ্গলে কেয়া ফুল ফুটে থাকে, গ্রামের লোকেরা কেয়ার ঝাড় দিয়ে ঘরের বেড়া বাঁধে।'

অরুণাবতী কুতূহলী হয়ে বললেন—'লাট দেশ! সে কত দূর?'

বিজয়কেতু বললেন—'ঘোড়ার পিঠে দুই-তিন দিনের পথ।'

রানী অরুণাবতী তখন রাজার বুকের ওপর দু'হাত রেখে পরম আগ্রহভরে বললেন—'রাজা, লাট দেশ থেকে আমাকে কেয়া ফুল আনিয়ে দাও। কেয়া ফুলের জন্যে আমার মন

banglabooks.in

বড় ব্যাকুল হয়েছে।'

রাজা বিজয়কেতু বললেন—'এ আর বেশী কথা কি! আমি নিজে গিয়ে তোমার জন্যে কেয়া ফুল তুলে নিয়ে আসব।'

অরুণাবতী একটু শঙ্কিত হলেন—'তুমি নিজে যাবে?'

বিজয়কেতু বললেন—'কাল সকালেই যাত্রা করব। তিন-চার দিনের মধ্যে তোমার কেয়া ফুল নিয়ে ফিরে আসব।'

রানী কিছুক্ষণ রাজার বুকের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর হাসিমুখ তুলে বললেন—'বেশ, তুমি যতদিন না ফিরে আসবে আমি ততদিন রোজ পাঁচ ফোঁটা মধু খাব, আর কিছু খাব না।'

রাজা বললেন—'আর কিছু খাবে না কেন?'

রানী বললেন—'তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

পরদিন ভোরবেলা রাজা ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিমমুখে যাত্রা করলেন। রানী প্রাসাদের চূড়ায় উঠে যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে রইলেন।

তারপর একদিন গেল, দু'দিন গেল। রানী পাঁচ ফোঁটা মধু খেয়ে আছেন। তৃতীয় দিন থেকে রানী আবার ছাদের উপর যাতায়াত আরম্ভ করলেন। শরীর দুর্বল, কিন্তু মন মানে না! ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিমদিকে চেয়ে থাকেন। চতুর্থ দিনও ওইভাবে কাটল। রানীর শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোলে কালি। ছয়দিন কেটে গেল রাজার কিন্তু দেখা নেই। কোথায় গেলেন রাজা! কী হল তাঁর?

রাজা বিজয়কেতু দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা লাট দেশে পৌঁছেছিলেন। সেখানে জঙ্গল থেকে কয়েকটি কেয়া ফুল তুলেছিলেন। তারপর একটি কেয়া ফুল বল্লমের ডগায় গেঁথে নিয়ে নিজ রাজ্যের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছিলেন। ঘোড়া পবনবেগে ঘরের পানে ছুটেছিল।

রাজ্যের সীমানায় ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, এই গিরিসংকট পার হয়ে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। তৃতীয় দিন দুপুরবেলা রাজা গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে চলেছেন, এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক আশপাশের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘিরে ধরল।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—'একি! কে তোমরা?'

তারা বলল—'আমরা যে হই, তুমি আমাদের বন্দী।'

রাজা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে বললেন—'কি, তোমাদের এত স্পর্ধা। জানো, আমি এ রাজ্যের রাজা?'

তারা জয়ধ্বনি করে বলল—'তবে তো ভালই হয়েছে। চল আমাদের সেনাপতির কাছে।'

পাহাড়ের মধ্যে বিদেশী শত্রু ছাউনি ফেলেছে, প্রায় বিশ হাজার সৈন্য। সেনাপতি তখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সৈন্যরা বলল—'তুমি আজ বন্দী থাকো, কাল সেনাপতির সঙ্গে দেখা হবে।'

সৈন্যরা রাজা বিজয়কেতুর কথা বিশ্বাস করেনি, তারা ঠাট্টা তামাসা করতে করতে তাঁকে একটা শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। রাজা জানতেন, উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ শক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, কিন্তু তারা যে এতদূর অগ্রসর হয়েছে তা তিনি জানতে পারেননি।

পরদিন সেনাপতির সঙ্গে দেখা হল না, সেনাপতি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার পরদিন দুপুরবেলা সৈন্যরা রাজাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। সেনাপতির প্রকাণ্ড চেহারা, টকটকে রঙ, বড় বড় চোখ। তিনি রাজাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন—'আপনি সত্যি এদেশের রাজা?'

বিজয়কেতু বললেন—'হ্যাঁ, এই দেখুন আমার অঙ্গুরী, এই দেখুন কবচ।'

সেনাপতি বললেন—'আপনি সত্যিই রাজা। আমরা আপনার রাজ্য জয় করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে যখন ধরেছি তখন আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না। বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয় হয়েছে।'

banglabooks.in

রাজা বললেন—'আমার রাজ্য ক্ষুদ্র, সৈন্যবল সামান্য। এ-রাজ্য জয়ে আপনার গৌরব নেই। তবে কেন এ-রাজ্য জয় করতে চান?'

সেনাপতি বললেন –'রাজস্থান বীরভূমি। মাটির গুণে মানুষ বীর হয়, মাটির দোষে কাপুরুষ হয়। তাই আমি রাজস্থান জয় করে নিজের রাজ্য স্থাপন করতে চাই।'

'কিন্তু আমাকে বন্দী করে লাভ কী? আপনি যদি আমার রাজ্য আক্রমণ করেন রাজ্যের লোক স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে।'

'না। তারা যখন জানতে পারবে আপনি আমার হাতে বন্দী, তখন আর যুদ্ধ করবে না, আত্মসমর্পণ করবে।'

রাজা চিন্তা করে বললেন--'সেনাপতি, আমাকে একবার আমার প্রাসাদে ফিরে যেতেই হবে। আপনি আমাকে দু'দিনের জন্য মুক্তি দিন, আমি আবার ফিরে এসে স্বেচ্ছায় ধরা দেব।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ রাজার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন—'আপনি যে ফিরে আসবেন তার নিশ্চয়তা কি?'

রাজা সগর্বে বললেন—'আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় কখনো শপথ ভঙ্গ করে না।'

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন—'কিন্তু প্রাসাদে আপনার এত কী প্রয়োজন?'

রাজা বললেন—'আমার পত্নী কেবল কয়েকবিন্দু মধু খেয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তাঁকে দেখা দিয়েই আমি ফিরে আসব।' রাজা কেতকী ফুল আহরণের কাহিনী সেনাপতিকে বললেন।

শুনে সেনাপতি প্রীত হলেন, বললেন—'ভাল। আমি আপনাকে মুক্তি দেব। কিন্তু আজ তো দিন শেষ হয়ে এল। আজ যদি যাত্রা করেন, দিন থাকতে প্রাসাদে পৌঁছুতে পারবেন না। তার চেয়ে কাল সকালে আপনি যাত্রা করবেন। শর্ত রইল পত্নীর সঙ্গে দেখা করেই আপনি ফিরে আসবেন।'

পরদিন প্রত্যূষে রাজা শূলেশীর্ষে কেতকী ফুল গেঁথে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন।

ওদিকে রানীর অবস্থা তখন শোচনীয়। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে শরীর এত দুর্বল হয়েছে যে শয্যা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়, মনের অবস্থা পাগলের মত। এমন সময় বেলা তিন প্রহরে দাসীরা ছুটে এসে খবর দিল---রাজা আসছেন!

রানী পালঙ্ক থেকে নেমে ছাদের পানে ছুটলেন। দাসীরা মানা করল, তিনি শুনলেন না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, তবু মনে হল, অনেক দূরে মাঠের পরপার থেকে একজন অশ্বারোহী ছুটে আসছে।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বারোহী আরো কাছে এলে রানী চিনতে পারলেন, রাজা আসছেন; তাঁর ভল্লের মাথায় একটি কেয়া ফুল উঁচু হয়ে আছে। রাজাও রানীকে প্রাসাদ-শীর্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লমসুদ্ধ হাত তুললেন।

রাণী আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। দু'হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। দাসীরা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু রানীকে ধরতে পারল না; তিনি আলিসা পেরিয়ে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন।

রাজা এসে দেখলেন রানী অরুণাবতীর মৃতদেহ প্রাসাদমূলে পড়ে আছে। তিনি দু'হাতে মৃতদেহ বুকে তুলে নিলেন।

তারপর রানীকে চিতায় তুলে দিয়ে রাজা কেয়া ফুল দিয়ে চিতা সাজিয়ে দিলেন। চিতা জ্বলে উঠল। কেয়া ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।

রাজা আর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন না, ঘোড়ায় চড়ে একলা শক সেনাপতির শিবিরে ফিরে গেলেন। সেনাপতিকে বললেন—'আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আমার রাজ্য আপনি পাবেন না। আসুন, যুদ্ধ করুন।'

শক সেনাপতির সঙ্গে রাজা বিজয়কেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল। যুদ্ধে রাজা বিজয়কেতু মারা পড়লেন। তারপর শক জাতি এসে রাজ্য দখল করল, সেনাপতি রাজপুরী দখল করলেন।

banglabooks.in

অনেক বছর কেটে গেল; মরুভূমি এসে রাজ্য গ্রাস করে নিল। দেশ জনশূন্য হল। প্রাসাদ শূন্য পড়ে রইল।

এই ভাবে কত শতাব্দী কেটে গেছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু এখনো প্রাসাদের বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়, হঠাৎ নিশুতি রাত্রে বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়। যারা শুনেছে তারা বলে, রাজার আর পুনর্জন্ম হয়নি, তাঁর আত্মা এই প্রসাদেই আছে। রানীর জন্ম হয়েছে, তিনি ষাট-সত্তর বছর অন্তর দেহ ত্যাগ করে আসেন, রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। তারপর আবার তিনি চলে যান, রাজা প্রতীক্ষা করে থাকেন।

এই হচ্ছে রাজা বিজয়কেতু আর রানী অরুণাবতীর গল্প।—

গল্প শেষ করিয়া রুক্মিণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার এখনও অর্ধেক রান্না বাকি।

সুবীর দেখিল, অরুণা আচ্ছন্ন অভিভূতের মত বসিয়া আছে। তারপরই অরুণা চমকিয়া সুবীরের পানে চোখ তুলিল, মুখে ছদ্ম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—'আষাঢ়ে গল্প—না?'

সুবীর বলিল—'একেবারে আষাঢ়ে গল্প নাও হতে পারে। মূলে হয়তো একটু সত্যি আছে।'

অরুণা আর কিছু বলিল না। তাহার মুখের উপর রহস্যের পর্দা নামিয়া আসিল। তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে সুবীর তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে না পারিলেও তাহার মনও অশান্ত হইয়া উঠিল। এ কোন্ অদৃশ্য কুহক জালে তাহারা জড়াইয়া পড়িতেছে! যে সন্দেহটা সুবীর জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল তাহা এইঃ অরুণা কি নিজেকে জন্মান্তরের রানী অরুণবতী মনে করিতেছে এবং মনে মনে বিদেহাত্মা রাজা বিজয়কেতুর উদ্দেশ্যে অভিসারযাত্রার জন্য উৎসুক হইয়াছে? অসুস্থ শরীরে মনও অসুস্থ হয়। ইহা কি সেই অসুস্থতার লক্ষণ?

কিন্তু যাহাই হোক, গল্পের রানীর অরুণাবতী নাম আশ্চর্য রকমের সমাপতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে রাত্রে অরুণা 'ক্ষিদে নেই' বলিয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেল। সুবীর যথাসময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল অরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুবীর তাহাকে জাগাইল না, অস্বচ্ছন্দ মন লইয়া কিছুক্ষণ খাটের চারিপাশে পায়চারি করিল, তারপর শয়ন করিল।

গভীর রাত্রে সুবীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দূর হইতে যেন বীণাযন্ত্রের অস্ফুট মূর্ছনা আসিতেছে। সুবীরের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। ঘরে আলো নাই, মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সুবীর পাশের দিকে অনুভব করিল, অরুণা শয্যায় নাই।

বালিশের পাশে সুবীর একটা বৈদ্যুতিক টর্চ রাখে, সেটা জ্বালিয়া দেখিল শয্যা শূন্য। ঘরের চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিল, ঘরেও অরুণা নাই। দূরাগত বীণাধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল।

সুবীর স্নায়ুপেশী শক্ত করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু অরুণা আসিল না। তখন সে উঠিয়া গায়ে চাদর জড়াইয়া লইল, টর্চ জ্বালিতে জ্বালিতে অন্য ঘর দুটা দেখিল। সেখানেও অরুণা নাই।

দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া সুবীর ঘরের বাহিরে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিম আকাশে প্রায় পূর্ণাঙ্গ চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশ এবং মরুভূমিতে চাঁদের কিরণ যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বরফের কাঁটার মত সুবীরের গায়ে বিঁধিল।

বিশাল ছাদ চন্দ্রকুহেলিতে ঝিমঝিম করিতেছে; সুবীর চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু অরুণাকে দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল রহিল। কোথায় গেল অরুণা? এই নির্জন পুরীতে গভীর রাত্রে একাকিনী কোথায় গেল? তবে কি নীচে গিয়াছে! কেন? তাহাকে না জাগাইয়া একাকিনী নীচের তলায় যাইবে কেন?...নিশির ডাক?

banglabooks.in

...না, না, এ সব কী অবিশ্বাস্য কথা সে ভাবিতেছে! আজ সন্ধ্যাবেলা যে গল্প তাহারা শুনিয়াছে, এ সব তাহারই অনুরণন। অরুণা নিশ্চয় কাছেই কোথাও আছে—

সে গলা চড়াইয়া ডাকিল—'অরুণা!'

সাড়া নাই। কেবল ঠাণ্ডা বাতাস তাহার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সুবীর নিজের মনকে দৃঢ় শাসনে রাখিয়াছিল। এইবার তাহার সংযমের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সে ছুটিয়া আলিসার কাছে গিয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিল, তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সারা ছাদ পরিক্রমণ করিল। না, অরুণা ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যায় নাই। তবে সে কোথায়?

সুবীর ক্ষণকাল মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। শয়নকক্ষটা ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, হয়তো অরুণা ঘুমের ঘোরে খাটের পাশে পড়িয়া গিয়াছে!

অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে কেয়া ফুলের গন্ধ ভর্‌ভর্‌ করিতেছে। স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া সুবীর ভাবিল —কেয়া ফুলের গন্ধ তবে মিথ্যা নয়, রোগ-বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। অতিপ্রাকৃত যতদূর প্রাকৃত হইতে পারে কেয়া ফুলের গন্ধ তাই। বীণাধ্বনিও তাই। এক সূক্ষ্ম জগতের অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে।

সুবীর টর্চ জ্বালিল। বিছানার এক পাশে অরুণা শুইয়া আছে। তাহার বেশবাস বিস্রস্ত, চুল এলোমেলো; সে গভীর ক্লান্তির ঘুম ঘুমাইতেছে। সুবীরের সংশয় জাগিল, তবে কি অরুণা সারাক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছিল! কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়া সুবীর শয্যাশিয়রে রাখিল, তারপর শয্যায় উঠিয়া অরুণার পাশে বসিল। তাহার নিদ্রাশিথিল মুখের পানে চাহিয়া সুবীরের হৃদয়ে একটি বাষ্পীভূত স্নেহের উচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত উদ্‌গত হইয়া উঠিল। সে দুই বাহু দিয়া নিবিড়ভাবে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া রুদ্ধস্বরে ডাকিল—'অরুণা! অরুণা!'

অরুণার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না; তাহার শ্লথ অঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া নাই। ক্লান্ত শিশুর মত সে ঘুমাইয়া রহিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুবীর তাহাকে ছাড়িয়া দিল, তারপর আলো নিভাইয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া শয়ন করিল। সে লক্ষ্য করিল, কেতকীর গন্ধ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বিলীন হইয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে সুবীর অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?'

অরুণার চোখে সদ্য ঘুম ভাঙার জড়িমা; সে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'কোথায় গিয়েছিলুম! যাইনি তো কোথাও।'

সুবীর বলিল—'গিয়েছিলে। দুপুর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি তুমি বিছানায় নেই।'

অন্তর্লীন কণ্ঠে অরুণা বলিল—'কি জানি—মনে পড়ে না—' সুবীর দেখিল অরুণার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। সে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অরুণা নত নেত্র তুলিয়া সুবীরের পানে চাহিল; চোখে শঙ্কা ও গোপন উত্তেজনা। সে জড়ানো গলায় বলিল—'ঘুমের ঘোরে কি করেছি মনে পড়ছে না।' তাহার মুখের উপর অদৃশ্য মুখোশের আবরণ পড়িয়া গেল।

বাহিরের ঘর হইতে চায়ের সরঞ্জামের ঠুং ঠাং শব্দ আসিল, গিরধর প্রাতঃকালীন চা আনিয়াছে। সুবীর উঠিয়া পড়িল। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে কাল রাত্রির কথা অরুণার মনে পড়িয়াছে, কিন্তু সে তাহা সুবীরের কাছে গোপন করিতে চায়। কী কথা গোপন করিতে চায়? স্বপ্নাভিসার?

দিনটা অবসন্ন আলস্যে কাটিয়া গেল। দু'জনেই শামুকের মত নিজেকে নিজের মধ্যে

banglabooks.in

গুটাইয়া লইয়াছে। সুবীর এইরূপ বিচিত্র পরিস্থিতিতে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। অরুণা একটা অন্তর্গূঢ় মাদকতায় নিমজ্জিত হইয়া আছে। তাহারা যেন দু'টি সচল যন্ত্র, পরস্পরের সহিত কোনও সচেতন সংযোগ নাই, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একত্র বিন্যস্ত হইয়াছে।

সূর্যাস্তের পর রুক্মিণী ছাদের উপর পাটি পাতিয়া অরুণার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধার সঙ্গে মৃদুস্বরে জল্পনা চলিতেছে। সুবীর দূর হইতে দেখিল অরুণার মুখ উৎসুক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তন্দ্রাচ্ছন্ন মাদকবিমূঢ় ভাব আর নাই। সে একটু আশ্বস্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেল। সায়ন্তন জ্যোৎস্নার ম্লান বিজনতায় বালুর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জামাইবাবু আজ যদি আসেন ভাল হয়...এ স্থানটা বিজনবাসের পক্ষে খুবই চমৎকার, কিন্তু...প্রাসাদে কোনও বুভুক্ষু আত্মা অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে...কেয়া ফুলের গন্ধ, বাজনার আওয়াজ, এসব মিথ্যা নয়...অরুণার মানসিক অবস্থা এখানে আসার পর আরও অবোধ্য রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে...তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে তাহা যদি দেখা যাইত ...জামাইবাবু আসিয়া পড়িলে ভাল হয়।...

ঘণ্টাখানেক পরে সুবীর বালির বাঁধ বাহিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। বসিবার ঘরে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বলিতেছে; অরুণা একটি আয়না হাতে লইয়া নিজের মুখ দেখিতেছে। সুবীর চমৎকৃত হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল। অরুণার চুলে নূতন ধরনের কবরী-বন্ধ, মুখে অলকা-তিলক, সীমন্তে একগুচ্ছ মুক্তার ঝুম্কো; তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে একটি অজন্তার ছবি। রুক্মিণী তাহাকে সেকালের ভঙ্গিতে সাজাইয়া দিয়াছে।

সুবীর কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—'বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!'

অরুণা সুবীরকে দেখিতে পায় নাই, ধরা পড়িয়া গিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিল, তারপর ছুটিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

অরুণার লজ্জা যেন অস্বাভাবিক। সুবীর ক্ষণকাল অবাক থাকিয়া শয়নকক্ষে অরুণাকে অনুসরণ করিল। দেখিল, অরুণা শয্যায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছে। খাটের পাশে দাঁড়াইয়া সুবীর হাল্কা সুরে বলিল—'এতে লজ্জার কী আছে? ওঠো, আর একবার ভাল করে দেখি।'

অরুণা কিন্তু মুখ তুলিল না। কিছুক্ষণ সাধাসাধনা করিয়া সুবীর বসিবার ঘরে ফিরিয়া গেল, চেয়ারে বসিয়া চোখের সামনে একটা বই খুলিয়া ধরিল। জীবনটা হঠাৎ অত্যন্ত শুষ্ক এবং জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রির আহারের পর অরুণা একটা বই লইয়া পড়িতে বসিল। তাহার নূতন সাজ-সজ্জার লজ্জা কাটিয়া গিয়াছে।

সুবীর বলিল—'শুতে যাবে না?'

অরুণা বলিল—'না, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছি, এখন শুলে ঘুম আসবে না।'

তিক্ত মনে সুবীর একাকী শয়ন করিতে চলিয়া গেল।—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সুবীরের ঘুম ভাঙিল। এবার বীণাধ্বনি নয়, কেয়া ফুলের হিম-গদ্‌গদ গন্ধ। সুবীরের ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

শয্যায় অরুণা নাই; সে যে শয়ন করিয়াছিল তাহার চিহ্নও শয্যায় নাই। টর্চ হাতে লইয়া সুবীর খাট হইতে নামিল। পাশের ঘরও নিষ্প্রদীপ, সেখানে অরুণা নাই। সুবীর ছাদে গেল।

আজও চাঁদ অস্ত যাইতেছে, পশ্চিম আকাশে আলোর বন্যা। কিন্তু অরুণা এখানে নাই। ছাদে কেয়া ফুলের গন্ধও কম।

banglabooks.in

সুবীর ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল। এখন কেয়ার গন্ধ বেশী, মনে হয় নীচের তলা হইতে গন্ধটা আসিতেছে। সুবীর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল।

যে ঘরটাতে প্রত্নবস্তু রাখা ছিল সেই ঘর হইতে গন্ধ আসিতেছে। সুবীর টর্চ জ্বালিল না, দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। প্রকাণ্ড ঘর অন্ধকার, কেবল দূরে ঘরের অন্য প্রান্তে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের আলোয় ঘরের ইতস্তত-বিন্যস্ত টেবিল প্রভৃতি আসবাবগুলি অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

সুবীর নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, সন্তর্পণে টেবিলগুলি বাঁচাইয়া ওই আলোকবিন্দুর দিকে অগ্রসর হইল।

অর্ধপথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মৃদু বিগলিত হাসির শব্দ! যেন দুইটি প্রণয়ী বাসক-শয্যায় শুইয়া চুপিচুপি কথা বলিতেছে, গভীর রসালুতার গদ্‌গদ হাসি হাসিতেছে। দীপের ক্ষীণ আলোকে কিন্তু মানুষ দেখা যাইতেছে না।

সুবীরের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বোধকরি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা অন্ধ আবেগ তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দপ্‌ করিয়া টর্চ জ্বালিল।

দেয়াল ঘেঁষিয়া পাটি পাতা, তাহার উপর অরুণা একাকিনী শুইয়া আছে। টর্চের তীব্র আলোয় তাহার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি ঝলমল করিয়া উঠিল। সে তড়িদ্বেগে উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল।

'অরুণা!'

ব্যাধের সাড়া পাইয়া ত্রস্ত হরিণী যেমন পলায়ন করে, অরুণাও তেমনি ছুটিয়া পালাইল। সুবীর ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরের এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলিল। কেহ কোথাও নাই। কেবল পাটির শিয়রে পীতাভ দীপশিখা জ্বলিতেছে। সুবীর দৈহিক এবং মানসিক জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত উপরে ফিরিয়া গেল।

শয়নঘরে অরুণা খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। সুবীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।—'অরুণা!'

অরুণা উঠিয়া বসিল, গলদশ্রু চক্ষে চাহিয়া বলিল—'কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?'

স্তম্ভিত হইয়া সুবীর বলিল—'আমি তোমাকে নির্যাতন করছি!'

অরুণা মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল—'আমাকে ছেড়ে দাও। মুক্তি দাও।'

সুবীর খাটের পাশে বসিল, অরুণার হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল—'অরুণা, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই, এই অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে দেশে ফিরে যাই।'

অরুণা সত্রাসে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—'অ্যাঁ! না না না—'

সুবীর বলিল—'এখানে তোমার মনের রোগ সারবে না। আমি তোমাকে আর এখানে থাকতে দেব না। জামাইবাবু আসুন, কালই আমরা চলে যাব।'

'না না না—আমি যাব না—'

'হ্যাঁ, যাবে। তোমাকে আমি জোর করে নিয়ে যাব। এ বাড়িতে আর নয়।'

'না না না—' অরুণা ধড়মড় করিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর তীরবেগে ছাদের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

'অরুণা, অরুণা—' ডাকিতে ডাকিতে সুবীর তাহার পিছনে ছুটিল।

চাঁদ অস্ত যাইতেছে, আকাশে বাঁধভাঙা জ্যোৎস্নার প্লাবন। সুবীর দেখিল অরুণা ছুটিতে ছুটিতে ছাদের পশ্চিম কিনারার দিকে যাইতেছে। সেও উচ্চকণ্ঠে অরুণার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল।

ছাদের আলিসার কাছে আসিয়া অরুণা একবার পিছন দিকে চাহিল। দেখিল, সুবীর ছুটিয়া আসিতেছে। অনৈসর্গিক চিৎকার করিয়া অরুণা ছাদ হইতে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সুবীর আলিসার উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নালোকে অরুণা বিশ হাত নীচে বালুর উপর পড়িয়া আছে। সুবীর দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস টানিয়া অন্ধের মত সিঁড়ি দিয়া নীচে

banglabooks.in

নামিয়া গেল।

আল্গা নরম বালুর উপর অরুণার দেহ বিস্রস্তভাবে লুণ্ঠিত রহিয়াছে। সুবীর দেখিল, তাহার জ্ঞান নাই কিন্তু প্রাণ আছে। আল্গা বালুর উপর পড়িয়াছিল বলিয়া দেহে আঘাত লাগে নাই। তখন সুবীর নিজের অজ্ঞাতসারে 'অরুণা, অরুণা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে দুই বাহু দিয়া তুলিয়া লইল, অসীম কষ্টে বালুর বাঁধ পার হইয়া উপরে আসিল; অরুণার বালু-ধূসর দেহ বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

সকাল হইতে এখনও দুই-তিন ঘণ্টা বাকি। সুবীর ভিজা তোয়ালে দিয়া অরুণার মুখ ও দেহ মুছাইয়া দিল। অরুণার কিন্তু জ্ঞান হইল না।

নিঝুম রাত্রি! ঝি-চাকরদের জাগাইবার কথা সুবীরের মনে আসে নাই। সে অরুণার পাশে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাত কাটাইয়া দিল।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় জীপে চড়িয়া বিরাজবাবু আসিলেন। সুবীরের মুখে সমাচার শুনিয়া তিনি বলিলেন—'এখনি হাসপাতালে নিয়ে চল।'

রেল স্টেশনের কাছে হাসপাতাল। অরুণাকে জীপে তুলিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। প্রবীণ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, শরীরে কোনও আঘাত নাই, কেবল কংকাশন হইয়াছে, শীঘ্রই জ্ঞান হইবে।

অপরাহ্ণে তিনটার সময় অরুণার জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে কিছুক্ষণ শূন্যপানে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার চোখের কোণ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুবীর পাশে বসিয়া ছিল, সে অরুণার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—'অরুণা!'

অরুণার ঠোঁট দু'টি একটু নড়িল—'আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

'বাড়ি!'

'হ্যাঁ। কলকাতায় আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যাব।'

বিহ্বল উল্লাস দমন করিয়া সুবীর বলিল—'আজই আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।'

মেল ট্রেন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। সর্বাঙ্গ প্রকম্পিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়াছে। এখানে মরুভূমি নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় হিমচর্চিত শ্যামলতা।

কুপে কামরার মধ্যে সুবীর অরুণার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল, আস্তে আস্তে বলিল—'অরুণা, মরুভূমির মাঝখানে সেই পাথরের বাড়িটার কথা তোমার মনে আছে?'

অরুণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল—'ও কথা আর কোনো দিন আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমি ভুলে যেতে চাই।'

সুবীর তাহার মুখখানা গাঢ়ভাবে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব। তুমিও একটা কথা মনে রেখো, ইহজন্মে তুমি আমার।'

১৮ পৌষ ১৩৬৮

banglabooks.in

ছোট কর্তা

আভার বিবাহের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কি একটা মতান্তর হইয়াছিল। কিন্তু দুই পক্ষই ভদ্রলোক, তাই মতান্তর ঝগড়ায় পরিণত হয় নাই। বরপক্ষ আভাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তারপর পনেরো বছর আভা আর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে নাই। দুই পরিবারের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছিল।

এই পনেরো বছরে দুই পরিবারেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। কর্তারা গত হইয়াছেন, যুবকেরা বাড়ির কর্তা হইয়াছে। যাহারা ছোট ছিল তাহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে। আভার বিবাহের সময় কি লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল তাহাও বোধ করি কাহারও মনে নাই। তবু দুইপক্ষের মাঝখানে দূরত্বটা যেন মনোযোগের অভাবেই পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছিল।

আভার ছোট ভাই দেবু আভার চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট। তাহার বয়স এখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর; সে ফৌজী দলের লেফটেনেণ্ট, উপস্থিত পুণায় আছে। হঠাৎ কর্মোপলক্ষে তাহাকে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইল। এবং আসিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, দিদির শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়।

দেবু জীবনটা যদিও পশ্চিমাঞ্চলেই কাটাইয়াছে, তবু কলিকাতা তাহার অপরিচিত নয়। ছেলেবেলায় কয়েকবার আসিয়াছে। কিন্তু তখন সে স্বাধীন ছিল না, এখন স্বাধীন। দিদিকে দেখিবার জন্য তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিল।

দিদির শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা তাহার জানা ছিল, শোভাবাজারের নামজাদা গোষ্ঠী। সে হোটেলে জিনিসপত্র রাখিয়া বিকালবেলা বাহির হইল। অবশ্য দিদির শ্বশুরবাড়িতে সে সমাদর পাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু না-ই বা পাইল সমাদর। সে একবার দিদিকে দেখিয়াই চলিয়া আসিবে। দিদির বিবাহকালীন কচি মুখখানি তাহার মনে আঁকা আছে। দিদির চেহারা এখন কেমন হইয়াছে কে জানে। দেবুর চেহারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, দিদি কখনই তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

সাবেককালের দোতলা বাড়িটা বেশ বড়। কর্তারা দুই ভাই একান্নবর্তী ছিলেন। প্রায় দশ বছর আগে আভার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন, ছাপা দায়-জানানো পত্র দেবু দেখিয়াছিল। তারপর এ সংসারে কী ঘটিয়াছে সে জানে না। হয়তো একান্নবর্তীই আছে, ছোট কর্তা এখন বাড়ির কর্তা।

দেবু দ্বারের কড়া নাড়িল। ক্ষণকাল পরে দ্বার খুলিয়া দিল একটি মেয়ে, কিন্তু জঙ্গী পোশাক পরা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে দ্বার খোলা রাখিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। দেবু অপ্রতিভভাবে খোলা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িতে যে অনেকগুলি লোক থাকে এইবার তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। দুই চারিটি বয়ঃপ্রাপ্ত লোক এবং অনেকগুলি কুচোকাচা দ্বারের কাছে আসিয়া পরম কৌতূহলের সহিত দেবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেবুর মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিবে ভাবিয়া পাইল না।

'তোরা সরে যা' বলিয়া একটি গোলাকৃতি মহিলা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলেন, দেবুকে একমুহূর্ত ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, দেবু এসেছিস! আয় আয়।'

তিনি দেবুর হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং দেবুর গণ্ডদেশে সশব্দে চুম্বন করিলেন। দেবু লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, বুঝিল এই গোলাকৃতি মহিলাই তাহার দিদি। পনেরো বছরে দিদির স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে।

আভা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, 'কত বড় হয়েছিস রে! তার ওপর আবার মিলিটারি পোশাক! কিন্তু আমার চোখে কি ধুলো দিতে পারিস! দেখেই চিনেছি।'

দেবুকে লইয়া বাড়িতে সমাদরের সমারোহ পড়িয়া গেল। বাড়িতে লোক অনেক; শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, দেবর, ননদ; আভা সকলের কাছে লইয়া গিয়া দেবুর পরিচয় করাইয়া

banglabooks.in

দিল। দেবু দেখিল, আভাই বাড়ির গৃহিণী। তাহার শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী ঠাকুরঘরে বসিয়া কেবল মালা জপ করেন।

ইতিমধ্যে আভার স্বামী পরিমলবাবু গৃহে ফিরিলেন। ইনি হাইকোর্টের উকিল। ভারি মজলিশী লোক, তিনি দেবুকে লইয়া মহানন্দে রঙ্গ রসিকতা শুরু করিয়া দিলেন। দেবু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন লোকগুলোর সঙ্গে এতদিন বিচ্ছেদ ছিল কি জন্য?

গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আভা আসিয়া বলিল, 'দেবু, আজ তুই যেতে পাবি না। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই শুয়ে থাকবি। কাল সকালে যেখানে ইচ্ছে যাস।'

দেবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'কিন্তু তোমাদের অসুবিধে হবে—'

'কিছু অসুবিধে হবে না।' আভা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওপরে ছোট্-ঠাকুরের ঘরে দেবুর শোবার ব্যবস্থা করি।'

পরিমলবাবু চকিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো।' স্বামী-স্ত্রীর চোখে চোখে কি একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল দেবু ধরিতে পারিল না। সে বলিল, 'কিন্তু জামা-কাপড় যে কিছুই আনিনি।'

আভা বলিল, 'বাথরুমে জামা-কাপড় রেখেছি। তুই যা, তোর মিলিটারি পোশাক ছেড়ে নে।'

দেবু বাথরুমে চলিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া সাদা জামা-কাপড় পরিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে চুপিচুপি কি কথা বলিতেছে। সে আসিতেই দিদি হাসিমুখে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যে মেয়েটি দেবুকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে বসিবার ঘরে আসিয়া চা-জলখাবার দিয়া গেল। মেয়েটির বয়স সতেরো কি আঠারো. রং ফরসা, ভাসা-ভাসা হাসিভরা চোখ। পরিমলবাবু বলিলেন, 'আমার খুড়তুতো বোন রানী।'

গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল, তখন পরিমলবাবু দেবুকে লইয়া রান্নাঘরে খাইতে বসিলেন। রানী লুচি বেলিয়া দিতেছে, আভা গরম গরম লুচি ভাজিয়া পাতে দিতে লাগিল। দেবু রানীর লুচি বেলা দেখিতে দেখিতে মনে মনে ভাবিল, বেশ মেয়েটা।

আহারের পর মুখ ধুইতে ধুইতে দেবু শুনিতে পাইল দিদি খাটো গলায় রানীকে বলিতেছে, 'ওপরে যা, ছোট্‌ঠাকুরকে বল আমার ভাই এসেছে, আজ রাত্তিরের জন্যে ঘরটা যেন ছেড়ে দেন।'

শুনিয়া দেবু বুঝিল, তাহার জন্য কোনও বৃদ্ধকে কক্ষচ্যুত করা হইতেছে, সে মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল, কিন্তু এখন আর আপত্তি করিয়া লাভ নাই।

রানী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই নামিয়া আসিয়া আভার দিকে ঘাড় নাড়িল। আভা বলিল, 'দেবু, রাত হয়েছে. শুয়ে পড়্ গিয়ে। আমি বাপু মোটা মানুষ, সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। রানী, তুই আর একবার ওপরে যা, দেবুকে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়। লক্ষ্মীটি।'

রানী তখন দেবুর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, দেবু তাহার অনুসরণ করিল। সিঁড়ি বেশী চওড়া নয়, অর্ধপথ উঠিয়া বিপরীত মুখে ঘুরিয়া গিয়াছে। দেবু অর্ধপথ উঠিয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। রানী সিঁড়ির মাঝখানের চত্বরে দাঁড়াইয়া পড়িল, দেবুও দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোষ, পায়ে কটকি চটি। মাথার চুল সাদা। স্বল্পালোকে মুখ চোখ ভালো দেখা গেল না, তিনি দেবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

রানী আবার উপরে উঠিতে লাগিল, দেবু তাহার অনুগামী হইল। দ্বিতলে উঠিয়া রানী কোনও কথা বলিল না, কেবল আঙুল দিয়া একটা খোলা দরজা দেখাইয়া দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

banglabooks.in

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দেবু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো। খাটের উপর ধবধবে বিছানা পাতা, বিছানার পদপ্রান্তে একটি রঙীন সুজনি পাট করা রহিয়াছে। দেয়ালে একটি বড় ফটোগ্রাফ টাঙানো, দেবু কাছে গিয়া দেখিল, যে-বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন তাঁহারই ফটো। শান্ত প্রসন্ন মুখ, চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। দিদি যাঁহাকে ছোট্‌ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল ইনি নিশ্চয় তিনিই।

কিন্তু ঘরের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ঘরের বাতাস বন্ধ, বাতাসে একটা মেটে-মেটে গন্ধ। অনেক দিন ঘর বন্ধ থাকিলে যেমন গন্ধ হয় সেইরূপ। দেবু জানালা খুলিয়া দিল, দ্বার ভেজাইয়া দিল, তারপর শয্যার পাশে বসিয়া সিগারেট ধরাইল। আজিকার নূতন অভিজ্ঞতাগুলি সে মনের মধ্যে গুছাইয়া লইতে চায়।

দিদি সুখে আছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। উঃ, কি মোটাই হইয়াছে! কিন্তু মুখের ছেলেমানুষী ভাব এখনও যায় নাই। পরিমলবাবুও চমৎকার লোক। আর রানী! বাংলা দেশের মেয়েগুলো তো বেশ ভাল! ইহারা সকলেই সহজ স্বাভাবিক মানুষ, বড় সুখের একটি একান্নবর্তী পরিবার। দেবু নিশ্বাস ফেলিল, আবার কতদিনে ইহাদের সঙ্গে দেখা হইবে কে জানে!

সিগারেট শেষ করিয়া দেবু আলো নিবাইল, সুজনি গায়ে টানিয়া লইয়া শয়ন করিল। খোলা জানালা দিয়া রাস্তার আলো চোরের মত তির্যকভাবে হাত বাড়াইয়াছে, ঘর একেবারে অন্ধকার নয়। দেবু ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে আভা ও পরিমলবাবুও শয়ন করিয়াছিলেন। আভা উৎসুক কণ্ঠে বলিল, 'হলে কিন্তু বেশ হয়—না?'

পরিমলবাবু বলিলেন, 'দেবুকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভাল।'

আভা গর্ব অনুভব করিয়া বলিল, 'আমার ভাই, ভাল ছেলে হবে না! এখন কাকা রাজী হলে হয়।'

পরিমলবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, অনেক সম্বন্ধই তো করলাম, কিন্তু কাকার পছন্দ হল না। এবার দেখা যাক।' বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় দেবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অনুভব করিল ঘরের মধ্যে কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া সে শয্যায় উঠিয়া বসিল; স্বল্পান্ধকারে মনে হইল কে যেন দরজা একটু ফাঁক করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেবু উঠিল। আলো জ্বালিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই, তখন সে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া আবার আলো নিবাইয়া শয়ন করিল।

দ্বিতীয়বার দেবুর ঘুম ভাঙিল তখন চারটে বাজিয়া গিয়াছে, ভোর হইয়া আসিতেছে। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, যে বৃদ্ধটিকে সে সিঁড়িতে দেখিয়াছিল তিনি শয্যার পাশে ঝুঁকিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দেবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

শয্যা হইতে নামিয়া দেবু সুইচ টিপিয়া আবার আলো জ্বালিল। ঘরে কেহ নাই, দরজার হুড়কা পূর্ববৎ লাগানো রহিয়াছে।

দেবুর হঠাৎ গা ছমছম করিয়া উঠিল। সে হুড়কা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। বাহিরেও কেহ নাই, বাড়ি সুপ্ত। তখন সে বৃদ্ধের ছবির দিকে তাকাইল। বৃদ্ধ প্রসন্ন অপলক চক্ষে তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন।

সিগারেট ধরাইয়া দেবু জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কী ব্যাপার! ভুতুরে কাণ্ড নাকি! কিংবা তাহারই স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া অবাস্তব ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে?

জানালার পাশে একটা আরাম-কেদারা ছিল, দেবু সিগারেট ফেলিয়া দিয়া তাহাতে লম্বা হইল। আর ঘুমের চেষ্টা বৃথা, ফরসা হইতে দেরি নাই।—

'হ্যা রে, রাত্তিরে কি ঘুম হয়নি?'

দেবু চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরে সকালের আলো ঝলমল করিতেছে; দিদি চায়ের পেয়ালা

banglabooks.in

হাতে লইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

চোখ মুছিয়া দেবু চায়ের পেয়ালা লইল, তাহাতে এক চুমুক দিয়া বলিল, 'দিদি, উনি কে?' বলিয়া দেয়ালে ফটোর দিকে আঙুল দেখাইল।

আভা থতমত খাইয়া বলিল, 'উনি? উনি আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন, রানীর বাবা।'

দেবু বলিল, 'খুড়শ্বশুর ছিলেন- তার মানে?'

আভা থপ করিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল, বলিল, 'দু' বছর আগে উনি মারা গেছেন।'

দেবু বলিয়া উঠিল, 'সে কি। ওঁকে যে আমি কাল রাত্তিরে দেখেছি।'

'দেখেছিস!' আভা কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'মারা গেছেন বটে, কিন্তু উনি আছেন। এই ঘরটা ওঁর ছিল, এই ঘরেই আছেন। কোনো গণ্ডগোল নেই; বাড়িতে অতিথি এলে ওঁকে খবর দিলেই উনি ঘর ছেড়ে দেন।—তা তুই ভয় পাসনি তো?'

দেবু বলিল, 'না, ভয় পাব কেন। কিন্তু সত্যি আছেন? মানে, সত্যি মারা গেছেন? আমি যে চোখে দেখলাম।'

আভা ধীরে ধীরে বলিল, 'আমরা সবাই চোখে দেখেছি, ইচ্ছে করলেই উনি দেখা দিতে পারেন। তবে কথা বলেন না, ইশারায় নিজের কথা জানিয়ে দেন। মৃত্যুর আগে রানীর বিয়ে দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। তারপর আমরা রানীর বিয়ের অনেক সম্বন্ধ এনেছি, কিন্তু ওঁর পছন্দ হচ্ছে না।'

দেবু কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, 'কি মুশকিল!'

আভা তখন উৎসুক হইয়া বলিল, 'আজ কাকা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তোকে ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তুই রানীকে বিয়ে করবি? কাকা জানিয়েছেন রানীর বিয়ে হয়ে গেলে উনি চলে যাবেন, আর এ বাড়িতে থাকবেন না। করবি বিয়ে? ভারি ভাল মেয়ে রে, অমন মেয়ে আজকালকার দিনে দেখা যায় না।'

দেবুর মাথাটা ঘুরপাক খাইতেছিল; সে দেওয়ালের দিকে চোখ তুলিল। দেখিল, বৃদ্ধের জীবন্ত চোখে যেন একটু হাসি খেলা করিতেছে।

১৯ জুলাই ১৯৬২

মালকোষ

বরদা বলিল, 'ওস্তাদ কাফি খাঁর সেতার শুনেছ?'

ক্লাবের পাঠাগারে আমরা কয়েকজন নীরবে বসিয়া সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে-ছিলাম। অমূল্য পত্রিকা হইতে চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'মতলবটা কি? নতুন আষাঢ়ে গল্প তৈরি করেছ, তাই শোনাতে চাও?'

বরদা কর্ণপাত করিল না, গল্প আরম্ভ করিয়া দিল—পুজোর ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি

banglabooks.in

গিয়েছিলাম। আমার ছোট শালা শুভেন্দুর ভারি গান-বাজনার শখ, একদিন আমাকে বলল—'জামাইবাবু, ওস্তাদ কাফি খাঁর সেতার শুনতে যাবেন? ওস্তাদজি আমাকে খুব ভালবাসেন; কয়েকদিনের জন্য শহরে এসেছেন, ডাকবাংলোতে আছেন। আমি খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলাম; তিনি বললেন, 'আজ রাত্রে যখন আর কেউ থাকবে না তখন বাজনা শোনাবেন। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে?'

নেই কাজ তো খই ভাজ। উচ্চাঙ্গ গান-বাজনার প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি নেই; ধ্রুপদ চৌতাল ধামার দশকুশী বুঝি না; রবীন্দ্র-সংগীতেই আমার আত্মা পরিতুষ্ট। কিন্তু বিনা মাশুলে যখন এতবড় একজন ওস্তাদের বাজনা শোনার সুযোগ হয়েছে তখন ছাড়ি কেন। বললাম—'আচ্ছা যাব।'

রাত্রি আন্দাজ নটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ডাকবাংলোতে উপস্থিত হলাম। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, পাঁচিল-ঘেরা উঁচু ভিতের বাড়ি, বাড়ির সামনে চার ফুট উঁচু চাতাল। এই চাতালের ওপর আলোয়ান গায়ে দিয়ে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন, তাঁর পাশে একটি সেতার শোয়ানো রয়েছে।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় ওস্তাদজিকে দেখলাম। লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় পাকা বাবরি চুল, চিবুকে ত্রিকোণ দাড়ি। বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে সত্তরের কাছাকাছি। শ্যালক ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। ওস্তাদজি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন—'এস বাবা। সঙ্গে ওটি কে?'

শালা পরিচয় করিয়ে দিল, আমিও হেঁট হয়ে প্রণাম করলাম। ওস্তাদজিকে দেখে তিনি হিন্দু কি মুসলমান এ কথা মনে আসে না। মনে হয় তিনি একটি প্রশান্তচিত্ত সাধক। সাধকের জাত নেই।

শালা জিজ্ঞেস করল—'আজ কেউ আসেনি?'

ওস্তাদজি একটু ম্লান হেসে বললেন—'এসেছিল কয়েকজন রঙ্গিস্ লোক, আধঘণ্টা বাজনা শুনে বাহবা দিতে দিতে চলে গেল।—কেউ কিছু বোঝে না।'

গুণিজনের পক্ষে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ কতখানি পীড়াদায়ক তা জানি বলেই নিজের কথা ভেবে মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। ওস্তাদজি যাতে আমার অজ্ঞতা ধরতে না পারেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ওস্তাদজি সেতারের ওপর হাত রেখে শালাকে বললেন—'কী শুনতে চাও বল।'

শালা হাত জোড় করে বলল—'অনেকদিন আপনার মালকোষ শুনিনি।'

ওস্তাদজি আস্তে আস্তে সেতারটি কোলে তুলে নিলেন, আঙুলে মেরজাপ্ পরে তারের ওপর মৃদু স্পর্শ করলেন; তারগুলি রণ্‌রণ্ করে উঠল। তারপর তিনি সেতারের কানে মোচড় দিয়ে তারগুলি বেঁধে নিতে নিতে বললেন—'এখন হেমন্ত কাল, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরও আরম্ভ হয়ে গেছে। মালকোষ বাজাবার উপযুক্ত সময় বটে।'

চারিদিকে জ্যোৎস্না ঝিম্‌ঝিম করছে; দূর থেকে শহরের যেটুকু শব্দ আসছে তাও যেন দূরত্বের দ্বারা মোলায়েম হয়ে আসছে। ওস্তাদজি যন্ত্র বেঁধে নিয়ে বললেন—'মালকোষ বাজাচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, যদি কিছু দেখতে পাও ভয় পেয়ো না।'

ওস্তাদজি নিতান্ত সহজভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। ওস্তাদজি আমার দিকে চেয়ে বললেন—'মালকোষ যদি শুদ্ধভাবে বাজানো যায় তাহলে জিন্ আসে। ওরা মালকোষ রাগ শুনতে বড় ভালবাসে।'

জিন্! আরব দেশের দৈত্য বিশেষ। আমি ভূত-প্রেত নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু জিন্ জাতীয় জীবের সঙ্গে কখনো মুলাকাৎ হয়নি। ওরা আরব্য রজনীর কাল্পনিক প্রাণী। এই ধারণাই ছিল। এখন মালকোষ শোনবার জন্যে তারা আসতে পারে এই কথা ভেবে মনটা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল।

ওস্তাদজি বাজাতে শুরু করলেন। লক্ষ্য করলাম, তাঁর হাতের আঙুলগুলো লোহার তারের মত বাঁকা-বাঁকা, কঠিন; কিন্তু সেতারের তারের ওপর তাদের স্পর্শ কি নরম! যেন ফুলের বাগানে মৌমাছি গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। তিনি প্রথমে খুব ঠায়ে বাজাতে শুরু করলেন,

banglabooks.in

তারপর আস্তে আস্তে তালের গতি দ্রুত হতে লাগল। আমি উচ্চসঙ্গীতের সমঝদার নই কিন্তু শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলাম। কে যেন ওই সুরের মধ্যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে মাথা কুটে কুটে কাঁদছে, যেন অব্যক্তকণ্ঠে বলছে—হামারি দুখের নাহি ওর—

আমার শালা সত্যিকারের রসজ্ঞ লোক। সে মাথা নাড়ছে না, উরুতে তাল ঠুকছে না, ঘাড় নীচু করে স্থির হয়ে বসে আছে। আমিও একটা নিবিড় অনুভূতির মধ্যে ডুবে গেছি। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে জানি না, বোধহয় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট হবে। এক সময় অনুভব করলাম, নাকে একটা গন্ধ আসছে। স্থান কাল বিবেচনায় গন্ধটা স্বাভাবিক নয়।

শুকনো তামাক পাতার কড়া গন্ধ! এতক্ষণ অর্ধনিমীলিত নেত্রে বাজনা শুনছিলাম, এখন চোখ আর একটু খুলে এদিক ওদিক তাকালাম। কই, তামাক পাতা তো কোথাও নেই। ওস্তাদজি ঘাড় গুঁজে বাজিয়ে চলেছেন, শালা নিবাত নিষ্কম্প বসে আছে। অন্য মানুষও কেউ আসেনি। তবে?

হঠাৎ নজর পড়ল চাতালের নীচে মাটির ওপর। বুকটা একবার গুরগুর করে উঠল—

আমি বসেছিলাম চার ফুট উঁচু চাতালের কিনারা ঘেঁষে, নীচে নজর পড়তেই বুঝলাম গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। ঠিক চাতালের নীচেই একটা প্রকাণ্ড মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নিকষের মত কালো গায়ের রঙ, আট হাত লম্বা তাগড়া শরীর, সর্বাঙ্গে লোহার শলার মত রোঁয়া খাড়া হয়ে রয়েছে। দুই বাহু দিয়ে মাথাটা বেড়ে নিয়ে দৈত্য পড়ে আছে।

ভূত-প্রেত দেখে ডরিয়ে ওঠার দিন আমার নেই, কিন্তু সাষ্টাঙ্গ প্রণামরত বিরাট দৈত্যটাকে দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখি, আমার ঠিক পিছনে আর একটা দৈত্য লম্বা হয়ে শুয়ে মালকোষ শুনছে।

আর একটু হলেই হাউমাউ করে উঠেছিলাম আর কি! অতি কষ্টে সামলে নিলাম। তারপর চোখ বুজে বসে রইলাম। চোখ খুলে তাকাবার সাহস নেই, হয়তো দেখব আরও অনেকগুলি আট হাত লম্বা জিন্ ভূমিষ্ঠ হয়ে মালকোষ শুনছে।

ভাই, আমি নানা জাতের ভূত দেখেছি, কিন্তু ভূতের গা দিয়ে তামাক পাতার গন্ধ বেরোয় এবং তারা উপুড় হয়ে শুয়ে মালকোষ শুনতে ভালবাসে এ কথা জানা ছিল না। অরব্য উপন্যাসেও কিছু লেখেনি। হয়তো আরব দেশের ভূত এমনিই হয়। মালকোষ সুরটা কিন্তু খাঁটি ভারতীয় সুর, তার আদি নাম মল্লকৌষিক।

ওস্তাদজির বাজনা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। যেন একটা মর্মন্তুদ বিলাপ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। ওস্তাদজি কিছুক্ষণ সেই ভাবে বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে সেতার নামিয়ে রাখলেন।

আমি চোখ বুজে বসে বসে অনুভব করলাম তামাক পাতার গন্ধটা মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকালাম, কাউকে দেখতে পেলাম না। জিনেরা চলে গেছে।

ওস্তাদজি আমার দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন—'ওরা এসেছিল নাকি?'

বললাম—'এসেছিল।'

তিনি তৃপ্তস্বরে বললেন—'আজ বাজানো ভাল হয়েছে; মন বসে গিয়েছিল। তোমরা ভয় পাওনি তো?'

এতক্ষণে শালার ধ্যানভঙ্গ হল। সে পকেট থেকে একটি রুমাল এবং একটি গিনি বার করল; গিনি রুমালের ওপর রেখে রুমাল ওস্তাদজির পায়ের কাছে রাখল। তারপর লম্বা হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

তার ভূমিষ্ঠ প্রণামের ভঙ্গী দেখে মনে হল সেও একটি ছোটখাটো জিন্।

৯ আগস্ট ১৯৬২

banglabooks.in

ফকির বাবা

মনে পড়ল পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন মুঙ্গেরে ওকালতি করি। আমার বাবা জেলা কোর্টের বড় উকিল ছিলেন, তাঁর গুটি তিন-চার জুনিয়র। আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

কাজকর্ম বিশেষ করতাম না; বাবার পিছন পিছন এক এজলাস থেকে অন্য এজলাসে ঘুরে বেড়াতাম, কখনো বা এজলাসে সাক্ষীর এজেহার লিখতাম, এবং বেশীর ভাগ সময় বার-লাইব্রেরীতে বসে সমবয়স্ক উকিলদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম।

বার-লাইব্রেরীর আড্ডা সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারি। অনেক চক্রে আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু এমন চোখা বুদ্ধি ও wit-এর সংঘর্ষ আর কোথাও পাইনি। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস সব বার-লাইব্রেরীই সমান।

আদালতের সরজমিনে নানা জাতীয় মানুষের বিচিত্র সমাবেশ। অধিকাংশই পুরুষ; বাদী প্রতিবাদী আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী উকিল মুন্সী তদ্বিরকারী পাটোয়ারি। কেউ ছুটোছুটি করছে, কেউ মোকদ্দমা জিতে ঢোল পিটোচ্ছে, কেউ হেরে গিয়ে গাছতলায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ক্রোধ লোভ কুটিলতা হতাশা জয়োল্লাস, কত রকম যে মনোভাব এই আদালত নামক ভূখণ্ডের মধ্যে তাল পাকাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনোটাই কিন্তু উচ্চাঙ্গের মনোবৃত্তি নয়।

এই জনাবর্তের মধ্যে একটি লোককে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম যার সঙ্গে আদালতের বাতাবরণের কোনো মিল নেই। তাকে লোকে বলত ফকির-বাবা। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, নিকষের মত গায়ের রঙ, মাথায় এক-মাথা তৈল-চিক্কণ বাবরি চুল, অল্প দাড়ি আছে। মাংসল মুখে সামনের দুটো দাঁত ভাঙা, কিন্তু হাসিটি প্রাণখোলা; কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখ দুটিও ওই ফোঁটার মতই রক্তবর্ণ। কি শীত কি গ্রীষ্ম—একটা কালো কম্বল তার চওড়া কাঁধে পাট করা থাকত। পরনে লুঙ্গি, কখনো সেই সঙ্গে একটা গেঞ্জি।

লোকটিকে দেখে আমার মনে হত সে আদৌ মুসলমান ছিল, তারপর তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেছিল। তার ফকির-বাবা নাম থেকেও তাই মনে হয়। কিন্তু এ আমার আন্দাজ মাত্র। তার গোটা পরিচয় কোনোদিন জানতে পারিনি।

ফকির-বাবা আদালতে আসত টাকা রোজগার করতে। তার টাকা রোজগারের প্রক্রিয়া আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আদালতের খোলা জায়গায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে হঠাৎ একটা লোকের হাত ধরে বলত—'তুই যদি আমাকে পাঁচটা টাকা দিস তোকে মামলা জিতিয়ে দেব।' কাউকে কখনো অস্বীকার করতে দেখিনি, বরং পরম আহ্লাদিত হয়ে টাকা দিত। আশ্চর্য এই যে, যারা টাকা দিত তারা কখনো মোকদ্দমায় হারত না। আবার দেখেছি কত লোক ফকির-বাবাকে একশো দুশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে, বলছে—'বাবা, আমাকে মোকদ্দমা জিতিয়ে দাও।' কিন্তু ফকির-বাবা টাকা নেয়নি। বলেছে—'তোর টাকা নেব না।'

আমার বিশ্বাস ফকির-বাবার একটা দৈবশক্তি ছিল—খুব নিম্নস্তরের সিদ্ধাই—যার দ্বারা সে লোকের মুখ দেখে তার ভবিষ্যৎ জানতে পারত। আমাকে একবার একটা এজলাসের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে বলেছিল—'তুই এখানে কি করছিস? যা ভাগ্—পালা।' তখন তার কথার মানে বুঝিনি।

দু'চার দিন আদালতে ঘুরে বেড়িয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে ফকির-বাবা ডুব মারত, আবার দু-চার মাস পরেই ঠিক ফিরে আসত।

যে ঘটনা আজ মনে পড়ল সেটা ঘটেছিল গ্রীষ্মকালের একটি অপরাহ্ণে। তখন বোধহয় সকালে আদালত বসছে, বিকেলবেলা বাড়িতে মক্কেল আসে। মনে আছে, বিকেল আন্দাজ চারটের সময় বাবা অফিস-ঘরে এসে বসেছেন, আমিও এসেছি, আর এসেছেন বাবার প্রধান জুনিয়র শ্রীনীরাপদ মুখোপাধ্যায়। নিরাপদদাদা পরবর্তীকালে রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতি

banglabooks.in

অর্জন করেছেন, তখন জুনিয়র উকিল ছিলেন, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন।

মক্কেল তখনো কেউ আসেনি; সদর দরজা ভেজানো আছে। বাবা আর নিরাপদদাদা টেবিলের দুই পাশে বসে বিশ্রম্ভালাপ করছেন। টেবিলের ওপর নথিপত্র, ভারী ভারী আইনের বই ছড়ানো রয়েছে।

হঠাৎ সদর দরজায় ঠেলা দিয়ে ঘরে ঢুকল—ফকির-বাবা। সেই শা-জোয়ান চেহারা, সেই কাঁধে কম্বল, সেই গালভরা হাসি। অনেকদিন তাকে আদালতে দেখিনি, আমাদের বাড়িতে তার পদার্পণও এই প্রথম। বাবা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ফকির-বাবা তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল; বলল, 'বকিল সাহেব, দুটো টাকা দাও।'

বাবা বললেন, 'তুমি টাকা কি করবে?'

সে ফোগলা মুখে হেসে সপ্রতিভভাবে বলল, 'মদ খাব।'

বাবা দোনা-মনা করতে লাগলেন। টাকা দিলেন না, কিন্তু 'দেব না' বলে তাকে হাঁকিয়েও দিলেন না। বাবার মনে বোধহয় সংশয় জেগেছিল, যে-ব্যক্তি মদ খাওয়ার জন্যে টাকা চায় তাকে টাকা দেওয়া উচিত কিনা।

নিরাপদদাদা এই সময় কথা বললেন। তিনি সে-সময় একটু নাস্তিক গোছের লোক ছিলেন, বললেন, 'ফকির সাহেব, তুমি তো সাধুসজ্জন ব্যক্তি, ভূত দেখাতে পারো?'

ফকির-বাবা তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ, পারি।'

ক্ষণেকের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বলে কি লোকটা! ভূত দেখাবে!

নিরাপদদাদা বললেন, 'দেখাও ভূত। কিন্তু খাঁটি ভূত দেখাতে হবে, বুজরুকি চলবে না।'

ফকির-বাবা বলল, 'এমন ভূত দেখাবো পিলে চমকে যাবে। এক তা সাদা কাগজ দাও।'

নিরাপদদাদা এক তা কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফকির-বাবা কাগজ স্পর্শ করল না, কেবল কাগজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'হয়েছে। এবার কাগজটা চাপা দিয়ে রাখো।'

নিরাপদদাদা একটা ভারী বইয়ের তলায় কাগজ চাপা দিয়ে রাখলেন। ফকির-বাবা তখন চেয়ার টেনে বসল, নিতান্ত সহজভাবে এ-কথা সে-কথা বলতে লাগল। কথাগুলো এতই সাধারণ যে আজ আর তার একটি কথাও মনে নেই।

পাঁচ মিনিট পরে ফকির-বাবা গালগল্প থামিয়ে বলল, 'এবার কাগজটা বের করে দেখ।'

নিরাপদদাদা বই-এর তলা থেকে কাগজ বের করলেন। কাগজ দেখে সত্যিই পিলে চমকে উঠল। তার ওপর আঁকা রয়েছে এক বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা। ছেলেমানুষদের ভয়-দেখানো রাক্ষস-খোক্কসের চেহারা নয়, এমন একটা জীবন্ত হিংস্র কদর্যতা আছে ঐ চেহারায় যে, বয়স্থ মানুষেরও বুক গুরগুর করে ওঠে। আমরা মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলাম।

ফকির-বাবা অট্টহাস্য করে বলল, 'দেখলে ভূত? এবার চাপা দিয়ে রাখো।'

নিরাপদদাদা যন্ত্রচালিতের মত কাগজখানা আবার বই-চাপা দিলেন। ফকির-বাবা পিতৃদেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'টাকা দাও।'

বাবা নিঃশব্দে দুটি টাকা দেরাজ থেকে বের করে তার হাতে দিলেন। ফকির-বাবা গালভরা হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমরা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর নিরাপদদাদা দ্বিতীয়বার চাপা দেওয়া কাগজখানা বের করলেন। দেখা গেল কাগজে ভূতের চেহারা নেই, সাদা কাগজ আবার সাদা হয়ে গেছে।

৮ জানুয়ারী ১৯৬৩

banglabooks.in

পিছু পিছু চলে

সত্যবান গজাধর সিন্ধে বললেন, 'আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?'

চুপ করে রইলাম। যারা ভূত দেখেছে তারা অন্যকে ভূত দেখাতে পারে না, সুতরাং নাস্তিকদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়। আজকাল নাস্তিকদের যুগ চলেছে, অতএব সাবধানে থাকা ভালো।

সত্যবান সিন্ধে পুণায় আমার প্রতিবেশী, আমার সমবয়সী। এককালে সুপুরুষ ছিলেন, এখন জীর্ণ শীর্ণ চেহারা। আমার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কিন্তু এক পাড়ায় থাকতে গেলে হাসি কথা শিষ্টতার বিনিময় করতে হয়। তিনি কোন এক বীমা কোম্পানীতে চাকরি করতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

গত পৌষ মাসে হপ্তাখানেক দারুণ শীত পড়েছিল। একদিন সন্ধ্যের পর আমি দোর-জানলা বন্ধ করে একখানা বই নিয়ে বসেছি, এমন সময় দোরের ঘণ্টি বেজে উঠল। দোর খুলে দেখি, সত্যবান সিন্ধে। তাঁর মাথায় পাগড়ির মত স্কার্ফ জড়ানো, গায়ে আলোয়ান, তবু ভদ্রলোক শীতে কাঁপছেন। একটু আশ্চর্য হলাম, কিন্তু আপ্যায়ন করে এনে বসালাম, 'আসুন, এবার বেজায় শীত পড়েছে।'

তিনি দন্তবাদ্য থামিয়ে এদিক-ওদিক চাইলেন, তারপর প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?'

আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন, 'আমি বড় বিপদে পড়েছি। আপনি ভূতের গল্প-টল্প লেখেন শুনেছি, তাই ভাবলাম—'

চাকরকে কফি তৈরি করবার হুকুম দিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি, আপনি ভূত দেখেছেন নাকি?'

তিনি অনেকক্ষণ চোখ বড় করে বসে রইলেন, তারপর বললেন, 'ভূত কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি ভূত দেখেননি?'

বললাম, 'চোখে দেখিনি, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি।'

'সে কি রকম?'

'গন্ধ পেয়েছি, শব্দ শুনেছি, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত পেয়েছি।'

সত্যবান সিন্ধে গুম হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে অশান্তের আতঙ্ক দুঃস্বপ্নের মত জেগে রইল।

চাকর কফি দিয়ে গেল। জিভ-পোড়ানো গরম কফি সত্যবান সিন্ধে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন, তারপর আলোয়ানটা গাঢ়ভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'তবে আপনাকে আমার গল্পটা বলি, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন।'

একটু দম নিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'গত মে মাসে একদিন সন্ধ্যের সময় আমি টিলক রোডের একটা রসবন্তী দোকানে বসে আখের রস খাচ্ছিলাম। আপনি তো জানেন গরম কালে এখানে খোলা জায়গায় বাখারির বেড়া দিয়ে ঘিরে আখ মাড়াইয়ের যন্তর বসায়। আমি একটা বেঞ্চিতে বসে রস খাচ্ছি, এমন সময় নজর পড়ল, বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'বুড়ো লোক, ক্ষীন দরিদ্র বেশ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে ছাবকা ছাবকা দাড়ি-গোঁফ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। প্রথমটা চিনতে পারিনি, তারপর—'

তিনি আবার চুপ করলেন। মুখ দেখে মনে হল তাঁর মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। বললাম, 'তাহলে চেনা লোক?'

সিন্ধে কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ। ত্রিশ বছর আগে যখন নাগপুরে ছিলাম তখন অনন্ত বিষ্ণু মারাঠেকে চিনতাম। স্কুলে মাস্টারি করত।'

বললাম, 'তাহলে অনন্ত বিষ্ণু মারাঠে আপনার বন্ধু!'

তিনি চমকে উঠে বললেন, 'না, না, বন্ধু নয়। তবে নাগপুরে এক পাড়ায় থাকতাম, যাওয়া-

banglabooks.in

আসা ছিল—' তারপর যে কথাটা চাপবার চেষ্টা করছিলেন তা বেরিয়ে এল, 'অনন্তার বৌ সুমন্তা ছিল অপরূপ সুন্দরী, আমি—আমি তাকে নিয়ে—সে আমার সঙ্গে ইলোপ করেছিল।'

যৌবনকালে সত্যবান সিন্ধে দেখছি গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছেন। কিন্তু আমাকে এসব কথা বলছেন কেন? আমি বিদেশী, তাই?

বললাম, 'তারপর বলুন।'

সত্যবান বললেন, 'সুমন্তাকে নিয়ে নাগপুর থেকে নাসিকে পালিয়ে এসেছিলাম, সেখান থেকে বোম্বে। সুমন্তা কিন্তু বেশীদিন আমার কাছে রইল না, আর একজনের সঙ্গে আমাকে ছেড়ে গেল। আর তাকে দেখিনি।

'তারপর আমি কাজের সূত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি; আমেদনগর, শোলাপুর, ঔরঙ্গাবাদ; শেষে কাজে অবসর নিয়ে পুণায় এসে বসেছি।

প্রশ্ন করলাম, 'এই ত্রিশ বছরের মধ্যে অনন্ত মারাঠের সঙ্গে আর দেখা হয়নি?'

তিনি বললেন, 'না, এই প্রথম। তাকে যখন চিনতে পারলাম, তখন ভয় হল। অনন্ত মারাঠে স্কুলের মাস্টার ছিল বটে, কিন্তু ভারি একরোখা লোক ছিল।

'রসবন্তীতে বসে রস খেতে খেতে আড়চোখে তার দিকে তাকাতে লাগলাম। সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

'আর এক গেলাস রস খেলাম। বাইরে বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এল, তখন বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকালাম। রাস্তায় তখন মোটর, অটো-রিক্সা, মানুষের ভিড়; অনন্ত মারাঠেকে দেখতে পেলাম না।

'তবু বাড়ির দিকে আসতে আসতে মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইছি। কিছু দূর এসে দেখলাম অনন্ত মারাঠে আমার পিছু নিয়েছে; খুব কাছে আসেনি, লোকের ভিড়ের সঙ্গে মিশে আমাকে অনুসরণ করছে। অনন্তার মতলব বুঝলাম; সে আমার বাড়ির ঠিকানা জানতে চায়। বাড়িতে এসে হাঙ্গামা বাধাবে। বাড়িতে আমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে—

'রাস্তা দিয়ে একটা খালি অটো-রিক্সা যাচ্ছিল, টপ্ করে তাতে উঠে পড়লাম। চলে গেলাম একেবারে শম্ভাজি পার্ক। সেখানে একটা বেঞ্চিতে অন্ধকারে বসে রইলাম। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরে এলাম। অনন্তাকে আর দেখতে পেলাম না।

'অনন্ত মারাঠে বোধ হয় কোনো কাজে নাগপুর থেকে পুণায় এসেছিল, তারপর হঠাৎ রসবন্তীতে আমাকে দেখতে পায়। ত্রিশ বছরে আমার চেহারা অনেক বদলে গেছে, তবু সে আমাকে চিনতে পেরেছিল। লোকটা ভয়ঙ্কর রাগী আর প্রতিহিংসাপরায়ণ।'

বললাম, 'বউ নিয়ে পালালে রাগ হবারই কথা।'

সিন্ধে বললেন, 'দেখুন, আমার দোষ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দোষ আমার একার নয়। অনন্তার বউটা ছিল—যাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে—প্রবিকীর্ণকামা বিকীর্ণমন্মথা পুংশ্চলী।'

'আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন নাকি?'

'জানি। আপনার কোষ্ঠী আছে? একদিন দেখব। যা হোক, তারপর তিন দিন আর বাড়ি থেকে বেরুলাম না, ভাবলাম দু-তিন দিনের মধ্যেই অনন্তা কাজ সেরে নাগপুরে ফিরে যাবে।

'প্রথম যেদিন বেরুলাম সেদিন অনন্তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরদিন লছমী রোডে গিয়েছি কিছু কেনাকাটার জন্যে, দেখি অনন্তা আমার পিছু নিয়েছে। তার হাতে একটা মোটা লাঠি। ভয় পেয়ে গেলাম, কি করি! একটা সাত নম্বর বাস রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল, টুক করে তাতে উঠে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে অনন্তা ওঠবার আগেই বাস ছেড়ে দিল।

'সাত নম্বর বাস পুণা স্টেশনে যায়, আমি স্টেশনে নেমে শিবাজিনগরের টিকিট কিনে একটা লোকাল ট্রেনে উঠে বসলাম; পাঁচ মিনিট পরে শিবাজিনগর স্টেশনে নেমে অটো-রিক্সা চড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। অনন্তা আমাকে ধরতে পারল না।

'এরপর সাত দিন বাড়ি থেকে বেরুলাম না। কিন্তু বুড়ো বয়সে প্রত্যহ একটু ঘোরা-ফেরা দরকার, নইলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। আমি ভোর চারটের সময় বেড়াতে বেরুতে

banglabooks.in

আরম্ভ করলাম। সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে আসি। অনন্তার দেখা নেই।

'কিন্তু শুধু প্রাতঃভ্রমণ করলেই তো চলে না; আমি গেরস্ত মানুষ, বাজার-হাটও করতে হয়। সাতদিন পরে বিকেলবেলা গুটি গুটি বেরুলাম। অনন্তার দেখা পেলাম না। ভাবলাম, যাক, অনন্তা নাগপুরে ফিরে গেছে।

'তারপর গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এল—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'একটা কথা বলুন। এটা ভূতের গল্প বলছেন, না মানুষের গল্প?'

সত্যবান বললেন, 'তা আমি নিজেই জানি না। শেষ পর্যন্ত শুনে আপনি বলুন।'

তিনি আবার আরম্ভ করলেন, 'বর্ষাও শেষ হয়ে এল। আমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছি। পুণার বৃষ্টি বোম্বের মত নয়, ঝিরঝিরে বৃষ্টি; কদাচিৎ তোড়ে পাউস্ নামে। একদিন আমি ছাতা নিয়ে মন্ডাই গেছি শাক-সব্জি কিনতে, হঠাৎ তোড়ে বৃষ্টি নামল। ছাতায় সে-বৃষ্টি সামলায় না, আমি বাড়ি ফেরার পথে আটকা পড়ে গেলাম। একটা দোকানের ওলুতলায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল, আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তারপর—সেই আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির মাঝখানে অনন্তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। অনন্তাও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল না, এতগুলো লোকের মাঝখানে অনন্তা নিশ্চয় আমাকে খুন করত না। কিন্তু তার চোখের চাউনি দেখে আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে গলার মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

'রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলাম, বৃষ্টি ভেদ করে দুটো ট্রাক রাস্তার দু'দিক থেকে দৈত্যের মত ছুটে আসছে। এই সুযোগ! ট্রাক দুটো এসে পড়বার আগেই আমি যদি রাস্তা পার হয়ে যেতে পারি, তাহলে অনন্তা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে আমার পিছু নিতে পারবে না। সেই ফাঁকে আমি পালাব।

'রাস্তার ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তবু নেমে পড়লাম; ট্রাক দুটো এসে পড়েছে, আমি চট করে রাস্তা পার হয়ে গেলাম। তারপরই শুনতে পেলাম, ট্রাকের ব্রেক কষার কড় কড় শব্দ। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে রক্তারক্তি কান্ড।

'দুটো ট্রাকই দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর তাদের মাঝখানে অনন্তার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে। তার একটা হাত ট্রাকের চাকার নিচে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে, চারদিকে রক্ত-মাখা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অনন্তা নিশ্চয় আমাকে অনুসরণ করেছিল, তারপর দুটো ট্রাক দু'দিক থেকে এসে তাকে থেঁতলে দিয়েছে। ডান হাতটা বোধহয় চাকার নিচে পড়েছিল, কনুই থেকে কেটে আলাদা হয়ে গেছে।

'চারদিক থেকে লোকজন হৈ-হৈ করে ছুটে এল। আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

'এ-রকম একটা বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখলে মানুষের প্রাণে আঘাত লাগে। আমার কিন্তু দুঃখ হল না। মনে হল, অনন্তা মরেছে আমার হাড় জুড়িয়েছে, আমি মুক্তি পেয়েছি।

'মাসখানেক ভারি আনন্দে কেটে গেল। বর্ষা গিয়ে শীত এল। আমি শীতকালে পাহাড়ের মাথায় পার্বতী মন্দিরে উঠি। আগে রোজ উঠতাম, আজকাল হপ্তায় একদিন উঠি। তার বেশী পেরে উঠি না। রোজ দেড়শো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার আর শক্তি নেই।

'একদিন সন্ধ্যের সময় পার্বতী মন্দিরের পাহাড়ে উঠেছি। এই শিখরটা পেশোয়াদের আমলে দুর্গ ছিল, এখনো তার চৌদ্দ হাত চওড়া প্রাকার ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি গিয়ে পশ্চিম দিকের প্রাকারের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসলাম। ঠিক পায়ের তলায় পার্বতী পাহাড়ের গা প্রায় খাড়া নিচে নেমে গেছে। সূর্যাস্তের পর আকাশে রঙের খেলা আরম্ভ হয়েছে। আমি সেই দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

'হঠাৎ মনে হল, আমার পাশে কে বসে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—অনন্তা! তার একটা হাত কনুই থেকে কাটা, সে আমার দু'হাত দূরে বসে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভয়ে আমার দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। তারপর কি করে যে পার্বতী পাহাড় থেকে নেমে

banglabooks.in

এসেছিলাম, তা আমি নিজেই জানি না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পিছু ফিরে দেখবার সাহস হয়নি, কিন্তু মনে হয়েছে অনন্তা পিছনে তেড়ে আসছে, এখনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। পার্বতী পাহাড় থেকে নেমে আমি এক ছুটে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

'সে আজ দশ-বারো দিন আগের কথা।

'তারপর থেকে সন্ধ্যের পর যখনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, হাতকাটা অনন্তা আমার পিছু নিয়েছে; বেশী কাছে আসে না, আট-দশ হাত দূরে থেকে আমার অনুসরণ করে। কিন্তু দিনের বেলা তাকে দেখতে পাই না।

'তাই সন্ধ্যের পর আর বাড়ির বাইরে থাকি না।

'আজ এক বন্ধুর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা ছিল। সন্ধ্যের আগেই সেখানে গিয়েছিলাম; ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, কিন্তু পাল্লায় পড়ে দেরি হয়ে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে বেশ জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলাম।

'আপনার এদিকটা রাত্রিবেলা বেশ নির্জন, কিন্তু এদিক দিয়ে এলে শিগ্‌গির হয়। তাই এই পথেই এলাম। বেশী দূরে আসতে হল না, দেখি অনন্তা নিঃশব্দে আমার পিছু নিয়েছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মত মূর্তি। প্রথমটা দূরে দূরে, তারপর ক্রমশ কাছে আসছে।

'উঠি-পড়ি করে ছুটে চলেছি। বুকের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে; যদি হোঁচট খেয়ে পড়ি আর উঠতে হবে না, হার্টফেল করে মরে যাব। পা দুটো অবশ হয়ে আসছে।

'আপনার বাড়ির সামনে যখন এলাম, তখন অনন্তা প্রায় আমার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। দেখলাম, আপনার সদরে আলো জ্বলছে। আর দ্বিধা করলাম না, এখানেই ঢুকে পড়লাম। নিজের বাড়ি পর্যন্ত যাবার সাহস হল না।'

সত্যবান সিন্ধে চুপ করলেন। আমিও খানিক চুপ করে রইলাম; শেষে বললাম, 'দেখুন, যে অনন্তা ট্রাক চাপা পড়েছিল সে জ্যান্ত মানুষ, কারণ প্রেত গাড়ি চাপা পড়েছে এমন কখনো শোনা যায়নি।'

সত্যবান বললেন, 'কিন্তু তার পরে?'

'তার পরে বলা শক্ত। প্রেতও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। ভেবে দেখুন, অনন্তার হাত কাটা গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রাণটা হয়তো শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিল।'

'কিন্তু আমি যে খবরের কাগজে তার মৃত্যু-সংবাদ পড়েছি। যেদিন দুর্ঘটনা হয়, তার পরদিন 'সকালে' বেরিয়েছিল। লিখেছিল, অনন্তা ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল পৌঁছুবার আগেই মরে গিয়েছিল।'

''তাই নাকি! তাহলে—'

'তাছাড়া, বিবেচনা করুন, আমি সেদিন পার্বতী পাহাড়ে ভাঙা পাঁচিলের কিনারায় বসে-ছিলাম, অনন্তা যদি মানুষ হত তা হলে সে পিছন দিক থেকে আমাকে ঠেলে খাদে ফেলে দিত, আমি মরে যেতাম। ও যে আমার পিছনে লেগেছে, ওর উদ্দেশ্য আমার মৃত্যু ঘটানো। জ্যান্ত অবস্থায় আমাকে মারতে পারেনি, এখন ভূত হয়ে মারবে!—আপনি বলুন, এখন উপায় কী! কেমন করে অনন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাব।'

ভূতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় জানা নেই। চাল-পড়া সর্ষে-পড়া আজকাল আর চলে না। অনেক ভেবে বললাম, 'এ-দেশে পিণ্ডদানের কোনো ব্যবস্থা আছে?'

সত্যবান একটু নিরাশভাবে বললেন, 'আছে। পেন্‌ঢারপুরে পিণ্ডি দেওয়া যায়, আরো দু'একটা জায়গা আছে। কিন্তু অত দূরে যাওয়া কি সম্ভব? অনন্তা আমার পিছু নেবে।'

'তা বটে।'

দু'জনে মুখোমুখি বসে উপায় চিন্তা করতে লাগলাম, বাঘের হাত ছাড়ানো যায়, জঙ্গলে না গেলেই হল; কুমীরকে এড়িয়ে চলা যায়, নদীতে না নামলেই হল। কিন্তু অশরীরীর হাত থেকে নিস্তার নেই। এই সব ভাবছি বটে, কিন্তু মনের সংশয় যাচ্ছে না। সত্যি ভূত বটে তো? ভয় পেলে মানুষ ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে—

হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোটা মিটমিট করে চোখ টিপল। এই রে, এবার বুঝি আলো নিভবে!

banglabooks.in

পুণায় এমন প্রায়ই হয়, হঠাৎ অকারণে আলো নিভে যায়, তারপর কখনো পাঁচ মিনিট কখনো দু-ঘণ্টা অন্ধকারে বসে থাকো।

আলো কিন্তু নিভল না, দু'চার বার মিটমিট করে স্থির হল। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজার ঘণ্টি ক্ষীণভাবে একবার বেজে উঠেই থেমে গেল।

এত রাত্রে আবার কে এল! উঠে গিয়ে সদর দরজা খুললাম। সদর দরজার মাথায় আলো আছে; দেখলাম, একজন লোক দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধোপার পাটে আছড়ালে যেমন দেখতে হয় সেই রকম চেহারা। তার ডান হাতটা কনুই থেকে কাটা।

লোকটা ঝাঁকড়া ভুরুর তলা থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হৃদযন্ত্রটা ধড়ফড় করে উঠল।

তারপর আলো নিভে গেল। আমি হাঁপিয়ে উঠে বললাম, 'কে?' কিন্তু সাড়া পেলাম না। দু'মিনিট পরে আবার আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম, কেউ নেই—লোকটা চলে গেছে। সেরাত্রে সত্যবান সিন্ধেকে টর্চ হাতে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

এই কাহিনী লেখা শেষ করবার পর আজ খবর পেলাম, সত্যবান সিন্ধে পেন্‌ঢারপুর যাচ্ছিলেন, পথে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

১৯ জুন ১৯৬৫

কামিনী

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনটি ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয়। ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুট্‌কেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে অন্য কোনো লটবহর নাই। সুট্‌কেসের মধ্যে আছে এক সেট্ প্যাণ্টলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোস্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং 'তার' দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোস্টমাস্টার, একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোস্ট অফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোস্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোস্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের আহারাদির

banglabooks.in

ব্যবস্থা পোস্টমাস্টারবাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরেনাথবাবু ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়া-চূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে তিনটি পোস্ট অফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরেনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোস্ট অফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুটকেসটি বাঁধিয়া সুরেনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে রাস্তা দু-ফাঁক হয়ে গেছে। ডান-হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরেনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বাঁ-হাতি রাস্তাটা কী দোষ করেছে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভাল নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরেনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। ক'য়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জলা মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরেনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো-চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে!

সুরেনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, কিন্তু বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছিলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে; মাঝখানে উঁচু জমি, তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল; চারিদিক অস্পষ্ট ছায়াছন্ন হইয়া গেল। সুরেনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আগে পাশে নিকটে দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের উপর এক টুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে। সুরেনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারেন, দিক্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোস্টমাস্টার বলিয়াছিলেন বাঁ-হাতি রাস্তাটা ভাল নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ-হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভাল।

সুরেনাথ সাইকেলে চড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোস্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ; কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরেনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরেনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরেনাথ ব্রেক্ কষিলেন।

banglabooks.in

একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশেপাশে অন্য কোনো কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

চাষার মেয়ে। গায়ের রঙ মাজা পিতলের মত পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগল্‌ভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন-রাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

'হ্যাঁগা, তুমি কোথায় যাবে?' যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু কথা বলিবার ভঙ্গী গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্ম-সংযম করিয়া বলিলেন, 'রতনপুর।'

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মন্দ্রকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছুতে পারবে না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?'

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'তারা মাঠে গেছে, সারা রাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা—যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দী-পালির মত ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনি তৈরি করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ-শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখাবিবক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি।' চা দিতে গিয়া আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল—

banglabooks.in

'আমি রান্না চড়াতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন?' ঘরে মুড়ি মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা, মুড়ি মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাত-উপোসী হাতী টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর, একটি রান্নাঘর, অপরটি বোধহয় শয়নকক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভাল হইবে। কোনো মতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ আতপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই; ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে।

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মত খোলের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী।'

নামটা তপ্ত লোহার মত সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মত আবার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা, বাইরে শোবে কি! শীতে কালিয়ে যাবে যে! যাও, বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামীর মত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াই শয়ন করিলেন।

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট্‌খাট্ ঠুন্‌ঠান বাসন-কোশনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র মধুর হাসি।

banglabooks.in

তিন দিন পর্যন্ত সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোস্টমাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কেবল সুরনাথবাবুর জন্য নয়, সেই সঙ্গে পোস্ট অফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোস্টমাস্টার পুলিসে খবর দিলেন।

পুলিস খোঁজ লইল। সুরনাথের যে তিনটি পোস্ট অফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিস তখন রীতিমত তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাত দিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ-হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুট্‌কেস রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে। কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমি'র মত শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিশ হাসপাতালে লাশ চালান দিল।

পোস্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু-বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনীর হাতে পড়েছিলেন! কামিনী ডাইনী এখনো ও তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টরবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়। কিন্তু উনি শুনলেন না।'

৮ আগস্ট ১৯৬৫

কর্তার কীর্তি

বর্ধমান জেলার ধনী ও বনিয়াদি জমিদার বাবু হৃষীকেশ রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমন্তকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কারণ সে তাঁহার মনোনীতা পাত্রীকে উপেক্ষা করিয়া একটি আই-এ পাস করা মেয়েকে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল।

ভয় নাই, ইহা পিতৃরোষপীড়িত হেমন্তের দুর্দশার করুণ কাহিনী নয়। হেমন্তকে শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। বিবাহের পূর্বে সে কলিকাতার একটা বড় কলেজে অধ্যাপনার কাজ পাইয়াছিল; তাহা ছাড়া পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ও ঘরে বসিয়া শিক্ষকতা করিয়াও যথেষ্ট উপার্জন করিত। সুতরাং পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেও, অর্থের দিক দিয়া অন্তত তাহার কোন ক্লেশ হয় নাই।

হৃষীকেশবাবুর মতো বদ্‌রাগী অগ্নিশর্মা লোক আজকালকার দিনে বড়-একটা দেখা যায় না। পুরাকালে বদ্-মেজাজী বলিয়া দুর্বাসা মুনির একটা অপবাদ ছিল বটে, কিন্তু

banglabooks.in

তিনিও অকারণে কাহাকেও অভিসম্পাত দিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। হৃষীকেশ-বাবুর কারণ-অকারণের বালাই ছিল না, তিনি সর্বদাই চটিয়া থাকিতেন। শুনা যায়, সতের বৎসর বয়সে তাঁহার একবার টাইফয়েড হয়, সারিয়া উঠিয়া তিনি তেঁতুলের অম্বল দিয়া ভাত খাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারের আদেশে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, ফলে সেই যে তিনি চটিয়া গিয়াছিলেন সে রাগ তাঁহার এখনও পড়ে নাই। একাদিক্রমে এত বৎসর রাগিয়া থাকার ফলে তাঁহার গোঁফ সমস্ত পাকিয়া গিয়াছিল এবং মাথার সম্মুখ দিকে চুল উঠিয়া পরিষ্কার ও চিক্কণ হইয়া গিয়াছিল। চক্ষু দুটি সর্বদাই কষায়িত হইয়া থাকিত।

রাগের মাত্রা বাড়িয়া গেলে তিনি ঘরের আসবাবপত্র ভাঙিতে আরম্ভ করিতেন। বাড়ির ভঙ্গপ্রবণ জিনিসগুলি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এমন সময় একদিন দৈবাক্রমে হাতের কাছে একটা কাচের গেলাস পাইয়া প্রথমেই সেটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ইন্দ্রজালের মতো কাজ হইল। কাচ-ভাঙার শব্দে কর্তার অর্ধেক রাগ পড়িয়া গেল—সেদিন আর তিনি অন্য কিছু ভাঙিলেন না। অতঃপর তাঁহার রাগের মাত্রা চড়িয়া গেলেই বাড়ির যে-কেহ একটা কাচের গেলাস তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া সবেগে প্রস্থান করিত। তিনি সেটা মেঝেয় আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিতেন। এই অভিনব উপায়ে বাড়ির টেবিল, চেয়ার, আয়না, ঝাড় ইত্যাদি দামী আসবাব অনেকগুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

দুই মাস অন্তর কলিকাতা হইতে এক গ্রোস করিয়া নূতন কাচের গেলাস আনানো হইত। তাহাতেই কোন রকমে কাজ চলিয়া যাইত।

রাগ যখন কম থাকিত, তখন তিনি তাঁহার খাসবেয়ারা গয়ারামকে 'শুয়ারকা বাচ্চা' না বলিয়া স্রেফ্‌ 'হারামজাদা' বলিয়া ডাকিতেন। তখন বাহিরের গোমস্তা হইতে ভিতরে গৃহিণী পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।

দুই বৎসর পূর্বে হেমন্ত যখন জানাইল যে, সে পিতৃনির্বাচিতা কলাবতী নাম্নী একাদশবর্ষীয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিবে না, পরন্তু বেথুন কলেজের একটি অষ্টাদশী মাতৃ-হীনা কুমারীকে বধূরূপে মনোনীত করিয়াছে তখন কর্তা দ্রুতপরম্পরায় তেইশটা গেলাস ভাঙিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তখন তিনি হেমন্তর ঘরে ঢুকিয়া একখানা ছয় ফুট লম্বা ভিনিসীর আয়না পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক ঘোর গর্জনে কহিলেন, "বেরিয়ে যা এখনি আমার বাড়ি থেকে, এক কাপড়ে বেরিয়ে যা! তোর মতো শুয়োরের মুখ দেখতে চাই না।"—বলিয়া হ্রেষাধ্বনির মতো একটা শব্দ করিলেন।

হেমন্ত সেই যে এক কাপড়ে বাহির হইয়া গেল, তাহার পর আজ পর্যন্ত পিতৃভবনে পদার্পণ করে নাই।

হেমন্তর বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াই ছিল,—তাহার মাসীর বাড়ি হইতে বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন-দুই পূর্বে গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে কর্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি কালীঘাট যাব—মানত আছে। শিশিরের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দাও।"

রাগী হইলেও হৃষীকেশবাবু অত্যন্ত কূটবুদ্ধি; গৃহিণীর আর্জি শুনিয়া তিনি হ্রেষাধ্বনিবৎ শব্দ করিলেন, কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "মানত আছে, শিশিরের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও! চালাকি! আচ্ছা, আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি কেমন কালীঘাটের মানত!—গয়া শুয়োরকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গয়া দ্বারের বাহিরে এক গেলাস সরবৎ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরে ঢুকিয়া কর্তার হাতে দিতেই তিনি সেটা দেয়ালে মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন, স-গর্জনে বলিলেন, "ম্যানেজারকে ডাক্‌।"

ম্যানেজার আসিলে তাহাকে হুকুম দিলেন, "খিড়কি আর সদর দেউড়িতে চারটে করে খোট্টা দারোয়ান বসাও। বুড়ী না পালায়!—আর গয়া হারামজাদা তামাক দিয়ে যাক্‌।"

'হারামজাদা' শুনিয়া সকলে বুঝিল গৃহিণীর চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া কর্তা মনে মনে

banglabooks.in

খুশি হইয়া উঠিয়াছেন।

গৃহিণীর কালীঘাটে পূজো দিতে যাওয়া হইল না। ওদিকে হেমন্তর বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিয়াছে। গৃহিণী বাড়ির মধ্যে নজরবন্দী আছেন, একদিনের জন্যও কোথাও যাইতে পান নাই। এমন কি ভগ্নীপতির অতবড় অসুখেও তাঁহাকে বোনের বাড়ি যাইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু শিশিরকে বাড়ির মধ্যে অন্তরীণ রাখা শক্ত। সে কলেজে পড়ে, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে কলিকাতায় মাসীর বাড়ি থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। যা হোক, হৃষীকেশবাবু তাহাকে ডাকিয়া শাসাইয়া দিয়াছেন যে, কোনদিন যদি সে হেমন্তর বাড়িতে যায় কিংবা তাহার সহিত বাক্যালাপ করে তাহা হইলে তাহাকেও তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিবেন।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েকদিন হইতে বাড়ির মধ্যে ভিতরে ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কর্তা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। গত শনিবার শিশির আসিয়াছিল, সে মার কানে ফুস্‌ফুস্ করিয়া কি বলিয়া গেল, সেই অবধি গৃহিণী অতিশয় চঞ্চল ও বিমনা হইয়া বেড়াইতেছেন। গৃহকর্মে তাঁহার মন নাই; একদিন ক্রন্দনরত অবস্থায় কর্তার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু বহু উৎপীড়ন ও তর্জন করিয়াও কর্তা ভিতরের কথা কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সকল প্রশ্নই গৃহিণী উদাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সহ্য করিয়াছেন। তাহাতে আর কিছু না হোক, বাড়িতে কাচের গেলাসের সংখ্যা ভয়ানক দ্রুত কমিয়া আসিতেছে।

একে তো এইরূপ অবস্থা, তাহার উপর আজ সকালে উঠিয়াই কর্তা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছেন। হতভাগ্য সরকার সকালবেলা হুকুম লইতে আসিয়া কর্তার সম্মুখেই হাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। আর যায় কোথা? কর্তা একেবারে হুংকার দিয়া উঠিলেন, "বেয়াদব, উল্লুক কোথাকার! এত বড় আস্পর্ধা! গয়া শূয়োরকা বাচ্চা কোথায় গেল?"

সরকার তো প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু কর্তার সে রাগ সমস্ত দিনে পড়িল না। আজ কিনা সন্ধ্যার সময় আবার শিশির আসিল! নিজের বসিবার ঘর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কর্তা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিশির ঘরে ঢুকিতেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "তুই হেমন্তর বাড়িতে যাস্? সত্যি কথা বল্ হতভাগা, নইলে আজ তোকে মেরেই খুন করব।"

কুড়ি বছরের ছেলে শিশির পিতার মুখের পানে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাঁহার প্রশ্নের হাঁ-না কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

হৃষীকেশবাবু তাঁহার কণ্ঠস্বর তারা গ্রামের ধৈবতে তুলিয়া বলিলেন, "কার হুকুমে তুই সেখানে গিয়েছিলি রে পাজি, নচ্ছার! কি বলেছিলাম তোকে আমি! আমার হুকুম হুকুম নয়, বটে?"

শিশির গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃষীকেশবাবু এক পদাঘাতে জ্বলন্ত কলিকাসুদ্ধ গড়গড়াটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কি করতে তুই গিয়েছিলি সেখানে, বল্ আমাকে! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নিজের মার কাছে এসে ফিসফিস করে কি বলেছিস? বল্ শীগগির হতভাগা, নইলে গাছে বেঁধে তোর গায়ে জলবিছুটি দেওয়াব।"

শিশির ভিতরে ভিতরে মরীয়া হইয়া উঠিল। সে দু-হাত শক্তভাবে মুঠি করিয়া বলিল, "আমি এখন থেকে দাদা-বৌদির কাছেই থাকব ঠিক করেছি। আর—আর মাকেও তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।"

হৃষীকেশবাবু একেবারে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "কী, এতবড় আস্পর্ধা!"

শিশির গোঁ-ভরে বলিয়া চলিল, "আমাকে থাকতেই হবে,—বৌদির শরীর খারাপ, তাঁর—তাঁর—ছেলে হবে—"

হৃষীকেশ আবার চীৎকার করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। সংবাদটা পরিপাক করিতে মিনিটখানেক সময় লাগিল, তারপর পুনশ্চ গর্জন ছাড়িলেন, "ছেলে হবে তো তোর কি রে শূয়োর?"

banglabooks.in

শিশির বলিল, "দাদা সমস্ত দিন বাড়ি থাকেন না, বৌদি একলা, তাই আমাকে থাকতে হবে। আর মাকেও—"

"বেরোও! বেরোও! এই দণ্ডে আমার বাড়ি থেকে দূর হ—নইলে চাবুকে লাল করে দেব। শূয়ার, পাজি, বোম্বেটে কোথাকার! যাবিনে? গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল, নিয়ে আয় আমার হাণ্টার—"

শিশির আর অপেক্ষা করিল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। মার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করা হইল না।

সমস্ত রাত্রি হৃষীকেশ বাড়িময় দাপাইয়া বেড়াইলেন। সেদিন আর ভয়ে কেহ তাঁহার কাছে গেলাস লইয়াও অগ্রসর হইতে পারিল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় স্নানাহার করিয়া তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি সাবধানে থেকো—গিন্নী না পালায়। আর শিশির লক্ষ্মীছাড়া যদি বাড়ি ঢুকতে চায়, মেরে তাড়াবে।—গাড়ি যুততে বলো।"

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "মোটর-কোম্পানির এজেন্টকে আজ ডেকেছিলেন, সে এসেছে। তাকে—"

হৃষীকেশবাবু বলিলেন, "তাকে চুলোয় যেতে বলো। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, নিজে দেখে মোটর কিনব। গাড়ি যুততে বলো।"—বলিয়া চেকবইখানা পকেটে পুরিলেন।

ম্যানেজার "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গাড়িতে স্টেশন যাইতে যাইতে হৃষীকেশ নিজের মনে গর্জিতে লাগিলেন, "কি আস্পর্ধা! আমার সঙ্গে চালাকি! দেখে নেব। আমার বৌ—আমার নাতি! আমি হৃষীকেশ রায়—দেখে নেব কে কি করতে পারে।"

বেলা প্রায় দেড়টার সময় একখানা ঝকঝকে নূতন ফিয়াট্ গাড়ি কলিকাতায় প্রোফেসার হেমন্ত রায়ের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির আরোহী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ছোট্ট সুদৃশ্য বাড়িখানি, চারি ধারে একটুখানি সংকীর্ণ ঘাসের বেষ্টনী; সামনে লোহার ফটক বন্ধ।

হ্রেষাধ্বনি করিয়া হৃষীকেশবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। ফটক খুলিয়া সম্মুখের বন্ধ দরজায় সজোরে কড়া নাড়িলেন। একটা ছোকরা গোছের চাকর দ্বার খুলিয়া সম্মুখে কষায়িত-নেত্র বৃদ্ধ ও তাঁহার পিছনে একখানি দামী নূতন মোটরকার দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বাবু?"

হৃষীকেশবাবু উত্তর না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চাকরটা বলিল, "বাবু বাড়ি নেই, কলেজে গেছেন। তাঁর ফিরতে দেরি আছে।"

হৃষীকেশ কর্ণপাত না করিয়া ভিতরের দিকে চলিলেন। চাকরটা এই অদ্ভুত বৃদ্ধের আচরণ দেখিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের পথ আগলাইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "ওদিকে কোথায় চলেছেন! ওটা অন্দরমহল। বাবু বাড়ি নেই, এসময় আপনি কি চান? আপনার নাম কি?"

হৃষীকেশ শুধু একটি হ্রেষাধ্বনি করিয়া চাকরটার কর্ণধারণপূর্বক এক ধারে সরাইয়া দিলেন। তারপর সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গট্ গট্ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

উপরের একটা ঘরে তখন মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রতিমা ভেল্‌ভেটের জুতার কাপড়ে রেশমের ফুল তুলিতেছিল। কৃশাঙ্গী সুন্দরী, বুদ্ধির বিভায় মুখখানি জ্বলজ্বল, চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো, নূতন সৌভাগ্যের কোন লক্ষণই এখনও দেহে প্রকাশ পায় নাই; তাহাকে দেখিলেই মন খুশি হইয়া উঠে। তাহার হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শিশির কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া লম্বা ভাবে শুইয়া ছিল। গতকল্য বাবার সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বৌদিদিকে বলা যাইতে পারে কিনা, সে

banglabooks.in

মনে মনে তাহাই গবেষণা করিতেছিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—না, বলিয়া কাজ নাই। বৌদিদি দুঃখ পাইবেন মাত্র, আর কোন ফল হইবে না। দাদাকে চুপি চুপি এক সময় বলিলেই হইবে।

বৌদিদির সন্তান-সম্ভাবনার কথা গত সপ্তাহে দাদার মুখে শুনিয়া শিশির আপনা হইতে ছুটিয়া মার কাছে গিয়াছিল। মাও শুনিয়া আনন্দে ও আশঙ্কায় অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কর্তার রোষ-বহ্নি ডিঙাইয়া কিছু করিতে সাহস করেন নাই। গতকল্য শিশির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আবার বাড়ি গিয়াছিল—যেমন করিয়াই হউক মাকে লইয়া আসিবে। তারপরেই সেই বিভ্রাট! মার সঙ্গে শিশির দেখা পর্যন্ত করিতে পাইল না।

এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে শিশির বলিল, "আচ্ছা বৌদি, মা যদি এখন কোন রকমে হঠাৎ এসে পড়েন?"

সম্মুখের দেয়ালে শ্বশুর ও শাশুড়ীর এন্‌লার্জ্‌ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। সেই দিকে চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ শাশুড়ীর ছবির দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতিমা বলিল, "তা যদি হত, ঠাকুরপো—"

শিশির সহসা কনুইয়ে ভর দিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, মাকে যদি চুরি করে নিয়ে আসি—বাবা কিছু টের না পান?"

জিভ কাটিয়া প্রতিমা বলিল, "বাপ রে! তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে? বাবা তাহলে কাউকে আস্ত রাখবেন না।"

বস্তুত, চোখে না দেখিলেও শ্বশুরের মেজাজ সম্বন্ধে কোন কথাই প্রতিমার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে বিবাহ করার ফলেই যে স্বামীর সহিত শ্বশুরের এমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা সে বিবাহের সময় হইতেই জানে। হেমন্ত অবশ্য কোনদিন এ-সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা বলে নাই, কিন্তু শ্বশুরঘরের জন্য সর্বদাই প্রতিমার প্রাণ কাঁদিতে থাকিত। রাগী হউন, কিন্তু শ্বশুর যে কখনই মন্দ লোক নহেন ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর আদরে বঞ্চিত হইয়া এই মেয়েটি যে মনের মধ্যে কতখানি বেদনা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীও কোনদিন জানিতে পারে নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া সে ও-ভাব কখনও ইঙ্গিতেও প্রকাশ করে নাই, পাছে স্বামী উদ্বিগ্ন হন।

শিশির আবার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া শুইয়া ছিল, প্রতিমা ছলছল চক্ষে বলিল, "আমার ভাগ্যে সে কি আর হবে, ঠাকুরপো? বাবা-মাকে আমি এজন্মে চোখে দেখতে পাব না।"—বলিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এমন সময় নিচে হ্রেষাধ্বনির মতো শব্দ শুনিয়া শিশির তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। এ শব্দ তো ভুল হইবার নয়! সে প্রতিমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "বাবা! বাবা এসেছেন!"—বলিয়াই এক লাফে পাশের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রতিমার মুখ সাদা হইয়া গেল, বুক ঢিবঢিব করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিতেই হৃষীকেশবাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম শ্রীহৃষীকেশ রায়। আমি বর্ধমান থেকে আসছি।"—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন।

এইখানে প্রতিমা একটু অভিনয় করিল। মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা জোর করিয়া চাপিয়া সে সচকিতে ফিরিয়া মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিল। বিস্ময়-আনন্দ-ভক্তি-লজ্জা-মিশ্রিত চক্ষে হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—"বাবা!" তারপর গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

অগ্ন্যুদ্‌গারী ভিসুভিয়াসের মাথার উপর উত্তর-মেরুর সমস্ত বরফ চাপাইয়া দিলে কি ফল হয় বলিতে পারি না, হৃষীকেশবাবুরও মুখের কোন ভাব-পরিবর্তন দেখা গেল

banglabooks.in

না। তিনি ক্ষীণভাবে একটু হ্রেষাধ্বনি করিয়া বলিলেন, "তুমিই আমার পুত্রবধূ? তোমার নাম কি?"

"আমার নাম প্রতিমা"—বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছেই বসিয়া পড়িল। এইটুকু অভিনয় করিয়াই তাহার উরু দুটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হৃষীকেশবাবু চাহিয়া দেখিলেন—হাঁ, নাম সার্থক বটে। বধূর মুখ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। শুনিয়াছিলেন বধূ আই-এ পাস, কিন্তু কৈ, তাহার আচরণে বিদ্যাভিমানের কোন চিহ্নই তো নাই। তিনি এক দর্পিতা তীক্ষ্ণভাষিণী যুবতী মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি? হৃষীকেশবাবু মনে মনে একবার হ্রেষাধ্বনি করিলেন, কিন্তু তাহা পুত্রদের উদ্দেশে। হতভাগারা তাঁহাকে বলে নাই কেন!

প্রতিমা শ্বশুরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি বড্ড ঘেমেছেন, জামাটা খুলে ফেললে হত না, বাবা?"

হাতপাখা আনিয়া সে বাতাস করিবার উপক্রম করিতেই হৃষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না, মা। আমি নিজেই বাতাস খাচ্ছি।"—বলিয়া ফেলিয়াই হৃষীকেশবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ ধরনের কথা গত তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুখ দিয়া একবারও বাহির হয় নাই।

পাশের ঘরের দরজায় কান লাগাইয়া শিশির নিস্পন্দ বক্ষে এতক্ষণ শুনিতেছিল; এবার সে পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গিয়া দেয়ালে-টাঙানো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল।

হৃষীকেশবাবু গায়ের জামা খুলিয়া মাদুরের উপর বসিলেন, পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে শয়তানটা ফিরবে কখন? তোমাকে বুঝি এই রকম একলা ফেলে রেখে যায়?"

চোখের জল ও মুখের হাসি একসঙ্গে নিরুদ্ধ করিয়া প্রতিমা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হৃষীকেশবাবু গলা এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "স্টুপিড, বদমায়েস সব! শিশিরটাকেও বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছি। এমন বৌ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল! আজই আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, দেখি কোন্ ব্যাটা কি করতে পারে।"

শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হৃষীকেশবাবু তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া নিজের থানের খুঁট দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া সগর্জনে কহিলেন, "কেঁদো না। আমি এই হেমন্তটাকে দেখে নেব। সব ঐ ছোঁড়ার শয়তানি—আমি বুঝেছি। গিন্নীও এর মধ্যে আছেন। আমাকে এতদিন বলেনি কেন? ষড়যন্ত্র! যত সব চোর-বোম্বেটের দল, নইলে এই বৌকে আমি দু-বচ্ছর বাইরে ফেলে রাখি?"

প্রতিমা শ্বশুরের কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, আমাকে বাড়িতে মার কাছে নিয়ে চলুন।"

"যাবই তো। এখনি নিয়ে যাব। আমি হৃষীকেশ রায়, আমি কি কারু তোয়াক্কা রাখি?" জামাটা গায়ে দিতে দিতে পুনরায় বলিলেন, "তোমায় নিয়ে যাব বলে নতুন মোটর কিনে নিয়ে একেবারে এসেছি। ট্রেনে তো আর তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

হৃষীকেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমা থতমত ভাবে একবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "এক্ষুনি? কিন্তু বাবা—"

হৃষীকেশবাবু চড়া সুরে বলিলেন, "কিন্তু কি? সেই রাস্কেলটার অনুমতি নিয়ে তবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে? (হ্রেষাধ্বনি করিলেন) আমি এই তোমাকে নিয়ে চললাম, ওদের যদি ক্ষমতা থাকে মোকদ্দমা করুক গিয়ে।"

প্রতিমা আর দ্বিরুক্তি করিল না, যেমন ছিল তেমনি বেশে শ্বশুরের সঙ্গে নামিয়া চলিল।

সদর দরজা পর্যন্ত গিয়া হৃষীকেশবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্নভাবে

banglabooks.in

পুত্রবধূর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কিন্তু শুনেছিলাম—ঐ শিশির হতভাগা বলছিল যে, তুমি নাকি—তোমার নাকি—? কোন ভয়ের কারণ নেই তো, মা? মোটরে প্রায় ষাট মাইল যেতে হবে। যদি কষ্ট হয়—যদি কোন রকম—"

আরক্ত মুখ কোনমতে ঘোমটায় ঢাকিয়া প্রতিমা তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়া উঠিল।

তিনটার সময় হেমন্ত বাড়ি ফিরিতেই শিশির ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা! বাবা এসেছিলেন, বৌদিকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আমাদের ক্ষমতা থাকে তো যেন মোকদ্দমা করি!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ভাইয়ের কাছে সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া হেমন্ত স্মিতমুখে বলিল, "সব তো তুই-ই করলি। এখন আমি কি করব উপদেশ দে।"

অতঃপর দুই ভায়ে আধঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বিকাল পাঁচটার গাড়িতে বর্ধমান রওনা হইল।

রাত্রি আটটার সময় বৌমার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া কর্তা দেখিলেন দুই ভাই হেমন্ত ও শিশির মায়ের ঘরের মেঝেয় আহারে বসিয়াছে। গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছেন এবং নববধূ একখানা রেকাবি হস্তে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। হৃষীকেশবাবু ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "এ দুটোকে কে বাড়ি ঢুকতে দিলে? নিশ্চয় খিড়কি দিয়ে ঢুকেছে! হুঁ—আস্পর্ধা! এখনি ওদের বেরিয়ে যেতে বলো।"

হেমন্ত ও শিশির কথা কহিল না, হেঁটমুখে আহার করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "কেন যাবে?—যাবে না। আর যায় যদি, বৌমাকে নিয়ে যাবে। আমিও যাব। দেখি তুমি কি করে আটকাও!"

হৃষীকেশবাবু কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "হুঁ! ভারি আস্পর্ধা হয়েছে। আচ্ছা, এখন কিছু বলছি না, বৌমার শরীর খারাপ, কিন্তু এর পরে—। বৌমা, তুমি শোও গে যাও, হতভাগাদের আর পরিবেশন করতে হবে না।" বলিয়া মধ্যম রকমের একটা হ্রেষাধ্বনি করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানা হইতে কর্তার গলা শুনা গেল, "গয়া হতভাগা কোথায় গেল, তামাক দিয়ে যাক্।"

গয়ারামের এতবড় সৌভাগ্য জীবনে কখনও হয় নাই। সে নববধূ ঠাকুরাণীর পায়ের কাছে ঢিব করিয়া একটা গড় করিয়া বাহিরে ছুটিল।

হেমন্ত ও শিশির মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন, "যাও বৌমা, তোমার শ্বশুর হুকুম দিয়ে গেলেন, আজকের মতো শুয়ে পড়োগে মা, কাল ওদের পরিবেশন করে খাইও।"

১৩ আষাঢ় ১৩৩৯

banglabooks.in

রূপকথা

চায়ের দোকানের অভ্যন্তর। ঘরটি বেশ বড়। কয়েকটি মার্বেল্‌-টপ্‌ টেবিল ও তদুপযোগী চেয়ার ঘরের মধ্যে ইতস্তত সাজানো। ঘরের অপর প্রান্তে একটি রান্নাঘর—খোলা দ্বারপথে কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। রান্নাঘরের দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি সস্‌প্যান ও কাঠের টেবিলের উপর কেট্‌লি পিরিচ পেয়ালা ইত্যাদি আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

দোকানের নাম 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। কলিকাতার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চা ও অনুরূপ খাদ্যপানীয় সরবরাহ করিয়া ইহার সর্বজনপ্রিয় স্বত্বাধিকারী অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের একটি বিশেষ আভিজাত্য আছে—সকল দ্রব্যেরই দাম প্রায় ডবল। সুতরাং সাধারণ চা-খোরদের পক্ষে এস্থান অনধিগম্য, বিত্তবান তরুণ-তরুণীরাই এই 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' সঙ্গত হইয়া থাকেন।

বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে—দোকানের এবং সেই সঙ্গে একটি বিরাট উদরের স্বত্বাধিকারী বেণীখুড়ো ওরফে বেণীমাধব চক্রবর্তী একটি লম্বা টেবিলের উপর শয়ন করিয়া পিরান ও কাপড়ের ফাঁকে নাভিমণ্ডল উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নাসিকার উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বর একটানা করাতের মত ঘরের স্তব্ধতাকে কর্তন করিতেছে।

দোকানের একমাত্র ভৃত্য বিদ্যাধর—একাধারে পাচক এবং পরিবেশক—অন্য একটা টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের পিছনের পায়া-যুগলের উপর দেহের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া মৃদু-মন্দ দুলিতেছে ও একমনে একটি বহুব্যবহারে মলিন ও ছিন্নপ্রায় পত্র পাঠ করিতেছে। বিদ্যাধর যুবাবয়স্ক—দেখিতে সুশ্রী, তাহার গায়ে সস্তা ছিটের পিরান, কাপড়ের কোঁচার অংশটা দুপাট করিয়া কোমরে জড়ানো।

বিদ্যাধর চিঠিখানার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল,—গন্ধ ছিল এখন প্রায় উবে গেছে। জাসমীনের গন্ধ। গুরুমা হলে কি হয়, প্রাণে সখ আছে। (পত্র খুলিয়া পাঠ) 'বন্ধুবর!' ইঃ, যেন বন্ধুবরের জন্য বুক ফেটে যাচ্ছিল। বন্ধুবর না লিখে শুধু বর লিখলেই তো ন্যাটা চুকে যেত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না, তা লিখবে কেমন করে? সে তো আর আমি নই, সে যে আর একজন। লিক্‌লিকে চেহারা, ঘাড়ছাঁটা চুল, কোট-সোয়েটার পরা, মেয়েলি মেয়েলি গড়ন—দেখলেই জুতো-পেটা করতে ইচ্ছে করে। মুখখানা পেছন থেকে দেখতে পেলুম না। দেখিনি ভালই হয়েছে! ঘাড়ের চুলগুলো যেন মুর্গীর বাচ্চার মত, মুখখানাও নিশ্চয় প্যাঁচার বাচ্চার মত হবে। দূর হোক গে! (পত্রপাঠ) 'আমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, ষাট টাকা মাহিনা পাই। তার উপর সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীনা—বংশমর্যাদাও কিছু নাই। যিনি আমার স্বামী হইবেন তাঁহাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই। রূপ ক'দিনের? গুণও নাই। তাই স্থির করিয়াছি ইহজীবনে বিবাহ করিব না। নিঃস্ব ভাবে রিক্ত হস্তে কাহারো গলগ্রহ হইতে চাহি না। ছোট ছোট মেয়েদের গুরুমা হইয়াই আমার জীবন কাটাইতে হইবে। তবে যদি দৈবক্রমে কোনদিন অর্থশালিনী হই, তবেই যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। ইতি

বিনীতা—মঞ্জুষা

—হুঁ! এতদিনে তাঁহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা হয়ে গিয়েছে। এখন তো আর ষাট টাকা মাইনের গুরুমাটি নয়—লক্ষপতি। সে বেটাছেলে নিশ্চয় আরো দুখানা মোটর কিনেছে। এতদিন হয়তো ছেলেপুলে—। দূর! এই তো মোটে তিন মাস! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তিনশ' বছর! চুলোয় যাক গে, আমি তো বেশ আছি। নিজে রোজগার করে খাচ্ছি, কোনো ভাবনা নেই। বেঁচে থাক বেণীখুড়ো আর তার রেস্তোরাঁ! (কিছুক্ষণ নিদ্রিত বেণীকে নিরীক্ষণ করিয়া) খুড়োর নাকে রসুনচৌকী বাজছে। ওর পেটে বোধ হয় একটা ব্যাগপাইপ লুকোনো আছে—ঘুমলেই বাজতে আরম্ভ করে। (সস্নেহে) খুড়োর আমার ভেতরে-বাইরে সমান—পেটেও ব্যাগপাইপ প্রাণেও ব্যাগপাইপ! অথচ সারাটা জীবন

banglabooks.in

হোটেল করে কাটিয়ে দিলে। এই দুনিয়া! (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া) কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলকাতা! খুব লম্বা পাড়ি জমানো গেছে, এখানে চেনা লোকের সঙ্গে থামকা মাথা ঠোকাঠুকি হবার ভয় নেই। তার ওপর যে রকম গোঁফ আর জুলপি গজানো গেছে, দেখা হলেও কেউ সহজে চিনতে পারবে না। উপরন্তু গোদের উপর বিষ-ফোড়া আছে—ইউনিফর্ম। ছদ্মবেশ দিব্যি পাকা রকম হয়েছে। (চিঠিখানা মুড়িতে মুড়িতে) আমি তো খাসা আছি—কিন্তু আর কিছু নয়, মঞ্জুষারানী কেমন আছেন, কি করছেন তাই জানতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে নয়। হয়তো সে বেটা মাতাল—আমার টাকাগুলো নাহক শুঁড়ির বাড়ি পাঠাচ্ছে—ওকে হয়তো যন্ত্রণা দিচ্ছে! যাক গে। যেমন কর্ম তেমনি ফল,·আমি আর কি করব? মাতালের শ্রীচরণে যখন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তখন মাঝে মাঝে লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে বৈ কি! টাকাগুলো হয়তো এর মধ্যে সব ফুঁকে দিয়েছে, মঞ্জুষারানী আবার যে গরুমা সেই গরুমা। না, অতটা পারবে না। দু'লাখ টাকা তিন মাসের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া সহজ মাতালের কর্ম নয়।—

দেওয়ালে টাঙানো জাপানী ঘড়িতে ঠং করিয়া আড়াইটা বাজিতেই বেণীমাধবের নাসিকাধ্বনি অর্ধপথে হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেল। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া দিগন্তপ্রসারী একটি হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন, বিদ্যে ওঠ্ বাবা ওঠ্, আর দেরি করিসনে, আড়াইটে বেজে গেল, উনুনে আগুন দে। এখুনি ছোঁড়াছুঁড়িরা—কি বলে ভাল—ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা আসতে আরম্ভ করবে।

বিদ্যাঃ তার এখনো ঢের দেরি আছে খুড়ো।

বেণীঃ না না, তুই ওঠ্, মাণিক আমার, উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের জলটা চড়িয়ে দে। আমার একটু চোখ লেগে গিছল। বলি হ্যাঁরে, আইস্ক্রীমটা ঠিক করেছিস তো? কাটলেটের মাছ আর মাংস দিয়ে গেছে তো—?

বিদ্যাঃ হ্যাঁ—

বেণীঃ তাহলে আর আলিস্যি করিসনে বাবা আমার, উঠে পড়্। এই বেলা গোটাকতক ভেজে রাখ্, তখন গরম করে দিলেই হবে। নইলে ভিড়ের সময় যুগিয়ে উঠতে পারবিনে। ঢাকাই পরটাগুলো—?

বিদ্যাঃ যাচ্ছি খুড়ো, অত তাড়া কিসের! আজ তোমার বেশী খদ্দের হবে না!

বেণীঃ (বিরক্ত হইয়া) ঐ তোর ভারি দোষ বিদ্যে, বড় কথা কাটিস। হোটেল করে করে আমার দাড়ি পেকে গেল, তুই আমাকে শেখাতে এসেছিস আজ খদ্দের হবে কিনা। বলি, আজ শনিবার সেটা খেয়াল আছে?

বিদ্যাঃ আছে, কিন্তু আজ ব্যারাকপুরে রেস আছে সেটাও যে ভুলতে পারছি না খুড়ো।

বেণীঃ হাত্তোর রেসের নিকুচি করেছে—রোজ রেস রোজ রেস!—আচ্ছা, রেসের দিন ছোঁড়াছুঁড়িরা আসে না কেন বলতে পারিস?

বিদ্যাঃ রেসে হেরে গিয়ে ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়ে কিনা খুড়ো, তাই আসে না। তখন আমার কাটলেটও আর মুখে রোচে না।

বেণীঃ ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। তা মাছ মাংস কম করে নিয়েছিস তো?

বিদ্যাঃ হ্যাঁ—সেজন্য ভেবো না—

বেণীঃ (উঠিয়া আসিয়া বিদ্যাধরের চিবুক স্পর্শ করতঃ চুম্বন করিয়া) জ্যালা মোর বাপ রে। সোনারচাঁদ ছেলে। তোর কাছে মিথ্যা বলবো না বিদ্যে, হোটেল আমি ঢের করেছি কিন্তু কপাল খুলল আমার তোর পয়ে। আজকাল তোর তৈরি কাটলেট আর ঢাকাই পরটা খেতে ছোঁড়াছুঁড়ির ভিড় দেখি আর ভাবি, এমন দিনও আমার গেছে যখন কারখানার ওড়িয়া মিস্তিরিদের ভাত রেঁধে খাইয়ে আমার দিন কেটেছে। তখন দিনান্তে পাঁচ গণ্ডা পয়সা আমার বাঁচত। ঝাড়া-হাত-পা রাঁড় মনিষ্যি বলেই পেরেছিলুম, নইলে মাগছেলে নিয়ে ন্যাঙ্গাল্ হয়ে পড়লে কি পারতুম, না এই বুড়ো বয়সে.তোর কল্যাণে দুটো পয়সার

banglabooks.in

মুখ দেখতে পেতুম?

বিদ্যাঃ (পা নামাইয়া বসিয়া) তবেই বল খুড়ো, আমি না হলে তোমার কিছুই হত না?

বেণীঃ কিছু না রে বাবা, কিছু না। এই যে সব ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল, আসবাব, এত টাকা ভাড়া দিয়ে শহরের মাঝখানে দোকান—এসব স্বপ্নই রয়ে যেত। 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' কেবল তোর পয়ে।

বিদ্যাঃ খুড়ো, এই জন্যেই তো তোমায় এত ভালবাসি। অন্য মনিব হলে আমাকেই বোঝাতে চেষ্টা করত যে তার পয়ে আমার কপাল খুলেছে। ভুলেও মানত না যে আমার কোনো কৃতিত্ব আছে, পাছে আমার দেমাক বেড়ে যায়, বেশী মাইনে চেয়ে বসি।

বেণীঃ দূর পাগল! ভুল বোঝালে কি ভবি ভোলে রে? তোর আমার কাছে যতদিন থাকবার ততদিন থাকবি, তারপর যেদিন কাজ ফুরুবে সেদিন কারণে-অকারণে আপনিই চলে যাবি। তোকে আমি ধরেও আনিনি, ধরে রাখতেও পারব না। কেউ কি তা পারে? দুনিয়ার এই নিয়ম।

বিদ্যাঃ রসো খুড়ো, তোমার দর্শনশাস্ত্র পরে শুনবো। এইবার চট করে একটা উনুনে আগুন দিয়ে আসি।

বিদ্যাধর প্রস্থান করিল। ঘরের এককোণে একটি কাঠের ছোট টেবিল ও টুল রাখা ছিল। টেবিলের উপর বেণীমাধবের ক্যাশবাক্স। এইখানে বসিয়া তিনি খদ্দেরের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন। কসি হইতে চাবি বাহির করিয়া বেণী ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি পুস্তক বাহির করিলেন, তারপর টুলের উপর বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

থেলো হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বিদ্যাধর প্রবেশ করিল।

বিদ্যাঃ (হুঁকা বেণীমাধবকে দিয়া) এই নাও টানো—আবার সেই 'শিহরণ-সিরিজ' বার করেছে? এটা কি দেখি—ওঃ একেবারে 'গুদামে গুমখুন' (উচ্চহাস্য) আচ্ছা খুড়ো, এগুলো পড়তে তোমার ভাল লাগে?

বেণীঃ তা লাগে বাবা, মিথ্যে বলব না। তোর মত পেটে বিদ্যে নেই, ইংরেজী খবরের কাগজটা পর্যন্ত পড়তে পারি না। তাই এই সব বইয়ে বিলিতী মেমসাহেবদের কেচ্ছা পড়ে একটু আনন্দ পাই।

বিদ্যাঃ আমার পেটে বিদ্যে আছে তুমি জানলে কোত্থেকে খুড়ো?

বেণীঃ জানি রে বাবা জানি, ওকি আর চেপে রাখা যায়। আজকাল লেখাপড়া শিখে গেরস্তর ছেলেদের এই দুর্দশাই তো হয়েছে। আমি কত সোনারচাঁদ ছেলেকে রাস্তায় রাস্তায় আলুর চপ, গরম ফুলুরি ফেরি করতে দেখেছি। লজ্জায় ভদ্দরলোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে চায় না, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে পিরান গায়ে দিয়ে ছোটলোক সেজে বেড়ায়। তুইও সেই দলের। কিন্তু এত লেখাপড়া শিখেও এমন রাঁধতে শিখলি কোত্থেকে সেইটেই বুঝতে পারি না!

বিদ্যাঃ তা জানো না খুড়ো? ভারতবিখ্যাত পীরু বাবুর্চির নাম শোনোনি কখনো? দেড়শ' টাকা তাঁর মাইনে, রাজা-রাজড়া তাঁর হাতের হোসেনী কাবাব খাবার জন্যে লালায়িত। এহেন পীরু মিঞা হচ্ছেন আমার গুরু। দুটি বছর তাঁকে মাইনে দিয়ে রেখে—ওর নাম কি—তাঁর পায়ের কাছে বসে রান্না শিখেছি। রান্নার এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তিনি—শুক্তুনি থেকে পেঁয়াজের পরমান্ন পর্যন্ত সব রান্নার হুনুরী—সকালবেলা তাঁর নাম স্মরণ করলে পুণ্য হয়। (উদ্দেশে প্রণাম) ভাগ্যে তাঁর কাছে শিখেছিলুম, নইলে আজ আমার কি দুর্দশাই না হত খুড়ো?

বেণীঃ আচ্ছা বিদ্যে, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই তিনমাস আমার কাছে আছিস, একদিনের তরেও তো তোকে বাড়ি যেতে দেখলুম না? তোর বাড়ি কোথায়—বাপ, মা, ভাইবোন সব আছে তো? তাদের একবার খোঁজখবর নিস না কেন? খালি দেখতে পাই, মাঝে মাঝে একখানা চিঠি বার করে বিড় বিড় করে পড়িস। বলি, বাড়ি থেকে ঝগড়া-

banglabooks.in

ঝাঁটি করে পালিয়ে আসিসনি তো?

বিদ্যাঃ ওসব কথা ছাড়ান দাও খুড়ো। আমার তিনকুলে কেউ নেই, তোমার মত ঝাড়া-হাত-পা লোক। তাই তো তোমার সঙ্গে জুটে গেছি। রতনেই রতন চেনে কি না। তুমি এখন তোমার 'গুদামে গুমখুন' আরম্ভ কর, আমি একবার ওদিকটা দেখি। এখনি হয়তো লোক এসে পড়বে।

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল। বেণী হুঁকা টানিতে টানিতে পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাধর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ বলিল,—খুড়ো, একটা গল্প শুনবে? তোমার শিহরণ সিরিজের চেয়ে ভাল গল্প।

বেণীঃ (বই মুড়িয়া) বলবি? আচ্ছা, তবে তাই বল্। অনেক ভাল ভাল ইংরিজী বই পড়েছিস সেই থেকে একটা বল্ শুনি। এমন গল্প বলিস বিদ্যে, যেন শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিদ্যাঃ আচ্ছা বেশ। (গলা সাফ করিয়া) এক রাজপুত্তুর ছিল—অর্থাৎ কিনা—

বেণীঃ (করুণ ভাবে) ওরে, এ যে রূপকথা আরম্ভ করলি বিদ্যে! আমার কি আর রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুরের গল্প শোনবার বয়স আছে!

বিদ্যাঃ রূপকথা নয়, তবে কতকটা আরব্য উপন্যাসের মত বটে। আচ্ছা, রাজপুত্তুরকে না হয় ছেড়ে দিলুম,—ধর, এক মস্ত বড়মানুষের ছেলে।

বেণীঃ নাম কি?

বিদ্যাঃ (মাথা চুলকাইয়া) নাম? মনে কর—রণেন্দ্র সিংহ। কেমন, জমকালো নাম কিনা? তোমার 'গুদামে গুমখুন'-এ এমন নাম আছে?

বেণীঃ না,—তারপর—বল্—

বিদ্যাঃ কি আশ্চর্য খুড়ো, এতদিন লক্ষ্য করিনি! কিন্তু আমাদের সাধারণ বাঙালীর ঘরে সময় সময় এমন এক একটা নাম বেরিয়ে পড়ে যা 'দুর্গেশনন্দিনী' 'জীবনপ্রভাত' খুঁজলেও পাওয়া যায় না। 'রণেন্দ্র সিংহ' শুনলে মনে হয় না যে, নামটা একখানা আনকোরা ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে পেড়ে এনেছে? অথচ—সে যাক, এখন গল্পটা শোনো। এই রণেন্দ্র সিংহের অনেক টাকা; বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়, অন্তত ছেলেপুলে অন্ধকারে দেখলে ডরিয়ে ওঠে না। তার বিয়ে হয়নি, কারণ বাপ বিয়ে দেবার আগেই মারা গেছেন। রাজধানীতে সাতমহল বাড়িতে একলা থাকে, কারুর তোয়াক্কা রাখে না। যেন একটি ছোটখাটো নবাব।

এহেন রণেন্দ্র সিংহ একদিন এক মেয়ে-ইস্কুলের গুরুমার সঙ্গে—থুড়ি—এক ঘুটে-কুড়ুনী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ে দেখতে ঠিক একটি রজনীগন্ধার কুঁড়ির মত। বলি, রজনীগন্ধার কুঁড়ি দেখেছ তো?

বেণীঃ দেখেছি রে বাপু, হগ সাহেবের বাজারে ফুলের দোকানে। তুই বলে যা না।

বিদ্যাঃ রণেন্দ্র সিংহ সেই রজনীগন্ধার কুঁড়ির প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল; শেষে তার এমন অবস্থা হল যে, মেয়ে-ইস্কুল না হয়ে যদি ছেলে-ইস্কুল হত তাহলে পোড়ো সেজে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়তেও সে দ্বিধা করত না—এঃ যা। কি বলতে কি বলে ফেল্‌ছি খুড়ো, আমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ের কথা বলতে কেবলি গুরুমা'র কথা বলে ফেলছি—

বেণীঃ তা হোক, আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। তুই বলে যা।

বিদ্যাঃ যা হোক, অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে রণেন্দ্র সিংহ শেষে মেয়েটির সঙ্গে ভাব করলে। মেয়েটির নাম—ধর, মঞ্জুষা। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হল। ক্রমে রোজ সন্ধ্যাবেলা মেয়েটির কুঁড়ে ঘরে দুজনের দেখা হতে লাগল। হাসি-গল্প, গান, চা-চকোলেটের ভিতর দিয়ে বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়ে উঠল। দূর থেকে দেখেই রণেন্দ্র সিংহ যাকে ভালবেসেছিল, এত কাছে পেয়ে তার প্রেমে একেবারে ডুবে গেল। নিজের বলে তার আর কিছু রইল না।

এমনি ভাবে মাস দুই কাটবার পর রণেন্দ্র সিংহ একদিন মঞ্জুষার কাছে বিয়ের প্রস্তাব

banglabooks.in

করলে। মঞ্জুষারাণীর মুখখানি লাল হয়ে উঠল,—এক মুহূর্তে রজনীগন্ধার কুঁড়ি ডালিম-ফুলের কুঁড়িতে পরিণত হল। তারপর কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে বললে—'না।' রণেন্দ্র সিংহের বুকের রক্ত থেমে গেল, সে জিজ্ঞেস করলে—'কারণ জানতে পারি কি?'

মঞ্জুষা বললে—'চিঠিতে জানাব।'

খালি বুক নিয়ে রণেন্দ্র সিংহ তার সাতমহল বাড়িতে ফিরে এল।

পরদিন মঞ্জুষার চিঠি এল। সে লিখেছে—সে গরীবের মেয়ে, বড়মানুষের ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। এমন কি, বিয়ে করতেই তার ঘোর আপত্তি। তবে যদি ভগবান কখনো তাকে টাকা দেন তখন সে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করবে—নচেৎ বিয়ে-থাওয়ার কথা ঐ পর্যন্ত!

চিঠি পড়ে আহ্লাদে রণেন্দ্র সিংহের বুক নেচে উঠল; সে তখনি ছুটল উকিলের বাড়ি। উকিলকে দিয়ে এক দলিল তৈরি করালে। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকাকড়ি যা ছিল সব ঐ ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ের নামে দানপত্র করে দিল। তারপর দানপত্র হাতে করে সন্ধ্যেবেলা মেয়েটির বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

বাড়িতে ঢোকবার আগেই রণেন্দ্র সিংহ দেখতে পেলে, দোতলার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জুষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কে একজন তাকে চুমু খাচ্ছে। জানলা দিয়ে তাঁদের কোমর পর্যন্ত দেখা গেল। যে লোকটা চুমু খাচ্ছে তার সরু লিক্‌লিকে চেহারা, ঘাড়ে ছাঁটা চুল, গায়ে কোট-সোয়েটার। রণেন্দ্র সিংহ তার মুখ দেখতে পেলে না। পা টিপে টিপে চোরের মত বাড়ি ফিরে গেল।

সে রাত্তিরটা রণেন্দ্র সিংহ ঘুমোতে পারলে না। পরদিন সকালে উঠে রেজিস্ট্রি করে দানপত্রটা ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে সে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ল।

বেণী: সব দিয়ে দিল? দানপত্রটা ছিঁড়ে ফেলল না? দূর আহাম্মক!

বিদ্যা: রণেন্দ্র সিংহটা ঐ রকম আহাম্মক ছিল, সব দিয়ে দিলে। ভাবলে টাকা পেলেই যখন মেয়েটা যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে পারবে তখন তাই করুক।

বেণী: হাঁদাগোবিন্দ রণেন্দ্র সিংগির কি দশা হল?

বিদ্যা: কি জানি। হাঁদাগোবিন্দদের যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে বোধ হয়? পথে পথে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেণী: আর মেয়েটা?

বিদ্যা: সে এখন বিয়ে-থা করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে আর মাতালটার লাথি-ঝ্যাঁটা খাচ্ছে। এতদিনে রণেন্দ্র সিংহের টাকাগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে।

বেণী: মাতাল, টাকা উড়িয়ে দিয়েছে,—এত খবর তুই জানলি কি করে?

বিদ্যা: এর আর জানাজানি কি? এ তো দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

বেণী: (বহুক্ষণ হুঁকায় টান দিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) তোর গল্প একদম বাজে, শেষের দিকে মন একেবারে খিঁচড়ে যায়। তার চেয়ে আমার শিহরণ-সিরিজ ঢের ভাল; শেষ পাতায় নায়ক-নায়িকা চুমু খেয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। (সহসা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া বিদ্যাধরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) তবে কি জানিস রে বাবা, মরদের বাচ্চা—কিছুতেই দমতে নেই। কোথাকার ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ে নিজের মাথা খেয়ে ফিরে চাইল না বলে কি প্রাণটাকে তাচ্ছিল্য করে নষ্ট করে ফেলতে হবে? আবার দেখবি, কত রাজার মেয়ে ঐ রণেন্দ্র সিংগির জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্কুলের মাস্টারনী কদর বুঝলে না বলে কি মণিমুক্তোর দাম কমে যাবে! দেখিস, ঐ রণেন্দ্র সিংগির একদিন রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিদ্যা: তা যদি হতে পারত খুড়ো তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব তোমাকে, রণেন্দ্র সিংহটা এমনি আহাম্মক যে ঐ ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে চায় না। রাজকন্যার ওপর তার একটুও নজর নেই।

বেণী: বিদ্যে, যা বাবা তুই কাটলেট ভাজগে যা। আর বুড়ো মানুষকে দুঃখ দিসনে। তোর গল্প আর আমি শুনতে চাই না।

banglabooks.in

এই সময় দোকানের সামনে একটি মোটর আসিয়া থামিল। বেণী উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে টাঙানো একটি কালো রঙের গলাবন্ধ কোট পরিধান করিতে করিতে বলিলেন—'বিদ্যে, শিগ্‌গির যা ইউনিফর্ম পরে নে। খদ্দের আসতে শুরু করেছে।'

বিদ্যাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল।

বহির্দ্বার দিয়া একটি তরুণীর প্রবেশ। সুন্দরী তন্বী, চোখে বিষাদের ছায়া। পায়ে হাই-হীল সোয়েড জুতা, পরিধানে দামী সিল্কের বেগুনী রঙের শাড়ি ও ব্লাউজ। হাতে একগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। বাম কব্জীতে একটি গিনির মত পাতলা ক্ষুদ্র ঘড়ি। গলায় প্লাটিনামের সরু হারে একটি হীরার লকেট ঝুলিতেছে। কানে কোন অলংকার নাই। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ, এলো খোঁপার আকারে জড়ানো।

বেণীঃ (সহর্ষে হাত ঘষিতে ঘষিতে) আসুন মা লক্ষ্মী আসুন, এই চেয়ারটিতে বসুন। —এখনো ফাগুন মাস শেষ হয়নি, এরি মধ্যে কি রকম গরম পড়ে গেছে দেখছেন? পাখাটা খুলে দেব কি?

তরুণী ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; বেণী পাখা খুলিয়া দিলেন।

বেণীঃ (হাত ঘষিতে ঘষিতে) তা আপনার জন্য কি ফরমাস দেব বলুন তো? চা? কোকো? না, এ গরমে চা কোকো চলবে না। ঘোলের সরবৎ? চকোলেট ড্রিঙ্ক? আইস্‌ক্রীম? যা চাইবেন তাই তৈরি আছে। আমি বলি, এক গেলাস বরফ দেওয়া ঘোলের সরবৎ খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে নিন, তারপর দুখানা ক্রীম কেক—কিম্বা যদি ইচ্ছা করেন দুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট—

তরুণীঃ চা দিন এক পেয়ালা—

বেণীঃ চা? যে আজ্ঞে, তাই দিচ্ছি। এ সময় চায়ে খুব তেষ্টা নাশ করে বটে! ওরে বিদ্যে, অর্ডার নিয়ে যা—

অদ্ভুত ইউনিফর্ম পরিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

নিম্নাঙ্গে চুড়িদার পায়জামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে জরীর কাজকরা নীল রঙের ফতুয়া, মাথায় হাঁড়ির মত আকৃতি-বিশিষ্ট এক টুপি। এই ইউনিফর্ম বিদ্যাধরের স্বকল্পিত সৃষ্টি।

তরুণীর সম্মুখবর্তী হইয়াই বিদ্যাধর ভীষণ মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল।

তরুণী অন্যমনস্ক ভাবে হাতের উপর চিবুক ও টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া বসিয়া ছিলেন—কিছু লক্ষ্য করিলেন না।

বেণীঃ (বিদ্যাধরকে একটা গুপ্ত ঠেলা দিয়া নিম্নস্বরে) ও কি, অমন করে দাঁত মুখ খিঁচুচ্ছিস কেন? অর্ডার নে।

বিদ্যাঃ (বিকট স্বরে) কি চাই?

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ বিদ্যাধরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিদ্যাধর পূর্ববৎ মুখভঙ্গী করিতে লাগিল।

তরুণীঃ (অধর দংশন করিয়া) চা চাই—একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনি ব্যারাকপুর রেসে যেতে হবে।

বিদ্যাধর পিছু হটিয়া প্রস্থান করিল।

বেণীঃ দু'মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে—সব তৈরি আছে। তা শুধু চা কি ঠিক হবে? সেই সঙ্গে দুটো কাটলেট—বিদ্যের হাতের কাটলেট এ অঞ্চলে বিখ্যাত—একবার মুখে দিলে আর ভুলতে পারবেন না।

তরুণীঃ (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা, আনতে বলুন—

বেণীঃ (নেপথ্যের উদ্দেশে) এক পেয়ালা চা, দুখানা কাটলেট, জলদি। (তরুণীর দিকে ফিরিয়া) মাঠাকরুণ এর আগে কখনো 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' পায়ের ধুলো দেননি, নইলে আগেই বিদ্যের কাটলেট অর্ডার দিতেন। কলকাতায় যত ভাল-ভাল তরুণী আছেন সবাই এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে থাকেন। অন্ততঃ হপ্তায় একবার বেণী খুড়োর হোটেলে আসাই চাই। তাঁদেরই দয়ায় বেঁচে আছি।

banglabooks.in

তরুণীঃ আমি কলকাতায় থাকি না। কখনও কখনও আসি।

বেণীঃ রেস খেলতে এসেছেন বুঝি? আজকাল অনেক মেয়েরা বাইরে থেকে আসেন—

তরুণীঃ না, রেস খেলতে নয়, রেসে যাচ্ছিলুম অন্য কাজে—আপনিই বুঝি এই রেস্তোরাঁর মালিক?

বেণীঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মালিক বটে তবে বিদ্যেই সব করে; আমি শুধু পয়সা কুড়োই।

তরুণীঃ আপনার ঐ চাকরটির নাম বিদ্যে? ও কি বাঙালী?

বেণীঃ বাঙালী বই কি, আসল বাঙালী। কায়েতের ছেলে। কিন্তু ওর নাম বিদ্যে নয়, (গলা খাটো করিয়া) ও মস্ত বড়মানুষ ছিল—নানান্ ফেরে পড়ে এখন গরীব হয়ে গেছে, তাই হোটেলে চাকরি করছে। ওর বাড়ি বোধ হয়—

চা ও কাটলেটের প্লেট লইয়া বিদ্যাধর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ প্রচণ্ড ভাবে উপর্যুপরি হাঁচিতে আরম্ভ করিল। বেণী ফিরিয়া দেখিলেন বিদ্যাধর গলা ও মাথার চারিপাশে একটা কম্ফর্টার জড়াইয়া আরও অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

বেণীঃ (কাছে গিয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্তভাবে) এসব তোর কি হচ্ছে বিদ্যে? গলায় কম্ফর্টার জড়িয়েছিস কেন, অত হাঁচ্ছিস কেন?

বিদ্যাঃ (বেণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) খবরদার খুড়ো, একটি কথা বলেছ কি এক কামড়ে তোমার কানটি কেটে নেব, একেবারে ভুবনের মাসী হয়ে যাবে। যা করছি করতে দাও—কথাটি কোয়ো না।

বেণী বিহ্বল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিদ্যা চা ও কাটলেট তরুণীর সম্মুখে রাখিল।

বিদ্যাঃ আমি বিদ্যে, আমার সর্দি হয়েছে—হাঁচ্ছি,—হাঁ—চ্ছি—

তরুণীঃ সর্বনাশ। আমার চায়ে হেঁচে দাওনি তো?

বিদ্যাঃ না—না—চায়ে আমি হাঁচি না—হাঁ—চ্ছি—

তরুণীঃ কিন্তু চা একেবারে তৈরি করে নিয়ে এলে কেন? আমি যে চায়ে চিনি খাই না।

বিদ্যাঃ খেয়ে দেখুন, চায়ে চিনি নেই—

(হাঁচিতে হাঁচিতে প্রস্থান)

(তরুণী এক চুমুক চা পান করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে বেণীকে ডাকিলেন, বেণী নিকটে আসিলেন।)

তরুণীঃ দেখুন, আপনার এই চাকরটি বোধ হয় পাগল।

বেণীঃ (মাথা নাড়িয়া) না, পাগল তো ছিল না তবে আজ হঠাৎ কেমন ধারা হয়ে গেছে। (গলা খাটো করিয়া) আমার কান কামড়ে নেবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল।

তরুণীঃ সে কি! তবে তো একেবারে উন্মাদ!

বেণীঃ না, উন্মাদ নয়, এই খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত বেশ সহজ ভাবে কথা কইছিল। ওর কিছু একটা হয়েছে—

তরুণীঃ যদি উন্মাদ না হয় তা হলে নিশ্চয় অন্তর্যামী, নইলে আমি চায়ে চিনি খাই না জান্‌লে কি করে?

বেণীঃ (চিন্তিতভাবে) সত্যিই তো! জান্‌লে কি করে? বিদ্যে, এদিকে আয়—

তরুণীঃ থাক, ওকে ডাকবার দরকার নেই। ভাল 'ওয়েটার'রা সাধারণতঃ অন্তর্যামী হয়ে থাকে—ওতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। (চা পান করিতে করিতে) আচ্ছা, আপনার দোকানে তো অনেক লোক আসে যায়, আমি একজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান দিতে পারেন? তারি খোঁজে আজ রেসকোর্সে যাচ্ছিলুম, সেখানে অনেক লোক যায়, যদি তার দেখা পাই।

বেণীঃ (সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিয়া) কি রকম লোক তুমি খুঁজছ মা-ঠাক্‌রুণ, তার বর্ণনাটা একবার দাও তো শুনি। তার নাম ধাম চেহারার একটা আন্দাজ দাও, দেখি

banglabooks.in

যদি বেরিয়ে পড়ে।

তরুণী: নাম জেনে বিশেষ সুবিধে হবে না, কারণ সম্ভবতঃ সে ছদ্মনামে বেড়াচ্ছে। যা হোক, কাজ চালানোর জন্যে ধরে নেওয়া যাক যে তার নাম—রণেন্দ্র সিংহ।

বেণী: কি নাম? রণেন্দ্র সিংহ?

তরুণী: মনে করুন রণেন্দ্র সিংহ। কেন, এ ধরনের নাম কি আপনি পূর্বে শুনেছেন নাকি?

বেণী: হুঁ, শুনেছি বলেই মনে হচ্ছে, তবে লোকটাকে যে চিনি সে কথা এখনো জোর করে বলতে পারছি না। লোকটির আর সব পরিচয়?

তরুণী: দেখুন, লোকটির পুরো পরিচয় দিতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়। আপনার ঐ চাকরটির মত তারো একটু পাগলামির ছিট আছে।

ইতিমধ্যে বিদ্যাধর হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া তরুণীর চেয়ারের পিছনে বসিয়াছিল এবং একাগ্রমনে কথাবার্তা শুনিতেছিল।

বেণী: বল মা লক্ষ্মী তোমার গল্প, আজ দেখছি আমার রূপকথা শোনবার পালা।

তরুণী: রূপকথা? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার গল্প রূপকথার মতই আশ্চর্য। তবে শুনুন,—একটি গরীবের মেয়ে ছিল। ধরুন, তার নাম—মঞ্জুষা—

বেণী: হুঁ ধরেছি, বলে যাও মা লক্ষ্মী—

তরুণী: মঞ্জুষা গরীবের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে অনেক দুঃখ পেয়ে সে মানুষ হয়েছিল। তাই যখন সে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো কারুর গলগ্রহ হবে না; যদি কোনদিন অনেক টাকা পায় তবেই বিয়ে করবে নচেৎ চিরদিন কুমারী থাকবে। কিন্তু অনেক টাকা পাবার কোনো আশাই তার ছিল না, কারণ ছোট ছোট মেয়েদের ক খ শিখিয়ে সে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করত। তাই চিরদিন মিসি-বাবা হয়ে থাকবার সম্ভাবনাই ছিল তার বেশী।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক রাজপুত্তুর কোথা থেকে এসে মঞ্জুষার সঙ্গে ভাব করতে আরম্ভ করে দিলে—তার নাম রণেন্দ্র সিংহ। এরই কথা আপনাকে বলেছিলুম। বাইরে থেকে লোকটিকে সহজ মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে পাগল। মঞ্জুষার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল, দুজনের রোজই দেখা হতে লাগল। তার সম্বন্ধে মঞ্জুষার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা আমি বলতে পারি না, কিন্তু মনের ভাব যাই হোক, কোন অবস্থাতেই যে সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না তাতে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রণেন্দ্র সিংহ যেদিন তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেদিন সে রাজী হল না। পরদিন মঞ্জুষা রাজপুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে কেন সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। চিঠি পেয়ে এই রাজপুত্র এক অদ্ভুত কাজ করলে, নিজের ধনরত্ন রাজ্যপাট সমস্ত মঞ্জুষার নামে দানপত্র করে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

বেণী: তারপর?

তরুণী: তারপর আর কি? মঞ্জুষা পাগলা রাজপুত্রকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

বেণী: হুঁ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটা রাজপুত্তুরের টাকাকড়ি সব নিলে?

তরুণী: হ্যাঁ নিলে।

বেণী: নিতে তার একটুও বাধ্‌লে না? হাত পুড়ে গেল না?

তরুণী: না, হাত পুড়ে গেল না। তার অধিকার ছিল বলে সে নিয়েছিল, নইলে নিত না।

বেণী: কি অধিকার?

তরুণী: (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হেঁট মুখে) বোধ হয় ভালবাসার অধিকার।

বেণী: বুঝলুম না।

তরুণী: (মুখ তুলিয়া) যাঁকে মঞ্জুষা ভালবাসে, যাঁকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছে তাঁর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই কি?

banglabooks.in

বেণী: (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া) কিন্তু—কিন্তু—আর একটা কথা, মেয়েটি কি আর একজনকে বিয়ে করেনি? একটা মাতাল লম্পট বদমায়েসকে—

তরুণী: মিথ্যে কথা। মঞ্জুষা তার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিয়ে তার রাজপুত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভগবান তাকে অনেক টাকা দিয়েছেন, সে এখন ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে তার রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে চায় না।

বিদ্যা: (সহসা সম্মুখে আসিয়া) কিন্তু যে লিক্‌লিকে চেহারা, ঘাড়ছাঁটা-চুল, সোয়েটার-পরা লোকটাকে মঞ্জুষা দোতলার সামনে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল, সে লোকটা তবে কে?

তরুণী: মিথ্যে কথা, মঞ্জুষা আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষকে চুমু খায়নি—

বিদ্যা: তবে সে কে?

তরুণী: সে আমার বন্ধু রমলা। আমরা দুজনে এক ইস্কুলে পড়াতুম। রমলার চুল শিঙ্গল করা—

বিদ্যা: অ্যাঁ! (ললাটে করাঘাত করিয়া) উঃ, মঞ্জু—(তরুণীর হস্তধারণের চেষ্টা করিল)।

তরুণী: (বেণীকে) আপনার চাকর তো ভারি অসভ্য—মেয়েমানুষের হাত ধরে!

বেণী: (হুঙ্কার করিয়া) বিদ্যে, শিগ্‌গির হাত ছেড়ে দে বেয়াদব—

বিদ্যা: (কম্ফর্টার ও টুপি খুলিতে খুলিতে) খুড়ো, জলদি ভাগো, রান্নাঘরে গিয়ে ঘোলের সরবৎ খাও গে, নইলে দুটো কানই তোমার কামড়ে শেষ করে দেব—কিছু থাকবে না (খুড়ো পশ্চাৎপদ) মঞ্জু, কখন চিনতে পারলে?

মঞ্জু: (বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে হাসিয়া) দেখবামাত্রই। মুখবিকৃতি করে কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারো? জান না, দাঁত খিঁচিয়ে কেউ কেউ নিজে সত্যিকার পরিচয় দিয়ে ফেলে!

রণেন্দ্র: মঞ্জু, বড্ড ভুল করে ফেলেছি—সত্যিই আমি পাগল—

মঞ্জু: কি বলে বিশ্বাস করলে? এতটুকু আস্থা নেই? এই ভালবাসা?

রণেন্দ্র: মঞ্জু, এইবারটি মাপ কর। বল তো খুড়োর টেবিলের ওপর দুশো বার নাকখৎ দিচ্ছি।

মঞ্জু: থাক। একে তো পাগল, তার ওপর যদি নাকটাও ঘষে মুছে যায়, (চুপি চুপি) তাহলে আমি কি নিয়ে ঘর করব?

রণেন্দ্র: (মঞ্জুকে নিকটে টানিয়া) মঞ্জু, এখনি বলছিলে আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষকে চুমু খাওনি। তা—সে ত্রুটি এইবেলা সংশোধন করে নিলে হত না?

বেণী: এই খবরদার! বুড়ো মানুষের সামনে বেয়াদবি করো না, আমাকে আগে রান্নাঘরে যেতে দাও। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কিন্তু বিদ্যে, তুই তো তোর রাজকন্যে নিয়ে আজ নয় কাল চলে যাবি, এ বুড়োর কি দশা হবে?

রণেন্দ্র: (বেণীর পিঠ চাপড়াইয়া) ভেবো না খুড়ো, আমিও যে পথে তুমিও সেই পথে। মঞ্জুর অনেক টাকা, আমাদের দুজনকে অনায়াসে পুষতে পারবে।

বাহিরে বহু মোটর আগমনের শব্দ শোনা গেল।

বেণী: (উঁকি মারিয়া দেখিয়া) ঐ রে! সব ছোঁড়াছুঁড়িগুলো একসঙ্গে এসে পড়েছে। কিছু যে তৈরি নেই—কি হবে বিদ্যে?

রণেন্দ্র: কুছ্ পরোয়া নেই খুড়ো, আজ আমরা দুজনে কাজ করব,—মঞ্জু তৈরি করবে আমি পরিবেশন করব। কি বল মঞ্জু—অ্যাঁ! মনে কর এটা তোমার আইবুড়ো ভাতের ভোজ।

মঞ্জু সলজ্জে ঘাড় নাড়িল।

একদল তরুণ-তরুণীর কল-কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ। সকলের উপবেশন ও খাদ্যপানীয়ের ফরমাস দান।

হঠাৎ একজন তরুণ এক হাতে এক গোছা নোট তুলিয়া ধরিয়া আন্দোলিত করিতে করিতে গান ধরিল। আর সকলে, কেহ গলা মিলাইয়া কেহ বা হাতে তাল দিয়া যোগ দিল:—

banglabooks.in

বেরালের ভাগ্যে ছিঁড়েছে আজ সিকে
—ট্রা—লা—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
ইচ্ছে হচ্ছে নাচি দিক্‌বিদিকে—ট্রা—লা—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
বিদ্যে কোথায়, নিয়ে আয় সরবৎ—
খুড়ো, বসে থেকো না জড়বৎ,
ঘোড়দৌড়ে জিতেছি আজ পাঁচ কড়া
পাঁচ সিকে—
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
খেয়ে বেদম চিংড়ির কাটলেট
আইস্‌ক্রীমে ভরিয়ে নিয়ে পেট
বিয়ে করবো আজ রাত্তিরেই প্রাণের
প্রেয়সীকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!

যবনিকা!!

১৩০৯

মেথুশীলা

বাইবেল-বর্ণিত মেথুশীলা পুরুষ ছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বাংলাদেশে আসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী চারুশীলার সহিত মিল বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে নারী-মূর্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে একথা যদি তাঁহার জানা থাকিত তাহা হইলে বোধ করি নয়শত উনসত্তর বছর বয়সেও তিনি মরিতে রাজী হইতেন না। কিন্তু মুশার ভগবান বৃদ্ধ বয়সে একটু রসিকতা করিবার বাসনা করিয়া ছিলেন, তাই—

সর্দা আইন পাস হইবার কিছুদিন আগেকার কথা। সনাতন ধর্মের জাত বাঁচাইবার জন্য নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে আছে সকলের বিবাহ দিয়া ফেলিতেছেন; গ্রহণ লাগিলে আর আহার চলিবে না। ইত্যবসরে সন্দেশ ও মৎস্যের দর ভয়ঙ্কর চড়িয়া যাইতেছে।

জমিদার লালমোহন চৌধুরী মহাশয়কে সনাতন হিন্দু ধর্মের বিজয়স্তম্ভ বলিলে সম্ভবতঃ তাঁহার বাবুর্চি নিয়ামৎ মিঞা দাঁত বাহির করিয়া ভাল্লুকের মতো হাসিবে, অতএব

banglabooks.in

সেকথা বলিব না; কিন্তু তিনিও এই হিড়িকে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ছেন। পুত্র অবশ্য নাবালক নয়, তাহার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স—আইনে বাধে না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের দুরভিসন্ধি অন্য প্রকার—তিনি একটি দশমবর্ষীয়া বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে চান। চৌধুরী পরিবারের কোনো বধূই আজ পর্যন্ত দশ বৎসরের অধিক বয়স লইয়া দুধে-আল্তায় পা দেয় নাই।

কিন্তু পুত্র ব্রজমোহনের মনে ভাবী বধূ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল। তা দিয়া ডিম ফুটাইয়া ছানা লালনপালন করিয়া দাম্পত্য জীবনের কলকাকলির ভূমিকা প্রস্তুত করিতে সে উৎসুক ছিল না। সাধারণ বাঙালীর আয়ুষ্কাল যে মাত্র তেইশ বৎসর ইহা সে কলেজে পড়িয়া জানিয়া লইয়াছিল। তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে বধূ হইবে ডাঁশা পেয়ারার মতো, বয়স হইবে সতেরো কিংবা আঠারো, রূপের চেয়ে রসে বেশী টলটল করিবে, প্রেমের অভিজ্ঞতা (পরোক্ষভাবে) ভিতরে ভিতরে ভালো রকম থাকিবে, এবং স্বামী প্রথম চুম্বন করিলে 'বাবা গো!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে না। শেষোক্ত রূপ ঘটনা চৌধুরী পরিবারে ইতিপূর্বে একবার ঘটিয়া গিয়াছিল।

সুতরাং আদর্শ লইয়া পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু লালমোহনবাবু—সম্ভবতঃ মুর্গী খাইতেন বলিয়া—পুত্রের আদর্শকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিলেন না, তিনি কুটিল কুপথ ধরিলেন। ব্রজমোহনের পিছনে তার্কিক লাগিল, দুই আদর্শের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বাড়িতে অষ্টপ্রহর তর্ক চলিতে লাগিল।

বড় পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী মেজবৌদি, মেয়েদের মধ্যে তাঁহার তর্কই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসংগত। একদিন তিনি কোমর বাঁধিয়া ব্রজকে বুঝাইতে বসিলেন। অন্যান্য কথার পর বলিলেন, 'বিশ বছরের একটা ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করে আন্‌বে, সেটাই কি দেখতে শুনতে ভালো হবে?'

ব্রজ বলিল, 'বিশ বছরের ধাড়ি মেয়ে মন্দ কিসে?'

মেজবৌদি বলিলেন, 'সব দিক দিয়েই মন্দ। মাগো, ভাবতেই যেন গা কেমন করে ওঠে!'

ব্রজ বলিল, 'শুধু মুখে বললে হবে না, প্রমাণ করতে হবে।'

মেজবৌদি তর্কের ঝোঁকে বলিলেন, 'প্রমাণ আবার কি? তোমার যে অনাছিষ্টি কথা!' বিশ বছরের পাকা মেয়ে কখনো ভালো হয়?'

ব্রজ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার এখন বয়স কত?'

মেজবৌদি চালাকি করিয়া কথাটা এড়াইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি বড় বাজে তর্ক করো। ধান ভান্‌তে শিবের গীত!—দেখ দিকিন্ আমাদের কেমন বিয়ে হয়েছিল, যখন শ্বশুরবাড়ি এলুম তখন বর কাকে বলে তাই জানি না।'—বলিয়া সুখের হাসি হাসিলেন।

ব্রজ বলিল, 'খুবই আনন্দের কথা! কিন্তু বর কি বস্তু তা জেনে শ্বশুরবাড়ি আসতেই বা দোষ কি?'

বৌদি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'ছেলেবেলায় বিয়ে না হলে মনের মিল হয় না।'

বিস্মিত ব্রজ বলিল, 'একথা তুমি কোথায় পেলে? তাহলে পিসিমার সঙ্গে পিসে-মশায়ের মনের মিল হয়নি কেন?'

নজিরটা খারাপ। হটিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বৌদি বলিলেন, 'ওসব বাজে কথা, কনে-বৌ কাঁচ মেয়ে না হলে কি মানায়? শাস্ত্রে কি লিখেছে জানো?'

ব্রজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ শাস্ত্রে? বেদে, না মনু-সংহিতায়?'

বৌদি অধীর ভাবে বলিলেন, 'অত জানিনে, তোমার খালি উল্টোপাল্টা কথা! তাছাড়া ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করার অনেক বিপদও আছে।'

'কি বিপদ?'

'সে-সব কথা আমি বলতে পারব না। এই সেদিন আমাদের জানা-শোনা একজন লোক উনিশ বছরের এক মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলো—তারপর সে-বৌ ত্যাগ করতে হল।'

banglabooks.in

ব্রজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'মোপাসাঁর Madame Baptiste পড়েছ? পড়নি, কারণ ইংরেজি বা ফরাসী ভাষা তোমার জানা নেই। যাহোক, চন্দ্রশেখর পড়েছ নিশ্চয়। শৈবলিনীর বয়স তো উনিশ বছর ছিল না। তবে অমন হল কেন বলতে পারো?'

বৌদি হাসিয়া ফেলিলেন, 'ও তো গল্প -ওকি সত্যি নাকি? সত্যি হলে চন্দ্রশেখরকেই শৈবলিনী ভালবাসত—প্রতাপের মুখে নুড়ো জেবলে দিত।'

ব্রজও হাসিল, 'তা বটে। কিন্তু তোমার আসল প্রতিপাদ্যটা এখনো প্রমাণ হল না। বড় মেয়ে নিন্দনীয় কিসে?'

মেজবৌদি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'দেখ, তুমি ছেলেমানুষ (ব্রজ মেজবৌদির চেয়ে বছর খানেকের বড়), তোমার কাছে সব কথা খুলে বলতে লজ্জা করে। যে মেয়ে ষোলো সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থেকে বাপের বাড়িতে কাটিয়েছে, সে ভেতরে ভেতরে পেকে ঝিঁকুট হয়ে গেছে। মনে মনে সে বুড়ী হয়ে গেছে, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই তার জানতে বাকি নেই,—বুকের মধ্যে তার আশী বছর বয়েস। এরকম মেয়েকে বিয়ে করে কেউ কোনো সুখ-শান্তি পায়নি ভাই—তুমিও পাবে না।'

ব্রজ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, 'কে বলে পাব না? নিশ্চয় পাব। বরং সংসারযাত্রার অভিজ্ঞতার সম্বল যার নেই তাকে নিয়েই পথ চলা মুশকিল হয়ে পড়বে। তুমি যাকে আশী বছরের বুড়ী বলছ, সেই আশী বছরের বুড়ীই আমার চাই। দশ বছরের খুকী সুখ-শান্তির জানে কি? সে তা দেবে কোত্থেকে? দেবার ক্ষমতা এক ঐ আশী বছরের বুড়ীরই আছে।'

বৌদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'সে বরং মন্দ কথা নয়, কিন্তু আশী বছরের আইবুড়ো বুড়ী পাওয়া মুশকিল হবে। সেকালে কুলীনদের ঘরে থাকত শুনেছি—'

ব্রজ ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিল, 'আমি সে-বুড়ীর কথা বলিনি—আমি চাই বুদ্ধিস্বং জরসা বিনা। মন যার পরিপুষ্ট হয়নি তাকে বিয়ে করে লাভ কি? সে তো খেলার পুতুল! আমি খেলার পুতুল চাই না।'

বৌদি বলিয়া উঠিলেন, 'আচ্ছা, বাবাকে সেই কথাই বলব।—কিন্তু এ মেয়েটিকে একবার দেখে এলে পারতে—কচি মেয়ে চোখে দেখলে পাপ হলে এমন তো শাস্ত্রে লেখেনি।'

ব্রজ মুখ তুলিয়া বলিল,—'আবার কোন্ মেয়ে?'

'নতুন সম্বন্ধ এসেছে -কলকাতার মেয়ে। বাবার খুব পছন্দ হয়েছে—কুষ্ঠীও মিলেছে। যাও না--দেখলে হয়তো পছন্দ হয়ে যেতেও পারে।'

'হুঁ। মেয়েটির বয়স কত? তিন না চার?'

'না গো না। আশ্বিন মাসে দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিয়েছে।'

'বলো কি! এখনো তার বাপকে কেউ একঘরে করছে না? তা—শিশুটির নাম কি? —পুটু না বুচু?'

ব্রজ কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, শেষে হাসিয়া বলিল, 'ও, বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যেই বোধহয় এই নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এখনি দেখতে যেতে হবে, আরো বছর দশেক অপেক্ষা করবে হয় না?'

বৌদি রাগ করিয়া বলিলেন, 'তারা অতদিন হা-পিত্যেশ করে তোমার জন্যে বসে থাকতে পারবে না। তার ওপর আবার আইন হচ্ছে—'

ব্রজ চিন্তা করিয়া বলিল, 'হুঁ--তাহলে বাবার ইচ্ছে আমি এই মেয়েকে দেখতে যাই?'

'হ্যাঁ। আর তোমার দাদাদেরও তাই ইচ্ছে।'

'বেশ, যাব। কলকাতায় একটা কাজও আছে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি আমার পছন্দ হবে না। তখন দোষ দিও না।'

বড়মানুষের বাড়িতে মেয়ে দেখা—যাহারা দেখিতে আসিতেছে তাহারাও বড়মানুষ

banglabooks.in

সুতরাং উদ্যোগ আয়োজন ভালোই হইয়াছিল। বৈঠকখানা ঘরের মেঝেয় কার্পেট পাতিয়া আসর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পাড়ার গণ্যমান্য কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন। ব্রজর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহার দুই বন্ধু।

যথাবিধি আদর-আপ্যায়নের পর কন্যার বাপ সগর্ব হাস্যে জানাইলেন যে তাঁহার মেয়ে আজকালকার মেয়ের মতো নয়, তাহার বয়স মাত্র দশ বৎসর। বর্ষীয়ান্‌গণ মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। তারপর মেয়ের বাপ অন্দরে গিয়া মেয়েকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন। মেয়ে গালিচার উপর বসিয়া করজোড়ে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

মেয়েটি দেখিতে ছোটখাটো, দোহারা, রং খুব ফরসা, মুখের গড়ন চমৎকার। ব্রজ একবার তাকাইয়া নিরুৎসুক ভাবে বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল,—মেয়েটা এখনো তাহাদের আগড়ুম-বাগড়ুম খেলিবার জন্য আহ্বান করিতেছে না কেন? বন্ধুরা মেয়েকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিতে লাগিল।

হঠাৎ কি একটা কৌতুককর প্রশ্নে মেয়েটি হাসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। ব্রজর সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল।

ব্রজ তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দেখা হয়েছে—এবার ভেতরে নিয়ে যান।'

মেয়েটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

কন্যার বাপ মতামত জানিতে চাহিলেন। ব্রজর সঙ্গে বন্ধুদের চোখে চোখে ইশারা হইল, তাঁহারা বলিলেন, 'পরে খবর পাঠাব।'

পরে খবর পাঠানোর একটি মাত্র অর্থ হয়। গৃহকর্তা বিমর্ষ হইয়া কন্যার বয়সের অল্পতার দিকে আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিলেন। গৃহকর্তা তখন জলযোগের প্রস্তাব করিতেই ব্রজ কোনমতে কাটাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেনে ফিরিতে ফিরিতে বন্ধুরা বহুবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে, ব্যাপারটা কি? খুলেই বলো না। পছন্দ হয়নি তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু কারণটা কি? মেয়েটি তো দিব্যি সুন্দরী। দেখতে একটু ছোট বটে, কিন্তু নেহাত দশ বছরের বলে তো বোধ হল না—'

ব্রজ বলিল, 'না, বয়স দশ-এগারো বছরের বেশী হবে না।'

বন্ধুদের সে কোনো কথা ভাঙিয়া বলিল না, কেবল ভাবিতে লাগিল, মেজবৌদির সঙ্গে যখন এই লইয়া আলোচন হইয়াছিল তখন কি ভগবান কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন?'

বাড়ি ফিরিয়া ব্রজ জানাইয়া দিল যে মেয়ে পছন্দ হয় নাই—মেয়ে অত্যন্ত ছোট।

রাত্রে মেজবৌদিকে চুপি চুপি বলিল, 'বৌদি, সে মেয়ের বয়স দশ বছর নয়—আশী বছর। তার চোখের মধ্যে অনাদি কালের অভিজ্ঞতা জমাট হয়ে আছে। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার,—সত্যিই ও-মেয়ে মেথুশীলা। তিনকালের বুড়ী জরাজীর্ণ হাড়-গোড় নিয়ে ওর বুকের মধ্যে বসে আছে।—ও মেয়ে নিয়ে আমি কি করব?'—

এই বলিয়া ব্রজ শিহরিয়া চক্ষু মুদিল।

২ আষাঢ় ১৩৪০

banglabooks.in

মনে মনে

দ্বিজেনের কথা

আজ অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।

মীনা দেরি হওয়া ভালবাসে না—তার মুখ একটু ভার হয়, চোখে গাম্ভীর্য ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে তো কিছু বলবে না—কেবল ভেতরে ভেতরে জট পাকাবে। আশ্চর্য মেয়েমানুষের স্বভাব। এই পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একদিনও মীনা ঝগড়া করলে না; রাগ হলেই মুখ টিপে থাকে, শুধু আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে, রাগ হয়েছে। কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা বিগ্রহো যত্র মৌনম্—

কিন্তু আজ আর রাগ হতে দিচ্ছি না। দেরি হবার কারণটা পকেট থেকে বার করে অন্যমনস্কভাবে টেবলের ওপর রাখলেই রাগ গলে জল হয়ে যাবে।

আজ অফিসে মাইনে পেলুম। পথে আসতে আসতে ভাবলুম, টাকা বাড়ি নিয়ে গেলে তো কিছুই থাকবে না, তার চেয়ে এই বেলা মীনার জন্যে একটা কিছু সৌখীন জিনিস কিনে নিয়ে যাই। সামনেই হীরালাল মতিলালের দোকানটা পড়ল—সেখানেই ঢুকে পড়লুম। বেশী কিনিনি, সামান্য ১৫৲ টাকা দামের একটি ব্রুচ—কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে। মীনা খুশী হবে।

বাড়িতে ঢুকে দেখলুম, মীনা একটা ডেক-চেয়ারে বসে নভেল পড়ছে। আমাকে দেখে ঘড়ির দিকে তীক্ষ্ণভাবে একবার তাকিয়ে বই নামিয়ে রেখে বললে, "এলে?"

এই ধরনের কথা আমার ভাল লাগে না। এলে? তার মানে কী? আমার আসাটা কি অভূতপূর্ব ব্যাপার, না আমার আজ ফেরবার কথাই ছিল না? আসলে খোঁচা দিয়ে কথা কওয়া মীনার একটা স্বভাব। আর দেরি হয়েছে তো হয়েছে কি? ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরব এমন লেখাপড়া তো কিছু করিনি।

একটা কোঁচানো কাপড় হাতের কাছে রেখে—'কাপড় ছাড়ো'—বলে মীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অর্থাৎ আমার ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন সেটা জানিয়ে দিয়ে যাওয়া হল। বেশ, বিরক্ত হয়েছেন তা আর কি করব! তাই বলে আমি তো ঘড়ির কাঁটার মত চলতে পারি না। কলের পুতুল তো নই!

জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে বসেছি, মীনা খাবার আর চা নিয়ে এসে সামনে রাখলে। আজ দেখছি আবার মোহনভোগ তৈরি হয়েছে। মনে আছে তা হলে। যাক, ক্ষিদেটাও খুব পেয়েছে......

ও—তাই বলি। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। বোধ হয় দুপুরবেলা কোনও সময় অবসর মত তৈরি করে রাখা হয়েছিল। তা তো হবেই, আমি মুটে-মজুর লোক, খেটে-খুটে এসে ঠাণ্ডা বাসি যা পাব তাই দিয়ে পেটের গর্ত বুজিয়ে ফেলব, খাবার একটা কিছু পেলেই হ'ল, এর বেশী প্রত্যাশা করাই অন্যায়......যাক, তবু চা'টা একটু গরম আছে। কি দরকার ছিল? ওটাও দুপুরবেলা তৈরি করে রাখলেই হত।

"আজ তোমার মাইনে পাবার দিন না?"

হুঁ—সে কথাটি ঠিক মনে আছে। পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়ে বললুম, "এই নাও।"

টাকা গুনে ভুরু তুলে বললে, "পনেরো টাকা কম যে?"

কৈফিয়ৎ চাই! নিজের টাকা যদি খরচ করি, তাও পাই-পয়সার হিসেব দিতে হবে। দূর ছাই, সংসার করাই একটা ঝকমারি।

বললুম, "খরচ করেছি।"

সপ্রশ্নভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইল—অর্থাৎ এখনও কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হয়নি;

banglabooks.in

কিসে খরচ করেছি, তা বলতে হবে! মীনার কি বিশ্বাস, আমি মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দিয়েছি! না তার চেয়েও সাংঘাতিক আরও কিছু!

উঃ! মেয়েমানুষের মত সন্দিগ্ধ মন পৃথিবীতে আর নেই। না, আমি বলব না, কিছুতেই বলব না,—দেখি, ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে কি না। যদিও জানি, তা কখনই করবে না; মনে মনে গেরো দেওয়া যে ওর স্বভাব।

জিজ্ঞাসা করলে কি অপমান হত, না আমি মিথ্যে কথা বলতুম! জিজ্ঞাসা করলেই তো আমায় বলতে হত যে, তোমার জন্যে গহনা কিনেছি।—বেশ, ভালই হল। কাল ঐ লক্ষ্মী-ছাড়া ব্রুচটা ফেরত দিয়ে আসব—বলব, পছন্দ হল না। মন্দ কি, কাঁচা টাকা বেঁচে গেল।

টাকা নিয়ে দুপ্ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দমাস করে আলমারির দরজা বন্ধ করা হল; মানে, আমি কি রকমে চটেছি, তুমি দেখ!

ফিরে এসে আবার দূরের একটা চেয়ারে বসল। মুখে কথা নেই, আমাকে দেখেই বোধ হয় সব কথা ফুরিয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট দু'জনে চুপচাপ আছি। ওঁর বোধ হয় আশা যে আমিই আগে কথা কইব। কিন্তু—কেন কইব? আমাকেই চিরদিন আগে কথা কইতে হবে, তার কি মানে?

অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন, "খবরের কাগজ পড়বে?"

হুঁ—খবরের কাগজ পড়ব। সোজা কথায় বললেই হয়, তোমার সংসর্গ আমার ভাল লাগছে না, তুমি যা হয় কর, আমি উঠে যাই। সমস্ত দিনের পর বাড়ি আসার কি চমৎকার সংবর্ধনা! বোধ হয় নভেলটা শেষ হয়নি, তাই প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। তা আমি তো ধরে রাখিনি; 'ওগো, তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না' বলে কাঁদিও নি। গেলেই পারেন, ছুতো খোঁজবার দরকার কি?

মেয়েমানুষ জাতটার মত এমন কপট আর—; দূর হোক গে, এই জন্যেই লোকে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমারও আর ভাল লাগছে না, অরুচি ধরে গেছে।

যাই, খানিকটা বেড়িয়ে আসি। বাড়ি তো নয়—সাহারা! এরই জন্যে মানুষ পাগল!

উঠে জামা পরতে পরতে বললুম, "বেড়াতে যাচ্ছি।"

কোনও জবাব নেই। বহুত আচ্ছা, তাই সই। যখন জুতো পরে ছড়ি নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, তখন,—"বামুন ঠাকুরের আজ দুপুর থেকে জ্বর—"

বামুন ঠাকুরের জ্বর, তা আমি কি করব? আমি ধন্বন্তরি না কি? আসলে তা নয়, কথার তাৎপর্যটা গভীর—অনেক দূর থেকে এসেছে। কোনও কোনও দিন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরতে রাত্রি ন'টা বেজে যায়—আড্ডায় বসলে সহজে ওঠা যায় না—তাই চেতিয়ে দেওয়া হল। আজ উনি নিজে রাঁধবেন, আজ যেন ফিরতে দেরি না করি। আমার যেন নারী-শাসন তন্ত্রে বাস হয়েছে—সব সময় কড়া শাসন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশবারও হুকুম নেই। বেশ, তাই হবে। সন্ধ্যে থেকেই ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকব।

'বুঝেছি' বলে বেরিয়ে পড়লুম।

ঠিক ন'টার সময় বাড়ি ফিরলুম। দেখি, গিন্নী রান্নাবান্না শেষ করে বসে আছেন। তখনই খেতে বসে গেলুম। কি জানি, যদি দেরি করি, আবার গোসা হতে কতক্ষণ!

না, গিন্নীটি আমার রাঁধেন ভাল। এই রান্নাই তো বামুন ঠাকুর রাঁধে,—কিন্তু সে যেন যাচ্ছেতাই।

আমি তো কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, তবে মীনা একটুতেই অমন মুখ অন্ধকার করে কেন? যেন কত বকেছি। আচ্ছা, আমারই না হয় ঘাট হয়েছে, আমিই যেচে ভাব করছি।

খেয়ে উঠে মীনার হাত থেকে পান নিতে নিতে বললুম, "উঃ—আজ কি গরম। রাত্রে ঘুম হলে হয়।"

banglabooks.in

মীনা মুখ টিপে বললে, "বেশ, আমি না হয় মেঝেয় মাদুর পেতে শোব।"

কি কথার কি উত্তর!

নাঃ—এদের মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ—এরা সোজা কথা বলতে জানে না। উনি আমার পাশে শোন্, তাই আমার গরম লাগে, অতএব মেঝেয় মাদুর পেতে শোবেন! এত দিন যেন—কিন্তু কুছ পরোয়া নেই, সেই ভাল। একলা শুতে চান, আমার আপত্তি কি? আমিই না হয় নীচে বসবার ঘরে তক্তপোশের ওপর শোব। কারুর কোনও অসুবিধে নেই—সব দিক দিয়েই ভাল। উনি সমস্ত ওপরতলাটা নিয়ে থাকুন।

বললুম, "আমিই নীচে তক্তপোশে শোব। তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

তক্তপোশের ওপর নিজেই চাদর পেতে শুয়ে পড়লুম—কারুর সাহায্যের তোয়াক্কা রাখি না। উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলবার ভান করে ওপরে চলে গেলেন।

দুনিয়াটাই ফাঁকি। এই যে দশটা-পাঁচটা অফিস করি,—কিসের জন্যে? এই ঘর-দোর, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পরিবার—সব মিথ্যে! মায়া! বেদান্ত ঠিক বলেছে—মায়া—

ঘুম আসছে, রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। ঘুমুই—দুত্তোর, কি হবে ও-কথা ভেবে! ধ্বত সব......

অ্যাঁ!—কে—!

মিনতির কথা

সত্যি বাপু, এত দেরিই বা হয় কেন? পাঁচটার সময় তো অফিসের ছুটি হয়, তবে এতক্ষণ কি করেন? সারা দিনের পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেও হয় না?

আমরাই শুধু ভেবে মরি। মেয়েমানুষ কি না! পুরুষমানুষের ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই। আমি যে সারা দিন একলা পড়ে থাকি, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। থাকবে কেন? দাসীবাঁদীকে কে কবে ভ্রূক্ষেপ করে!

আচ্ছা, এতক্ষণ কি করেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? বিশ্বাস হয় না। তবে? কি জানি, বুঝতেও পারি না; ভাবতেও ভাল লাগে না।

আজ সকাল সকাল খাবার তৈরি করে চায়ের জল চড়িয়ে রেখেছি—ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারেন না, আবার খাবার দিতে দেরি হলেও বিরক্ত হন—কিন্তু বুঝে বুঝে আজই দেরি করছেন। জানি তো ওঁকে—মাথার টনক নড়ে। আজ আমি ঠিক পাঁচটার সময় গরম খাবার তৈরি করে রেখেছি কি না—আজ বোধ হয় ছ'টার আগে বাড়ি ঢোকাই হবে না।

কিছু বলতেও ভয় করে—এমন মুখ ভারী করে থাকেবেন, যেন কি ভয়ানক অন্যায় কথাই বলেছি। কিচ্ছুটি বলবার জো নেই, অমনি পুরুষমানুষের পৌরুষে ঘা লাগবে। মুখ এতখানি হয়ে উঠবে। ও রকম মুখ অন্ধকার করে থাকার চেয়ে বকাও ভাল। কেন বকেন না। বকলেই পারেন, ও রকম মুখ বুজে শাস্তি দেওয়া আমি সইতে পারি না।

ছ'টা বাজল, এখনও দেখা নেই। খাবারগুলো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কেন যে এত করে মরি, তাও জানি না। স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া, মনে দুঃখ দেওয়া ওদের স্বভাব। যাই, খাবারগুলো ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরি করি গে। ও পান্তাভাত খেতে পারবেন কেন?

না, আজ সত্যি বকব। কেন উনি এর দেরি করবেন? আমি কি কেউ নই? সমস্ত দিন পরে বাড়ি আসবেন, তাও দু'ঘণ্টা দেরি করে? কেন, বাড়িতে বাঘ আছে না ভাল্লুক আছে? দিনান্তেও দেখতে ইচ্ছে করে না? আমার তো—, না পুরুষমানুষের সে সব বালাই নেই। সে শুধু এই পোড়া মেয়েমানুষের।

এই পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে, এক দিনের জন্যে কখনও বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছেও

banglabooks.in

হয়নি। আর উনি? বোধ হয় আমি বাপের বাড়ি গেলেই খুশী হন। বেশ, তাই যাব। আমাকে যখন ভালই লাগে না তখন থেকেই কি আর না থেকেই কি?

ঐ যে আসা হচ্ছে! মুখ হাসি-হাসি। তা তো হবেই—কত ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আসা হল—মুখ হাসি-হাসি হবে না? আমাকে দেখলেই আবার মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে।

না, মনের ভাব প্রকাশ করব না, প্রকাশ করেই বা লাভ কি? আমার রাগ-অভিমান কে গ্রাহ্য করে? তার চেয়ে একখানা বই নিয়ে বসি—যেন কিছুই হয়নি।

উনি এসে বাড়ি ঢুকলেন। মুখে অনুতাপ বা লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই, যেন দেরি করে এসে ভারি বাহাদুরি করেছেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সওয়া ছ'টা। বই মুড়ে রেখে খুব ঠাণ্ডা ভাবেই জিজ্ঞাসা করলুম, "এলে?"

অমনি মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, যেন কে সুইচ্ টিপে বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে দিলে।

কি বলেছি আমি? 'এলে' বলাতেই এত দোষ হল? তা ছাড়া আর কি বলতুম? যদি বলতুম 'এত দেরি করে এলে কেন,' তা হলেই কি ভাল হত? তা নয়—আমাকে দেখেই মুখ অমন হয়ে গেল। আমি বাড়িতে না থাকলেই বোধ হয় খুশী হতেন।

কিন্তু তাই বলে তো আমি চুপ করে থাকতে পারি না। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে খাবার আনতে গেলুম। খাবার তো যা হবার তা হয়ে আছে, চায়ের জলও উনুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আমার যেমন কপাল, তেমনই তো হবে।

তাই এনে মুখের সামনে ধরে দিলুম। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল। কি করব? এখন তো আর নতুন তৈরি করে দেবারও সময় নেই। খাবার মুখে দিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন। আমি কি করব—ওগো, আমি কি করব? কেন তুমি এত দেরি করে এলে? আমারই খালি দোষ?

আচ্ছা, আমারি দোষ, ঘাট হয়েছে। কিন্তু বকছ না কেন? অমন মুখ বুজে শাস্তি দেবার কি দরকার?

যাক, তবু চা'টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। এবার অন্য কথা বলি, তবু যদি মনটা অন্য দিকে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ তোমার মাইনে পাবার দিন না?"

কথার জবাব দিলেন না, উঠে গিয়ে পকেট থেকে টাকা বার করে হাতে দেওয়া হল। যেন টাকার জন্যেই আমি মরে যাচ্ছিলুম, আমি খালি টাকাই চিনি। এ তো অপমান করা! টাকাগুলো জানালা গলিয়ে দূর করে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। উঃ—আমার মরণও হয় না!

টাকা গুনে দেখলুম—পনেরো টাকা কম। এই এক ঘণ্টার মধ্যে পনেরো টাকা কি করলেন? হাতে টাকা এলে আর রক্ষে নেই, অমনি নয়-ছয় করবেন। না বাপু, আমি আর পারি না। হয়তো কতকগুলো বই কিনে বসে আছেন কিংবা কোনও বন্ধুকে ধার দেওয়া হয়েছে! বন্ধুকে ধার দেওয়া মানেই—

বললুম, "পনেরো টাকা কম যে?"

উত্তর হল, "খরচ করেছি!"

আমি যেন তা জানি না। খরচ না করলে টাকাগুলো কি পকেট থেকে ডানা মেলে উড়ে যাবে? মানে, কিসে খরচ করেছেন তা বলা হবে না। সত্যিই তো, আমাকে বলতে যাবেন কেন? ওঁর নিজের টাকা নিজে খরচ করেছেন—আমাকে তার হিসেব দিলে যে অপমান হবে। আমি তো ওঁর কেউ নই—জানবার অধিকারও নেই?'

যাই, টাকাগুলো ওপরে বন্ধ করে রেখে আসি, নইলে এখনই হয়তো মনে করবেন—কি মনে করবেন উনিই জানেন। মনের মধ্যে গিঁট দেওয়া স্বভাব তো।

ফিরে এসে বসলুম। তবু মুখে কথা নেই। আচ্ছা, চুপ করে দু'জন মুখোমুখি কতক্ষণ বসে থাকা যায়? আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন বললেই তো পারেন। আর, কথা কইতে ইচ্ছে না হয়, তাও খুলে বললেই হয়। না বাপু, মিছিমিছি অমন মুখ ভার করে থাকা আমার ভাল লাগে না।

banglabooks.in

খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে—বোধ হয় ঐটে পড়বার জন্যেই মন ছটফট করছে। তা পড়লেই তো পারেন। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবারই কি দরকার?

বললুম, "খবরের কাগজ পড়বে?"

মুখখানা আরও অন্ধকার হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়লেন—কাপড়-জামা পরতে লাগলেন। তার পর মুখ কালো করে বললেন, "বেড়াতে যাচ্ছি।"

আবার কি অপরাধ করলুম?

বেশ, বেড়াতে যাচ্ছেন যান—আমার সঙ্গ এক মিনিটও ভাল লাগে না, সে তো আমি জানি—কিন্তু এদিকে যে বামুন ঠাকুরটা দুপুর থেকে জ্বরে পড়েছে, কখন উনি এসে একফোঁটা ওষুধ দেবেন, এই পিত্যেশ করে রয়েছে। উনি ওষুধ না দিলে এ বাড়ির কারুর সারেও না অসুখ। এখন কি করি? উনি তো আড্ডায় চললেন,—সেই সাড়ে ন'টার সময় ফেরা হবে। ততক্ষণ বামুনটা এক ফোঁটা ওষুধ পাবে না?

ভয়ে ভয়ে বললুম, "বামুন ঠাকুরের আজ দুপুর থেকে জ্বর—"

'বুঝেছি' বলে বেরিয়ে গেলেন।

বুঝেছি মানে কি? বামুন ঠাকুরের জ্বর হয়েছে, এতে বোঝাবুঝির কি আছে? সব কথাই যেন হেঁয়ালি। পাঁচ বছর ঘর করছি—বয়সও কম হল না কিন্তু তবু মনের অন্ত পেলুম না। না—আমার আর ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে, কোথাও চলে যাই।

কিন্তু যাবার কি উপায় আছে? চিরদিন ঘরে বন্ধ থাকবার জন্যে জন্মেছি, শেষ পর্যন্ত ঘরেই বন্ধ থাকব। বাইরের সমস্ত পৃথিবী ওঁদের, ঘরটি খালি আমাদের! তা আমি তো ঘরের বার হতে চাই না, কিন্তু উনি কেন একদণ্ড ঘরে থাকবেন না? উনি থাকলে তো আমার আর কিছু দরকার হয় না!

বেশ, যেখানে ইচ্ছে থাকুন, যেখানে ভাল লাগে থাকুন। আমি একলাটি মন গুমরে থাকলে ওঁর কি? পুরুষমানুষ যে—পাথর দিয়ে তৈরি।

না, আর ভাবব না। যাই কাপড় ছেড়ে রান্না চড়াই গে। আচ্ছা, সারা দিন একলাটি থাকি—একটু দয়াও হয় না?

সেই ন'টা বাজল, তবে ফিরলেন। এক মিনিট আগে হবার যো নেই। সেখানে যে প্রাণের বন্ধুরা আছেন!

এসেই খেতে বসলেন—কথাবার্তা কিছু নেই। তবু দেখতে পাই, বাইরে থেকে ফিরলেই মুখখানা প্রফুল্ল হয়। হবেই তো। বাইরে কত মজা—কত বন্ধু, হবে না? আমার সঙ্গে হেসে কথা কইতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বেশ, আমিও কথা কইব না, শুনতে যখন ভালবাসেন না, তখন কাজ কি!

পান নিতে নিতে প্রথম কথা কইলেন। বললেন "উঃ! আজ কি গরম! রাত্রে ঘুম হলে হয়।"

এ কথার মানে আমি আর বুঝতে পারি না? গরম এমন কিছু নয়—আমি পাশে শুই বলেই ঘুম হয় না! বেশ, তাই সই। আমি না হয় আলাদাই শোব—তাতে কি? এক বিছানায় শুতে যখন কষ্ট হয়, তখন আমি মেঝেতেই শোব।

বললুম, "বেশ, আমি না হয় মেঝেয় মাদুর পেতে শোব।"

না, তাও হবে না। আমার সঙ্গে একঘরে শুতেও কষ্ট হবে। বললেন, "আমিই নীচে তক্তপোশে শোব। তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

নিজে বিছানা পেতে শোয়া হল। বেশ! বেশ!

আমার চোখের জল না দেখলে ওঁর যে প্রাণে শান্তি হয় না। একলা ঘরময় ঘুরে বেড়াই—আর কি করব! ঘুম তো কিছুতেই চোখে আসবে না!

শোব? উনি নীচে তক্তপোশে পড়ে রইলেন...আমি আমি—

এগারটা বাজল; এতক্ষণে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারা দিন খেটে—

না, আমি পারব না—পারব না। কেন আমি দূরে দূরে থাকব? এই পাঁচ বছরের মধ্যে

banglabooks.in

এক দিনও আলাদা শুয়েছি?...যাই, দেখি—

ঘুমিয়ে পড়েছেন। তক্তপোশের বিছানা—একটা তোশকও নেই, শুধু সতরঞ্চি আর চাদর। শক্ত কাঠ গায়ে ফুটছে, তবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, এ কেন? আমার ওপর রাগ করে নিজেকে শাস্তি দেওয়া—কি জন্যে?

পাশে শুতেই "অ্যাঁ, কে?"—বলে চমকে উঠলেন। তারপর তন্দ্রার ঘোরেই জড়িয়ে ধরে বললেন, "মীনা।"

এই তো রাগের বহর—ঘুমুলেই ভুলে যান!

আমি বললুম, "চল, ঘরে শোবে চল।"

এইবার ভাল করে ঘুম ভাঙ্গল, বললেন, "না, আজ এইখানেই শুই এস। আর ওপরে উঠতে পারি না।"

সেই ভাল।

কিন্তু একটি বৈ মাথার বালিশ যে নেই? তা—

আমার কিছু কষ্ট হবে না।

২১ আষাঢ় ১৩৪০

নারীর মূল্য

বৈরাগ্য সাধনের পক্ষে শংকর-ভাষ্যের চেয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান বেশী উপযোগী। মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইয়া অবধি এই কথাটা আমি বেশ ভালো করিয়া বুঝিয়াছি।

বৈরাগ্য-শতকের কবি লিখিয়াছেন বটে—স্তনৌ মাংসগ্রন্থী (আধুনিক লেখকগুলো একথাটা জানে না—মাংসপেশী লেখে), কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তাহা কিছুই নয়। মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ও বৈরাগ্য-সাধনা একসঙ্গে চালাইতে গিয়া এ বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

এই দেখুন না, আজ সকালবেলা আমার পত্রিকার আপিসে আসিয়া খবরের কাগজ খুলিতেই দেখিলাম,—একজন বৈরাগী-বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন যে, মানুষের শরীরের—সুতরাং সেই সঙ্গে নারীর শরীরের—সমস্ত মাল-মশলা আলাদা করিয়া দাম কষিলে তাহার মূল্য দাঁড়ায় মোটে আঠারো টাকা। বেশীর ভাগ জিনিসই বাজে—বাজারে চলে না; মূল্যবান পদার্থের মধ্যে—ফস্ফরাস! অতএব ইহার পর, তরুণী সুন্দরী লেখিকা হাসিহাসি মুখে কবিতা লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আর আমার ভয় কি? সম্পাদকদের মধ্যে যাঁহাদের বয়স কাঁচা তাঁহাদের সকলকেই আমি পদার্থ-বিজ্ঞান পড়িতে বলি। রামানন্দবাবু না পড়িলেও ক্ষতি নাই।

হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না; বৈরাগী-বৈজ্ঞানিক মহাশয় যোগ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন

banglabooks.in

মেয়েমানুষের মূল্য ঠিক আঠারো টাকা,—অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহাই পড়িতেছি, এমন সময় পর্দা সরাইয়া একটি হাসি-খুশি মুখ ঘরে প্রবেশ করিল।

এক নজরে সমস্ত চেহারাখানা আগাগোড়া দেখিয়া লইলাম। বয়স সতেরো-আঠারো, পায়ে হাই-হীল জুতা, বাঁ হাতের কব্জি হইতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিতেছে, বাঁকা সিঁথি, আর চোখ মুখ গড়ন—

এক কথায়, ঘোর সুন্দরী। বুঝিলাম, বিপদ উপস্থিত—এবং কবিতা।

বৈরাগ্যের প্রথম সোপান স্ত্রীজাতির প্রতি রূঢ়তা। আমি তাহাকে বসিতে না বলিয়া কঠোর স্বরে কহিলাম, 'আপনার মূল্য আঠারো টাকা।'

যুবতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'আঠারো টাকা? মোটে!...'

বাংলাদেশে এরূপ স্ত্রী-কবি কখনো দেখি নাই, কথাটা যেন গায়েই মাখিল না। তাই আরো তীব্রভাবে বলিলাম, 'সতেরো টাকাও হতে পারে। কারণ আপনি তন্বী—মানে, আপনি রোগা, শরীরে বেশী মাল নেই। তাছাড়া, আপনার চামড়ায় পিগ্‌মেণ্টের অভাব—যেহেতু আপনি ফরসা। এই দুই দফায় এক টাকা কাটা গেল। আপনার দাম সতেরো টাকা।'

যুবতী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্মিত-মুখে বলিল, 'তাই তো, তবে উপায়? মোটা হলে দাম বাড়তে পারে কি?

বুঝিলাম, রসিকতা করিতেছে। রসিকার বিরুদ্ধে বৈরাগ্য রক্ষা করা অতিশয় কঠিন, তাই আমি কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ শ্লেষ মিশাইয়া বলিলাম, 'আপনার শরীরে যে লোহা আছে তা থেকে একটি মাত্র পেরেক তৈরি হয়।'

যুবতীর চোখে দুষ্টু হাসি নৃত্য করিয়া উঠিল, সে বলিল, 'আর বঁড়শি?'

আমি বলিলাম, 'তা জানি না, কাগজে কিছু লেখেনি। আরো শুনুন, আপনার মধ্যে যে গন্ধক অর্থাৎ সালফার অছে তা দিয়ে মাত্র পাঁচটি দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি হতে পারে —তার বেশী নয়।'

যুবতীর গাল হাসির আবেগে টোল খাইয়া গেল, সে মুখ টিপিয়া বলিল, 'এতখানি আগুন যে আমার মধ্যে আছে তা আমি নিজেই জানতুম না।'

আমি বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম; স্ত্রী-কবিরা তো এমন ভাবে কথা বলে না, তাহারা কেবলই গলিয়া নেতাইয়া পড়িতে চায়। এ কিরূপ স্ত্রী-কবি? বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কি রকম তরুণী? আপনার কি আত্ম-সম্মান জ্ঞান নেই? আমার কথা শুনে আপনার রাগ হচ্ছে না? এখনো চলে যাচ্ছেন না কেন?'

যুবতী চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, 'আপনার মাথায় ছিট আছে আমি জানি।'

আমার মাথায় ছিট আছে! না, আর শুধু বৈরাগ্যে শানাইবে না, এই যুবতীটাকে ভালো রকম শিক্ষা দিতে হইবে। হাত বাড়াইয়া চাপা গর্জনে বলিলাম, 'দেখি, বার করুন আপনার কবিতা।'

'কবিতা!'—যুবতী ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিল।

'হ্যাঁ—কবিতা। আপনি কবিতা আনেননি?'

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, একটা লিখব ভেবেছিলুম, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।'

'তবে আপনি চান কি!'

'আমার দাদার বিয়েতে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে চাই।'

'আপনার দাদা!'

'হ্যাঁ—আমার দাদা। কেন, আমার কি দাদা থাকতে নেই?'

মনে মনে ভাবলাম, দাদা যদি বা থাকে সে অতি অপদার্থ দাদা। এমন সাংঘাতিক একটা ভগিনীকে অম্লানবদনে লোক সমাজে ছাড়িয়া দিয়াছে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার দাদা কে?'

banglabooks.in

সে বলিল, 'আমার দাদার নাম সৌরীন্দ্রনাথ—'

আমি লাফাইয়া উঠিলাম, 'অ্যাঁ! সৌরীন আপনার—তোমার দাদা? তার মানে—তার মানে—তুমি পলা!'

সে বলিল, 'হ্যাঁ আমি পলা, মানে প্রমীলা দেবী। চিনতে পেরেছেন?'

আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম, 'না। অনেক দিন আগে দেখেছি—প্রায় সাত-আট বছর। সৌরীনটা কোথায়? সে কলকাতায় এলো কবে?'

'আমরা সবাই কাল এসেছি। আজই বিয়ে, তাই তিনি আসতে পারলেন না, তাঁর বদলে আমি এসেছি। ভেবেছিলুম আমাকে চিনতে পারবেন।'

আমি ক্ষুব্ধ ভাবে বলিলাম, 'আমার সন্দেহ হয়েছিল তুমি একজন স্ত্রী-কবি।'

পলা বলিল, 'আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনেছিলুম, আপনি ঠিক তেমনি আছেন।'

আমি একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলাম, 'আমার মাথায় কিন্তু ছিট নেই।'

পলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চললুম। আজ নিশ্চয় যাবেন তাহলে।'

আমি গোঁ ধরিয়া বলিলাম, 'আমার মাথায় কিন্তু ছিট নেই।'

পলা হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নেই। তাহলে যাবেন তো?'

'যাব।'

বাড়ির ঠিকানা দিয়া পলা দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, আমার বৈরাগ্য আর একবার চাগাড় দিয়া উঠিল, ডাকিলাম, 'শোনো।'

পলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, 'আবার কি হল?'

আমি আঙুল তুলিয়া বলিলাম, 'তোমার শরীরে যে লোহা আছে তা থেকে একটি মাত্র পেরেক হয়, যে সালফার আছে—'

'মনে আছে, পাঁচটি দেশলাইয়ের কাঠি।'

আমি বলিলাম, 'স্ত্রী-কবি না হলেও তোমার দাম সতেরো টাকা—একথা ভুলো না।'

'আচ্ছা—বেশ!'

মাস তিনেক পরে, একদিন রাত্রে একটি পুষ্পকীর্ণ বিছানার পাশে বসিয়া পলা আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'সতেরো টাকার জন্যে বৈরাগ্য বিসর্জন দিলে?'

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, 'আমার হিসেবে ভুল ছিল; একটা জিনিস বাদ পড়ে গিয়েছিল।'

'কি?'

'তুমি।'

৭ আশ্বিন ১৩৪০

banglabooks.in

বহুবিঘ্নানি

বৌভাতের ভোজ শেষ হইয়া বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গেল। আজই আবার ফুলশয্যা।

ফাল্গুন মাস;—অর্ধ-বিস্মৃত সুদূর জনশ্রুতির মত বাতাসে এখনো শীতের আমেজ লাগিয়া আছে। তেতলার দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটাই নিখিলের শয়নকক্ষ—সেই ঘরেই আজ ফুলশয্যা হইবে। ঘরটি আগাগোড়া ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। বিছানায় রাশি রাশি শাদা ফুল, মশারির চারিধারে ফুলের মালার ঝালর, খাটের চারিটি ডাণ্ডায় গোলাপ ফুলের মালা লতার মত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। ঘরে দুটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি আছে—একটা শাদা, অন্যটাতে লাল বাল্‌ব। দুটিতেই ফুলের দুল দুলিতেছে।

শাদা আলোটা জ্বালিয়া নিখিল দক্ষিণের খোলা জানালার পাশে আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিল। চোখের সম্মুখে একটা খবরের কাগজ ধরা ছিল—বাহির হইতে কেহ আসিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে করিত সে বুঝি পড়ায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি রসিক, চব্বিশ বছর বয়সে একদা ফাগুনের রাতে যিনি নব-বধূর চরণধ্বনির আশায় উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিখিলের মনের অবস্থা বুঝিবেন। চক্ষুই কাগজে নিবদ্ধ, কিন্তু মন?—হায় চব্বিশ বছরের মন!

অধিকন্তু, বধূটি নিখিলের সম্পূর্ণ অপরিচিতা নয়; চোখে চোখে হাসিতে হাসিতে একটু আলাপ বহুপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। তিন বছর আগে নিখিলের ছোট বোনের বিবাহের রাত্রে সে প্রথম ললিতাকে দেখিয়াছিল, সেই অবধি—

যে জিনিস তিন বছর ধরিয়া অহরহ কামনা করা যায়, পরিপূর্ণ প্রাপ্তির শুভলগ্ন যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, মুহূর্তগুলি ততই যেন অসহ্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। নিখিল কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল; দখিনা বাতাস ক্রমেই যেন উন্মদ হইয়া উঠিতেছে, আর যেন শান্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। একটা পাপিয়ার কণ্ঠ পর্দায় পর্দায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া রঙীন আতসবাজীর মত ভাঙিয়া ঝরিয়া পড়িল। পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

বারোটা বাজিল। দ্বারের বাহিরে ফিস্‌ফিস্‌ গলার আওয়াজ ও চুড়ি-চাবির মৃদু শব্দ কানে যাইতেই নিখিল সচকিত ভাবে চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রে নিবদ্ধ করিল।

বড় বৌদিদি বধূর হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, 'এই নাও ভাই তোমার জিনিস।'

নিখিল কাগজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বৌদিদি বয়সে তাহার জ্যেষ্ঠা; চিরদিনই নিখিল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করিয়া চলে। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বড় বৌদিদি হাসিয়া বধূর হাতটি নিখিলের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'নাও। এবার আমি চললুম।—একটু সাবধানে কথাবার্তা কোয়ো কিন্তু। সবাই আড়ি পাতবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।' বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে অনেকগুলি চাপা গলার ফিস্‌ফিস্‌ ও তর্জন শুনা গেল—'কেন তুমি বলে দিলে—' বৌদিদি বলিলেন, 'নে, আর ওদের জ্বালাতন করিস্‌নি। অনেক রাত হয়ে গেছে; এখন যে-যার নিজের ঘরে গিয়ে ফুলশয্যে করগে যা।'

নিখিলের একটু দুর্ভাবনা হইল। বাড়িতে গুটি চারেক নবীনা বৌদিদি আছেন, তাঁহারা রেয়াৎ করিবেন না; দুটি কনিষ্ঠা ভগিনী—না, তাহারাও আজ কোনো বাধা মানিবে না। তাছাড়া একটি পঁয়তাল্লিশ বছরের শিশু ভগিনীপতি আছেন, তিনি তো আগে হইতেই শাসাইয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু বধূর হাতটি নিখিলের মুঠির মধ্যে। ললিতা কম্প্রবক্ষে নম্রতনয়নে দাঁড়াইয়া আছে,—মাথার অনভ্যস্ত ঘোমটা খসিয়া পড়িতেছে। কপালে, ঠোঁটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাহার টানাটানা চোখে কে সরু করিয়া কাজল পরাইয়া দিয়াছে। অপূর্ব হর্ষাবেশে নিখিলের

banglabooks.in

বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল! এই নারীটি তাহার! সে ললিতার হাতে একটু টান দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, 'ললিতা!'

ললিতার চোখ দুটি একবার স্বামীর মুখের পানে উঠিয়াই আবার নামিয়া পড়িল; ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, 'আলো নিবিয়ে দাও।'

বধূর হাত ছাড়িয়া নিখিল উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া লাল আলো জ্বালিয়া দিল। ঘরটি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল। জানালা-পথে দখিনা বাতাস তখন আরো অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বধূর কাছে ফিরিয়া আসিতেই বধূ একটু হাসিয়া খাটের নীচে আঙুল দেখাইয়া দিল। নিখিল প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া খাটের নীচে উঁকি মারিল। খাটের নীচে বধূর দুটো বড় বড় তোরঙ্গ ছিল, তাহাদের মাঝখানে একটি বড় পুঁটুলির মত বস্তু দেখিতে পাইল। টিপ করিয়া নিখিল পুঁটুলির গোলাকার স্থানটিতে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া ভগিনীপতি বাহির হইয়া আসিলেন। 'উঃ, শালা বোম্বাই চড় জমিয়েছে রে!' বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে দরজা খুলিয়া পলায়ন করিলেন।

ললিতা হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে আঁচল দিল।

জামাইবাবুকে ঘরের বাইরে খেদাইয়া দিয়া, দ্বারে খিল দিয়া নিখিল ঘরটা ভাল করিয়া তদারক করিল। ওয়ার্ডরোবের দরজা হঠাৎ খুলিয়া দেখিল ভিতরে কেহ আছে কিনা। আর কাহাকেও না পাইয়া সে নিশ্চিত হইয়া বলিল, 'আর কেউ নেই।'

ললিতার হাত ধরিয়া সে শয্যার পাশে লইয়া গিয়া বসাইল। ললিতার পা চলে চলে চলে না। ঐ পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যাটি চিরজন্মের জন্য তাহার—আর এই লোকটি—জীবনে মরণে সেও তাহার। তবু পা চলে না—পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায়। হায় ষোল বছরের যৌবন! হায় প্রথম-প্রণয়-ভীতি!

বধূর পাশে বসিয়া নিখিল চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'শুভদৃষ্টির সময় অমন মুখ টিপে হেসেছিলে কেন বল তো?'

বাহিরের অশান্ত দখিনা বাতাসটা আর শাসন মানিল না—হু হু করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মশারি উড়াইয়া, আল্‌নার কাপড়-চোপড় ছত্রাকার করিয়া, বধূর বস্ত্রাঞ্চল এলোমেলো করিয়া খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা সঙ্গে লইয়া আকস্মিক দুরন্ত বিপ্লবের মত উত্তরের জানালা দিয়া-বাহির হইয়া গেল!—বসন্তের মাতাল বাতাস—নাহি লজ্জা নাহি ত্রাস—আকাশে ছড়ায় অট্টহাস—

পাগলা বাতাসটা চলিয়া গেল—গোলাপী ছায়াময় ঘরটি আবার নিস্তব্ধ হইল। আলোটা দোল্‌নার মত দুলিতে রহিল।

হাওয়ার এই বিঘ্নকারী উৎপাতে নিখিল মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। বধূকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করে দেব নাকি?'

ললিতা মাথা নাড়িল, 'না, থাক।'

নিখিল তখন ললিতার পাশে আরো একটু সরিয়া বসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'ললিতা!'

ললিতা তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'ছাড়ো।'

নিখিল ডান হাতে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'না, ছাড়বো না।'

এই সময় খুব নিকট হইতে ভারী গলায় কে বলিয়া উঠিল, 'খবরদার।'

চমকিয়া নিখিল ললিতাকে ছাড়িয়া দিল; ললিতাও জড়সড় হইয়া সরিয়া বসিল।

নিখিল আবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিল, খাটের তলাটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল—কিন্তু কেহ কোথাও নাই। তবে কে কথা কহিল? গলাটা ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিয়াছে—এ জামাইবাবু না হইয়া যায় না। কিংবা হয়তো সেজ বৌদিদি—তিনি পরের গলা চমৎকার নকল করিতে পারেন। কিন্তু যিনিই হোন্—কোথায় তিনি? দুই জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কাহাকেও চোখে পড়িল না। দরজায় কান পাতিয়া শুনিল—কাহারো সাড়া-শব্দ নাই। ব্যর্থ হইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া ললিতার পাশে বসিল।

banglabooks.in

ঠং করিয়া সাড়ে বারোটা বাজিল।

নিখিল বলিল, 'বোধ হয় শোনবার ভুল কিন্তু ঠিক মনে হল কে যেন বললে—খবরদার—তুমি শুনেছিলে?'

ললিতা বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সেও 'খবরদার' শুনিয়াছিল—লজ্জায় লাল হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয় কেহ দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নিখিল আবার তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল, বলিল, 'ও কিছু নয়।'

ললিতা তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া বসিয়া চাপা উৎকণ্ঠার স্বরে বলিল, 'না না, এক্ষুনি কে দেখতে পাবে।'

নিখিল উঠিয়া গিয়া উত্তরের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল—সেদিকে ছাদ, সুতরাং আড়ি পাতিবার সুবিধা বেশী। দক্ষিণ দিক ফাঁকা—সেদিক হইতে কোনো ভয় নাই—তাই সে জানালাটা খোলাই রহিল।

'এবার আর কোনো ভয় নেই' বলিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিখিল ললিতার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার একটি হাত তুলিয়া লইয়া আঙুলের ডগায় একটা চুম্বন করিল। ললিতা হাত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। নিখিল হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী মেয়েটির মত একটি—' বলিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। ললিতার তপ্তনিশ্বাস তাহার অধরে লাগিল।

ঠিক এই সময় তেমনি ভারী গলায়—'এই! ও কি হচ্ছে?'

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নিখিল চারিদিকে চাহিল। শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে তাহা উৎকর্ণ হইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু আর কোনো শব্দ শুনা গেল না। নিখিলের মনে হইল শব্দটা যেন ঘরের ভিতর হইতেই আসিতেছে—অথচ ঘরের ভিতর কেহ নাই, সে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছে।

নিখিলের বড় রাগ হইল। বার বার বাধা! কথা যে-ই বলুক, সে নিশ্চয় তাহাদের কার্যকলাপ দেখিতে পাইতেছে—নচেৎ ঠিক ঐ সময়েই—

একটি মলক্কা বেতের লাঠি হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া নিখিল সন্তর্পণে দ্বার খুলিল—ইচ্ছাটা, সম্মুখে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই এক ঘা বসাইয়া দিবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সেখানে কেহই নাই। তবু নিখিল বাহির হইল—কে বজ্জাতি করিতেছে তাহাকে ধরিতেই হইবে; রসিক লোকটিকে আজ ভাল করিয়া জব্দ করা চাই।

পনের মিনিট বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া নিখিল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাড়ি নিশুতি—ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ। চাকর দাসীরা পর্যন্ত সমস্তদিনের ক্লান্তির পর যে যেখানে পাইয়াছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদি প্রভৃতিরা বোধ করি প্রথমে খানিকক্ষণ নিখিলের ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া শেষে প্রবলতর আকর্ষণে স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

লাঠিটা ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া নিখিল বলিল, 'নাঃ, কাউকে দেখতে পেলুম না. সবাই ঘুমিয়েছে।' সে আশ্চর্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল—কি এ! ভৌতিক ব্যাপার! ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌?

ঘড়িতে একটা বাজিল।

তখন নিখিল আবার ললিতার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিল। তারপর, কি ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া দক্ষিণের জানালাটাও বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'শুয়ে পড়লে হত না?'

নিখিল কিন্তু এখনি ঘুমাইতে রাজী নয়। বধূর সহিত নব পরিচয়ের রাত্রে, যখন সবেমাত্র পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে—তখন ঘুম!

নিখিল ললিতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'এখনি ঘুমুবে? আচ্ছা, আগে একটা চুমু দাও. তারপর বিছানায় শুয়ে গল্প করব।'

'আলো নিবিয়ে দাও।'

'না—আলো থাক। ললিতা—' বলিয়া ঠোঁটের কাছে ঠোঁট লইয়া গেল।

banglabooks.in

পুনরায় সেই গম্ভীর স্বর—'দাঁড়াও তো মজা দেখাচ্ছি।'

এবার নিখিলের মনটা সতর্ক ছিল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর উঠিয়া গিয়া সুইচ টিপিল।

বড় আলোর আকস্মিক তীব্র দীপ্তিতে ঘর ভরিয়া যাইতেই কার্নিসের উপর হইতে শব্দ হইল, 'রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ!'

কার্নিসের দিকে তাকাইয়া নিখিল হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ললিতাও সেদিকে একবার তাকাইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

একটা পাহাড়ী ময়না কার্নিসের উপর বসিয়া আছে এবং গম্ভীরভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছে।

নিখিল হাসিতে হাসিতে গিয়া ললিতাকে বিছানা হইতে ধরিয়া তুলিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বধূকে শক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পাখিটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'হতভাগা পাখি! বোধ হয় সেই ঝড়ের সময় কারুর খাঁচা থেকে পালিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়াও ওকে শায়েস্তা করছি।'

এক ঘর আলো—তাহার মাঝখানে স্বামীর একি কাণ্ড! ললিতা তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, 'ও কি করছ! ছেড়ে দাও—আলো নিবিয়ে দাও।'

নিখিল বলিল, 'না—ও বেটা পাখিকে আমি আজ দেখিয়ে দেব যে ওকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ যে আমার নিজের স্ত্রী তা বেটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।' বলিয়া ললিতার ঠোঁটে চোখে কপালে চার পাঁচটা চুম্বন করিল। ললিতাও বিবশা হইয়া স্বামীর বুকের উপর চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

পাখিটা বলিল, 'খবরদার! ও কি হচ্ছে! দাঁড়াও তো—'

নিখিল ললিতার নরম গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'ললিতা, এবার তুমি একটা।'

ললিতার অবশ অঙ্গে একটু সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, 'আলো নিবিয়ে দাও। দুটোই।'

নিখিল বলিল, 'কিন্তু পাখিটা যে দেখতে পাবে না!'

'তা হোক।'

তখন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতে হাত বাড়াইয়াই নিখিল সুইচ টিপিয়া দিল। ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল।

'ললিতা!'

'কি?'

'আলো নিবিয়ে দিয়েছি।'

মিনিটখানেক পরে একটি ভারি মিষ্টি ছোট্ট শব্দ হইল।

পাখিটা অন্ধকারে তাহা শুনিতে পাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, 'রাধে কৃষ্ণ!'

২৫ আশ্বিন ১৩৪০

banglabooks.in

গ্রন্থকার

প্রকাশকের জরুরী তাগিদে সেদিন ন'টা পাঁচিশের লোকালে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলাম। আন্দাজ ছিল, সাড়ে দশটা বাজিতে বাজিতে হাওড়ায় পৌঁছিয়া কলিকাতার কাজকর্ম সারিয়া দেড়টার গাড়িতে আবার বাড়ি ফিরিব।

আমাদের স্টেশনে মাত্র আধ মিনিট গাড়ি দাঁড়ায়; তাই দেখিয়া-শুনিয়া একটা নির্জন কামরা খুঁজিয়া লওয়া সম্ভব হইল না, সম্মুখে যে ইণ্টার-ক্লাস কামরাটা পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িতে হইল। গাড়ি তখন আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইখানি করিয়া সমান্তরাল বেঞ্চি লোহার গরাদ দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে অনেকগুলা লোকাল প্যাসেঞ্জার একত্র হইয়া কামড়া-কামড়ি না করে। আমি যে কুঠুরীতে ঢুকিয়াছিলাম তাহাতে গুটি চার-পাঁচ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। দুই পাশের অন্য খাঁচাগুলিতেও দু'চারজন করিয়া লোক ছিলেন। তাঁহাদের চেহারা দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে, ছাড়া পাইলেই তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবেন। যাহোক, সবধানে একটু কোণ ঘেঁষিয়া বসিলাম।

আমার পাশে বসিয়া একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক একাগ্রভাবে একখানা বই গিলিতেছিলেন। অন্য কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বোধ হয় আবেগের প্রাবল্যেই তাঁহার কাঁচা-পাকা দেড়-ইঞ্চি-চওড়া গোঁফ নড়িয়া উঠিতেছিল, কোটরগত চক্ষু জ্বলজ্বল করিতেছিল। ভারী চোয়াল চিবানোর ভঙ্গীতে নাড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে গলা দিয়া একপ্রকার শব্দ বাহির করিতেছিলেন—গর্ র্—র্—

কি এমন বই যাহা ভদ্রলোককে এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে? জিরাফের মত গলা উঁচু করিয়া বইখানার নাম পড়িলাম—'নীল রক্ত'। বইখানা পরিচিত—লেখকের নাম প্রদ্যোত রায়। মাস কয়েক পূর্বে বইটি বাহির হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পাশের খাঁচা হইতে এক ভদ্রলোক গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্যারীদা, অত মন দিয়ে কি পড়ছেন?'

পুস্তকপাঠনিরত ব্যক্তিই প্যারীদা। তিনি মুখ তুলিয়া সক্রোধে খ্যাঁক খ্যাঁক করিয়া হাসিলেন, বলিলেন, 'পদা ছোঁড়ার কেলেঙ্কারি দেখছি! কি ল্যাখাই লিখেছেন! মরি মরি! এই বই নিয়ে আবার তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। বইখানা বিশে লাইব্রেরী থেকে এনেছিল। ভাবলুম, দেখি তো পদা কি লিখেছে। ছেলেবেলা থেকেই ছোঁড়াকে জানি—আমার শ্যালীর সম্পর্কে ভাসুরপো হয়।—তা, যে বিদ্যে ছর্কুটেছেন সে আর কহতব্য নয়।'

সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন, 'নাম কি বইখানার?'

প্যারীদা তাচ্ছিল্যসূচক গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন, 'নীল রক্ত। যেমন নাম, তেমনি বই। আরে, তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল, পদা আবার বই লিখবে! মেনিমুখো একটা ছোঁড়া, তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে—'

আর একজন বলিলেন, 'নীল রক্ত! বইখানার নাম শুনেছি বটে—সেদিন বোসেদের গুপে বলছিল বইখানা ভাল হয়েছে। গুপে বাংলা বইয়ের খবর-টবর রাখে। তা লেখককে আপনি চেনেন নাকি?'

প্যারীদা বলিলেন, 'বললুম না, আমার শ্যালীর ভাসুরপো।—বাঘ-আঁচড়ায় থাকে, চালচুলো কিছু নেই। রোগা সিড়িঙ্গে হাড়-বের-করা ছোঁড়া, মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নেই, কথা কইতে গেলে তিনবার হোঁচট্ খায়—সে আবার বই লিখবে! হেসে আর বাঁচিনে!'

গ্রন্থকার শব্দটার মধ্যে কি-একটা সম্মোহন আছে, বিশেষত কেহ যদি বলে আমি অমুক লেখককে চিনি, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, দেখিতে দেখিতে সে সকলের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। প্যারীদাও গাড়িসুদ্ধ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গালে এক গাল পানদোক্তা পুরিয়া মৃদু-মন্দ রোমন্থন

banglabooks.in

করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, 'প্যারী, তুমি তো দেখছি ছোকরার ওপর বেজায় চটে গেছ। গল্পটা কি লিখেছে বল দেখি—আমরাও শুনি।'

প্যারীদা বলিলেন, 'লিখেছে আমার মুণ্ডু আর তার বাপের পিণ্ডি।'

"আহাহা, গল্পটা বলই না ছাই।'

'গল্প না ঘণ্টা—এক বুনিয়াদি জমিদার বংশের ছেলের কেচ্ছা। আস্পা দেখে হাসি পায়! তোর বাপ তো হল গিয়ে সব্‌পোস্ট-অফিসের পোস্টমাস্টার—তুই জমিদারের ছেলে কখনো চোখে দেখেছিস যে তাদের কেচ্ছা লিখতে গেলি? একেই বলে, পেটে ভাত নেই কপালে সিঁদুর!—আমি যদি ও গল্প লিখতুম তাহলেও বা কথা ছিল। নিজে ছাপোষা বটে কিন্তু ত্রিশবচ্ছর ধরে দু'বেলা জমিদারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিচ্ছি—তাদের নাড়ী থেকে হাঁড়ি পর্যন্ত সব খবর রাখি।—বলুন তো মশায়?' বলিয়া প্যারীদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরিলেন।

প্যারীদার কথা শুনিতে শুনিতে কেমন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জগৎটাই মায়াময় বোধ হইতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে তো ঠিক কথা, কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নয়—খাঁটি কথা। লেখার অভ্যেস নেই এই যা, নইলে এমন গল্প লিখতে পারতুম যে, পদার বাবাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত।'

পূর্বোক্ত পান-চর্বণ-রত ভদ্রলোক বলিলেন, 'কিন্তু গল্পটাই যে তুমি বলছ না হে!'

প্যারীদা বলিলেন, 'গল্পের কি আর মাথা-মুণ্ডু আছে! যত সব উদ্ভট ব্যাপার। শুনতে চাও তো বলছি।' বলিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আমার একবার সন্দেহ হইল, প্যারীদা গল্পটা সকলকে শুনাইবার জন্যই এতটা তাল ঠুকিতেছিলেন। যাহারা গল্প বলিতে জানে, শ্রোতার মনকে তৈয়ার করিয়া লইতেও তাহারা পটু! দেখিলাম, চলন্ত গাড়ির শব্দের ভিতর হইতে প্যারীদার গল্প শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছে। প্যারীদার মুখের উপর একটা তৃপ্তির ভাব ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া গেল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শেক্সপীয়রের মত এক একজন প্রতিভাবান লোক আছে, যাহারা পরের গল্প আত্মসাৎ করিয়া তাহার চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। দেখিলাম প্যারীদারও সেই শ্রেণীর প্রতিভা। বইখানা কেমন হইয়াছে তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কিন্তু প্যারীদার বলার ভঙ্গীতে গল্প জমিয়া উঠিল। আমি তাঁহারই কথায় যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে গল্পটাকে উদ্ধৃত করিলাম।—

এক মস্ত জমিদার বংশ; তিনশ' বছর ধরে চলে আসছে। তিন লক্ষ টাকা বছরে আয়, সাতমহল বাড়ি, এগারোটা হাতী, বাওয়ান্নটা ঘোড়া; ল্যাঠি সড়কি বরকন্দাজ মশাল্‌চি হুঁকাবরদার—চারদিকে গিশ গিশ করছে। মোটের ওপর, একটা রাজপাট বললেই হয়।

সেকালে জমিদারেরা ভীষণ দুর্দান্ত ছিল। ডাকাতি, খুনখুন, গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া—এমন কাজ নেই যা তারা করত না। তাদের এক বিধবা মেয়ের নাকি চরিত্র খারাপ হয়েছিল—জমিদার জানতে পেরে নিজের মেয়ে আর তার উপপতিকে ধরে এনে নিজের বৈঠকখানা ঘরের মেঝেয় পুঁতে আবার রাতারাতি মেঝে শান বাঁধিয়ে ফেলেছিল। তাদের অত্যাচার আর দাপটের কত কাহিনী যে প্রচলিত ছিল তার শেষ নেই! আশেপাশের জমিদারেরা তাদের যমের মত ভয় করত। শোনা যায়, সীমানার এক ঘাটোয়ালের সঙ্গে দখল নিয়ে তকরার হওয়াতে সেই ঘাটোয়ালকে তার বাড়ি থেকে লোপাট করে এনে অমাবস্যার রাত্রে মা কালীর সামনে বলি দিয়েছিল।

আজকাল অবশ্য সে সব আর নেই। তবে রাজপাট ঠিক বজায় আছে। বর্তমান জমিদারের একমাত্র ছেলে, তার নাম অহীন্দ্র। সেই হল গিয়ে এই গল্পের নায়ক। সে রীতিমত ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে, কলকাতায় প্রকাণ্ড বাসা করে থাকে। সে বড় ভাল ছেলে। বড় শান্ত

banglabooks.in

প্রকৃতি তার—পূর্বপুরুষদের দুর্দান্ত স্বভাব একটুও পায়নি—সাত চড়ে মুখে রা নেই। চেহারাও চমৎকার—লেখাপড়াতেও ধারালো। এক কথায় যাকে বলে হীরের টুক্‌রো ছেলে।

এই ছেলে লেখাপড়া করতে করতে হঠাৎ এক ব্যারিস্টারের মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সে ব্যারিস্টারের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করলে। ব্যারিস্টারটির বাইরের ঠাট ঠিক আছে; কিন্তু ভেতরে একেবারে ভুয়ো—আকণ্ঠ দেনা। তাঁর মেয়ে মনীষা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে; সুন্দরী শিক্ষিতা বটে কিন্তু ডেঁপো চালিয়াৎ নয়—শান্ত ধীর নম্র। সেও মনে মনে অহীন্দ্রকে ভালবেসে ফেললে।

কিন্তু প্রেমের পথ বড়ই কুটিল; এতবড় জমিদারের ছেলেও দেখলে তার প্রিয়তমাকে পাবার পথে দুস্তর বাধা। অর্থাৎ মনীষার আর একটি উমেদার আছে। উমেদারটি আর কেউ নয়—ব্যারিস্টার সাহেবের পাওনাদার। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, অবিবাহিত, বিলেত-ফেরত এবং টাকার আণ্ডিল। তার নামে মাঝে মাঝে কিছু কানাঘুষোও শোনা যেত—কিন্তু যার অত টাকা তার নামে কুৎসা কে গ্রাহ্য করে?

ব্যারিস্টার সাহেবের চরিত্র অতি দুর্বল। তিনি মেয়েকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু পাওনাদারের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। তাই, ইচ্ছা থাকলেও অহীন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনাটা মনে মধ্যে গ্রহণ করতে পারছেন না। অহীন্দ্রও স্পষ্ট করে কোনো কথা বলে না, কেবল আসে-যায়, গল্প করে, চা খায়—এই পর্যন্ত। তার মনের ভাব হয়তো কেউ কেউ বুঝতে পারে; কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করে না। এমনি ভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

ছ'মাস পরে একদিন কথায় কথায় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর মনের ভাব জানতে পারলে। তিনি মনীষাকে বিয়ে করতে চান না—বিয়েতে তাঁর ভারি অরুচি—তাঁর মতলব অন্য রকম। কিন্তু মনীষা ভালমানুষ হলেও ভারি শক্ত মেয়ে, সে ও-সবে রাজী নয়। ব্যারিস্টার সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু পাওনাদারকে চটাবার সাহস তাঁর নেই—তিনি কেবল চোখ বুজে থাকেন। কিন্তু তবু পাওনাদার বাবু সুবিধা করে উঠতে পারছেন না।

এই ব্যাপার জানতে পেরেও অহীন্দ্র কোনো কথা বললে না, চুপ করে রইল। সে এতই ভালমানুষ যে, পাওনাদার বাবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনেও সে কোনো দিন তাঁর প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা দেখায় নি। দু'জনের মধ্যে বেশ সদ্ভাবই ছিল। পাওনাদার বাবু অহীন্দ্রকে গোবেচারি ভ্যাড়াকান্ত মনে করে ভেতরে ভেতরে একটু কৃপার চক্ষেই দেখতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অহীন্দ্র ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়িতে এসে দেখলে, মনীষা বাগানে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। অহীন্দ্র নিঃশব্দে বাগান থেকে ফিরে চলে গেল।

পরদিন বিকেলবেলা অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করে বললে, 'আপনার সঙ্গে একটা ভারি গোপনীয় কথা আছে—কিছু টাকা ধার চাই। কাজটা কিন্তু খুব চুপিচুপি সারতে হবে—বাবা না জানতে পারেন।'

বড়লোকের ছেলেদের টাকা ধার দেওয়াই পাওনাদার বাবুর ব্যবসা, তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ তো! আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি আমার বাড়িতে যাবেন। কেউ থাকবে না—চাকর-বাকরদেরও সরিয়ে দেব।'

রাত্রি দশটার সময় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর বাড়িতে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হল; দেখলে, গৃহস্বামী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। তখন দু'জনে টাকার কথা আরম্ভ হল।

অহীন্দ্র বিশ হাজার টাকা ধার চায়। কিন্তু সুদের হার নিয়ে একটু কষাকষি চলতে লাগল। অহীন্দ্র বললে সে শতকরা দশ টাকার বেশী সুদ দিতে পারবে না। পাওনাদার বাবু বললেন, তিনি শতকরা পনের টাকার কম সুদ নেন না। তার কারণ, যারা তাঁর কাছে ধার নেয় তাদের নাম কখনও জানাজানি হয় না—গোপন থাকে। অহীন্দ্র তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে। তখন তিনি লোহার আলমারি খুলে অন্যান্য তমসুক বার করে দেখালেন যে সকলেই শতকরা পনের টাকা হারে সুদ দিয়েছে।

এই সময় টেবিলের ওপর আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। তারপর অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি

banglabooks.in

হল কেউ জানে না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অহীন্দ্র যথারীতি ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি গিয়ে শুনলে যে পাওনাদার বাবু হঠাৎ মারা গেছেন। কিসে মারা গেছেন কেউ বলতে পারলে না। তবে তাঁর চরিত্র ভাল ছিল না, তাই অনেকেই অনুমান করলে যে, এর মধ্যে স্ত্রীলোকঘটিত কোনো ব্যাপার আছে।

এই ঘটনার সাতদিন পরে ব্যারিস্টার সাহেব বুক-পোস্টে একটা কাগজের তাড়া পেলেন। খুলে দেখলেন, কোনো অজ্ঞাত লোক তাঁর তমসুকখানি পাঠিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর জমিদারের সুবোধ শান্ত ছেলের সঙ্গে ঋণমুক্ত ব্যারিস্টারের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমিক প্রেমিকার মিলন হল।

প্যারীদা বলিলেন, 'শুনলে তো গল্প?'

সকলে চুপ করিয়া রহিল। ট্রেন এতক্ষণ প্রত্যেক স্টেশনে থামিতে থামিতে প্রায় গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বেলুড়ে গাড়ি থামিতেই, একটি পুরাদস্তুর তরুণ আমাদের কামরায় প্রবেশ করিয়া রুমালে সন্তর্পণে গদি ঝাড়িয়া উপবেশন করিল এবং চওড়া কালো ফিতার প্রান্তে বাঁধা প্যাঁশ-নে চশমার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের দিকে একবার অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিল।

গাড়ি আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

'নীল রক্ত' বইখানা প্যারীদা'র হাতেই ছিল; তরুণ এতক্ষণে সেটার নাম দেখিতে পাইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কেমন পড়লেন বইখানা? ওটা আমার লেখা।'

আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া তরুণের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। প্যারীদা কিয়ৎকালের জন্য একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন, তারপর গর্জন করিয়া উঠিলেন, 'তোমার লেখা? কে হে তুমি ছোকরা? এ বই পদার লেখা—আমার শ্যালীর ভাসুরপো পদা।'

তরুণ অবিচলিত ভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আপনার শ্যালীর ভাসুর থাকতে পারে এবং সেই ভাসুরের পদা নামক ছেলে থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু বইখানা আমার লেখা। আমার নাম—প্রদ্যোত রায়।'

গাড়িসুদ্ধ লোক এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। যাহারা দূরের খাঁচায় ছিল তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া একদৃষ্টে তরুণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তরুণ বলিল, 'পদা নামধারী কোন ব্যক্তির বই লেখা সম্ভব নয়।—দেখি বইখানা।' বলিয়া তরুণ হাত বাড়াইল।

প্যারীদা'র মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি এখনি বইখানা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু লাইব্রেরীকে দেড় টাকা গুনাগার দিতে হইবে এই ভয়েই বোধ হয় তাহা করিলেন না। তরুণ বইখানা লইয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া বলিল, 'শুনুন, মুখস্থ বলছি—১০৯ পৃষ্ঠায় আছে—"সভ্যতা ও ধর্মভয় মানুষের গায়ে ক্ষীণতম পালিশ মাত্র; জীবনের অবিশ্রাম ঘর্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়া ভিতরের প্রকৃত মনুষ্যমূর্তি কখনও কখনও বাহির হইয়া পড়ে। তখন সেই আদিম সভ্যতালেশবর্জিত নখদন্তায়ুধ মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। বুঝিতে পারি না যে, আমাদের সকলের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর মূর্তি লুক্কায়িত আছে—প্রয়োজন হইলেই সে ছদ্মবেশ ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অনেকের জীবনেই সে প্রয়োজন আসে না—কিন্তু যাহার আসে,—" তরুণ মুচকি হাসিয়া বলিল,—'এখনও কি আপনি বলতে চান যে এ লেখা আপনার পদার হাত থেকে বেরিয়েছে?'

প্যারীদা এবার একেবারে নিবিয়া গেলেন, অতি কষ্টে অসংলগ্নভাবে বলিলেন, 'পদা—মানে পদার নামও প্রদ্যোত রায়, তাই আমি—'

বিজয়ী তরুণ সহাস্যে আমার দিকে ফিরিল, 'আপনি বইটা পড়েছেন কি?' আমার চেহারা দেখিয়া আমাকেই বোধ হয় সে এই দলের মধ্যে সব চেয়ে শিক্ষিত মনে করিয়াছিল।

banglabooks.in

আমি কি আর বলিব, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিলাম, 'হ্যাঁ। প্রুফ সংশোধন করবার সময় একবার পড়েছিলুম, তার পর আর পড়া হয়নি।'

তরুণ বলিল, 'ও! আপনি ছাপাখানায় কাজ করেন?'

কথাটা একটু গায়ে লাগিল। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, আমি বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, 'না। বইখানা আমারই লেখা।'

তরুণ উচ্চকিতভাবে আমার পানে তাকাইল, একটু অস্বস্তির ভাব তাহার মুখে দেখা দিল। সে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি বলতে চান—?'

মনকে কঠিন করিলাম। পকেট হইতে একটা পোস্টকার্ড বাহির করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম, 'আপনারা রাগ করবেন না, কিন্তু আমিই প্রদ্যোত রায়। খাঁটি এবং অকৃত্রিম—ভেজাল নেই। বিশ্বাস না হয়, এই পোস্টকার্ডখানা পড়ে দেখুন—'নীল রক্ত'র দ্বিতীয় সংস্করণ বার হবে তাই প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।'

সঙ্কুচিতভাবে পোস্টকার্ডখানা প্যারীদা'র দিকে বাড়াইয়া দিলাম, তিনি কেবল হিংস্রভাবে আমার পানে তাকাইলেন।

গাড়ি প্ল্যাট্‌ফর্মে আসিয়া থামিল। আমি কার্ডখানা তরুণের দিকে বাড়াইবার উপক্রম করিতেই সে দ্রুত প্ল্যাট্‌ফর্মে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

২২ পৌষ ১৩৪০

তিমিঙ্গিল

তিমি মৎস্যই যে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব, এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একমত। আমি কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বলিতে পারি যে, তিমিঙ্গিল নামধারী আর একটি অতি বৃহদায়তন জীব আছে যাহারা তিমি মৎস্যকে গিলিয়া খায়। বিশ্বাস না হয়, অভিধান দেখুন।

অপিচ, তিমিঙ্গিল যদি থাকিতে পারে, তবে তিমিঙ্গিল-গিল (যাহারা তিমিঙ্গিলকে গিলিয়া খায়) থাকিবে না কেন? এবং তিমিঙ্গিল-গিল থাকা যদি সম্ভবপর হয় তবে তিমিঙ্গিল-গিল-গিল থাকিতেই বা বাধা কি?

এইভাবে প্রশ্নটাকে অনন্তের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনর্থক কতকগুলা গিল-গিল-গিল বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই লাভ হইবে না। আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, জগতের সর্বত্রই বৃহৎকে বৃহত্তর গ্রাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুপ্ত মহাশয় বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিট সময়ে তিনি হঠাৎ তড়াক্ করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

banglabooks.in

ঘরে আর কেহ থাকিলে মনে করিত, নিশিকান্তবাবু বুঝি বৈদ্যুতিক 'শক্' খাইয়াছেন। হইয়াছিলও তাই। তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চল্লিশ হাজার ভোল্টের প্রচণ্ড একটি আইডিয়া খেলিয়া গিয়াছিল।

নিশিকান্তবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দালাল; ব্যবসা-সম্পর্কীয় সকল বিদ্যার হুনরী। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ক্রয়-বিক্রয় তেজী-মন্দা বাজার-জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ কলিকাতা শহরে বড় কেহ ছিল না। এই সূক্ষ্ম বাজার-জ্ঞানের ফলে গত পঁচিশ বৎসরে তিনি কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেহ জানিত না। যাহারা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে তাঁহার চমৎকার সুসজ্জিত দোতলা বাড়িখানা দেখিত, তাহারা সংহিসভাবে অনুমান করিত মাত্র।

কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, নিশিকান্তবাবুর চিত্তে সুখ নাই। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ আছে। কারণ কাজ করিতে গেলেও লাভের মাত্রা এত কম হস্তগত হয় যে খরচা পোষায় না। ব্যবসার জগৎটা যেন ধীরে ধীরে প্রলয়পয়োধিজলে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্তবাবুর অবশ্য অর্থোপার্জনের কোনও প্রয়োজন নাই; ব্যাঙ্ক হইতে ছয় মাস অন্তর যে সুদ বাহির করেন তাহাতে তাঁহার পাঁচটা হাতী পুষিলেও ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয় না। কিন্তু নিশিকান্ত কর্মী পুরুষ, অর্থোপার্জনের নেশা তিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছেন। তাই, আফিমের মৌতাতের মত উপার্জনের মোহই তাঁহাকে বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। অথচ দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান মন্দার বাজারে উপার্জন একেবারেই নাই।

নিশিকান্ত জগদ্ব্যাপী অবসাদের মধ্যে কোথাও একটু আশার আলো দেখিতে পাইতে-ছিলেন না, এমন সময়ে রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিটে তাঁহার মাথায় চল্লিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল!

আলোক-বিভ্রান্তের মত নিশিকান্ত কিছুক্ষণ বিছানায় জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল,—মোমবাতি! হ্যারিকেন লণ্ঠন!!

হাত বাড়াইয়া তিনি বেড্‌সুইচ টিপিলেন; রক্তবর্ণ নৈশ-দীপ মাথার উপর জ্বলিয়া উঠিল। নিশিকান্ত প্রায় দশ মিনিট মুগ্ধ তন্ময় ভাবে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

বালিশের পাশে তাঁহার নোটবুক ও পেন্সিল থাকিত। নিশিকান্ত বুকের তলায় বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইলেন, তারপর নোটবুকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। নোটবুকের অবোধ্য ইঙ্গিতে তাঁহার ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় গুপ্ত কথা লেখা ছিল, তিনি সেইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিসাব করিলেন, কত টাকা তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থান হইতে বাহির করিতে পারেন। হিসাব বোধ করি বেশ মনোমত হইল, কারণ তিনি পরিতোষের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর তিনি নোটবুকের পাতায় পেন্সিল দিয়া আর এক-জাতীয় অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এটা খরচের হিসাব। সমস্ত যোগ করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশী হইল। নিশিকান্ত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তারপর নোটবহি বন্ধ করিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মুখে দশ হাজার দীপশক্তির যে হাসিটি ফুটিয়া উঠিল তাহার কাছে রক্তবর্ণ নৈশ-দীপের প্রভা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

তিনি মনে মনে বলিলেন, 'তিন দিনে বাহাত্তর হাজার টাকা! মানে—রোজ চব্বিশ হাজার।'

নিশিকান্তবাবুর স্ত্রী পাশের ঘরে শয়ন করিতেন, মাঝের দরজায় পর্দার ব্যবধান। নিশিকান্তবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ—তবে ভার্যাটি নেহাৎ তরুণী নয়, বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। তিনি অত্যন্ত সৌখিন এবং বন্ধ্যা, এই জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ। প্রায়ই মাসিক

banglabooks.in

পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

নিশিকান্তবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, পর্দার নীচে দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। বুঝিলেন, গৃহিণী এখনও মাসিক পত্র শেষ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁগা, জেগে আছ?'

পাশের ঘর হইতে হ্যাঁগা উত্তর দিলেন, 'হুঁ।'

আলুথালু বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া নিশিকান্ত স্ত্রীর ঘরে গেলেন। স্ত্রী পিঠে বালিশ দিয়া অর্ধশয়ান অবস্থায় শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া ছিলেন, মাথার শিয়রে একটা ত্রিপদের শীর্ষে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। স্ত্রী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া নিশিকান্তবাবুর চেহারা দেখিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিলেন।

নিশিকান্ত আলোর নিকটে গিয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিলেন; আবার জ্বালিলেন, আবার নিবাইয়া দিলেন।

বিরক্তভাবে গৃহিণী বলিলেন, 'ও কি হচ্ছে?'

নিশিকান্ত বলিলেন, 'বেশ—না? ইলেক্‌ট্রিক বাতি। সুইচ টিপলেই নিবে যায় আবার সুইচ টিপলেই জ্বলে ওঠে।'

স্ত্রী ধমক দিয়া বলিলেন, 'এত রাত্রে হল কি তোমার?'

নিশিকান্ত স্ত্রীর শয্যার এক পাশে আসিয়া বসিলেন; একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, 'আমি ভাবছি একটা ছাপাখানা করতে কত খরচ লাগে।'

স্ত্রীর হাত হইতে মাসিক পত্র পড়িয়া গেল। তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। বহুদিন হইতে তাঁহার বাসনা নিজের ছাপাখানা করিয়া একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন; মাসিক পত্রে কেবল কবিতা ছাপা হইবে। পত্রিকার নাম হইবে—'মন-কুসুম'—সম্পাদিকা হইবেন স্বয়ং শ্রীমাধুরী দেবী!

স্বামীকে এই সুন্দর পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। কবিতার মাসিক পত্র কিরূপ চলিবে সে-বিষয়ে নিশিকান্তবাবুর মনে কোনও মোহ ছিল না। অথচ স্ত্রীর একটা সখ মিটাইবার ইচ্ছা তাঁহার যে একেবারেই ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া নিশিকান্ত গা করেন নাই।

মাধুরী দেবী এক নিশ্বাসে বলিলেন,—'সত্যি কিনবে?—আমার কতদিনের যে সখ। 'মন-কুসুম'—কেমন নামটি বলে বল তো? নীচে লেখা থাকবে—সম্পাদিকা শ্রীমাধুরী দেবী! খরচ এমন কিছু নয়; সেদিন নীলকান্ত প্রেসের মালিক আমার কাছে এসেছিল। তারা প্রেস বিক্রি করতে চায়, কোথা থেকে শুনেছে আমি কিনতে পারি। খুব বড় প্রেস—ইংরেজী বাংলা সব আছে; নতুন দাম সাতাশ হাজার টাকা। বলছিল আঠার হাজার পেলেই বিক্রি করবে। তা—কষামাজা করলে হয়তো কিছু কমেও দিতে পারে।'

নিশিকান্ত ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'খবর নিও যদি বারো হাজারে ছাড়ে তো নিতে পারি।'

মাধুরী দেবী বলিলেন, 'অত কমে দেবে কি? আচ্ছা—'

নিশিকান্ত শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিলেন। মাধুরী দেবী তাঁহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এখনি শুতে চললে?'

নিশিকান্ত আলস্য ভাঙিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, আর দ্যাখ, কাল দুই টিন ভাল কের'সিন তেল আর গোটা দশেক হ্যারিকেন লণ্ঠন কিনে আনিও। আর পাঁচ বাণ্ডিল মোমবাতি।' বলিয়া নিগূঢ় ভাবে হাস্য করিতে করিতে তিনি নিজের শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

অতঃপর সাতদিন ধরিয়া নিশিকান্তবাবুর ভোমরা রঙের সিডান-বডির গাড়িখানি মধু-সঞ্চয়ী মৌমাছির মত কলিকাতার পথে পথে গুঞ্জন করিয়া উড়িয়া বেড়াইল। নিশিকান্ত-বাবু কোথায় কোথায় গেলেন ও কাহার সহিত নিভৃতে কি কথা বলিলেন তাহা ব্যক্ত করা

banglabooks.in

আমাদের সাধ্য নয়—সাধ্য হইলেও বলিতাম না। পরের গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া দিতে আমরা ভালবাসি না। এই সব যাতায়াতের ফলে নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক হইতে লক্ষাধিক টাকা অপসৃত হইয়া কোন্ মৌচাকে সঞ্চিত হইল তাহাও বলিব না। ঘুষির পুংলিঙ্গে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করি।

তারপর মাল খরিদ আরম্ভ হইল। নিশিকান্তবাবু যে যে মাল খরিদ করিয়া বাজার কোণঠাসা করিলেন তাহার ফিরিস্তি দিবার প্রয়োজন নাই; তিনি বাজার উজাড় করিয়া গুদামজাত করিলেন। বড় বড় দেশী বিলাতী ব্যবসায়ীরা ভ্রূ তুলিল, মনে মনে হাসিল—কিন্তু অকপট আনন্দে হাত ঘষিতে ঘষিতে মাল সরবরাহ করিল। কেবল নিশিকান্তবাবু কেরাসিন তেলের দিকে গেলেন না; অনেক মূলধন চাই, লাখে কুলাইবে না। অপ্রসন্ন চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন, 'করে নিক্ ব্যাটারা কিছু লাভ।'

দশদিনের দিন নিশিকান্তবাবুর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। তিনি গুদামে গিয়া মাল পরিদর্শন করিলেন, অফিসে বসিয়া খাতাপত্র তদারক করিলেন; তারপর চেয়ারে ঠেসান দিয়া একটি স্থূলকায় সিগার ধরাইয়া বলিলেন, 'এইবার।'

সেইদিন রাত্রি সাতটার সময় কলিকাতা শহরের সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া গেল। রাত্রি দশটার সময় রাস্তার গ্যাস-বাতিও হঠাৎ দপ্‌দপ্ করিয়া চক্ষু মুদিল—তিনদিনের মধ্যে আর জ্বলিল না!

আলোকহীন মহানগরীর বর্ণনা আমরা করিব না। অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে—কালিমা লইয়া যাঁহাদের কারবার তাঁহারা সে রূপ নয়ন ভরিয়া দেখুন এবং বর্ণনা করুন। নিশিকান্তবাবুর মত আমরা আলোর কারবারী।

রাস্তা এবং ঘর অন্ধকার; ট্রাম বন্ধ। হ্যারিকেন লণ্ঠন ও মোমবাতির দর ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িতে লাগিল। অথচ ঐ দুইটি দ্রব্য নিশিকান্তবাবুর গুদামে বন্ধ। তিনি অল্পে অল্পে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রেও যখন আলো জ্বলিল না, তখন চারিদিকে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আশ্চর্য দৈব দুর্ঘটনায় গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্র এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই মেরামত হইতেছে না। কিন্তু গৃহস্থের আলো চাই। লণ্ঠন ও মোমবাতির দাম এমন একটা কোঠায় গিয়া উঠিল যে, কল্পনা করাও কঠিন। নিশিকান্তবাবু মাল ছাড়িতে লাগিলেন, এবং ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। যে সব বড় বড় ব্যবসাদার একগাল হাসিয়া নিশি-কান্তকে মাল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা হাত কামড়াইতে লাগিল!

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মূলধন উঠিয়া বারো হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তাছাড়া এখনো ষাট হাজার টাকার মাল গুদামে মজুত।

বারো হাজার টাকা পকেটে লইয়া নিশিকান্তবাবু অফিস হইতে বাড়ি ফিরিলেন। স্ত্রী তিনটা লণ্ঠন জ্বালিয়া স্বামীর জন্য স্বহস্তে চা তৈয়ার করিতেছিলেন, তাঁহার কোলে নোটের তাড়া ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এই নাও।'

মাধুরী দেবী একমুখ হাসিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা করিলেন, 'আজ সরকারকে বাজারে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম; একটা হ্যারিকেন দাম পাঁচটাকা!—হ্যাঁগা, আর ক'দিন?'

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবুর গুদাম খালি হইয়া গেল।

শেষ কিস্তির ষাট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইবার সময় ছিল না। এই টাকাটাই নিশি-কান্তবাবুর মূল লভ্যাংশ। এত টাকা এখন কোথায় রাখিবেন—নিশিকান্ত একটু চিন্তা করিলেন। চেক নয়, নগদ টাকা। অফিসের লোহার সিন্দুকে রাখিয়া গেলেও চলে, কিন্তু—দু'একটা সংবাদ নিশিকান্তর স্মরণ হইল। অন্ধকারের সুযোগ লইয়া চোর গুণ্ডার দল খালি অফিস-বাড়ি ইত্যাদি ভাঙিয়া লুট করিতেছে—বড় বড় দুই তিনটা অফিসে এইরূপ

banglabooks.in

ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। নিশিকান্ত নোটের গোছা পকেটে পুরিয়া লইলেন। বাড়িতে রাখিলে সব চেয়ে নিরাপদ হইবে। বাড়িতে পাঁচটা গুর্খা দারোয়ান, দশটা চাকর আছে; তাহার উপর আবার দু'জন কনেস্টবলকে খরচা দিয়া পাহারা দিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

নিশিকান্ত অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন মোটরে চড়িলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মোটরের কাচের ভিতর দিয়া দু'ধারি রাস্তার চেহারা সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতা যেন রাত্রিযোগে ভৌতিক শহরে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় দোকানের বিদ্যুৎ-দন্ত-বিকশিত হাসি আর নাই, অধিকাংশই বন্ধ। যেগুলি খোলা আছে তাহাতে মোমবাতি ও লণ্ঠন জ্বলিতেছে। পথে গাড়ি মোটরের চলাচলও কম। মানুষ যাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহাদের নিশাচর প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়।

কলেজ স্ট্রীট বাজারের নিকটে পৌঁছিয়া নিশিকান্তবাবুর ভারি কৌতূহল হইল। কোনও একটা বড় কাজ করিয়া সাধারণের মতামত জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি মোটর হইতে নামিলেন। একটা ক্ষুদ্র দোকানে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মোমবাতি আছে?'

দোকানদার বলিল, 'আজ্ঞে আছে, তিনটাকা বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত পকেট হইতে তিনটাকা বাহির করিয়া ছদ্ম বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, 'দিন এক বাণ্ডিল। যত সব চোরের পাল্লায় পড়া গেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'শার্ক' এই ব্যবসাদারগুলো হচ্ছে তাই।'

দোকানদার নেহাৎ অশিক্ষিত নয়, একটু রসিক; বলিল, 'শার্ক তো পদে আছে মশাই, ব্যবসাদারেরা যাকে বলে তিমি মাছ—তাই! আস্ত গিয়ে খায়। নিন এক বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত দোকানদারের কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিলেন; তিনি নিজেই যে তিমি মাছ, দোকানদার তাহা জানে না—অজ্ঞাতসারেই প্রশংসা করিতেছে! তাঁহার ছদ্ম বিরক্তির ভিতর দিয়া একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি মোমবাতির বাণ্ডিল লইয়া মোটরের দিকে ফিরিলেন।

মোটরে উঠিতে যাইবেন, এমন সময়—

তিমিঙ্গিল!

নিশিকান্ত হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চারিপাশে কয়েকজন লোক নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি সচকিতে চারিধারে চাহিলেন; অস্পষ্ট আলোয় মুখগুলি ভাল দেখা গেল না।

একজন তাঁহার পেটের উপর ছোরার অগ্রভাগ রাখিয়া চাপা গলায় বলিল, 'চিল্লাও মৎ!'

আর একজন তাঁহার কোটের ভিতর-পকেটে হাত পুরিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া লইল। নিশিকান্তবাবু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তিমিঙ্গিলের দল ছায়ার মত অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার মিনিটখানেক পরে নিশিকান্ত উন্মত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'পুলিস! আমার বাট হাজার টাকা—'

নিশিকান্ত থানায় গেলেন।

থানার দারোগা বলিলেন, 'লিখে নিচ্ছি। কিন্তু টাকা আর পাবেন না। এই আলোর গোলমাল হয়ে অবধি শহরটা চোর বদমায়েসের আড্ডা হয়েছে।'

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে নিশিকান্তবাবুর বিভ্রান্ত চিত্তে একটি ক্ষীণ সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল—'যাক তবু বারো হাজার টাকা লাভ রইল।'

রাত্রি আটটার সময় তিনি বাড়ি পৌঁছিলেন। মাধুরী দেবী অধীরভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, 'ওগো, ভারি, সুখবর! নীলকান্ত প্রেস কিনে নিয়েছি। বারো হাজারেই রাজী হয়ে গেল।'

নিশিকান্ত বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার গলা দিয়া একপ্রকার ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইল। ঘরের মধ্যেও যে তিমিঙ্গিল বসিয়া আছে তাহা কে জানিত!

banglabooks.in

এই সময়, যেন নিশিকান্তকে বিদ্রূপ করিয়া, কলিকাতার ইলেকট্রিক বাতি আবার জ্বলিয়া উঠিল। বানচাল যন্ত্র এতদিনে ঠিক হইয়া গিয়াছে!

২ পৌষ ১৩৪১

ভেন্‌ডেটা

এক

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

ওলগোবিন্দ ঘোষ ও কুঞ্জকুঞ্জর কর পাশাপাশি জমিদার ছিলেন। উভয়ের নামই বিস্ময়-উৎপাদক। আসল কথা, ওলগোবিন্দবাবু ছিলেন ওলাই চণ্ডীর বরপুত্র; এবং কুঞ্জকুঞ্জরবাবু শাক্তভাবাপন্ন বৈষ্ণববংশের সন্তান।

চারপুরুষ ধরিয়া দুই বংশে কলহ চলিতেছিল। শতাধিক বর্ষ পূর্বে কুঞ্জকুঞ্জরের বৃদ্ধপিতামহ ওলগোবিন্দের বৃদ্ধপিতামহের পুত্রের (অর্থাৎ পিতামহের) বিবাহের বৌভাত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া নববধূ দেখিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'ছেলের কথা কিছু বলব না, বাপকা বেটা; কিন্তু ভায়া, বৌ হয়েছে যেন মুক্তোর মালা।'

রসিকতাটি বুঝিতে বরপক্ষের একটু দেরি হইয়াছিল, সেই অবকাশে রসিক ব্যক্তিটি নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তারপর হইতেই পুরুষ-পরম্পরায় কলহ চলিয়া আসিতেছে।

বর্তমানে, ওলগোবিন্দের সহিত আদালতে ছাড়া কুঞ্জকুঞ্জরের সাক্ষাৎ হইত না—তাহাও কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হইলে, যুযুধান ষণ্ডের মত উভয়ে ঘোর গর্জন করিতেন!

পার্ষদ ও শুভানুধ্যায়িগণ উভয়কে দূরে দূরে রাখিত।

কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে?

ওলগোবিন্দ একদা দেওঘরে এক বাড়ি খরিদ করিলেন। বাড়ির চারিধারে প্রকাণ্ড বাগান —পাঁচিলে ঘেরা। বাগানে ইউক্যালিপ্টাস, ঝাউ পেঁপে কলা—নানাবিধ গাছ।

ওলগোবিন্দ সপরিবারে একদিন হেমন্তকালে নব-ক্রীত বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভারি বাগানের সখ—বাগান দেখিয়া অত্যন্ত হরষিত হইলেন।

পাঁচিলের পরপারে আর একটা বাড়ি; অনুরূপ বাগানযুক্ত। সন্ধ্যাকালে ওলগোবিন্দ দারোয়ান সঙ্গে সেই পাঁচিলের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে পাঁচিলের ওপারে আর একটি মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

তারপর ওলগোবিন্দ ঘোর গর্জন করিলেন।

banglabooks.in

প্রত্যুত্তরে কুঞ্জকুঞ্জর ঘোরতর গর্জন করিলেন।

কিন্তু মধ্যে পাঁচিলের ব্যবধান—তাই সেযাত্রা শান্তিরক্ষা হইল।

ওলগোবিন্দ নিজের দারোয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভেঁপু সিং, এই বুড্ঢাকো রাস্তামে পাওগে তো টাক ফাটা দেওগে।' বলিয়া ভেঁপু সিং-এর হাতে একটি কোদালের বাঁট ধরাইয়া দিলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর নিজের দারোয়ানকে বলিলেন, 'মৃদং সিং, ঐ বুড্ঢাকে রাস্তামে দেখোগে তো ভুঁড়ি ফাঁসা দেওগে।' বলিয়া মৃদং সিং-এর হাতে একটি ভোঁতা খুরপি ধরাইয়া দিলেন।

এইরূপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া উভয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। ওলগোবিন্দ নিজের পুত্র প্রিয়গোবিন্দকে বলিলেন, 'কুঞ্জ শালা পাশের বাড়িতে উঠেছে।' কুঞ্জকুঞ্জর নিজ নিজ কন্যা সুধামুখীকে বলিলেন, 'ওলা শালা পাশের বাড়িতে আড্ডা গেড়েছে।'

দুই

স্ত্রীজাতির কৌতূহলের ফলে জগতে অসংখ্য অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ি সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহল আজ পর্যন্ত কেহ রোধ করিতে পারে নাই; বৃথাই অবরোধ-প্রথা, হারেম, ঘোমটা, বোরখার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ওলগোবিন্দের বাড়িতে তিনটি স্ত্রীলোক,—ওলগোবিন্দের স্ত্রী ভামিনী ও দুই কন্যা। কন্যা দুইটি বিবাহিতা—গিন্নীবান্নী-জাতীয়া। প্রিয়গোবিন্দ তাহাদের কনিষ্ঠ।

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহে তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা। তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা সুধামুখীই কেবল অনূঢ়া।

দুই পরিবারের একুনে নয়টি স্ত্রীলোকের কৌতূহল একসঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিল। পাঁচিলের আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুখ-চেনাচেনি হইল।

ভামিনী অন্যপক্ষের কর্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন, 'মিন্সের ঝ্যাটার মত গোঁফ দেখলেই ইচ্ছা করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিই!'

গৃহিণী সম্বন্ধে বলিলেন, 'মরণ আর কি!'

সুধামুখী সম্বন্ধে বলিলেন, 'বেশ মেয়েটি!'

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণীও মত প্রকাশ করিলেন; ওলগোবিন্দ সম্বন্ধে বলিলেন, 'মিন্সের পেটটা দেখ না—যেন দশমাস!'

গৃহিণী সম্বন্ধে—'মরণ আর কি!'

প্রিয়গোবিন্দ সম্বন্ধে—'বেশ ছেলেটি!'

তারপর সুগোপনে রমণীদের মধ্যে আলাপ হইয়া গেল। কর্তারা কিছুই জানিলেন না।

কেহ যদি মনে করে, নারীরা স্বামীর শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে—তবে তাহারা কিছুই জানে না। হিন্দুনারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু শত্রুপক্ষের নারীদের সঙ্গে গোপনে ভাব করিবার বেলা তাহাদের নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্যই কবি ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—কি বলিয়াছেন এখন মনে পড়িতেছে না। তবে প্রশংসাসূচক কিছু নয়।

তিন

ওদিকে কর্তারা পরস্পরকে জব্দ করিবার মতলব আঁটিতেছেন।

উকিল মোক্তার হাতের কাছে নাই, তাই মোকদ্দমা বাধাইবার সুবিধা হইল না। উভয়ে

banglabooks.in

অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জগতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়, শত্রুর কথা অহর্নিশি চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার ধারাও একই প্রকার হইয়া যায়। তাই পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে ওলগোবিন্দ ও কুঞ্জকুঞ্জর একই কালে একই সঙ্কল্পে উপনীত হইলেন।

গাছ!

বাগান নির্মূল করিয়া দাও!

চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিবার সময় কিন্তু দেখা গেল ওলগোবিন্দই অগ্রণী! ইহার গুটিকয় কারণ ছিল। প্রথমত ওলগোবিন্দ পুত্রবান—সুতরাং তাঁহার তেজ বেশী। কুঞ্জকুঞ্জর উপর্যুপরি পাঁচটি কন্যার পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, ক্রমাগত কন্যা জন্মিতে থাকিলে উৎসাহী ব্যক্তিরও কর্মপ্রেরণা কমিয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, ওলগোবিন্দকে শত্রুদলন কার্যে সহায়তা করিবার জন্য সাবালক পুত্র ছিল—কুঞ্জকুঞ্জরের তাহা ছিল না।

ফলে, একদিন গভীর রাত্রে ওলগোবিন্দ সাবালক পুত্রের হাতে একটি কাটারি দিয়া বলিলেন 'ঝাউগাছগুলো! একেবারে সাবাড় করে দিবি—একটাও রাখবি না।'

কর্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কাটারি হস্তে প্রস্থান করিল। প্রিয়গোবিন্দকে দেখিলে কাসাবিয়াঙ্কার কথা মনে পড়ে। কর্তব্যে কঠোর! The boy stood on the burning deck.

চার

পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জকুঞ্জর দেখিলেন, তাঁহার ঝাউগাছগুলি কাৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ ঝাউয়ের মতই কণ্টকিত হইয়া উঠিল; মাথায় চুল ছিল না বলিয়াই কিছু কণ্টকিত হইতে পাইল না।

তিনি চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিতে লাগিলেন।

তারপর দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মৃদং সিং, দেখ্‌তা হ্যায়?'

মৃদং সিং বলিল, 'হুজুর!'

কুঞ্জকুঞ্জর বলিলেন, ঐ বুড্‌ঢা কিয়া।'

'আলবাৎ। বে-শক্‌।'

'হাম্‌ভি বুড্‌ঢাকো দেখ্‌ লেঙ্গে!'

মৃদং সিং বলিল, 'তাঁবেদার মোজুদ হ্যায়!'

কুঞ্জকুঞ্জর ভাবিলেন, মৃদং সিংকে দিয়াই প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বিবেচনার পর দেখিলেন তাহা উচিত হইবে না। চাকরকে দিয়া বে-আইনী কাজ করানো মানেই সাক্ষীর সৃষ্টি করা। তাহাতে কাজ নাই। যাহা করিবার তিনি নিজেই করিবেন।

ওলগোবিন্দ সে রাত্রি সুখনিদ্রায় যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার কদলীকুঞ্জে কুঞ্জকুঞ্জর প্রবেশ করিয়া একেবারে তচ্‌নচ্‌ করিয়া গিয়াছে। কলাগাছগুলি নিতম্বিনীর ঊরুস্তম্ভের মত পাশাপাশি পড়িয়া আছে।

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীজয়দেব কবি এ দৃশ্য দেখিলে হয়তো একটা নূতন কাব্য লিখিয়া ফেলিতেন। কিন্তু ওলগোবিন্দের চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

তিনিও চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিলেন।

তারপর বাড়ির ভিতর হইতে বন্দুক আনিয়া দমাদম্‌ আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর হটিবার পাত্র নয়। তিনিও বন্দুক আনিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল কিন্তু হতাহতের সংখ্যা শূন্যই রহিল।

banglabooks.in

বিক্রম প্রকাশ শেষ করিয়া দুইজনে আবার চিন্তা করিতে বসিলেন। ওদিকে স্ত্রীমহলে কি ব্যাপার চলিতেছে কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

পাঁচ

যুদ্ধ-বিগ্রহ একটু ঠাণ্ডা আছে।

কারণ, দুই পক্ষই বন্দুক লইয়া সারারাত বারান্দায় বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে আকাশ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন।

কিন্তু দুইপক্ষই সুযোগ খুঁজিতেছেন।

ওলগোবিন্দের লক্ষ্য কুঞ্জকুঞ্জরের পুষ্পবর্ষী শিউলি গাছটির উপর।

কুঞ্জকুঞ্জরের নজর ওলগোবিন্দের সুন্দর কৃশাঙ্গী তরুণীর মত ইউক্যালিপ্টাস গাছের উপর।

একদিন ওলগোবিন্দের স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, 'কী ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছ—মিটিয়ে ফেল। সুধা মেয়েটি চমৎকার—প্রিয়র সঙ্গে—'

ওলগোবিন্দ চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন, 'খবরদার!'

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণী বলিলেন, 'বুড়োয় বুড়োয় ঝগড়া করতে লজ্জা করে না—মিটিয়ে ফেল। প্রিয় ছেলেটি চমৎকার—সুধার সঙ্গে—'

কুঞ্জকুঞ্জর গুম্ফ কণ্টকিত করিয়া বলিলেন, 'চোপ রও!'

কিন্তু প্রিয়গোবিন্দ এসব কিছুই জানে না (সুধা জানে)। প্রিয়গোবিন্দ পিতৃভক্ত যুবক, তার উপর কর্মকুশল। ওলগোবিন্দ যখন কেবল শূন্যে বন্দুক ছুঁড়িতে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রিয়গোবিন্দ সেই অবকাশে শিউলি গাছ কাটিবার উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়গোবিন্দ লক্ষ্য করিয়াছিল যে রাত্রি তিনটার পর কুঞ্জকুঞ্জর আর বন্দুক ছোঁড়েন না। অতএব তিনটার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। প্রিয়গোবিন্দ স্থির করিল, পিতাকে না বলিয়া শেষরাতে অভিযান করিবে। পিতাকে বলিলে তিনি হয়তো তাহাকে বন্দুকের মুখে যাইতে দিবেন না।

সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। ভোর রাত্রে উঠিয়া প্রিয়গোবিন্দ করাত হাতে লইল; তারপর নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের বাগানে প্রবেশ করিল।

জ্যোৎস্না ফিন্‌ ফুটিতেছে; কেহ কোথাও নাই। প্রিয়গোবিন্দ পা টিপিয়া টিপিয়া শিউলি গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

শিউলি গাছের তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল—

ছয়

একটি মেয়ে ফুল কুড়াইতেছে!

প্রিয়গোবিন্দ পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পলাইবার সুবিধা হইল না। সুধাও তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। এবং চিনিতে পারিয়াছিল। প্রিয়গোবিন্দ সুধাকে আগে দেখে নাই।

আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখিলে উঁকিঝুঁকি মারে এরূপ একটা অপবাদ আছে; মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো অপবাদ নাই, অথচ—

ত্রস্ত সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই?'

প্রিয়গোবিন্দ করাত পিছনে লুকাইল; বলিল, 'কিছু না।'

সুধা—'তুমি আমার শিউলি গাছ কাটতে এসেছ!' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

banglabooks.in

প্রিয়গোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া বলিল, 'মানে—এ গাছ কার?'

'আমার!'

'মানে—তুমি কে? এ গাছ তো কুঞ্জরবাবুর!'

'আমি তাঁর ছোট মেয়ে। আমার নাম সুধা।'

'ও—মানে, তা বেশ তো।'

সুধা চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'তোমরা কেন আমাদের ঝাউ গাছ কেটে দিয়েছ?'

প্রিয়গোবিন্দ ক্ষীণস্বরে বলিল, 'আমাদের কলা গাছ—'

'তোমরা তো আগে কেটেছ!'

প্রিয়গোবিন্দ নীরব। সুধার মুখে একটু মেয়েলী চাপা হাসি দেখা দিল। বিজয়িনী! পুরুষ ও-হাসি হাসিতে পারে না।

সুধা আবার আঁচলে ফুল কুড়াইয়া রাখিতে লাগিল; যেন প্রিয়গোবিন্দ নামক পরাভূত যুবক সেখানে নাই!

প্রিয়গোবিন্দ বোকার মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার করাত দিয়া পিঠ চুলকাইল।

শেষে ঢোক গিলিয়া বলিল, 'তুমি রোজ এই সময় ফুল কুড়োতে আসো?'

সুধা মুখ তুলিয়া বলিল, 'হাঁ—কেন?'

প্রিয়গোবিন্দের কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল; সে তোৎলাইয়া বলিল, 'তবে আ-আমিও রোজ এ-ই সময় গাছ কাটতে আসব।' বলিয়া এক লাফে পাঁচিল ডিঙাইয়া পলায়ন করিল।

সুধা আবার হাসিল। বিজয়িনী!

সাত

অন্দরমহলের ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে জটিল হইয়া উঠিতেছে। The plot thickens!

একদিন কুঞ্জকুঞ্জরের কুলপুরোহিত হাওয়া বদলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হঠাৎ ডিস্‌পেপসিয়া হইয়াছে।

ওদিকে কর্তারা রাত্রি জাগিয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাত দিন পরে দুজনেই ঘুমাইতে গেলেন। মৃদং সিং ও ভেঁপু সিং বাগান পাহারা দিতে লাগিল।

তিন দিন ঘুমাইবার পর দুই কর্তা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তখন আবার তাঁহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চাগাড় দিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়গোবিন্দ রোজ শেষরাত্রে শিউলি গাছ কাটিতে যাইতেছিল। ওলগোবিন্দ তাহা জানিতেন না; তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রিয়গোবিন্দ শিউলি গাছের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিয়া জানাইল, ওদিকে তাহার নজর আছে; সুবিধা পাইলেই সে শিউলি গাছের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

ওলগোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর একজন মন্ত্রী পাইয়াছেন—পুরোহিত মহাশয়। তিনি ইউক্যালিপ্টাস গাছ সম্বন্ধে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সাদাসিধা লোক, তার উপর ডিস্‌পেপসিয়া রোগী; তিনি বলিলেন 'এ আর বেশী কথা কি! ভাল দিন দেখে কেটে ফেল্‌লেই হল। দাঁড়াও আমি পাঁজি দেখি।'

পাঁজি দেখিয়া পুরোহিত বৃক্ষচ্ছেদনের উৎকৃষ্ট দিন দেখিয়া দিলেন; এমন সহৃদয় অথচ ধর্মপ্রাণ সহায়ক পাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

স্থির হইল সোমবার রাত্রি একটার সময় শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে। গুলি গোলা বন্ধ আছে, ওলগোবিন্দটা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমাইতেছে; সুতরাং নির্বিঘ্নে কার্য সম্পন্ন করিবার এই সময়।

banglabooks.in

আট

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

বিশেষত নারীজাতি একজোট হইয়া যাহাদের পিছনে লাগিয়াছে তাহাদের জয়ের আশা কোথায়?

রাত্রি একটার সময় কুঞ্জকুঞ্জর করাত লইয়া নির্বিঘ্নে পাঁচিল পার হইলেন। কিন্তু ইউক্যালিপ্টাস গাছের কাছে যেমনি দাঁড়াইয়াছেন, অমনি ওলগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। কুঞ্জকুঞ্জর করাত দিয়া তাঁহার কান কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ভেঁপু সিং দারোয়ান তাঁহাকে পিছন হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

এইভাবে বুকে-পিঠে আলিঙ্গিত হইয়া কুঞ্জকুঞ্জর বাড়ির মধ্যে নীত হইলেন। তাঁহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া, তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অন্য প্রান্ত নিজ হস্তে লইয়া ওলগোবিন্দ আর একটি চেয়ারে বসিলেন। বন্দুক তাঁহার কোলের উপর রহিল।

দুইজনে পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলেন।

চারি চক্ষুর ঠোকাঠুকিতে একটা বিস্ফোরক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল না, ইহাই আশ্চর্য! ওলগোবিন্দ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন, 'বুদিমানা অফ্ দি ব্রঙ্কাইটিস্ ইস্টু দি ঘুল্-ঘুলি অফ্ চাট্নি কাবাব। তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা—া গিজিতাক্‌শিন!'— তাঁহার উদর জীবন্ত ফুটবলের মত লাফাইতে লাগিল।

কুঞ্জকুঞ্জর কিছুই বলিলেন না।

ওলগোবিন্দ তখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভেঁপু সিংকে বলিলেন, 'প্রিয়কে ডাক।'

প্রিয় আসিল।

ওলগোবিন্দ গর্জন করিয়া বলিলেন, 'শিউলি গাছ।'

কাসাবিয়ান্‌কা তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ছুটিল।

নয়

পনের মিনিট কাটিয়া গেল। ওলগোবিন্দ দুই মিনিট অন্তর ফুটবল নাচাইয়া হাসিতে লাগিলেন, 'হিঃ! হিঃ! হিঃ।'

তারপর ওলগোবিন্দ বলিলেন, 'ভেঁপু সিং, থানামে খবর দেও! এই চোট্টাকে জেলমে ভেজেগে!'

'যো হুকুম' বলিয়া ভেঁপু সিং প্রস্থান করিল।

আরও পনের মিনিট অতীত হইল। ওলগোবিন্দ পূর্ববৎ দু'মিনিট অন্তর হাসিতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ উভয়ের কর্ণে দূর হইতে একটা শব্দ প্রবেশ করিল—'লু—লু—লু—'

দুজনে শিকারী কুকুরের মত কান খাড়া করিলেন। শব্দটা যেন কুঞ্জকুঞ্জরের বাড়ি হইতে আসিতেছে।

ওলগোবিন্দ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রে ও আবার কিসের শব্দ! শেয়াল নাকি? প্রিয় এতক্ষণ ওখানে কি করিতেছে?

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইবারও উপায় নাই—কুঞ্জকুঞ্জর পলাইবে।

এমন সময় ভেঁপু সিং হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল; বলিল, 'আয়্ হুজুর, আপ বৈঠা হ্যায়?'

banglabooks.in

ওলগোবিন্দ রাগিয়া বলিলেন, 'বৈঠা রহেঙ্গে নেইত কি লাফাঙ্গে? ক্যা হুয়া?'

ভেঁপু সিং জানাইল ও-বাড়ির মাইজীলোগ দাদাবাবুকে পাকড়িয়া লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছে!

দুই কর্তা একসঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। ওলগোবিন্দের কোল হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

ভেঁপু সিং তখনও বার্তা শেষ করে নাই, সক্ষোভে বলিল, উক্ত মাইজীলোগ কেবল দাদাবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে 'উলু উলু' বলিয়া গালি দিতেছে।

এই সময় কর্তারা স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন—'উলু—উলু—উলু—'

দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর, যেন একই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জকুঞ্জরের পায়ের দাঁড়ি অজ্ঞাতসারেই ওলগোবিন্দের হাতে ধরা রহিল।

তাঁহারা যখন কর্মস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ডিস্পেপসিয়া রোগাক্রান্ত পুরোহিত মহাশয় শুভকর্ম শেষ করিয়াছেন।

দুই বাড়ির গৃহিণীই উপস্থিত ছিলেন। কর্তাদের মূর্তি দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; বলিলেন, 'আ মরে যাই! বুড়ো মিন্সেদের রকম দ্যাখ না! যেন সঙ!'

৮ পৌষ ১৩৪১

জটিল ব্যাপার

একটা জটা জুটিয়াছিল।

পরচুলার ব্যবসা করি না; সখের থিয়েটার করাও অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছি। তাই, আচম্বিতে যখন একটি পিঙ্গলবর্ণ জটার স্বত্বাধিকারী হইয়া পড়িলাম তখন ভাবনা হইল, এ অমূল্য নিধি লইয়া কি করিব।

কিন্তু কি করিয়া জটা লাভ করিলাম সে বিবরণ পাঠকের গোচর করা প্রয়োজন; নহিলে বলা-কহা নাই হঠাৎ জটা বাহির করিয়া বসিলে পাঠক স্বভাবতই আমাকে বাজীকর বলিয়া সন্দেহ করিবেন। এরূপ সন্দেহভাজন হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে উক্ত জটা মাথায় পরিয়া বিবাগী হইয়া যাওয়াও ভাল।

রবিবার প্রাতঃকালে বহির্দ্বারের সম্মুখে মোড়ায় বসিয়া রোদ পোহাইতে ছিলাম। সাঁওতাল পরগণার মিঠে-কড়া ফাল্গুনী রৌদ্র মন্দ লাগিতেছিল না—এমন সময় এক গাঁটা-

banglabooks.in

গোটা সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, 'বম্ মহাদেব। ভিখ্ লাও।'

বাবাজীর নাভি পর্যন্ত সর্পাকৃতি জটা দুলিতেছে, মুখ বিভূতিভূষিত। তবু ভক্তি হইল না, কহিলাম, 'কিছু হবে না।'

বাবাজী ঘৃণিত নেত্রে কহিলেন, 'কেঁও! তু ম্লেচ্ছ্ হ্যায়? সাধু-সন্ত নহি মান্তা?'

বাবাজীর বচন শুনিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, বলিলাম, 'নাহি মান্তা।'

সাধুবাবা অট্টহাস্যে পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, 'তু বাংগালী হ্যায়—বাংগালী-লোগ ভ্রষ্ট্ হোতা হ্যায়!'

আর সহ্য হইল না; উঠিয়া সাধুবাবার জটা ধরিয়া মারিলাম এক টান।

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। তারপর বাবাজী জটাটি আমার হস্তে রাখিয়া মুণ্ডিত শীর্ষ লইয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন। রাস্তায় কয়েক জন লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল, বাবাজী কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

একজন পথচারী সংবাদ দিয়া গেল,—লোকটা দাগী চোর, সম্প্রতি জেল হইতে বাহির হইয়া ভেক লইয়াছে। সে যা হোক, কিন্তু এখন এই জটা লইয়া কি করিব? সংবাদদাতাকে সেটা উপহার দিতে চাহিলাম, সে লইতে সম্মত হইল না।

হঠাৎ একটা প্ল্যান মাথায় খেলিয়া গেল—গৃহিণীকে ভয় দেখাইতে হইবে।

বাহিরে প্রকাশ না করিলেও আধুনিকা বলিয়া প্রমীলার মনে বেশ একটু গর্ব আছে। গত তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে কখনও তাহাকে সেকেলে বলিবার সুযোগ পাই নাই। নিজেকে সে পুরুষের সমকক্ষ মনে করে, তাই তাহার লজ্জার বাড়াবাড়ি নাই; কোনও অবস্থা-তেই লজ্জা বা ভয় পাওয়াকে সে নারীসুলভ লজ্জার ব্যতিক্রম মনে করে।

তার এই অসঙ্কোচ আত্মনির্ভরিতা মাঝে মাঝে পৌরুষকে পীড়া দিয়াছে, একটা অস্পষ্ট সংশয় কদাচিৎ মনের কোণে উঁকি মারিয়াছে—

ভাবিলাম, আজ পরীক্ষা হোক প্রমীলার মনের ভাব কতটা খাঁটি, কতটা আত্মপ্রতারণা।

জটা লুকাইয়া রাখিয়া বাড়ির ভিতরটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। প্রমীলা বাড়ির পশ্চাদ্দিকের ঘরে বসিয়া আছে। তাহার হাতে একখানা চিঠি। নিশ্চয় জটা-ঘটিত গণ্ডগোল শুনিতে পায় নাই।

আমাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। মুখখানা গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু চাই?'

বলিলাম, 'না। কার চিঠি?'

'বাবার।'

'বাড়ির সব ভাল?'

প্রমীলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। আমি ঘরময় একবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া বলিলাম, 'আজ বিকেলে আমায় জংশনে যেতে হবে। রাত্রি এগারোটার গাড়িতে ফিরব।'

'বেশ।'

'রাত্রে একলাটি বাড়িতে থাকবে, ভয় করবে না তো?'

'ভয়!' ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আমার ভয় করে না।'

'ভাল।' ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। হঠাৎ এত গাম্ভীর্য কেন?

যা হোক, আজ রাত্রেই গাম্ভীর্যের পরীক্ষা হইবে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বন্ধুর গৃহে খানিকটা ছাই লইয়া মুখে মাখিয়া ফেলিলাম; তারপর আলখাল্লা ও জটা পরিধান করিয়া আয়নায় নিজেকে পরিদর্শন করিলাম।

বন্ধু সপ্রশংসভাবে বলিলেন, "খাসা হয়েছে, কার সাধ্যি ধরে তুমি দাগাবাজ ভণ্ড-সন্ন্যাসী নও।— এক ছিলিম গাঁজা টেনে নিলে হত না?"

'না, অভ্যাস নেই—' বলিয়া বাহির হইলাম।

নিজের বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা বন্ধ। পিছনের পাঁচিল ডিঙাইয়া

banglabooks.in

ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

শয়নঘরে আলো জ্বলিতেছে। দরজার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, প্রমীলা আলোর সম্মুখে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পশমের গোঞ্জি বুনিতেছে।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম, 'হর হর মহাদেও!'

প্রমীলার হাত হইতে শেলাই পড়িয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চমকিত কণ্ঠে বলিল, 'কে?'

আমি খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'বম্ শঙ্কর! জয় চামুণ্ডে!'

প্রমীলা বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভয় পাইয়া পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। তারপর সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া নিজের বুকের উপর হাত রাখিল। 'সুরেশদা, তুমি এ বেশে কেন?'

ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। সুরেশদা! আমি পাকা সন্ন্যাসী, আমাকে সুরেশদা বলে কেন?

প্রমীলা স্খলিতস্বরে বলিল, 'সুরেশদা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কেন এলে?—তোমাকে আমি বলেছিলুম আর আমার কাছে এস না, তবু তুমি এখানে এলে?'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সুরেশ প্রমীলার বাপের বাড়ির বন্ধু, বোধ হয় একটু সম্পর্কও আছে। লোকটাকে আমি গোড়া হইতে অপছন্দ করিতাম; প্রমীলার সংগে বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা যে এত দূর—

ভাঙা গলায় বলিলাম, 'প্রমীলা—আমি—'

প্রমীলা দুই মুঠি শক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না না, তুমি যাও সুরেশদা, ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। আগেকার কথা ভুলে যাও। এখন আর আমি তোমার কাছে যেতে পারব না।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'প্রমীলা, এক দিনের জন্যেও কি তুমি আমাকে ভাল—'

'বাসতুম। এখনও বাসি। কিন্তু তুমি যাও সুরেশদা, দোহাই তোমার—এখনই বাড়ির মালিক এসে পড়বে—সর্বনাশ হবে।'

আমি তাহার কাছে ঘেঁষিয়া গেলাম কিন্তু সে সরিয়া গেল না, উত্তেজনা-অধীর স্বরে বলিল, 'যাবে না? আমার গালে চুনকালি না মাখিয়ে তুমি যাবে না? তোমার পায়ে পড়ি সুরেশদা, এখনই সে এসে পড়বে। তবু দাঁড়িয়ে রইলে? আচ্ছা, এবার যাও—' সহসা সে আমার ভস্মলিপ্ত অধরে চুম্বন করিল—'এস।' আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি হতভম্বের মত চলিলাম।

খিড়কির দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রমীলা বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি করো না। যদি থাকতে না পার, চিঠি দিও—ও আমার চিঠি পড়ে না। কিন্তু এমন ভাবে আর কখনও আমার কাছে এস না। মনে রেখ, যত দূরেই থাকি আমি তোমারই, আর কারুর নয়।'

অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল সে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিজের খিড়কির দরজা দিয়া চুপি চুপি চোরের মত বাহির হইয়া গেলাম।

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল।

কিন্তু তবু, চিরদিন অন্ধের মত প্রতারিত হওয়ার চেয়ে এ ভাল।

প্রমীলার চুম্বন আমার অধরে পোড়া ঘায়ের মত জ্বলিতেছিল, তাহার কথাগুলা বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। 'ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে—' কিরূপ সম্পর্কের ইঙ্গিত এই কথাগুলার মধ্যে রহিয়াছে? 'বাসতুম—এখনও ভালবাসি'—আমার সঙ্গে তবে এই তিন বৎসর ধরিয়া কেবল অভিনয় চলিয়াছে! 'আমি তোমারই, আর কারুর নয়'—হুঁ, স্বামী শুধু বিলাসের সামগ্রী জোগাইবার যন্ত্র! উঃ!

banglabooks.in

এই নারী! আধুনিকা শিক্ষিতা নারী!

বন্ধুর গৃহে ফিরিলে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল! বিদুষী বৌ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কি রকম অভ্যর্থনা করলে?'

মুখের ছাই ধুইতে ধুইতে বলিলাম, 'ভাল।'

'দাঁতকপাটি লেগেছিল?'

মনে মনে বলিলাম 'লেগেছিল, আমার।'

স্থির করিলাম, নাটুকে কান্ড ছোরাছুরি আমার জন্য নয়। প্রমীলা কতখানি ছলনা করিতে পারে আজ দেখিব; তারপর তাহার সমস্ত প্রতারণা উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিব। ভদ্রলোক ইহার বেশী আর কি করিতে পারে? ইহার পরও যদি প্রমীলা তাহার আধুনিক কালচারের দর্প লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তো পারুক। রোহিণী-গোবিন্দলালের থিয়েটারী অভিনয় করিয়া আমি নিজে নিজেকে কলঙ্কিত করিব না।

বাড়ি গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িলাম। প্রমীলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখ প্রশান্ত, চোখের দৃষ্টিতে গোপন অপরাধের চিহ্নমাত্র নাই।

সে বলিল, 'এরই মধ্যে স্টেশন থেকে এলে কি করে? এই তো পাঁচ মিনিট হল ট্রেন এল, আওয়াজ শুনতে পেলুম।'

জুতা জামা খুলিতে খুলিতে বলিলাম, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলুম—তুমি একলা আছ!' প্রথমটা আমাকেও তো অভিনয় করিতে হইবে!

'কিছু খাবে নাকি? দুধ মিষ্টি ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

'না—খেয়ে এসেছি।' টেবিলের উপর আলোটা বাড়াইয়া দিয়া চেয়ারে বসিলাম।

'শোবে না? আলো বাড়িয়ে দিলে যে!'

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার কণ্ঠস্বরে, মুখের ভঙ্গিমায়, দেহের সঞ্চালনে, কোন একটা নির্দেশক চিহ্ন খুঁজিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য তাহার অভিনয়, চক্ষের পলকপাতে তাহার মনের কথা ধরা গেল না।—এমনি করিয়াই এত দিন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে! উঃ—

বলিলাম, 'আলো বাড়িয়ে দিলুম তোমার মুখ ভাল করে দেখব বলে।'

সে গ্রীবাভঙ্গী সহকারে হাসিয়া বলিল, 'কেন, আমার মুখ এই প্রথম দেখছ নাকি?'

বলিলাম, 'না। কিন্তু মুখ কি ইচ্ছে করলেই দেখা যায়! আমার মুখ তুমি দেখতে পেয়েছ?'

'পেয়েছি। এত রাত্রে আর হেঁয়ালি করতে হবে না—শুয়ে পড়।—আমি আসছি।'

পাশের ঘরে গিয়া অতি শীঘ্র বেশ পরিবর্তন করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। 'এখনও শোওনি? শীতও করে না বুঝি! আমি বাপু ছেলেমানুষ, আর দাঁড়াতে পারব না।' একটু হাসিল।

তারপর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'ওগো এস, শুয়ে পড়ি।'

এত ঘনিষ্ঠ, এত অন্তরঙ্গ এই কথা কয়টি, যে আমার হঠাৎ ধোঁকা লাগিল—আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন নয় তো?

'প্রমীলা!'

শঙ্কিত চক্ষে চাহিয়া সে বলিল, 'কি গা?'

আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, 'না, কিছু নয়। শুয়ে পড়াই যাক, রাত হয়েছে।'

শয়ন করিবার পর কিয়ৎকাল দু-জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। পাশাপাশি শুইয়া দুইজন মানুষের মধ্যে কতখানি লুকোচুরি চলিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

হঠাৎ প্রমীলা বলিল, 'আজ সন্ধ্যের পর কানন বেড়াতে এসেছিল।'

'কানন?'

'হ্যাঁ গো—কানন। যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—এখন মনেই পড়ছে না?'

গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'ভালবাসতুম না, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'ঐ হল। সে দু-তিন দিন হল বাপের বাড়ি এসেছে; আজ এ বাড়িতে এসেছিল। তার

banglabooks.in

সঙ্গে অনেক গল্প হল।'

'কি গল্প হল?'

'তুমি কবে একবার কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে রাত্রে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলে, সেই গল্প বললে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'আর কি বললে?'

'আরও অনেক গল্প। আচ্ছা, রাত দুপুরে সোমত্ত মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলে কেন বল তো?'

'ভয় দেখাবার জন্যে।'

'আর কোন মতলব ছিল না?'

মাথায় রাগ চাড়িতেছিল। প্রমীলা আমার খুঁত ধরিতে চায় কোন স্পর্ধায়? অথবা ইহাও ছলনার একটা অঙ্গ?

গলার স্বরটা একটু উগ্র হইয়া গেল—'না। তবে তুমি অন্য কিছু ভাবতে পার বটে!'

'কেন?'

আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম, 'প্রমীলা!'

'কি?'

'তোমার সুরেশদা এখন কোথায়?'

ক্ষীণস্বরে প্রমীলা বলিল, 'সুরেশদা!'

'হ্যাঁ—সুরেশদা—যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—মনে পড়ছে না?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রমীলা ধীরে ধীরে বলিল, 'পড়ছে। তাঁকে বিয়ের আগে ভালবাসতুম, এখনও বাসি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার মুখের উপর একথা বলিতে বাধিল না?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'তোমার এই সুরেশদা এখন কোথায় আছেন বলতে পার?'

'পারি! তুমি শুনতে চাও?'

'বল। তোমার মুখেই শুনি।'

প্রমীলা ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল, 'তিনি স্বর্গে।'

'স্বর্গে?—মানে?'

প্রমীলা ভারী গলায় বলিল, 'আজ সকালে বাবার চিঠি পেয়েছি, সুরেশদা মারা গেছেন। তুমি সুরেশদাকে পছন্দ করতে না, তাই তোমাকে বলিনি।' হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল, 'সুরেশদা দেবতার মত লোক ছিলেন, আমাকে মা'র পেটের-বোনের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন।'

মাথাটা পরিষ্কার হইতে একটু সময় লাগিল।

প্রমীলা আমার গায়ে হাত রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'এবার ঘুমোও।' তারপর নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি করো না। মনে রেখ আমি তোমারই, আর কারুর নয়—'

২৫ ভাদ্র ১৩৪২

banglabooks.in

আদিম নৃত্য

পুরুষ-মাকড়সা প্রেমে পড়িলে প্রেয়সীর সম্মুখে নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। কিন্তু মিলন ঘটিবার পর নৃত্য করিবার মত মনোভাব আর তাহার থাকে না। প্রেমমুগ্ধা স্ত্রী-মাকড়সা তাহাকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

যাহার আটটা পা এবং ষোলটা হাঁটু আছে, সে যে সুযোগ পাইলেই নৃত্য করিবে তাহাতে বিস্ময়কর কিছু নাই। পরন্তু অতগুলা পা ও হাঁটু থাকা সত্ত্বেও মানুষ অনুরূপ অবস্থায় ঠিক অনুরূপ কার্যই করিয়া থাকে। ডারুইন মহাশয়ের কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, মাকড়সার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে; হয়তো নারীজাতির সম্মুখে নৃত্য করিবার স্পৃহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি; এবং নারীজাতিও যখন আমাদের সঙের মত নৃত্য দেখিয়া বেবাক গ্রাস করিয়া ফেলে তখন তাহারা তাহাদের আদিম অতিবৃদ্ধ-পিতামহীর মৌলিক বৃত্তিরই অনুসরণ করে।

কিন্তু এসব বাজে কথা। কাজের কথা এই যে, আমরা অহরহ নানা কলাকৌশল দেখাইয়া নারীকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ধাপ্পা টিকিতেছে না, নারীর মোহমুক্ত চোখে বারম্বার ধরা পড়িয়া যাইতেছে। উদয়শঙ্করের গলায় যিনি মাল্য দিবেন তিনি জানিয়া বুঝিয়াই দিবেন।

শ্রীমতী লতারাণী ও শ্রীমান বীরেশ্বরের মধ্যে প্রণয়ঘটিত একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রেমের প্রতিবন্ধক—আর্থিক সামাজিক ঐহিক দৈহিক পৈতৃক বা পারত্রিক—কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু প্রতিবন্ধক না থাকিলেই যদি মিলন ঘটিত তবে আর ভাবনা ছিল কি?

যা হোক, কবির ভাষায়—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।

লতা কলিকাতায় পিতৃভবনরূপ স্বর্ণপিঞ্জরে কালচারের ঝাললঙ্কা লালঠোঁটে ধরিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিত, এবং জমিদারের ছেলে বীরেশ্বর বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইত। সহসা কি করিয়া দুইজনে দেখাশুনা হইয়া গেল। তারপরই উক্ত প্রণয়ঘটিত জটিলতা। এবং তারপরেই বীরেশ্বর লতার সম্মুখে—মেটাফরিক্যালি—নাচিতে শুরু করিয়া দিল।

লতার ঠোঁটে হাসি, চোখে কৌতুক; সে এই নৃত্য উপভোগ করিতেছে, কদাচিৎ হাত-তালি দিয়া তাহা জানাইয়া দেয়। উৎসাহিত বীরেশ্বর আরও বেগে নৃত্য করে। নাচিতে নাচিতে লতার কাছে ঘেঁষিয়া আসে কিন্তু লতা মৃদু হাসিয়া অলক্ষিতে সরিয়া যায়। নর্তক ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান পূর্ববৎ থাকিয়া যায়—কমে না।

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমে মেটারলিঙ্কীয় রূপকের মত দুর্বোধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্পষ্ট-ভাষায় না বলিলে চশমাপরা অস্পষ্টদর্শী পাঠক বুঝিবেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর লতাদের ড্রয়িংরুমে লতা ও বীরেশ্বর বসিয়া ছিল; লতার ডাক্তার বাবাও এতক্ষণ ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ফোনে রোগীর আহ্বান পাইয়া তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বীরেশ্বর উঠিয়া আসিয়া লতার পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, ঢিলা আস্তিনের ভিতর হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া কব্জি সমেত বাহু খানিকটা দেখা যাইতেছে। সে ঈষৎ হস্তসঞ্চালনে বাহুর আরও খানিকটা মুক্ত করিয়া দিয়া অলসকণ্ঠে বলিল, 'আজ ব্যায়াম সঙ্ঘের মিটিঙে বক্তৃতা দিতে হল।'

বিস্ময়-প্রশংসা-তরলিত স্বরে লতা বলিল, 'আপনি বক্তৃতা দিতেও পারেন?'

একটু হাসিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'পারি যে তা নিজেই জানতুম না; কিন্তু বলতে উঠে দেখলুম পারি।'

banglabooks.in

'কি বক্তৃতা দিলেন?'

'এই—স্বাস্থ্য, ব্যায়াম, শিকার সম্বন্ধে দু'চার কথা। সকলেই বেশ মন দিয়ে শুনলে।'

লুতা বলিল, 'আপনি শুনেছি একজন মস্ত শিকারী। কি শিকার করেন?'

বীরেশ্বর তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'বাঘ ভালুক—তা ছাড়া আর কি শিকার করব! সিংহ তো আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।'

উৎসুকভাবে লুতা জিজ্ঞাসা করিল, 'ক'টা বাঘ মেরেছেন?'

'গোটা আষ্টেক হবে।—আমার বাড়িতে যদি কখনও যাও, দেখবে তাদের মুণ্ডুসুদ্ধ চামড়া আমার ঘরে সাজানো আছে। যবে লুতা? একদিন চল না।'

লুতা হাসিল। প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল, 'আপনার খুব সাহস—না?'

ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'সাহস! কি জানি। আছে বোধ হয়। কখনও ভয় পেয়েছি বলে তো স্মরণ হয় না।' তারপর লুতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এবার তোমার জন্যে একটা বাঘ মেরে নিয়ে আসব, কি বল?'

লুতা আবার হাসিল; উজ্জ্বল চপল হাসি। বলিল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'—লুতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বীরেশ্বর বলিল, 'বাঘের বদলে তুমি আমায় কি দেবে বল।'

আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া লুতা বলিল, 'কি দেব? বাঘের বদলে কি দেওয়া যেতে পারে? আচ্ছা, আপনাকে ভাল একটা প্রশংসাপত্র দেব।'

'তার বেশী আর কিছু নয়?'

লুতা মুখটি ভালমানুষের মত করিয়া বলিল, 'প্রশংসাপত্রের চেয়ে বেশী আর আপনার কি চাই? ওর চেয়ে বড় আর কি আছে!'

বীরেশ্বর ক্ষুণ্ণ হইল, ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আজ উঠতে হল, সাড়ে আটটা বেজে গেছে! পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোটর চালিয়ে যদি যাই, তবু বাড়ি পৌঁছতে দু'ঘণ্টা লাগবে।'

গাড়িবারান্দার সম্মুখে আয়নার মত ঝকঝকে দীর্ঘাকৃতি একখানা মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, লুতা বীরেশ্বরকে বিদায় দিতে আসিয়া বলিল, 'কি চমৎকার গাড়ি! নতুন কিনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। বারো হাজার টাকা দাম নিলে। মন্দ নয় জিনিসটা।'

তারপর বীরেশ্বর বোধ হয় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে বাড়ির দিকে রওনা হইল।

লুতা ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার মুখে মনালিসার গূঢ় রহস্যময় হাসি।

ও হাসিটা কিন্তু মনালিসার নিজস্ব নয়; সকল নারীই সময় বুঝিয়া ঐরকম হাসিয়া থাকে।

লুতার বাবা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বীরেশ্বর চলে গেছে?'

'হ্যাঁ'।—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া লুতা বলিল, 'বীরেশ্বরবাবুর মত এমন সর্বগুণমণ্ডিত লোক দেখা যায় না। তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন, বাঘ মারতে পারেন, পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতে পারেন, শুধু নাচতে পারেন কিনা এ খবরটা এখনও পাইনি। বাবা, বীরেশ্বর-বাবুর ভেতরের সত্যিকার মানুষটি কেমন?'

বাবা চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'জানি না।'

লুতার চোখদুটি এবার ক্রুদ্ধ ও সজল হইয়া উঠিল—কেন ওরা কেবলি অভিনয় করে! কেন এত যত্ন করিয়া সত্যকার মানুষটিকে লুকাইয়া রাখে? ছদ্মবেশের এই ভাঁড়ামি দেখিয়া লুতার লজ্জা করে, আর তাহাদের নিজের লজ্জা নাই?

কিন্তু লুতা মুখে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

দিন সাতেক পরে বীরেশ্বর ফিরিল। তাহার মোটরের পিছনে একটা প্রকাণ্ড বাঘের মৃতদেহ বাঁধা।

banglabooks.in

লতো দ্বিতলের জানালা হইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু নামিয়া আসিতে বিলম্ব করিল। যখন নামিল তখন বীরেশ্বর তাহার বাবার কাছে বাঘশিকারের গল্প করিতেছে।

লতোকে দেখিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'তোমার বাঘ এনেছি।'

লতো স্ত্রীজাতি, সে বিস্ময় প্রকাশ করিল। তারপর কৌতূহল, ও শেষে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া বীরেশ্বরের বীরত্বের মূল্য অযথা বাড়াইয়া দিল। বাঘ পরিদর্শন হইল। তারপর বীরেশ্বর আবার বাঘশিকারের গল্প আরম্ভ করিল।

লতোর বাবা কাজের লোক, ক্রমাগত বাঘশিকারের গল্প শুনিবার তাঁহার অবকাশ নাই। তিনি এক ফাঁকে অপসৃত হইয়া পড়িলেন।

কাহিনী শেষ করিয়া বীরেশ্বর বলিল, 'এবার তোমার বাঘ তুমি নাও।'

লতো বলিল, 'আমার বাঘ! বাঘের গায়ে কি আমার নাম লেখা আছে?'

'নাম লিখতে আর কতক্ষণ লাগে। বল তো এখনি—'

'তার দরকার নেই।—ল্যাকি-বোনটা আমায় দেবেন।'

বীরেশ্বর লতোর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'লতো, এবার তোমার পালা। তুমি আমায় কি দেবে?'

হাত টানিয়া লইয়া লতো বলিল, 'ও—ভুলে গিয়েছিলুম। দাঁড়ান, প্রশংসাপত্রটা লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলিয়া সহাস্য মুখে উপরে চলিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐহিক এবং দৈহিক, পৈতৃক এবং পারত্রিক প্রতিবন্ধক না থাকিলেও প্রণয়ের পথ কণ্টকাকীর্ণ। ক্ষুব্ধ বীরেশ্বর বাঘ লইয়া ফিরিয়া গেল এবং দশদিন ধরিয়া মেজাজ এমন তিরিক্ষি করিয়া রাখিল যে আত্মীয় পরিজন সকলেই সন্দেহ করিল মৃত বাঘের প্রেতাত্মা তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে।

কিন্তু এগারো দিনের দিন হঠাৎ তাহার রাগ পড়িয়া গিয়া আবার নৃত্যলিপ্সা জাগিয়া উঠিল।

সে টেলিফোনে লতোকে ট্রাঙ্ক-কল দিল। ওদিকে এই দশ দিনে লতোও কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। নৃত্যো দেখিলে রাগ হয়, আবার না দেখিলেও মন খারাপ হইয়া যায়—ইহাই নারীজাতির স্বভাব।

বীরেশ্বর টেলিফোনে বলিল, 'তোমার ল্যাকি-বোন্ তৈরি হয়ে এসেছে।'

উদ্গ্রীব স্বরে লতো বলিল, 'তৈরি হয়ে এসেছে! কোথা থেকে?'

'স্যাকরা-বাড়ি থেকে। একটা ব্রোচ। পাঠিয়ে দিতে পারি?'

লতোর কণ্ঠ মধুর হইয়া উঠিল, 'আপনার বুঝি কাজ আছে? নিজে আসতে পারবেন না?'

'কাজ!' বীরেশ্বর লাফাইয়া উঠিল, 'তোমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?'

'তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। কেন?'

'আচ্ছা, চারটে বেজে পাঁচ মিনিটে আমি গিয়ে পৌঁছুব।'

'অ্যাঁ! এক ঘণ্টায় সত্তর মাইল! না—না—'

কিন্তু বীরেশ্বর আর কিছু শুনিল না, টেলিফোন ফেলিয়া গ্যারাজের দিকে ছুটিল।

ঠিক চারটে বাজিয়া তিন মিনিটে লতোদের বাড়ির সম্মুখে একটা বিরাট শব্দ হইল। লোমহর্ষণ কাণ্ড! সত্তর মাইল নিরাপদে আসিয়া বীরেশ্বরের মোটর লতোর দ্বারের কাছে চিৎ হইয়া পড়িয়াছে। একটা লোহাবোঝাই তিন-টন্ লরী যাইতেছিল, তাহারই সহিত ঠোকাঠুকি।

মোটরের তলা হইতে বীরেশ্বরের সংজ্ঞাহীন দেহ বাহির করা হইল, তারপর ধরা-ধরি করিয়া লতোদের বাড়িতে তোলা হইল। বাড়িতেই ডাক্তার। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই। মুখের আঁচড়গুলো মারাত্মক নয়; তবে বাঁ পায়ের টিবিয়া ভেঙে গেছে।' বলিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ইন্‌জেকশন্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

লতো জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রাণের ভয় নেই?'

banglabooks.in

'নাঃ। কিছুদিন বাবাজীকে একটু খুঁড়িয়ে চলতে হবে—এই পর্যন্ত।'

বীরেশ্বরের নৃত্য-জীবনের যে এই সঙ্গে অবসান হইয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

এক ঘণ্টা পরে বীরেশ্বরের জ্ঞান হইল। তখন সে সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ লইয়া বিছানায় শুইয়া আছে। লুতো তাহার পাশে একটি টুলের উপর উপবিষ্ট।

লুতো জলভরা চোখে বলিল, 'কেন এত জোরে গাড়ি চালিয়ে এলেন? না হয় দু' ঘণ্টা দেরি হত?'

চিরন্তন প্রথামত বীরেশ্বর 'আমি কোথায়' বলিল না। বলিল, 'আমার সারা গা এত জ্বালা করছে কেন?'

লুতোর বুক দুলিয়া উঠিল, সে বলিল, 'টিঞ্চার আয়োডিন।'

বীরেশ্বর বলিল, 'আমার মুখখানা কি কেটেকুটে একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু ও কিছু নয়। বাবা বললেন, সেরে যাবে।'

বীরেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, 'আর কি হয়েছে?'

'আর বাঁ পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে।'

মর্মভেদী স্বরে বীরেশ্বর বলিল, 'চিরজীবনের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেলুম।'

লুতো উদ্বেলিত হৃদয়ে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বীরেশ্বরও চুপ করিয়া রহিল; তারপর তাহার মুদিত চোখে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে চোখ বুজিয়াই বলিল, 'লুতো, আমরা ভারি বোকা।'

লুতো জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

বীরেশ্বর বলিতে লাগিল, 'কেন? আমরা যাকে ভালবাসি তাকে ভালবাসার কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার মনে করি না—কেবল নিজের যোগ্যতাই প্রমাণ করতে চাই। তাই, আজ বলবার অবকাশ যখন হল তখন আর সে-কথা মুখ থেকে বার করবার উপায় নেই।'

মৃদুস্বরে লুতো বলিল, 'কেন উপায় নেই?'

অধীর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বীরেশ্বর বলিল, 'বোকার মত কথা বলো না লুতো। কি হবে বলে? বললেই বা শুনবে কে? ভাঙা বাঁশীর বেসুরো আওয়াজ কার শুনতে ভাল লাগে!

লুতো বলিয়া উঠিল, 'আমার ভাল লাগে—তুমি বল।'

'লুতো!' বীরেশ্বর প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাঁশী ভাঙিয়াই যে তাহার বেসুরো আওয়াজ সুরে ফিরিয়া আসিয়াছে, লুতো তাহা বলিল না। সে উঠিয়া বীরেশ্বরের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মস্তকটি বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইল, বলিল, 'অত চেঁচিও না—পাশের ঘরে বাবা আছেন। এতদিন খালি ছেলেমানুষী করলে কেন? কেন নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে এত দেরি করলে?'

কিন্তু বীরেশ্বরের সত্যিকার পরিচয় দেওয়া তখনও শেষ হয় নাই। সে কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর চাপা যন্ত্রণার সুরে বলিয়া উঠিল, 'লুতো, মাথা ছেড়ে দাও—উঃ উঃ—অত জোরে চেপো না—বড্ড লাগছে—'

লুতোরাণী দুর্বল অসহায় পুরুষকে তাহার বুভুক্ষু বক্ষে গ্রাস করিয়া লইল। এইরূপে প্রকৃতির আদিমতম বিধান সার্থক হইল এবং প্রত্যহ হইতেছে।

৫ আশ্বিন ১৩৪২

banglabooks.in

প্রতিদ্বন্দ্বী

নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাশ্বত। কিন্তু বহুলাংশে উহা ফল্গু নদীর মত অন্তঃপ্রবাহিণী বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সাধারণত নরনারীর মধ্যে প্রেমটাই চোখে পড়ে।

বিবাহ নামক সংস্কারটা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পূর্ণ বিকাশ। তাই কাব্য ও রোমান্সে দুইটি নরনারীকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া লেখক লেখনী সম্বরণ করেন। অর্থাৎ দুইটি যুদ্ধোদ্যত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আখড়ায় ঢুকাইয়া দিয়া সরিয়া পড়েন। অতঃপর যে কেলেঙ্কারি আরম্ভ হইবে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিবার সাহস তাঁহার নাই।

নৃসিংহবাবুর অন্তরে কাব্য বা রোমান্সের বাষ্পটুকু ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল শেষ পর্যন্ত দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্দম সাহস ছিল এবং লোকে বলিত, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি নাকি Natural Selection নামক জৈব আইনকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার মতলব করিয়াছিলেন। অসম্ভব নয়; আমরা যতদূর জানি, লোকটি অতিশয় ধূর্ত ও ফন্দিবাজ।

কোন বৈজ্ঞানিক দুরভিসন্ধিবশত নৃসিংহবাবু এক ঝাঁক পায়রা ও এক পাল খরগোস পুষিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার এক শ্যালীর পুত্র ও ভগিনীর কন্যাও তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইত। ইহারা সকলেই অনাথ; নৃসিংহবাবু ছাড়া ইহাদের আর কেহ ছিল না।

নৃসিংহবাবুরও ইহারা ছাড়া আর কেহ ছিল না। স্ত্রী বহুকাল পূর্বে Survival of the Fittest নামক আইন শিরোধার্য করিয়া বিগত হইয়াছিলেন। সন্তানাদিও কস্মিন্ কালে হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সংসারে পারাবত, শশক, শ্যালীর পুত্র ও ভাগিনেয়ী ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। নৃসিংহবাবু ছিলেন ইহাদের ভাগ্যবিধাতা।

নৃসিংহবাবুর বয়স ছাপ্পান্ন। তাঁহার মস্তকের মধ্যস্থলে একটিমাত্র কেশ ছিল; প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি সেটিকে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইতেন, তারপর বুরুশ দিয়া মস্তকের উপর শোয়াইয়া দিতেন। অতঃপর এক বাটি দুগ্ধ পান করিয়া তিনি ল্যাবরেটারিতে প্রবেশ করিতেন। বাড়িতে থাকিয়া যাইত নীরেন ও মিলু। নৃসিংহবাবু অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ঝগড়া আরম্ভ করিত।

ঝগড়ার কোন হেতু ছিল না, নিতান্ত অকারণেই পরস্পরের ছুতা ধরিয়া ইহারা ঝগড়া করিত। নীরেন মিলু অপেক্ষা ছয় সাত বৎসরের বড়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের বাধিত না। বছর আষ্টেক আগে যখন এই বাড়িতে তাহাদের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তখনই এই কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। নবাগত নীরেন মিলুকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিল, 'এই ছুঁড়ি, তুই বুঝি এই বাড়ির ঝি? আমার জুতো ভাল করে বুরুশ করে দে তো।'

দশমবর্ষীয়া মিলু কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, 'মামা একটা বাঁদর পুষবেন বলেছিলেন; তুমি বুঝি সেই বাঁদরটা!'

আড়াল হইতে নৃসিংহবাবু এই কথোপকথন শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহার মনে একটা কুটিল অভিসন্ধি জাগিয়াছিল।

অতঃপর নীরেন ও মিলু একত্র বড় হইয়াছে; দুজনেই এখন কলেজে পড়ে। কিন্তু তাহাদের বিরোধ কিছুমাত্র কমে নাই। চোখাচোখি হইলেই তাহারা ঝগড়া করে; এমন কি বেশীক্ষণ চোখাচোখি না হইলে দুজনেরই মন ছটফট করিতে থাকে। তখন একজন আর একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাড়ম্বরে কলহ আরম্ভ করিয়া দেয়।

তাহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বাড়ির ঝি অন্নদা ছড়া কাটিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল—

"মরি কি ভাবের হুলোহুলি
না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে চুলোচুলি।"

নৃসিংহবাবু অবশ্য বিজ্ঞানে মগ্ন আছেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি এসব কিছু লক্ষ্য করেন। পায়রা ও খরগোসের মত ইহারা দুজনেও যেন তাঁহার জীবন-

banglabooks.in

যাত্রার আনুষঙ্গিক অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীরেন ও মিলুর কলহের ক্রমবিকাশ আনুপূর্বিক বর্ণনা করা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রথম কিছুদিন তাহারা নির্লজ্জভাবে মারামারি করিয়াছিল। একবার নীরেন মিলুর উরুতে ছুরির এক কোপ বসাইয়া দিয়াছিল; পরিবর্তে মিলু নীরেনের হাত কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দেয়; দু'জনের দেহেই সে ক্ষতচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু যতই তাহাদের বয়স বাড়িতে লাগিল, যুদ্ধের রীতিতেও ক্রমশ পরিবর্তন দেখা দিল। এখন আর কেহ কাহাকেও দৈহিক আক্রমণ করে না, যুদ্ধের অস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। মনের প্রগতির ইহাই ইতিহাস।

সেদিন সকালে নৃসিংহবাবু তাঁহার একটিমাত্র কেশ যথারীতি প্রসাধনপূর্বক ল্যাবরেটরিতে প্রস্থান করিবার পর, মিলু নীরেনের ঘরে গিয়া দেখিল নীরেন তখনও ঘুমাইতেছে। মিলু কিয়ৎকাল চিন্তিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা খরগোস আনিয়া তাহার বিছানায় ছাড়িয়া দিবে? না, সেটা নূতন কিছু হইবে না, কারণ কিছু দিন পূর্বে নীরেনই ঐ কার্যটি করিয়াছিল। তাহার অনুকরণ করিলে নীরেন খুশীই হইবে।

সহসা মাথায় কোন বুদ্ধি গজাইল না। তখন মিলু নীরেনের নাকে একটি খড়্কে কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, 'কুম্ভকর্ণ, ওঠ—আটটা বেজে গেছে।'—বলিয়া প্রস্থান করিল।

নীরেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল, 'রাক্ষুসী—' বলিয়াই প্রচণ্ড বেগে হাঁচিয়া ফেলিল।

মুখ-হাত ধুইয়া সে টেবিলের সম্মুখে বসিল এবং গভীর মনঃসংযোগে কি লিখিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিলু আসিয়া জলখাবারের রেকাবি টেবিলের উপর রাখিতেই নীরেন অসম্পূর্ণ লেখাটি লুকাইয়া ফেলিল। মিলু কিন্তু এক নজর লেখাটা দেখিয়া লইয়াছিল, বলিল, 'কি লেখা হচ্ছিল? পদ্য? আ মরে যাই! কার নামে পদ্য লেখা হচ্ছে?'

নীরেন বলিল, 'যার নামেই লিখি না—'

মিলু ফস্ করিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া পড়িল—

'একটি বালিকা—নামটি তার মিলু
মস্তকে তার নাই এক ফোঁটা ঘিলু—'

নীরেনের নাকে কাঠি দিয়া মিলু যে বিজয়গর্ব অনুভব করিতেছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গেল, সে দু'হাতে কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ক্রোধ-অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'আচ্ছা, আমিও জানি। মাথায় ঘিলু আছে কি না দেখিয়ে দেব।'

তখনকার মত বিজয়ী নীরেন দন্ত বাহির করিয়া হাসিল এবং পরম পরিতৃপ্ত সহকারে জলযোগ আরম্ভ করিল।

দু'জনেই যথাসময়ে কলেজে গেল; নীরেন যাইবার সময় মিলুর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল। মিলু নিদ্রালু বিড়ালীর মত কেবল চক্ষু কুঞ্চিত করিল।

নীরেন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার টেবিলের উপর একটি ছয় পংক্তির কবিতা শোভা পাইতেছে।—

"একটি যুবক—নামটি তাহার নীরু,
ক্যাবলার রাজা, চাষা, অসভ্য, ভীরু,
মহিলাগণের সম্মান নাহি জানে;
বুদ্ধি এবং শিক্ষার দোষ—মানে—
মানুষ না হয়ে ভাল্লুক হত যদি
নাচ দেখিতাম আনন্দে নিরবধি।"

নীরেন কবিতা পাঠ শেষ করিয়াছে, এমন সময় মিলু প্রবেশ করিয়া বলিল, 'কেমন কবিতা?'

নীরেন দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, 'আমার ছন্দ চুরি করেছিস।'

banglabooks.in

মিলু বিদ্রূপপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ইঃ—ওঁর ছন্দ! বাজার থেকে উনি কিনে এনেছেন!'

নীরেন উত্তপ্ত স্বরে বলিল, 'তুই একটা চোর।'

মিলু ততোধিক উত্তপ্ত স্বরে বলিল, 'তুমি একটা ডাকাত।'

নীরেন চেয়ারে বসিয়া বলিল, 'তুই প্যাঁচা।'

মিলু তাহার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা।'

দু'জনেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিল।

'তুই ইঁদুর।'

'তুমি টিকটিকি।'

'তুই ক্যাঙারু।'

'তুমি গণ্ডার।'

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। ক্রমে পশুপক্ষীর নাম ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন মিলু জিভ বাহির করিয়া নীরেনকে ভ্যাংচাইয়া দিল। নীরেন প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তারপর সেও দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। বিরোধ এতটা চরমে অনেক দিন উঠে নাই।

এই সময় নৃসিংহবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মিলু ও নীরেন চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ এবং জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে! তিনি ধূর্ত বৈজ্ঞানিক, চট্ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। আনন্দে তাঁহার মস্তকের একটিমাত্র কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

তিনি হর্ষোৎফুল্লস্বরে ডাকিলেন, 'মিলু, নীরেন!'

উভয়ে জিহ্বা সম্বরণ করিয়া চক্ষু মেলিল।

নৃসিংহবাবু বলিলেন, 'বড় খুশী হয়েছি। তোমরাই আমার থিয়োরী প্রমাণ করতে পারবে। আমি তোমাদের দু'জনের বিয়ে দেব—পরস্পরের সঙ্গে। হাঃ হাঃ হাঃ।'—তিনি প্রস্থান করিলেন।

মিলু ও নীরেন পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তাবটা আকস্মিক বটে, কিন্তু সেজন্য কেহ বিস্মিত হইল না। নৃসিংহবাবুর সকল কার্যই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অমান্য করিবার কল্পনাও কখনো ইহাদের মাথায় আসে নাই। তিনি ইচ্ছামত পায়রা ও খরগোসের বিবাহ দিতেন, কেহ আপত্তি করে নাই, এক্ষেত্রেও কেহ আপত্তি করিল না। বরং সারা জীবন ধরিয়া দু'জনে দু'জনকে জ্বালাতন করিতে পারিবে এই আনন্দেই আত্মহারা হইয়া পড়িল। উভয়েই একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'এবার মজা টের পাবে।'

ফুলশয্যার রাত্রে নীরেন খাটে বসিয়া পা দুলাইতেছিল, মিলু প্রবেশ করিতেই গম্ভীর স্বরে বলিল, 'আমি হচ্ছি তোমার স্বামী, শিগ্‌গির প্রণাম কর।'—বলিয়া নিজের পায়ের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করিল।

মিলু তৎক্ষণাৎ ভালমানুষের মত গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল; তারপর উঠিবার সময় নীরেনের পায়ে চিমটি কাটিয়া দিল। নীরেন লাফাইয়া উঠিল, 'উঃ!' তারপর দুই বাহুর দ্বারা পলায়নপরা মিলুকে চাপিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, 'তবে রে—'

দু'জনের দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

আশা করিতেছি ইহাদের দাম্পত্য জীবন অন্যান্য সাধারণ দাম্পত্য জীবন হইতে পৃথক হইবে না। কারণ নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যাহাই হোক—সার্বজনিক; মিলু ও নীরেন সাধারণ পাঁচজনের মতই ঝগড়া করিয়া, ভালবাসিয়া, পরস্পরকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়া জৈব ধর্ম পালন করিবে।

আমরা অবশ্য বিবাহ দিয়াই সরিয়া পড়িলাম।

১৪ ফাল্গুন ১৩৪২

banglabooks.in

কেতুর পুচ্ছ

ডাক্তার অমিতাভ মিত্রের বয়স আটাশ বৎসর। মাত্র দুই বৎসর হইল সে কলেজ ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে শহরে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছে। শহরটি বেশ বড় এবং তাহাতে বহুমারী প্রবীণ চিকিৎসকের অভাব নাই—তবু—

ইহাকেই বলে ভাগ্য।

অমিতাভ বেশ চটপটে; নাকে মুখে কথা। চেহারাও মন্দ নয়, বলিষ্ঠ দোহারা লম্বা—মাথায় কোঁকড়া চুল। ঠোঁটের গড়ন এমন যে মুহূর্তমধ্যে চটুল ঠাট্টার ভঙ্গি হইতে গভীর সমবেদনায় নতপ্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে। চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিতে প্রখর, নাকের ডগা হঠাৎ একটু উঁচু হইয়া গিয়া মুখখানাতে একটা ধৃষ্ট ডেঁপোমির ভাব আনিয়া দিয়াছে।

শহরের ঈর্ষাপরবশ শতমারীরা তাহাকে 'ডেঁপো ছোঁড়া' বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোগীর অভিভাবকরা তাহার কথা শুনিয়া অর্ধেক উদ্বেগ ভুলিয়া যাইতেন; শয্যাশায়ী রোগী তাহাকে দেখিয়া পাংশুমুখে হাস্য করিত।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, কেবলমাত্র ভাগ্যের জোরেই অমিতাভ দুই বৎসরের মধ্যে শহরে পসার জমাইয়া তুলে নাই।

সেদিন সকালে আটটার সময় নিজের ডিসপেন্সারির খাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমিতাভ দেখিল এক ভীমকান্তি বিরাট উদরবিশিষ্ট রোগী অত্যন্ত মাচ্ছভঙ্গ ভাবে বসিয়া আছেন। রোগীটি অমিতাভের পরিচিত; প্রায় প্রত্যহই প্রভাতে আসিয়া নিজ দেহের নানা বিচিত্র লক্ষণ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যবস্থা লইয়া গিয়া থাকেন। ইনি জাতিতে স্বর্ণকার।

অমিতাভ বলিল, 'এই যে বিশ্বম্ভরবাবু! আজ কেমন আছেন?'

মুমূর্ষুকণ্ঠে বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, 'বড় খারাপ। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না ডাক্তারবাবু।'

অমিতাভ মুখখানা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল। বলিল, 'তাই তো! আপনাকে আজ যেন কেমন একটু রোগা-রোগা দেখছি। কি হয়েছে বলুন তো! আবার কান কট্‌কট্ করছে নাকি?'

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বিশ্বম্ভরবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না। কাল রাত্রে দু'বার ঢেকুর উঠেছে; একবার এগারোটা বেজে সাত মিনিটে, আর একবার দু'টো বাজতে উনিশ মিনিটে।'

'বলেন কি! এ তো ভাল কথা নয়। দেখি আপনার নাড়ী।'

বিষণ্ণমুখে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার বজ্রমুষ্টি অগ্রসর করিয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া অমিতাভ বলিল, 'হুঁ। কাল রাত্রে কি খেয়েছিলেন?'

কাতরকণ্ঠে বিশ্বম্ভরবাবু আহারের যে ফর্দ দিলেন তাহা শ্রবণ করিলেই সহজ মানুষের অজীর্ণরোগ জন্মে। অমিতাভ কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, 'তাই তো! এমন কিছু গুরুভোজন তো হয়নি, যার জন্যে রাত্রে দু'বার ঢেকুর উঠতে পারে। তবে কেন এমন হল?'

বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমি কি সত্যিই বাঁচব না?'

ঈষৎ হাসিয়া অমিতাভ বলিল, 'আপনি ভয় পাবেন না। আপনার মত লোক যদি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে আমরা আছি কি জন্যে? একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, সেইটে খাবার পর দু'বেলা ব্যবহার করুন। ওষুধটা অবশ্য দামী—'

'কত দাম?'

'সাড়ে তিন টাকা পড়বে।'

'বেশ, লিখে দিন। প্রাণের কাছে সাড়ে তিন টাকা আর কি বলুন!' বলিয়া বিশ্বম্ভর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

টাকাডায়েস্‌টেস্, অ্যাকোয়া টাইকোটিস্ সহযোগে একটি হজমি প্রেস্‌ক্রিপশান লিখিতে

banglabooks.in

লিখিতে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করিল, 'আজকাল আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'বেশ ভালই আছে।'

'কাশিটা এখনো যায়নি?'

'কাশে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে কিছু নয়।'

'সন্ধ্যেবেলা জ্বর আসত, সেটা এখনো আসে নাকি?'

অনিচ্ছাভরে বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'আসে হয়তো, ঠিক বলতে পারি না। আর মেয়েমানুষ—বুঝলেন না? অমন একটু আধটু—'

'সে তো বটেই!' প্রেস্‌ক্রিপশান বিশ্বম্ভরকে দিয়া অমিতাভ বলিল, 'তবে আমার মনে হয় তাঁকে কয়েকটা ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকশান দেওয়া দরকার। অবশ্য আপনার তুলনায় তাঁর অসুখ কিছুই নয়—তবু—'

বিশ্বম্ভর একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'নিজের অসুখের চিকিচ্ছে করতে করতেই লম্বা হয়ে গেলাম ডাক্তারবাবু, তার ওপর আবার যদি—'

অমিতাভ জানিত বিশ্বম্ভরের লম্বা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তবু সে বলিল, 'আচ্ছা, তাঁকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন, আমি এমনি ইন্‌জেকশান দিয়ে দেব। ওষুধের দামটা খালি দিতে হবে।'

বিশ্বম্ভরবাবু অপ্রসন্নমনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন, 'আচ্ছা দেখি।—ডাক্তারবাবু, আপনি দৈব ওষুধে বিশ্বাস করেন?'

অমিতাভ তৎক্ষণাৎ বলিল, 'হ্যাঁ করি বৈকি। তবে সামান্য অসুখে দৈব ওষুধ তেমন কাজ করে না। আপনি বরঞ্চ নিজে ব্যবহার করতে পারেন, আপনার যে ব্যাধি তাতে দৈব ওষুধ অব্যর্থ কাজ করবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি ওষুধও খাওয়া চাই।'

বিশ্বম্ভর স্ত্রীর জন্যই দৈব ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তার যখন দৈব চিকিৎসায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিল তখন তাঁহার নিজের জন্যও লোভ হইল। দৈব ঔষধের মূল্য কম অথচ উহা মনকে শান্তি দিতে পারে। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন কাউকে জানেন ডাক্তারবাবু, যে মাদুলি-টাদুলি দিতে পারে? তাহলে হয়তো—'

এই সময় টেবিলের উপর টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। ফোন তুলিয়া লইয়া অমিতাভ বলিল, 'কে আপনি?...আরে বিন্দা! কি খবর?...যেতে হবে? কি হয়েছে? মীনা ভাল আছে তো? যাক, আমি ভেবেছিলুম মীনার বুঝি অসুখ করেছে...'

বিশ্বম্ভরবাবু মাদুলির কথা ভুলিয়া এই একতরফা আলাপ শুনিতে লাগিলেন।

'...সার্জারির কেস! কার ওপর অস্ত্র করতে হবে?...অ্যাঁ...কেতু? মীনার—কি বললে—ছেলে?...ও বুঝেছি। তা বেশ। আট টাকার কমে আমি ছুরি ধরি না, কিন্তু এ কেসে ডবল ফী চার্জ করব। রাজী আছ?...বেশ! মীনা কোথায়?...ঘরেই আছে? তাকে ফোন ধরতে বল।...ভাল আছ মীনা? তোমার ছেলের—অর্থাৎ কেতুর—বয়স কত হল? দু' মাস?...অ্যাঁ! কি বললে ভাল শুনতে পেলুম না। আমার মনে হল, তুমি বললে—ধ্যেৎ!...যাহোক, এই মাসেই তোমার বিয়ে, তার আগে তোমার ছেলের রোগ সারিয়ে দিতে হবে—কেমন? কোনো ভয় নেই; অপারেশানটা অবশ্য গুরুতর কিন্তু আমি সারিয়ে তুলব।...ভাল কথা, তোমার ভাবী পতিদেবতা শুনলুম একজন তরুণ ডাক্তার;—লোকটি বেশ উদার প্রকৃতির দেখছি...অভিনন্দন জানাচ্ছি, আশা করি তোমরা সুখী হবে। পরমেশ্বরের কাছে দম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি...না না রাগ নয়,—সে তো এর পরে, সারা জীবন ধরেই আছে...কিন্তু রবিবাবুর সেই কবিতাটা মনে আছে তো—'খ্যাতির ক্ষতি পূরণ-প্রীতি দৃষ্টি রাখি হরিণ আঁখি'। আমিও এখন থেকে ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে রাখছি।...কিসের ক্ষতি! বল কি! যদি এখানকার লোক জানতে পারে যে ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করে আমি এই অপারেশান করছি, তাহলে কি রক্ষে থাকবে? প্রফেশনাল এটিকেট আছে তো। আচ্ছা, এখনি যাচ্ছি। তোমার বিয়েতে কি উপহার দেব ভাবছি; কি দিলে ভাল হয় বল তো? একটা কুমীরের চামড়ার সুটকেস? ...না! এক সেট চায়ের বাসন?—তাও না! তবে?...অ্যাঁ! একটা আস্ত মানুষ চাই!...আচ্ছা

banglabooks.in

মীনা, তুমি দূর থেকে তো বেশ কথা কইতে পারো, মুখোমুখি হলে আর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না কেন?...লজ্জা! হুঁ— 'আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান কেবল সরমটুকু রেখেছি'...আহাহা—কবিতা বললে অমন চটে যাও কেন?...যাচ্ছি. পনেরো মিনিটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুব...কেতুর বাবাকে আমার ভালবাসা দিও—' অপরপ্রান্ত হইতে টেলিফোনের তার কাটিয়া গেল।

ফোন রাখিয়া দিয়া অমিতাভের চেতনা হইল যে বিশ্বম্ভরবাবু এতক্ষণ একাগ্র মনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। সে চট্ করিয়া মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া ফেলিল, বলিল, 'আমাকে এখনি বেরুতে হবে, একটা শক্ত অপারেশান আছে।'

বিশ্বম্ভরবাবু কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যেতে হবে?'

'বিনোদবাবু জমিদারের বাড়ি। তাঁর একটি ভাগ্নে—দু' মাসের বাচ্চা—তার মেরুদণ্ডের কয়েকটা হাড় কেটে বাদ দিতে হবে।—আপনি তাহলে ঐ ওষুধটা আপাতত চালান—'

অপারেশানের অস্ত্রাদি ব্যাগে লইয়া অমিতাভ তাহার দশ-মডেল অস্টিন গাড়িতে চড়িয়া প্রস্থান করিল। বিশ্বম্ভরবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। জমিদার বিনোদ-বাবুর পরিবারস্থ সকলকেই তিনি চেনেন,—কেবল ভ্রাতা আর ভগিনী, আর কেহ নাই। উভয়েই অবিবাহিত। সম্প্রতি ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—এই সূত্রে বিশ্বম্ভর-বাবু প্রায় পনেরো হাজার টাকার গহনা সরবরাহ করিবার ফরমাস পাইয়াছেন।

অথচ—।

বিনোদ বলিল, 'ডাক্তারই বল আর গো-বদ্যিই বল, তুমি ছাড়া মীনার কারুর ওপর বিশ্বাস নেই।'

বিনোদের পড়ার ঘরে বিনোদ ও অমিতাভ মুখোমুখি বসিয়াছিল, মীনা দাদার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। ছোটখাটো মেয়েটি, বয়স সতেরো কি আঠারো; সুন্দর চোখ দুটিতে আশঙ্কার ছায়া স্বাভাবিক লাজুকতার সহিত মিশিয়া তাহাকে যেন আরও ছেলেমানুষ করিয়া দিয়াছে।

অমিতাভ তাহার দিকে চোখ তুলিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'একেই বলে পূর্বরাগ। ডাক্তারের কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু গো-বদ্যির চেয়েও আমার ওপর বেশী বিশ্বাস,—খাঁটি ভালবাসা না হলে এমন হয় না।'

মীনা উত্তপ্ত মুখে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। অমিতাভ যদিও তাহার দাদার কলেজের বন্ধু, (উভয়ে এক সঙ্গে আই এস্‌সি পড়িয়াছিল) তবু অমিতাভের সান্নিধ্যে আসিলে সে কেবলই ঘামিতে থাকে; ফোনে যদি বা তাহার দু'একটা ঠাট্টার জবাব দিতে পারে, চোখাচোখি হইলে একেবারে বোবা হইয়া যায়।

অমিতাভ বলিল, 'বিন্দা, দেখছ মীনার কি রকম লজ্জা হয়েছে! তোমার সামনে প্রেমের কথা উত্থাপন করা আমার উচিত হয়নি। প্রেম হচ্ছে ভারি গোপনীয় জিনিস, দাদার সামনে তা নিয়ে আলোচনা অতি গর্হিত, আড়ালে আবডালে চুরি করেই প্রেমের কথা বলতে হয়। অতএব ও-কথা এখন থাক। এখন তোমার সংসারের খবর কি মীনা? তোমার বিলিতি ইঁদুর-গুলি বেশ মনের আনন্দে আছে? রূপী বাঁদরটির স্বাস্থ্যের কোনো রকম ব্যাঘাত হয়নি?'

বিনোদ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আঃ, অমি, ওকে আর জ্বালাতন করিসনি। এমনিতেই বেচারা কাল থেকে দুর্ভাবনায় শুকিয়ে উঠেছে। এখন যা, কাজটা সেরে আয়।'

'তথাস্তু।' অমিতাভ ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল মীনা। বিন্দা, তুমি আসবে না?'

'না, এখনি একজন লোক আসবার কথা আছে।'

'উঃ—কি পাষণ্ড! ভাগ্নের চেয়ে লোক বড় হল!' অমি হৃদয়বিদারক নিশ্বাস ত্যাগ করিল,

banglabooks.in

'বেশ! বেশ! চল মীনা।'

অন্দরের একটি রুদ্ধদ্বার ঘরের সম্মুখে আসিয়া মীনা দাঁড়াইল, অমিতাভের মুখের দিকে কাতর চোখ তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, 'বাঁচবে তো?'

চমকিত হইয়া অমি বলিল, 'কে?'

ভর্ৎসনাপূর্ণ চোখে মীনা বলিল, 'কেতু।'

অমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'কোনো ভয় নেই, আমার অস্ত্রাঘাতে আজ পর্যন্ত কেউ মরেনি। একবার একটা হুলো বেরালকে লাঠি মেরেছিলুম, সে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে।—এই ঘরে কেতু আছে তো? তুমিও এস না।'

মীনা শিহরিয়া উঠিল, 'আমি ও চোখে দেখতে পারব না।' বলিয়া চোখে আঁচল দিল।

অমি বলিল, 'আচ্ছা, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাক; এক মিনিটে কাজ শেষ হয়ে যাবে।—কিন্তু ক্ষতিপূরণের কথাটা মনে আছে তো? তোমার দাদা অবশ্য ডবল ফী দেবে বলেছে, কিন্তু বিন্দাকে বিশ্বাস নেই; শেষ পর্যন্ত হয়তো ফাঁকি দেবে। তখন কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করব।'

আঁচলের ভিতর হইতে মীনা বলিল, 'যাও।'

অমি একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

'অগ্রিম কিছু আদায় করে নিই।'—অমি চট্ করিয়া তাহার সিঁথি-মূলে একটা চুম্বন করিল, তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রক্ত করবীর মত রাঙা মুখ দু'হাতে চাপিয়া মীনা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। ছি ছি—একটু লজ্জাও কি নাই! বিয়ের আগে—

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। মীনা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। কেতু কি—?

তারপর সহসা ঘরের ভিতর হইতে তারস্বরে চীৎকার উঠিল—কেঁউ কেঁউ কেঁউ।

ক্রমশ কুক্কুর শাবকের কাতরোক্তি ক্ষীণ হইয়া থামিয়া গেল। মিনিট দুই তিন পরে অমি বাহিরে আসিতেই মীনা ব্যাকুল বিস্ফারিত চক্ষে তাহার পানে তাকাইল।

অমি নিজের মুঠি তাহার দিকে বাড়াইয়া বলিল, 'এই নাও।'

না বুঝিয়া মীনা হাত পাতিল। কেতুর কর্তিত পুচ্ছটি তাহার হাতে দিয়া অমি বলিল, 'অপারেশান সাক্‌সেস্‌ফুল। রোগী এখন নিদ্রা যাচ্ছেন।'

মীনা ল্যাজটি ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল; তারপর ঘরে গিয়া ঢুকিল। অতর্কিতে অমির পিঠে একটি কিল মারিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।

অমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ক্ষুদ্র পুচ্ছাংশটি পকেটে পুরিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে বাহিরের দিকে চলিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া অমি দেখিল বিশ্বম্ভরবাবু বিনোদের কাছে বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, 'একি! বিশ্বম্ভরবাবু, আপনি এখানে যে?'

বিনোদ বুঝাইয়া দিল যে বিশ্বম্ভরবাবু মীনার বিবাহের সমস্ত গহনা গড়ার ভার লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এ বাড়িতে যাতায়াত বিচিত্র নয়।

অমিতাভ কিছুকাল অপলক দৃষ্টিতে বিশ্বম্ভরবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, 'এদিকে একবার শুনে যান, একটু কথা আছে।'

বিশ্বম্ভরকে আড়ালে লইয়া গিয়া অমি বলিল, 'আপনি আজ মাদুলি ধারণের কথা বলছিলেন না? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার কাছে ভাল দৈব ওষুধ আছে।'

বিশ্বম্ভর উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অমি গম্ভীর মুখে বলিল, 'কেতু গ্রহই আপনার অনিষ্ট করছে; কেতুর মাদুলি ধারণ করলেই আর কোনো রোগ থাকবে না।'

banglabooks.in

সাগ্রহ স্বরে বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'কি করতে হবে?'

পকেটে হাত পুরিয়া কেতুর পুচ্ছটি নাড়িতে নাড়িতে অমি বলিল, 'একটি বেশ বড় দেখে সোনার মাদুলি তৈরি করে কাল আপনি আমার কাছে নিয়ে যাবেন, আমি তাতে দৈব ওষুধ ভরে দেব। মাদুলিটি অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা হওয়া চাই, আর সেই অনুপাতে মোটা। সেটি গলায় ধারণ করতে হবে।'

হাত ঘষিতে ঘষিতে বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'যে আজ্ঞে।'

'আর আপনার স্ত্রীকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন, ইন্‌জেকশান দিবে দেব।'

ঈষৎ ম্লান হইয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'আচ্ছা।'

'আপনি যখন এ বাড়ির স্যাকরা তখন ওষুধের দামটা আর আপনাকে দিতে হবে না।'

পুনরায় উৎফুল্ল হইয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'যে আজ্ঞে।'

৩০ চৈত্র ১৩৪২

বরলাভ

প্রৌঢ় সদরালা সারদাবাবু গভীর রাত্রে দেবীর বরলাভ করিলেন।

দেবীর চেহারাটি ঠিক ঠাকুর-দেবতার মতো নয়; তন্বী তরুণী কুহকিনীর মতো। ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া দেবী বলিলেন, 'বৎস, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম; কাল রাত্রেও যদি তোমার মনোভাব পূর্ববৎ থাকে, বর পাকা করিয়া দিব।'—বলিয়া চটুল হাস্যময়ী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

ব্যাপারটা এই—শৈশবকাল হইতে সারদাবাবু ধর্মভীরু লোক। তাই ওকালতি হইতে মুন্সেফি এবং মুন্সেফি হইতে সদরালা পদবীতে উত্তীর্ণ হইয়াও তাঁহার ধর্মভীরুতা দূর হয় নাই। সুবিচার করিবার দুরন্ত বাসনা সর্বদাই তাঁহার অন্তরে জাগিয়া থাকিত। অথচ আদালতের সকল সাক্ষী এবং উকিলই যে ঘোর মিথ্যাবাদী এ-বিষয়েও তাঁহার মনে সংশয় ছিল না। তিনি ব্যথিতচিত্তে ভাবিতেন—আহা, মানুষের মুখ দেখিয়া যদি তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিতাম!

বুঝিবার চেষ্টাও তিনি বিলক্ষণ করিতেন। ফলে তাঁহার অধিকাংশ রায় আপীলে উল্টাইয়া যাইত। কিন্তু দীর্ঘকালের একান্ত বাসনা কখনও নিষ্ফল হয় না। নিদ্রাযোগে সারদাবাবু হঠাৎ দেবীর বরলাভ করিলেন।

সেদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে তাঁহার বিলম্ব হইল; ঘুম ভাঙিতে দেখিলেন, বাড়ির ঝি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে টিপয়ের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিতেছে। ঝিটি অনুত্তীর্ণযৌবনা বিধবা; সারদাবাবু চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিতেই শুনিতে পাইলেন, সে বলিতেছে, 'বুড়ো মড়ার লজ্জাও নেই, তিন পহর বেলা অবধি খাটে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মরণ আর কি!'

banglabooks.in

সারদাবাবু এই ঝিটিকে অত্যন্ত স্নিগ্ধভাষিণী ও নম্রপ্রকৃতির বলিয়া জানিতেন, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তার পর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ! কি বললে?'

ঝি বলিল, 'কিছু তো বলিনি বাবু, চা এনেছি।' মিষ্ট হাসিয়া ঝি প্রস্থান করিল। সারদাবাবু ব্যাদিত মুখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সংশয়াকুলচিত্তে চা পান করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ হইল, রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সারদাবাবুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

সারদাবাবুর সংসারে প্রথম পক্ষের একটি কন্যা ও দ্বিতীয় পক্ষের একটি পত্নী থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। তিনি জানিতেন, ইহারা দু'জনে সর্বদা তাঁহার আদেশ, এমন কী ক্ষীণতম বাসনাটি পর্যন্ত মানিয়া চলে। স্বাধীন ইচ্ছা তাহাদের নাই, স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে গেলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিতেন, ফলে, একটিমাত্র কর্তার দ্বারা শাসিত হইয়া সংসার-তন্ত্র হিটলারের জার্মানি বা মুসোলিনীর ইটালীর মতো নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছিল।

যা হোক, সারদাবাবু নিজের আপিস-ঘরে গিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনটা আশা-আশঙ্কার মাঝখানে দোল খাইতে লাগিল।

একটি তরুণবয়স্ক মুন্সেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল, সে প্রায়ই আসে; প্রবীণ হাকিমের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ; বড় ভালো ছেলে। সারদাবাবু হৃষ্টচিত্তে তাহাকে হাকিমের কর্তব্য সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন।

মুন্সেব আসিতেই তিনি সহাস্যে কলম রাখিয়া বলিলেন, 'এসো হে সুবোধ। একটা রায় লিখেছি, তোমার দেখা উচিত। অনেক শিখতে পারবে।'

সুবোধ বিনীতভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো সকালবেলা এসেছি। দিন।'

সারদাবাবু রায় দিতে দিতে শুনিতে পাইলেন, সুবোধ বলিতেছে, 'কচু রায় লিখেছ! পেটে বোমা মারলে তো এক লাইন নির্ভুল ইংরেজি বেরোয় না!'

অভিভূত সারদাবাবু শুনিতে লাগিলেন, গভীর মনঃসংযোগে তাঁহার রায় পড়িতে পড়িতে সুবোধ বলিতেছে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, রায়ের মধ্যে আবার রসিকতা হয়েছে! দ্বিতীয় পক্ষ কি না, রস একেবারে উথলে পড়ছে! বেশী দূর যেতে হবে না, জজ-সাহেবই রায়ের পিণ্ডি চটকে ছেড়ে দেবে।...চমৎকার। এখানটা কী পাওয়ারফুল্ আর্গুমেণ্ট!... মেয়েটা তো আজ এখনও আসছে না! রোজই ছল-ছুতো করে ঘরে ঢুকে পড়ে, আর আমাকে দেখেই জিব কেটে পালায়,—যেন কতই লজ্জা! হুঁ হুঁ শিকারী মেয়ে!...বুড়ো কিন্তু আচ্ছা বেরসিক; নিজে দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে ফুর্তিতে আছে, এদিকে মেয়ের যে বুক ফাটছে সেদিকে নজর নেই। আমার সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দিলেও তো পারে...'

সারদাবাবু শিহরিয়া কানে আঙুল দিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না, সুবোধের স্বগতোক্তি তাঁহার কানে পৌঁছিতে লাগিল। তিনি তখন ঘাড় গুঁজিয়া প্রবল বেগে রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

যথাসময়ে মেয়ে চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে ঘরে প্রবেশপূর্বক সুবোধকে দেখিয়া জিব কাটিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। সারদাবাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

সেদিন আহারে বসিয়া সারদাবাবু করুণনয়নে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিলেন। স্ত্রী বলিলেন, 'হ্যাঁ গা, আজ কি শরীর ভাল নেই? মুখখানা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। আজ না হয় কোর্টে গিয়ে কাজ নেই।' বলিয়া উদ্বিগ্নমুখে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সারদাবাবু স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন, 'জজ-সাহেব নিশ্চয় হুড়ো দিয়েছে, তাই মন খারাপ। ভালোই হয়েছে—বাইরে গুঁতো না খেলে পুরুষমানুষ ঘরের লোকের কথায় কান দেয় না। আজই সন্ধ্যেবেলা মাইসোর জর্জেট শাড়ির কথাটা তুলব। সোজাসুজি তুললে হবে না, তা হলেই উল্টো রাস্তা ধরবে। ছেঁড়া কাপড়খানা পরে সামনে ঘোরাঘুরি করব, চোখে

banglabooks.in

পড়লেই জিগ্যেস করবে। তখন বেশ গুছিয়ে কথাটা পাড়তে হবে। সত্যি বাপু, তুমিই না হয় বুড়ো, তাই বলে আমার কি সাধ আহ্লাদ নেই। পঁচিশ বছর বয়সে কি কেবল মালা-জপই করব? দোজপক্ষে না পড়ে যদি...'

নীরবে আহার সমাপ্ত করিয়া সারদাবাবু কোর্টে গেলেন।

এজলাসে বসিয়া সারদাবাবু উৎসুকভাবে চারিদিকে চাহিলেন। গৃহে যদিচ কয়েকটা প্রবল ধাক্কা খাইয়াছেন, তবু তিনি একেবারে দমিয়া যান নাই।

এজলাসে তাঁহার পেশকার ও কয়েকজন উকিল উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া সারদাবাবু এক অপূর্ব কলরব শুনিতে পাইলেন। সকলেই একসঙ্গে কথা কহিতেছে, অন্যের কথা শুনিবার ধৈর্য কাহারও নাই। এই সম্মিলিত অনৈক্যতানের ভিতর হইতে একটি শব্দ কেবল অনাহত-ধ্বনির মতো উত্থিত হইতেছে—টাকা! টাকা! টাকা।

সারদাবাবু কড়া হাকিম, এজলাসে কোলাহল সহ্য করিতে পারেন না; তিনি পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'সাইলেন্স!'

সকলে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কেহই তো কোনও কথা বলে নাই।

নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সারদাবাবু সংকুচিতভাবে অধোবদন হইলেন; অমনি কোলাহল থামিয়া গেল। তিনি তখন পেশকারের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, 'কি কাজ আছে দেখি!'

একজন উকিল একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়া বলিলেন, 'হুজুর, আমার মক্কেল পীড়িত, এক হপ্তার মুলতুবি প্রার্থনা করি।'

সারদাবাবু বলিলেন, 'ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে?'

'আছে হুজুর, সিবিল-সার্জেনের সার্টিফিকেট।'

উকিলের মুখের দিকে চাহিয়া সারদাবাবু সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। দরখাস্ত মিথ্যা, সার্টিফিকেট মিথ্যা,—পীড়িত মক্কেল সেই মুহূর্তে আদালতের নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জিলিপি ভক্ষণ করিতেছে।

তিনি কড়া সুরে বলিলেন, 'দরখাস্ত নামঞ্জুর।'

বিস্মিত উকিল বলিলেন, 'হুজুর, সিবিল-সার্জেনের সার্টি—'

সারদাবাবু ততোধিক চড়া সুরে বলিলেন, 'সার্টিফিকেট মিথ্যে, দরখাস্ত মিথ্যে!'

তিনি রোষরক্তিম চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই, কিন্তু সকলেই বলিতেছে, 'বুড়ো বোম্বেটে বলে কি!...কুকুরে কামড়েছে, খ্যাপা কুকুর!...মরেছে ব্যাটা লাল-মুখো—সিবিল-সার্জেন এবার ধরে চাবকাবে।'

দরখাস্তকারী উকিল বলিতেছেন, 'দাঁড়াও যাদু, তোমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করছি...হুজুর, স্পষ্ট করে আর একবার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করবেন কি? আমি হয়তো শুনতে ভুল করেছি, কিন্তু সিবিল-সার্জেনের সার্টিফিকেট মিথ্যে—এই কথাই কি আপনি বলতে চান? ...বল্ শালা, আর একবার বল্। তার পর তোর বাপের নাম না ভুলিয়ে দিতে পারি তো আমি...বলুন হুজুর!'

সারদাবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন, 'বেরোও—বেরোও—পাজি নচ্ছার চোর! এই চাপরাশি, কান পাকাড়কে সবকো নিকাল দেও!...'

সায়ংকাল। সারদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষভাবে নিজের গৃহের বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে

banglabooks.in

শয়ন করিয়া আছেন : তাঁহার চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ। শহরের সর্বত্র উকিল-মহলে ও হাকিম-মহলে—যে বিরাট হইচই বাধিয়া গিয়াছে তাহা কানে না শুনিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই। হয়তো এতক্ষণে মহামান্য হাইকোর্টেও খবর গিয়াছে। উকিল-সম্প্রদায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার বান্দা নয়।

গৃহিণী আসিলেন। কয়েক বার তাঁহার সম্মুখে পায়চারি করিলেন, তার পর তাঁহার মুখ যেন হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছেন এমনই ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'ওগো, তোমার শরীর সত্যিই খারাপ হয়েছে। "না" বললে শুনব কেন! খেটে খেটে যে কালী হয়ে গেলে; এ বয়সে অত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন! আমি বলি, ছুটি তো পাওনা হয়েছে, ছুটির দরখাস্ত দাও—কিছু দিন পুরীতে নাহয়...কাপড়খানা কি এখনও চোখে পড়ছে না।...শরীর আগে, তার পর চাকরি—'

সারদাবাবু গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও কথাই বলিলেন না।

মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া গৃহিণী প্রস্থান করিবার পর কন্যা আসিল। হাসি-হাসি মুখ, চোখে চপল দৃষ্টি।

কন্যা বলিল, 'বাবা, তোমার মাথায় বড্ড পাকা চুল হয়েছে—তুলে দেব?'

কন্যাটিকে সারদাবাবু বড় ভালোবাসিতেন, তাই চোখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিলেন না। সেখানে কোন্ কালসর্প লুকাইয়া আছে কে জানে! সপ্তদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা—সারদাবাবু চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। মুন্সেব সুবোধ আসিতেছে। কন্যা বোধ হয় পিতার পাকা চুল তুলিতে এত তন্ময় যে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইল না।

সুবোধ আসিয়া বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইল। সুবেশ সৌখীন যুবক, হাতে ছড়ি। সারদাবাবু দেখিলেন, সে সসম্ভ্রম চক্ষে তাঁহার মেয়ের পানে তাকাইয়া আছে।

কিন্তু সারদাবাবু তাহার মনটাও পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে একটা শিরা যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। তিনি উঠিয়া সুবোধের উপর লাফাইয়া পড়িলেন, তাহাকে এলোপাথাড়ি লাথি কিল চড় মারিতে মারিতে ফেনায়িত মুখে বলিতে লাগিলেন, 'শুয়োর! কুকুর! পাঁঠা!...'

গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গের ওজুহাতে ছয় মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিয়া সেই রাত্রে সারদাবাবু কাতরকণ্ঠে বরদাত্রী দেবীকে জানাইলেন, 'মা, তোমার বর ফিরিয়ে নাও। যথেষ্ট হয়েছে- -আর চাই না—'

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

banglabooks.in

প্রেমের কথা

পৃথিবীতে যেদিকে দৃষ্টি ফিরাই, দেখি নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ কেবল অহরহ প্রেম করিতেছে। আশ্চর্য ব্যাপার!—বাংলাদেশেরও নিস্তার নাই; যুবক-যুবতীদের মধ্যে নিরন্তর প্রেম চলিতেছে—ট্রামে, বাসে, কলেজে প্রেম জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই প্রেম দীর্ঘজীবী নয়, অধিকাংশই আঁতুড় ঘরে পেঁচোয় পাইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতেছে। তবু বিরাম নাই। প্রেমের জন্মনিরোধ করিবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না।

কিন্তু তবু নিয়ম মাত্রেরই ব্যতিক্রম আছে। কলিকাতা শহরেই এইরূপ দুইটি ব্যতিক্রম বাস করিতেছিল। হঠাৎ এক চিত্র-প্রদর্শনীতে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রম দুটির একটি যুবক, অপরটি যুবতী।

প্রাচ্যকলার প্রদর্শনী। সুতরাং কলার সঙ্গে সঙ্গে বেল, তাল, নারিকেল, এমন কি কাঁঠাল পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদর্শিত হইতেছিল।

যুবতীটি এইরূপ একটি ফলভারপীড়িত চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, যুবক ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ছবির নাম—প্রেমালসা! যুবতী সেইদিকে ঘৃণাপূর্ণ তর্জনী নির্দেশ করিয়া কহিল, 'কী কুৎসিত!'

যুবক বলিল, 'বীভৎস।'

এই প্রথম আলাপ।

উভয়েরই উভয়ের কথা ভালো লাগিল। যুবক যুবতীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'নরকের চিত্র কি প্রেমের চিত্রের চেয়েও বীভৎস? সম্ভব নয়...আপনার নাম কি?'

যুবতী বলিল, 'কখনই না।...আমার নাম কলিকা।'

'কলিকা! কিসের—গাঁজার?'

'তা হলেও দুঃখ ছিল না—আপনার নাম কি?'

'হুতাশন।'

'বেশ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় গাঢ় হওয়া কর্তব্য।'

'আমি কিন্তু প্রেম মানি না।'

'আমিও না।'

'বেশ, তবে চলুন—চা খাওয়া যাক্।'

উভয়ের মধ্যে পরিচয় গাঢ় হইল।

হুতাশন একদিন বলিল, 'দেখ কলিকা, এ জগতে প্রেমই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল, যে প্রেম করেছে সেই মরেছে। সংসারে বিবাহের একটা রীতি আছে—কিন্তু সে কি জন্যে? প্রেমের জন্যে নয়, কম খরচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্যে। যারা বিয়ে করে, তারা সেই কথাটা ভুলে গিয়ে প্রথমেই বৌয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে দেয়। ন্যক্কারজনক কাণ্ড! আমি ব্যয়-সংক্ষেপের জন্যে বিবাহ বরদাস্ত করতে রাজী আছি, কিন্তু প্রেম আমার অসহ্য।'

কলিকা বলিল, 'আমারও। আচ্ছা, প্রেম যদি না থাকত পৃথিবীটা কি সুন্দর জায়গা হত বলুন দেখি!'

'চমৎকার। ঠিক গার্ডেন অফ্ ইডেনের মতো! কাপড়-চোপড় কিছু দরকার হত না, খরচ অনেক কম হত। কিন্তু প্রেমরূপী কালসর্প ঢুকেই সব মাটি করে দিয়েছে। সাবধান, এই কালসর্পের কুহকে ভুলে যেন আপেল খেয়ে ফেলো না।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—আচ্ছা, আপনি তো অনেক খবর রাখেন, প্রেমের লক্ষণ কি—বলুন তো?'

হুতাশন ভাবিয়া বলিল, 'প্রেমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বিরহ। অর্থাৎ বেশীক্ষণ দেখতে না পেলে দেখতে ইচ্ছে করে, মন ছটফট করে—এইটেই সবচেয়ে গুরুতর লক্ষণ।'

'আর?'

'আর—নিজের ক্ষতি করে তার ভালো করবার চেষ্টা।—যেমন ধরো, তুমি বই পড়তে

banglabooks.in

ভালোবাসো—কেউ যদি নিজের সিগারেটের পয়সা কেটে তোমাকে বই কিনে দেয়—বুঝবে সে তোমার প্রেমে পড়েছে—'

'বুঝেছি। আমি বই পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু বাড়তি পয়সার অভাবে কেনা হয় না। কেউ উপহারও দেয় না।'

'সেটা তোমার সৌভাগ্য। জগতে পয়সার বড় অভাব—আমার বাড়তি পয়সা নেই, তোমারও নেই।—এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

অতঃপর পুরো এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হুতাশন ও কলিকা পরস্পরের প্রেমে পড়ে নাই—যদিও পড়িলে কেহই বিস্মিত হইত না। তাহারা একই বাড়িতে বাস করিতেছে, পাশাপাশি ঘরে শয়ন করিতেছি—এবং তাহাদের হাঁড়িও অভিন্ন। এরূপ অপূর্ব ব্যাপার বাংলাদেশে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। হুতাশন সাধারণতঃ বেলা চারটের সময় কর্মস্থান হইতে ফিরিত; একদিন সাড়ে পাঁচটার সময় সে চোরের মতো চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকিল। তাহার বগলে একটি প্যাকেট।

বাড়ি ঢুকিতেই কলিকা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, 'এত দেরি করলে কেন? উঃ—ভেবে ভেবে আমি'—বলিয়া সহসা তাহার হাত ছাড়িয়া দিল।

হুতাশন ভগ্নস্বরে বলিল, 'কলিকা, সর্বনাশ হয়েছে!'

শঙ্কিত কণ্ঠে কলিকা বলিল, 'কি হয়েছে?'

'আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এই দেখ—সিগারেটের পয়সা খরচ করে তোমার জন্যে বই কিনেছি।—এখন উপায়!'—হুতাশন চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কলিকার মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া পড়িল, সে বিমনা হইয়া হুতাশনের কাঁধের উপর হাত রাখিল; অন্যমনস্কভাবে হাত দুটি হুতাশনের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। কলিকা বলিল, 'আমিও —আমিও বোধ হয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

চমকাইয়া হুতাশন তাহাকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিল, উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, 'তাই নাকি। কি করে জানলে?'

কলিকা তাহার কোলের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'বিরহ। তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছিল—তাই—'

দু'জনেই গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

হুতাশন বলিল, 'কলি, পাছে প্রেমে পড়ি এই ভয়ে গোড়াতেই তোমাকে বিয়ে করেছিলুম —কিন্তু সব ফস্কে গেল। যে বইটা এনেছি, তার নাম কি জানো? চুম্বন।—এসো।'

হুতাশন ও কলিকার মাঝখানে প্রেমরূপী গঞ্জিকার উদ্ভব হইয়া ব্যাপারটাকে অকস্মাৎ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ করিয়া তুলিল।

১ পৌষ ১৩৪৩

banglabooks.in

ভালবাসা লিমিটেড

ভাস্করানন্দ, ললিত, বাসুদেব ও সাধুপদ—এই চারজন ছিল একাধারে লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটার ও প্রধান অংশীদার; তাহাদের নামের আদ্য অক্ষর লইয়া কোম্পানীর নামকরণ হইয়াছিল—ভালবাসা। বাকি যে সব অংশীদার বাংলাদেশের যত্রতত্র ছড়ানো ছিল তাহাদের সমষ্টিকে নির্দেশ করিবার জন্য ছিল—লিঃ।

একদা ডিরেক্টারগণ সমবেত হইয়া সংকল্প করিলেন যে সিনেমার ব্যবসা করিতে হইবে। কারণ সম্প্রতি দেখা যাইতেছে উহাতেই কাঁচা পয়সা বেশী। আপাততঃ একটা স্টুডিও ভাড়া লইয়া ছবি তুলিলেই চলিবে, তারপর ছবির মুনাফা হইতে কুড়ি পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়া বাকি যে কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচিবে তাহাতে নিজস্ব স্টুডিও খুলিয়া রীতিমত ব্যবসা আরম্ভ হইবে।

ভাস্করানন্দ বলিল, 'আমি সিনেরিও লিখব, ডায়ালগ্ লিখব, প্রযোজনা করব, উঃ—মাইরি! অ্যাসা একটা প্লট আমার মাথায় আছে—সে-প্লট ছবির পর্দায় উঠলে দেশের লোক বাপ্ বাপ্ বলে টিকিট কিনবে। হরদম ইয়ে—কিছু আর বাকি রাখব না, সব দেখাব।'

ললিত বলিল, 'আমি হিরোর পার্ট নেব,'—বলিয়া আয়নার দিকে তাকাইয়া নানা ভঙ্গীতে ভ্রূ নাচাইতে লাগিল।

ভাস্করানন্দ বলিল, 'বেশ। আর বাসুদেব নেবে ভিলেনের পার্ট—তোফা মানাবে।'

বাসুদেব চটিয়া বলিল, 'কি! আমার চেহারা ভিলেনের মতো? তোমার চেহারা তো ছিঁচ্‌কে চোরের মত—তুমি করো না! আমি ভিলেন হব না।'

ভাস্করানন্দ গরম হইয়া বলিল, 'কুছ পরোয়া নেই—হয়ো না। ভিলেন ভাড়া করে আনব। বাংলাদেশে ভিলেনের অভাব নেই জেনো।'

এতক্ষণে সাধুপদ কথা বলিল। সে ডিরেক্টারদের মধ্যে সবচেয়ে নিরেস; অতটা হাল-ফ্যাশনের নয়, মাথায় ক্ষুদ্র টিকি আছে—তাই সকলে যুক্তি করিয়া তাহাকে কোম্পানীর খাজাঞ্চি নিযুক্ত করিয়াছিল। সে বলিল, 'শুধু ভিলেন নয়, হিরোইনও ভাড়া করতে হবে। তা ছাড়া আরও আছে।—অনেক খরচ।' সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

ললিত বলিল, 'হোক্ খরচ। ভালো হিরোইন চাই। বিজ্ঞাপন দাও। খেঁদি-পেঁচী-পুঁটি চলবে না,'—বলিয়া পুনশ্চ ভ্রূ নাচাইতে লাগিল।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। তাহার উত্তরে যিনি আসিলেন তিনি একটি নবায়মানা তরুণী, তারুণ্যের প্রাচুর্যে তাঁহার তনুলতা টলমল। নাম ছলনা দেবী।

হাসি এবং কথা, নৃত্য এবং গীত—সকল ক্ষেত্রেই তিনি অনন্যপূর্বা। তিনি যখন তিনশত টাকা মাসিক বেতনের চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইয়া নৃত্যচপল ভঙ্গীতে প্রস্থান করিলেন, তখন চারজন ডিরেক্টারই কিছুক্ষণ হাস্য-বিকশিত বোকাটে মুখ লইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর ভাস্করানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া দেরাজের ভিতর হইতে খাতা বাহির করিয়া প্রাণপণে লিখিতে আরম্ভ করিল। হিরোইনকে দেখিয়া তাহার দারুণ প্রেরণা আসিয়াছে।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিল, 'ভিলেনকে কি করতে হবে?'

ভাস্করানন্দ লিখিতে লিখিতে বলিল, 'নারী-হরণ—মানে নারী-হরণের চেষ্টা। হিরোর বিক্রমে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।'

ললিত আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, 'এবং শেষ পর্যন্ত হিরোর সঙ্গে হিরোইনের মিলন হবে।' তাহার ভ্রূযুগল তখন কপালের উপর তাণ্ডব শুরু করিয়া দিয়াছে।

বাসুদেব বলিল, 'কুছ পরোয়া নেই, আমিই ভিলেন হব।'

সাধুপদ বলিল, 'বাঁচা গেল। তুমি ত্রিশ টাকা মাসে হাতখরচ পাবে। ভিলেনের পক্ষে ওই যথেষ্ট।'

ললিত উদার ভাবে বলিল, 'আমার কিছু চাই না।'

পরদিন হইতে মহলা শুরু হইল। ভাস্করানন্দই ডিরেক্টার। তাহার নির্দেশ অনুসরণ

banglabooks.in

করিয়া হিরো এবং ভিলেন উভয়েই এমন বস্তুতান্ত্রিক অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল, হিরোর স্পর্শন চেষ্টা ও ভিলেনের ধর্ষণ চেষ্টা এতই জীবন্ত হইয়া উঠিল যে সকলের তাক লাগিয়া গেল। হিরোইনের কিন্তু কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই, তিনি নিরপেক্ষভাবে হিরোর কবল হইতে ভিলেনের কবলে এবং ভিলেনের কবল হইতে হিরোর কবলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

রিহার্সাল চলিতে লাগিল। আপাতদৃষ্টিতে সকলেই খুশী। এমন কি সাধুপদর ক্ষুদ্র টিকিও মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে দেখা গেল।

রিহার্সাল শেষ হইয়া ছবি তোলা আরম্ভ হইবে। স্টুডিও, ক্যামেরাম্যান, শব্দ-যন্ত্রী সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।

একদিন রাত্রি দশটার সময় বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি বাড়ির দরজার সম্মুখে হিরো ও ভিলেনের মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া গেল।

ললিত জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাসুদেব বলিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ললিত হুংকার দিয়া বলিল, 'হুঁ, বুঝেছি।'

বাসুদেবও হুংকার দিল, 'হুঁ—বুঝেছি।'

ফুটপাথের উপর উভয়ের হাতাহাতির উপক্রম হইল।

এমন সময় বাড়ির দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিল সাধুপদ। দুজনকে চপেটাযুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া সে বলিল, 'একি, তোমরা এখানে লড়াই করছ কেন?'

উভয়েই নির্বাক। তার পর উভয়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে ইহা রিহার্সাল মাত্র।

সাধুপদ বলিল, 'আমি এসেছিলুম ছলনা দেবীকে বোঝাতে, তিনি মাইনেটা যাতে কিছু কম করেন। অনেক বুঝিয়ে দেড়শ' টাকায় রাজী করেছি।—ঐ একটা কন্‌স্টেবল আসছে। চলো।'

পরদিন বেলা এগারোটার সময় স্টুডিওতে সকলে প্রস্তুত হইয়া আছে, ছবি তোলা আরম্ভ হইবে। কিন্তু হিরোইনের দেখা নাই। কিছুক্ষণ পরে সকলে লক্ষ্য করিল খাজাঞ্চি সাধুপদও অনুপস্থিত।

হিরো ও ভিলেন একই ট্যাক্সিতে চড়িয়া ছুটিল। ছলনা দেবীর গৃহে গিয়া দেখিল, হিরোইন ও খাজাঞ্চি একসঙ্গে উড়িয়াছে—এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর তহবিল।

ভালবা(সা) লিঃ কুকুরের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। কুক্কুরজাতির স্বাভাবিক চরিত্র-হীনতার সুযোগ লইয়া নানাপ্রকার বর্ণসংকর কুক্কুরশাবক তৈয়ার করিয়া বিলাতী খদ্দের মহলে বিক্রয় করিতেছে। শুনা যাইতেছে ভালবা(সা) লিঃ আগামী বৎসর ½ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড ঘোষণা করিবে। শেয়ারের দাম চড়িতেছে।

৯ পৌষ ১৩৪৩

banglabooks.in

সন্দেহজনক ব্যাপার

মন্মথ নামক যুবককে প্রেমিক বলিব কিংবা কুচক্রী হত্যাকারী বলিব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। সে পুটু ওরফে তমাললতা দেবীর প্রেমে পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; উপরন্তু পুটুর পিতামহ রামদয়ালবাবু যে মন্মথর হাতে পড়িয়াই প্রাণ হারাইয়াছিলেন তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। মোটিভ্ অর্থাৎ দুরভিসন্ধি যে তাহার পুরামাত্রায় ছিল তাহাও এখন প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পুটুর সহিত সে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় পাঠক যদি পুলিসে খবর দেন তাহা হইলে অন্তত আমার দিক হইতে কোনও আপত্তি হইবে না।

মন্মথ যে আদর্শ বাঙালী যুবক নয় তাহার প্রমাণ—সে কুড়ি বছর বয়স হইতে শেয়ার মার্কেটে বেচা-কেনা করিয়া টাকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই স্বাবলম্বী, ফন্দিবাজ ও মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল; আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার অসাধ্য কাজ নাই। সুতরাং মধ্যমনারায়ণ-ঘটিত ব্যাপারটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কি না তাহা লইয়া কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আসামী পক্ষের উকিল হয়তো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে যে মন্মথ ভ্রমক্রমে এই কার্য করিয়াছিল, কিন্তু আসামীর উকিলের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা আমরা সকলেই জানি।

যা হোক, এখন মামলার হাল বয়ান করা দরকার।

রামদয়ালবাবুর বয়স হইয়াছিল পঁয়ষট্টি বৎসর এবং তাঁহার টাকা ছিল পঁয়ষট্টি লাখ। কথাটা অবিশ্বাস্য—তবু সত্য। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, পুটু ব্যতীত আর সকল আত্মীয়-স্বজন পুত্র-পৌত্র মরিয়া গিয়াছিল। এই সকল পুত্র-পৌত্র যে তাঁহার সহিত বেইমানি করিবার উদ্দেশ্যেই মরিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া রামদয়াল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং উহাদের মজা দেখাইবার জন্যই প্রাণপণে শেয়ার মার্কেটে টাকা উড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। টাকা কিন্তু উড়িল না; ফলে গত পনের বছরের মধ্যে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা তাঁহার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাঙালী হইয়া এত টাকা রোজগার করিলে ভগবান তাহা সহ্য করিতে পারেন না; রামদয়ালকে আপাদমস্তক রোগে ধরিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার পায়ে ধরিয়াছিল বাত, এবং মস্তকে রক্তের চাপ বাড়িয়া মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তা ছাড়া চোখেও ছানি পড়িয়াছিল, ভাল দেখিতে পাইতেন না।

রামদয়াল সাবেক লোক, কবিরাজী চিকিৎসা করাইতেছিলেন। মস্তকের রক্ত-চাপ কমাইবার জন্য সুশীতল মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্বদা মস্তকে মাখিতেন। পদদ্বয়ের বাত-বেদনা অপনোদনের জন্য মহাতেজস্কর মহামাস তৈল বিমর্দিত করাইতেন, এবং দুই চক্ষুতে ভেষজ-গুণোক্রান্ত কোনও বৃক্ষের রস দিয়া চক্ষু বন্ধনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র সাজিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে গন্ধ-গোকুলের ন্যায় সুরভি নির্গত হইতে থাকিত।

একদা প্রাতঃকালে রামদয়াল নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া গড়্গড়া টানিতেছিলেন, এমন সময় মন্মথ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া সে কাজের কথা পাড়িল। ধৃতরাষ্ট্ররূপী রামদয়ালকে বলিল, 'শুনেছি আপনার কাছে এক হাজার 'গিরি-গোবর্ধন' শেয়ার আছে। বেচে ফেলুন, আমি এক টাকা প্রিমিয়াম্ দিয়ে কিনে নিতে রাজী আছি।'

রামদয়াল বলিলেন, 'তুমি কে হে বাপু?'

'আমার নাম মন্মথ মজুমদার। যদি সৎপরামর্শ চান, এই বেলা গিরি-গোবর্ধন বেচে ফেলুন; নইলে আপনারই বুকে চেপে বসবে।'

রামদয়াল হাঁকিলেন, 'পরশুরাম!'

ভিতর দিকের পর্দা সরাইয়া একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল; পুটু বলিল, 'কি বলছ

banglabooks.in

দাদু? পরশুরাম কবিরাজের বাড়ি গেছে।'

রামদয়াল বলিলেন, 'বেশ, তুমিই এসো। এই বেয়াদব লোকটাকে কান ধরে বার করে দাও।'

পুটু ঘরে প্রবেশ করিল; মন্মথ ও পুটুর দৃষ্টিবিনিময় হইল। মন্মথ একটু হাসিল, পুটু একটু লাল হইল।

মন্মথ খাটো গলায় পুটুকে বলিল, 'এই যে কান—ধরুন।'

পুটু লজ্জা পাইয়া চুপি চুপি বলিল, 'দাদু রেগেছেন। এখনই ব্লাড্‌প্রেসার বেড়ে যাবে। আপনি যান।'

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কান ধরেছ?'

পুটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'ধরেছি।'

রামদয়াল বলিলেন, 'বেশ, এবার বার করে দাও। ফের যদি এ বাড়িতে মাথা গলায়, জুতো-পেটা করব।'

পুটু ও মন্মথ পাশাপাশি বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল। মন্মথর মুখ কৌতুকে চটুল, পুটুর গাল দুইটি লজ্জায় অরুণাভ।

বাহিরে আসিয়া মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম কি?'

পুটু বলিল, 'পুটু—মানে তমাললতা।'

মন্মথ বলিল, 'আজ বিকেলবেলা আমি আস্‌ব। গিরি-গোবর্ধন বিক্রি করে ফেলা যে একান্ত দরকার, এ কথা আপনাকে বুঝিয়ে দেব।'

অতঃপর পাদুকা-প্রহারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মন্মথ প্রত্যহ সকাল-বিকাল রামদয়ালের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। রামদয়াল চক্ষে ফেট্টা বাঁধিয়া মস্তকে ঠান্ডা তৈল ও পদদ্বয়ে গরম তৈল মালিশ করাইতে লাগিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনে ও পুটুর অন্তর্লোকে যে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জানিতেও পারিলেন না।

একদিন মন্মথ পুটুকে বলিল, 'পুটু, গিরি-গোবর্ধন শেয়ার আমার চাই; কারণ তোমাকে বিয়ে করা আমার একান্ত প্রয়োজন।'

পুটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বসিল, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইল, তারপর বলিল, 'দাদু তোমার নাম শুনলে জ্বলে যান।'

মন্মথ বলিল, 'এর একটা বিহিত করা দরকার। তোমাকে বিয়ে করা এবং গিরি-গোবর্ধন শেয়ারে হস্তগত করা আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

পুটু বলিল, 'হনুমানপুরের রাজবাড়িতে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

মন্মথ বলিল, 'হনুমানপুরকে কলা দেখাব। এসো, দু'জনে ষড়যন্ত্র করি।'

তখন উভয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

পরশুরাম নামক ভৃত্য রামদয়ালবাবুর মস্তকে ও পদদ্বয়ে তৈল মালিশ করিত। সে হঠাৎ এক মাসের ছুটি লইয়া রুগ্ণা স্ত্রীকে দেখিতে দেশে চলিয়া গেল। তাহার স্থানে যে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া গেল, তাহার নাম নসীরাম। নসীরামের অপর নাম মন্মথ।

নসীরাম অত্যন্ত মনোযোগসহকারে রামদয়ালকে তৈল মর্দন করিতে লাগিল। রামদয়াল সর্বদা চোখে ফেট্টা বাঁধিয়া থাকিতেন না; মাঝে মাঝে খুলিতেন। নসীরামের চেহারা দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। ছোকরা লেখাপড়াও কিছু জানে; তাহাকে দিয়া তিনি শেয়ার মার্কেটের রিপোর্ট পড়াইয়া শুনিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নসীরাম আসা অবধি গিরি-গোবর্ধন শেয়ারের দাম দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে। মন্মথ মজুমদার নামক বেয়াদব ছোকরার কান ধরিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য তিনি অনুতাপ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একগুঁয়ে লোক, শেয়ার বিক্রির কথা মুখে উচ্চারণ করিলেন না।

banglabooks.in

ওদিকে হনুমানপুরের রাজবাড়িতে পুটুর বিবাহের কথা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান একেবারে থামিয়া গেল। ইহার কারণ, রামদয়াল নসীরামকে চিঠি ডাকে ফেলিবার জন্য দিতেন, নসীরাম তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং হনুমানপুর হইতে যে সব পত্র আসিত পুটু তাহা নির্বিকারচিত্তে আত্মসাৎ করিত।

কিন্তু তবু হনুমানপুরকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। পঁয়ষট্টি লাখ টাকা রাজরাজড়ার পক্ষেও সামান্য নয়, বিশেষতঃ যদি রাজার সমস্ত রাজস্ব মহাজনের কাছে বন্ধক থাকে।

একদিন হনুমানপুরের এক দূত উপস্থিত হইল। সে জানাইল যে, রামদয়ালের পত্রাদি না পাইয়া মর্মাহত রাজা স্বয়ং কলিকাতায় আসিতেছেন; কল্যই কথাবার্তা পাকা করিয়া ফেলিতে চান। পত্রাদির ব্যাপার শুনিয়া রামদয়াল নসীরামের উপর অতিশয় সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু সেইদিনই দ্বিপ্রহরে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল।

পুটু রামদয়ালের বুকের উপর কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, 'দাদু, আমি—আমি হনুমানপুরে বিয়ে করব না।'

রামদয়াল বলিলেন, 'কী!'

পুটু ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, 'আমি নসীরামকে বিয়ে করব।'

শুনিবামাত্র রামদয়ালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তিনি একটি হুংকার ছাড়িয়া ডাকিলেন, 'নসীরাম!'

নসীরাম নিকটেই ছিল, বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম মন্মথ।'

রামদয়াল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

নসীরাম ছুটিয়া গিয়া শিশি হইতে রামদয়ালের মাথায় তৈল ঢালিতে আরম্ভ করিল। পুটু কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে অন্য শিশির তৈল মালিশ করিতে লাগিল।

কবিরাজ আসিয়া দেখিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক! ঔষধ উল্টা-পাল্টা হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ পায়ে মধ্যমনারায়ণ ও মাথায় মহামাস মালিশ চলিতেছে।

এই সাংঘাতিক চিকিৎসা-বিভ্রাটের ফলে রামদয়াল সেই রাত্রেই পরলোক যাত্রা করিলেন।

পরদিন হনুমানপুর উপস্থিত হইলে নসীরাম সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল, 'আপনি আসবেন শুনে রামদয়ালবাবু মারা গেছেন। এখন আপনি রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন।'

শ্রাদ্ধ শেষ হইলে মন্মথ পুটুকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'পুটু, দুঃখ ক'রো না, ভগবান যা করেন ভালর জন্যে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমাদের দু'জনকেই খুন করতেন; কিংবা আমাকে খুন করে তোমাকে হনুমানপুরের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। সেটা কি ভাল হত? এদিকে দেখছ তো, গিরি-গোবর্ধনের শেয়ার চড়চড় করে উঠছে; এখন অশৌচটা কেটে গেলেই...'

মন্মথকে পুলিসে দেওয়া যাইতে পারে কি না আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। আর কিছু নয়, সে গিরি-গোবর্ধনের নাম করিয়া পঁয়ষট্টি লাখ টাকা মারিয়া দিবে ইহাই অসহ্য বোধ হইতেছে।

১৩ মাঘ ১৩৪৩

banglabooks.in

তন্দ্রাহরণ

পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধুমাসের সায়াহ্নে তিনি তাই প্রাসাদশিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারি করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম করিয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম।

অনেক দিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দমনীয় ছিল; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে কনৌজে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রার বয়স আঠারো বৎসর, ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন। তথাপি মধু-মাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বছরের বিকশিতযৌবনা কুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন? একালে তো এমনটা দেখা যায় না। তবে কি সেকালে—

না, তাহা নয়। সেকালেও এমন ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার আপত্তির কারণ, তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য। কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আসল কথা—বর বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোড়া হইতেই তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয় সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন—চন্দ্রানন মাণিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভালই, চালচলনও অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবারে অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সহযোগে তিনি যাহা বলেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। এ কি অত্যাচার! তিনি রাজ-কুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ—তবু বাঙাল তো! দেশে কি আর রাজপুত্র ছিল না? আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবেন না এই বা কেমন কথা!

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্র লিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীর-পুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধুসায়াহ্নে একাকী প্রাসাদ-শীর্ষে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে গণ্ড আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম!

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মত প্রাসাদপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজপ্রাসাদ-শীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিক্ষেপ করিল? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নীচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক ঊর্ধ্বমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে যুবকের মুখাবয়ব ভাল দেখা গেল না; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া

banglabooks.in

আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে।

লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

"ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূরে হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ কর; আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না। যদি আমাকে বঞ্চনা কর, নিজেই পরিতাপ করিবে। পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে?

সদয়া হও—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। একবার সাক্ষাৎ হয় না?—তোমার অনুগত বন্ধু।"

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল ইদানীং প্রিয় সখী নন্দা যখন তখন ছলছুতা করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ! ঐ কমকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে; নন্দাও নিশ্চয় তাহার প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূরে হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্যশীল যুবক তখনও ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরিখার পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধনিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখি, তুমি এখানে?'

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, 'কতক্ষণ এখানে এসেছ?'

তন্দ্রা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'নন্দা, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমায় দেখতে পাবি না। সখি, তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই, ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চল, নীচে চল। কাজললতা যে পড়ে রইল, আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খসে পড়েছে দেখছি! সখি, উতলা হয়ো না; তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হলে কি চলে?'

শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা, আজ রাত্রে আমি একা শোব, তুই যা। আর দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।'—মনে মনে বলিলেন, 'অদল-বদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল, 'ওমা, ওকি কথা! আমি যে তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। নন্দার এই পলায়ন একেবারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া থামিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিয়া যাইবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা প্রাসাদের গুপ্তপথ দিয়া পরিখা পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া আছে রাত্রির মতই নিবিড় নীল একটি ঊর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্ত তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর এক লম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্র-

banglabooks.in

খচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল, পৌণ্ড্রভুক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখে শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বযুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীল উর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্তির পানে চাহিলেন। দৃষ্টি বিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক দাড়িমের মত তার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবন্ধ দেহ, মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব মেশামেশি। নবজাত গুম্ফের নীচে একটু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূরে হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর!

সহসা অনুতাপে তন্দ্রার হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্য-পুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা কর। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন, 'হেসে—সেডা না জাইনাই কি চুরি কৈরা আনছি? রাজকুমারী, তুমি বরই চতুরা; কিন্তু আমার চৈক্ষে যদি ধুলাই দিতি পারবা তো তোমারে বিয়া করতি আইলাম কিয়ের লাইগা?'

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি—তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝবার পার নাই? আমি চন্দ্রানন মাণিক্য—হেসে—প্রাগ্জ্যোতিষের যুবরাজ। হ—সৈত্য কইলাম।'

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি মন্থর গমনে পৌণ্ড্রবর্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার স্খলিতবেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুবরাজের বাম স্কন্ধের উপর নত হইয়া পড়িতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ, কী সুন্দর তোমার ভাষা, যেন মধু ঝরে পড়ছে! কত দিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মণিবন্ধে একটি আনন্দ-গদ্গদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'হেসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা এক মাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু।'

৩ আষাঢ় ১৩৪৪

banglabooks.in

দন্তরুচি

প্রেমের জন্য পাগল হইয়া যাইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। ইতিহাসে একটিমাত্র পাকা নজির আছেঃ পারস্য দেশে মজনু লয়লার জন্য দেওয়ানা হইয়া গিয়াছিল। আমি আর একটি দৃষ্টান্ত জানি; তিনি বাংলাদেশের নীরদবাবু। বর্তমানে তিনি রাঁচি আছেন।

নীরদবাবুর বয়স কত হইয়াছিল আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত—বড় জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বেশ মজবুত দেহ, মাথায় টাক পড়ে নাই; বিপত্নীক হইবার পর হইতে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার দাঁতগুলি—

বিজ্ঞান ও ডাক্তারী শাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু দাঁতের কোনও ব্যায়াম আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কায়কল্পের তপস্বী বাবা মালবীয় মহাশয়ের দাঁতের কি ব্যবস্থা করিলেন জানিবার জন্য আমরা সকলেই উৎসুক আছি।

প্রেমের সহিত দাঁতের সম্বন্ধ নাই—কোনও কোনও লেখক এরূপ মনে করেন। প্রেম চিবাইয়া খাইবার বস্তু নয়, তাহা মানি। কিন্তু সাধারণতঃ প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে "দন্তরুচি-কৌমুদী যে অবহেলার বস্তু নয়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শকুন্তলার যদি একটিও দাঁত না থাকিত, অথবা রোমিও যদি সদ্যোজাত শিশুর মতো ফোগলা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেম কতদূর অগ্রসর হইত, তা বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু যাক্, বাজে কথার মোহে নীরদবাবুর নিকট হইতে আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি। শৈশবকালে নীরদবাবুর যাহারা নামকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে সম্ভবতঃ পরিহাসের অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু বর্তমানে তাঁহার জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু এই বলিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতেন যে, তাঁহার নামটি নিম্নোক্তভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। যথা—নিঃ + রদ :: নীরদ। কিন্তু ব্যাকরণ-ঘটিত রসিকতায় আমাদের রুচি নাই।

তাছাড়া, হোয়াট্'স্ ইন্ এ নেম!

নীরদবাবু হঠাৎ একটি পার্টিতে গিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলেন। যুবতীটি চঞ্চলা, রসিকা, কলহাস্যনিপুণা—প্রথম আলাপেই নীরদবাবুর সহিত অন্তরঙ্গের মতো চটুল রহস্যালাপ করিয়া হাস্যবিচ্ছুরিত দশনচ্ছটায় তাঁহার চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে, নীরদবাবুর বিপত্নীক হৃদয়কোটরে বহুকালরুদ্ধ বাষ্প বয়লারের মতো তাঁহাকে ফাটাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল।

কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল মুচকি মুচকি হাসিয়াছিলেন। এই আত্মনিগ্রহের ফলে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহা হইতে কেহ যেন না মনে করেন যে, নীরদবাবু অত্যন্ত লাজুক অথবা বাক্যবিন্যাসে অপটু; তাহা হইলে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। পরন্তু তিনি পরম উদ্যোগী পুরুষ, প্রথম দিনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে পুনরায় সপত্নীক হইবার বাসনা জাগরূক হইয়া উঠিয়াছিল।

নীরদবাবুর মনোহারিণী মহিলাটির নাম—সুদতি দেবী। সম্ভবতঃ নামটির কোনও মানে আছে, অভিধান দেখিলেই পাওয়া যাইবে। আজকাল অনেক মহিলারই নামের অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু, হোয়াট্'স্ ইন্ এ নেম!

উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া একদিন নীরদবাবু সুদতি দেবীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিবেশীগণ মুগ্ধবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার মুখে শুভ্রমধুর হাসি ফুটিয়াছে।

ক্রমে প্রণয় দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। সুদতি দেবীর গৃহে নীরদবাবুর যাতায়াত নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিল। যাতায়াতের কোনও বাধা নাই; কারণ শ্রীমতী সুদতি সম্পূর্ণ স্বাধীনা, কোনও একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের নৃত্য ও সংগীতের শিক্ষয়িত্রী। ছাত্রীদিগকে নিয়মিত নৃত্য শিক্ষা দিবার ফলে শ্রীমতীর যৌবন অতিশয় দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছিল; মুখ সর্বদাই হাস্যবিম্বিত। তাহা দেখিয়া নীরদবাবুর দন্তগুলিও সানন্দে বিকশিত হইয়া থাকিত। এইরূপে হাসিতে হাসি মেশামেশি হইয়া উভয়ের মনে রাসায়নিক মাদকতার উদ্ভব

banglabooks.in

হইতে লাগিল।

সত্যই প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর হাসিতে অদ্ভুত মাদকতা আছে। কিন্তু কোথা হইতে এই মাদকতা জন্মগ্রহণ করে—কেহ জানে না; হয়তো অশোকফুল্ল রক্তাধরে ইহার জন্ম, হয়তো কুন্দশুভ্র দন্তপংক্তিতে ইহার উদ্ভব! কে বলিতে পারে?

হাসিই তো প্রণয়ের প্রধান অভিব্যক্তি।

দুইজনের মনের কথা হাসির ইঙ্গিতে দুইজনের কাছে প্রকাশ পাইল—অর্থাৎ দুই-জনেই রাজী। দুইজনের প্রাণেই যৌবন-জলতরঙ্গ! কে রোধ করিবে? হরে মুরারে!

উভয়েই বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলা দরকার—নচেৎ বিবাহ হইবে কি করিয়া? শুধু হাসিলে আর যাহাই হোক বিবাহ হয় না। শেষে নীরদবাবুই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন মনস্থ করিলেন।

কিন্তু নীরদবাবুর প্রাণে যৌবনের সঙ্গে কাব্যের জলতরঙ্গও জোয়ারের বেগে প্রবেশ করিয়াছিল। গতানুগতিকভাবে ঘরের কোণে বিবাহের প্রস্তাব করা তাঁহার পছন্দ হইল না। তার চেয়ে মুক্ত আকাশের তলে, গঙ্গার তীরে, সন্ধ্যার সমাগমে পশ্চিম-দিগ্বধূ যখন সোনার স্বপ্ন দেখিবে, সেই সময় নির্জন বনপথে দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে—

নীরদবাবু স্থির করিলেন, আগামী রবিবারে তিনি শ্রীমতী সুদতিকে লইয়া মোটর-যোগে বটানিকাল-গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবেন।

নিজে মোটর চালাইয়া নীরদবাবু বটানিক্যাল-উদ্যানের অভিমুখে চলিয়াছেন; পাশে সুদতি দেবী নির্জন পথের উপর দিয়া হু হু করিয়া মোটর চলিয়াছে, বায়ুর সুবেগভরে সুদতি দেবীর অঞ্চল উড়িতেছে,—সোনালী অপরাহ্ণে উন্মথিত পথের ধূলি যেন আবীর হইয়া উঠিয়াছে।

নীরদবাবুর প্রাণে দুরন্ত আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি এক হাতে স্টিয়ারিং ধরিয়া সুদতির দিকে ফিরিলেন, গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'সুদতি, আমি বিপত্নীক।'

সুদতি সম্ভবতঃ পূর্বেই এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল মৃদুমধুর হাস্য করিলেন। সন্ধ্যালোকে তাঁহার দাঁতগুলি ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

নীরদবাবু কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নির্জলা সত্য কথা কখনও এরূপ ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ হয় না। তিনি নিজের অবিমৃষ্যকারিতা সংশোধন করিবার জন্য বলিলেন, 'কিন্তু আমার বয়েস—ইয়ে—পঁয়ত্রিশ বছর।'

সুদতি দেবী সলজ্জভাবে মুখটি নিচু করিয়া বলিলেন, 'আমার বয়েস—একুশ।'

চিত্রগুপ্ত যদি অন্তরীক্ষে থাকিয়া উক্ত কথাবার্তা শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে নিজের হিসাব-নিকাশ লইয়া বড়ই বিপদে পড়িতেন। কিন্তু নীরদবাবুর প্রাণ আর ধৈর্য মানিল না, তিনি স্টিয়ারিং-হুইল ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে সুদতির হাত চাপিয়া ধরিয়া আহ্লাদভরে বলিলেন, 'সুদতি, আমি তোমাকে—হি-হি-হি তোমার দাঁতগুলি ঠিক মুক্তোর মতো—মানে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

মোটরখানা বোধ হয় এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল, সে নিমেষের মধ্যে পথের ধারের একটা খানা উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিপূর্ণ একটি ডিগবাজি খাইয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল।

সুদতি ও নীরদবাবু ঘাসের উপর ছিটকাইয়া পড়িলেন। দৈবক্রমে দুইজনের দেহই অক্ষত রহিল বটে, কিন্তু আকস্মিক বিপর্যয়ে মাথা ঘুলাইয়া গেল। বহিঃচেতনা ফিরিবার সঙ্গে নীরদবাবু দেখিলেন—তিনি পা ছড়াইয়া ভূমিতলে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে দুই পাটি দাঁত! চমকিয়া নীরদবাবু দাঁতের পাটি নিজ মুখের মধ্যে পরিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুদতি দেবীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনিও ঘাসের উপর বসিয়া ছিলেন; নীরদবাবু দেখিলেন, সুদতি দেবীও তাড়াতাড়ি দুই পাটি দাঁত মুখের মধ্যে

banglabooks.in

পরিতেছেন।

কিন্তু এ কি হইল! নীরদবাবুর দাঁত তাঁহার মাড়িতে বসিতেছে না কেন? ওদিকে সদ্যদাঁত দেবীরও সেই অবস্থা। তবে কি—তবে কি—?

হাঁ, তাই বটে। দাঁত অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। মোটরের ঝাঁকানিতে উভয়েরই বাঁধানো দাঁত ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল...

হরে মুরারে!

অপরাহ্ণ ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম-দিগ্‌বধূ বোধ হয় সোনার স্বপ্নই দেখিতে-ছেন। নীরদবাবু দাঁতের পাটির দিকে তাকাইয়া হাবলার মতো দন্তহীন হাসি হাসিতেছেন।

নীরদবাবু যে পাগল হইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতিবেশীরা ক্রমশঃ জানিতে পারিল। একদিন তাহারা দেখিল, নীরদবাবু স্রেফ মাথায় হ্যাট ও পায়ে বুটজুতা পরিয়া খোলা ছাদে পায়চারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, 'ফোগলা! ফোগলা! হি-হি-হি'!'

শ্লীলতা রক্ষার খাতিরে পাড়ার বিবাহিত লোকেরা পুলিসে খবর দিল; তদবধি নীরদবাবু রাঁচিতে আছেন।

১২ ফাল্গুন ১৩৪৪

প্রেমিক

গল্পের শেষে একটি করিয়া মরাল বা হিতোপদেশ জুড়িয়া দিবার ফন্দিটা বোধ হয় বিষ্ণুশর্মা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে অবধি, লাগায়েৎ বর্তমান কাল, যিনিই গল্প লিখিয়াছেন, তিনিই এই ফন্দিটি কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; অর্থাৎ শুরু হইতে ক্রমাগত মুখ খারাপ করিয়া শেষের কয়েক ছত্রে দুই চারিটি তত্ত্বকথা ছাড়িয়া পিত্ত রক্ষা করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান কথাসাহিত্যের বৈদর্ভী রীতি।

মাতাল সারা রাত্রি মাতামাতি করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সারিয়া ঘরে ফিরিতেছে।

ইহার প্রতিকার আবশ্যক। যদি কিছু উপদেশ দিবার থাকে, গোড়াতেই সারিয়া লইতে হইবে। আরম্ভে নিম্বভক্ষণ সকল রসশাস্ত্রের বিধি হওয়া উচিত। অথ—

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কয়েক শতাব্দী পরে আবার বাংলাদেশে নূতন করিয়া

banglabooks.in

প্রেমের বান ডাকিয়াছে, কেহ কেহ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়। মাঠে, ঘাটে, ট্রামে, রিক্সায়, কলেজে, সিনেমায়, তরুণ-তরুণীরা অনবরত প্রেম করিতেছে। এত প্রেম কিন্তু ভাল নয়। সাধু সাবধান! কোনও বস্তুর অত্যধিক প্রাচুর্য ঘটিলে জ্ঞানী ব্যক্তির সন্দেহ হয়, ইহাতে ভেজাল আছে। বর্তমানে প্রেমের কারবারে কতখানি ভেজাল চলিতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বস্তুত, অহৈতুকী প্রীতি যে এই নশ্বর সংসারে অতীব দুর্লভ তাহা বহু মহাজন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মনের মানুষ মাত্র 'কোটিকে গুটিক' মিলে। বিদ্যাপতি ঠাকুর তো পরিষ্কার বলিয়াই দিয়াছেন যে, প্রাণ জুড়াইতে লাখের মধ্যে একটি মানুষও তিনি পান নাই। সুতরাং, আজকাল যে সব তরুণ তরুণী পথে ঘাটে এই দুর্লভ বস্তু কুড়াইয়া পাইতেছে, তাহাদের কি বলিব? ভ্রান্ত? মূঢ়? না—স্বার্থপর?

আধুনিকদের ভ্রান্ত বা মূঢ় বলিলে চটাচটি হইবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তাহাদের ভণ্ড, স্বার্থসর্বস্ব, মতলববাজ, কুচক্রী বলাই শ্রেয়।

শ্রীমান বিমানবিহারীর সহিত কুমারী অনিন্দ্যার প্রণয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। যেহেতু বিমান কুকুর ভালবাসিত, সেহেতু অনিন্দ্যার সহিত তাহার প্রেম ঘটিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেহ ভুল বুঝিবেন না। অনিন্দ্যা মানব-নন্দিনী। অনিন্দ্যার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটিই এই যোগাযোগের ঘটক।

আরম্ভে পাত্র-পাত্রীর কুল-পরিচয় দান করাই বিধি। কিন্তু বিমান ও অনিন্দ্যার কুলজি ঘাঁটিবার আমাদের সময় নাই। মনে করিয়া লওয়া যাক, বিমান স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় auto-fertilisation প্রক্রিয়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তাহার বাপ-পিতামহ কস্মিন্ কালেও ছিল না। অনিন্দ্যাও বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের কাহিনীর কোনও ক্ষতি হইবে না।

একদা শহরের নির্জন প্রান্তে নবরচিত এক পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে বিমান লক্ষ্য করিল, একটি বেঞ্চির উপর এক তরুণী বসিয়া আছে, তাহার পায়ের কাছে খরগোসের মত ছোট একটি কুকুর খেলা করিতেছে। বিমানের পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল; একদৃষ্টে কুকুরের পানে তাকাইয়া সে বেঞ্চির এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। কুকুরের গায়ে কুচকুচে কালো কোঁকড়া লোম, চোখ দুটি তরমুজ বিচির মত। মুগ্ধভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইতেই সে টুকটুকে রাঙা জিভ বাহির করিয়া তাহার হাত চাটিয়া লইল। বিমান আবেগরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'কি সুন্দর কুকুর! পিকেনীজ বুঝি?'—বলিয়া কুকুরের স্বত্বাধিকারিণীর দিকে চোখ তুলিল।

দেখিল, কুকুরের স্বত্বাধিকারিণী টুকটুকে রাঙা ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া মিশমিশে কালো চোখে কৌতুক ভরিয়া হাসিতেছে। তাহার কোঁকড়া ঝামর চুলগুলি দুলিয়া উঠিল; সে বলিল, 'না, সায়ামীজ।'

তরুণীর কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না, বিমান তীরবিদ্ধের মত চমকিয়া উঠিল, তারপর কুকুরের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'তাই হবে। আমার ভুল হয়েছিল।—নাম কি?'

তরুণীর গালদুটি মুচকি হাসিতে টোল খাইয়া গেল, 'কার নাম জিজ্ঞেস করছেন? আমার?'

বিমান লাল হইয়া উঠিল, 'না না—মানে—ওর একটা নাম আছে তো—তাই—'

তরুণী টিপিয়া টিপিয়া হাসিল, বলিল, 'ওর নাম রুমঝুম। আর আমার নাম—অনিন্দ্যা।'

বিমান অতিমাত্রায় উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'রুমঝুম? ভারি চমৎ—! অর্থাৎ কিনা অনিন্দ্যা। ভারি চমৎকার নাম তো—'

banglabooks.in

'কোন্ নামটা চমৎকার?'

বিমান ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িল, তাহার কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া রুমঝুমকে আদর করিতে করিতে তোতলার মত অর্ধবিভক্ত ভাষায় বলিল, 'অ্যাঁ—দ্ দ্ দ্—মানে দু-দুটো নামই চমৎকার—'

অনিন্দ্যা স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্ রুমঝুম, বাড়ি যাই।—নমস্কার।'

হিরণ্ময়ী শাললতার মত স্বল্পমা, স্ফুট-বিকশিত-যৌবনা অনিন্দ্যা চলিয়া গেল; রুমঝুম তাহার চারিপাশে একটি কালো প্রজাপতির মত নৃত্য করিতে করিতে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, বিমান বেঞ্চিতে বসিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

পরদিন—আবার সেই দৃশ্য। আবার সেই ধরনের কথাবার্তা। অনিন্দ্যার গাল মৃদু কৌতুকে টোল খাইয়া যায়, টুকটুকে ঠোঁট দুটি বিভক্ত হইয়া দাঁতগুলিকে ঈষৎ ব্যক্ত করে; বিমান ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠে—অপরিচিতা তরুণীর সহিত রসালাপ করা তাহার অভ্যাস নাই; রুমঝুম দু'জনকে ঘিরিয়া খেলা করে, বিমানের হাত চাটিয়া দেয়।

এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটিল। বিমান ও অনিন্দ্যার মধ্যে বেশ ভাব হইয়াছে—বিমান আর ততটা সংকোচ করে না। বরং একটা অপূর্ব মোহ দিবারাত্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিমান চরিত্রবান যুবা, কিন্তু তাহার ভয় হইতেছে চরিত্র বুঝি আর থাকে না। এদিকে অনিন্দ্যার মিশমিশে কালো চোখে কিসের রং ধরিয়াছে। সমস্ত দিনটা যেন সন্ধ্যার প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় পার্কে বেড়াইতে যাইবার পূর্বে প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজেকে দেখে, একখানা কাপড় ছাড়িয়া আর একখানা পরে, কানের দুল খুলিয়া ঝুমকা পরে, ঝুমকা খুলিয়া কানবালা পরে—

একদিন অনিন্দ্যা বলিল, 'আপনি তো প্রথম দিনই আমার নামটা জেনে নিলেন। নিজের নাম বলেন না কেন?'

রুমঝুমকে কোলে লইয়া বিমান বসিয়া ছিল, চমকিয়া বলিল, 'আমার নাম বি—বিভূতি মিত্র।'

'কলেজে পড়েন বুঝি?'

আবার চমকিয়া বিমান বলিল, 'হ্যাঁ,—পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—আজকাল রোজই বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। জনহীন পার্ক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। আকাশে চাঁদ নাই। অনিন্দ্যা বিমানের পাশে একটু ঘেঁষিয়া বসিল। হাঁটুতে হাঁটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া গেল।

দু'জনে কিছুক্ষণ নীরব। তারপর বিমান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

অনিন্দ্যা বলিল, 'নিশ্বাস ফেললেন যে?'

বিমান অবরুদ্ধ আবেগের প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভুল আবৃত্তি করিল—

'—যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই,
যাহা চাই তাহা পাই না।'

আবার কিছুক্ষণ নীরব। পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে—চাঁদ উঠিবে। অনিন্দ্যা অস্ফুট আধ-বিজড়িত স্বরে বলিল, 'আপনি কখনও ভালবেসেছেন?'

আকস্মিক উত্তেজনার ফলে মানুষের বাহ্য অভিব্যক্তি কখনও কখনও উৎকট আকার ধারণ করে। বিমান সহসা ঘুমন্ত রুমঝুমকে দু'হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রজ্বলিত চক্ষে অনিন্দ্যার পানে চাহিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'এ পৃথিবীতে টাকা না থাকলে কাম্য বস্তু লাভ করা যায় না। আমার টাকা নেই। কেন মিছে আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন?'—বলিয়া রুমঝুমকে অনিন্দ্যার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

রাত্রে ঘুমাইয়া বিমান স্বপ্ন দেখিল—কালো কোঁকড়া চুল, মিশমিশে দুটি চোখ, লাল টুকটুকে—

ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তপ্ত মস্তকে জল দিয়া সে আবার ঘুমাইল। আবার স্বপ্ন

banglabooks.in

দেখিল—

সকালে উঠিয়া বিমান উদ্‌ভ্রান্তের মত ভাবিল,—আর তো পারা যায় না। লোভ সংবরণ করা বড় কঠিন, চরিত্র তো রসাতলে গিয়াছেই—মনের অগোচর পাপ নাই—তবে আর বাহিরে সাধু সাজিয়া লাভ কি? যাহা হইবার হোক—আজই, হাঁ আজই সে এই কার্য করিবে। সন্ধ্যার পর পার্কে কেহ থাকে না—সেই সময়—

কামনার বিষে যখন অন্তর জর্জরিত, তখন অতিবড় সাধু ব্যক্তিরও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ঘৃত ও অগ্নির সান্নিধ্য অতি ভয়ংকর। কত সচ্চরিত্র যুবা—। কিন্তু যাক, শেষের দিকে আর হিতোপদেশ দিব না।

সন্ধ্যার পর আবার দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। অনিন্দ্যার চুলের সৌরভ বিমানের নাকে আসিতেছে। একরাশ নরম রেশমের মত রুমঝুম তাহার কোলে ঘুমাইতেছে।

পার্ক অন্ধকার, জনমানব নাই। অনিন্দ্যা কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল আমার কথার জবাব না দিয়ে চলে গেলেন যে?'

অন্ধকারে হাতে হাত ঠেকিল, বিমান তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'জবাব কি বুঝতে পারোনি?'

'না, বলুন না শুনি।' বিমানের তপ্ত মুঠির মধ্যে অনিন্দ্যার হাতখানি যেন মাখনের মত গলিয়া গেল।

'অনিন্দ্যা, তোমাকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে?'

'হয়তো পারি, শুনিই না আগে।'

'তবে তুমি একটু বসো। আমি এখনই আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'রুমঝুমের বোধ হয় তেষ্টা পেয়েছে, ওকে একটু জল খাইয়ে আনি।'

বিমান চলিয়া গেল। তারপর পনেরো মিনিট—আধ ঘণ্টা—একটি কম্প্রবক্ষা তরুণী অন্ধকার পার্কে একাকিনী প্রতীক্ষা করিতেছে! কোথায় গেল বিমান?

বিমান তখন শহরের অন্য প্রান্তে নিজের ঘরে বিছানার উপর শুইয়া রুমঝুমকে চটকাইতেছে, 'রুমঝুম, তোকে আমি চুরি করে এনেছি! তোর মন কেমন করবে না? ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না? আর কখনও আমরা পার্কের ত্রিসীমানায় যাব না। কি বলিস? অনিন্দ্যা নিশ্চয় খুব রাগ করবে;—কিন্তু তোকে ছেড়ে যে আমি এক দণ্ডও থাকতে পারছিলুম না।'

১৮ চৈত্র ১৩৪৪

banglabooks.in

স্বর্গের বিচার

আমি স্বর্গে গিয়াছিলাম।

বন্ধুগণ শুনিয়া হয়তো অবিশ্বাসের অট্টহাস্য করিতেছেন; ভাবিতেছেন তাঁহাদের ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নন, তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমি যে ধার্মিক এবং সত্যনিষ্ঠ লোক, এ কথা সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম, আমার নানাবিধ পুণ্যকার্যের সংবাদ পাইয়া বুঝি দেবরাজ স্থায়ীভাবে আমার স্বর্গে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু দেখিলাম, তাহা নয়, সাক্ষী দিবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। বিচারসভায় হাজিরা দিতে হইবে।

মেঘলোক ভেদ করিয়া বৈদ্যুতিক পুষ্পকরথ স্বর্গের এলাকায় পৌঁছিলে অমরাবতীর বিস্তৃত দৃশ্যটা এক নজরে দেখিয়া লইলাম। এদিকে মন্দাকিনীর ঘাটে বস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিয়া কয়েকটি অপ্সরা জলকেলি করিতেছে, কয়েকজন রসিক দেবতা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। ওদিকে চন্দ্রদেব নন্দন-কাননে পারিজাত-বৃক্ষের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া গত রাত্রির খোঁয়াড়ি ভাঙিতেছেন, পাশে সুধা-ভৃঙ্গার পড়িয়া আছে। দুই জন তকমাপরা দেবদূত তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছে, কিন্তু তিনি নড়িতেছেন না, কেশহীন সুচিক্কণ মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে কেবলই ফিক্ ফিক্ হাসিতেছেন।

এই সব মনোরম দৃশ্য অতিক্রম করিয়া পুষ্পকরথ বিচারগৃহের সিংহদ্বারে উপনীত হইল। একটি স্বর্গীয় বটবৃক্ষতলে বহু আসামী-ফরিয়াদী-সাক্ষী-পেয়াদা জমা হইয়াছে। একটা ষণ্ডা গোছের যমদূত আমাকে খপ করিয়া ধরিয়া বিচারমণ্ডপে হাজির করিল এবং মুহূর্ত মধ্যে হলফ পড়াইয়া কাঠগড়ায় তুলিয়া দিয়া আবার অন্তর্হিত হইল।

দেখিলাম, সম্মুখেই উচ্চ আসনে দণ্ডধারী যমরাজ বসিয়া আছেন; তাহার নিম্নে পেশকার চিত্রগুপ্ত এক রাশ নথিপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

তারপর অদূরে অপর একটি কাঠগড়ায় আসামীর উপর নজর পড়িল। আরে, এ যে হতভাগা ক্যাবলা! তিন দিন আগে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

ক্যাবলাকে আমি বাল্যাবধি চিনি, তাহার জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই আমার অজানা নাই। সে যে কত বড় নরাধম, তাহা বোধ হয় যমরাজ স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাই আমাকে তলব হইয়াছে। ক্যাবলা রৌরব নরকে যাইবার যোগ্য, অথবা কেবলমাত্র কুম্ভীপাক পর্যন্ত গিয়াই নিষ্কৃতি পাইতে পারে, ইহাই সম্ভবতঃ বিচার্য বিষয়।

যমরাজ প্রচণ্ড স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ক্যাবলাকে চেন?'

করজোড়ে কহিলাম, 'চিনি, ধর্মাবতার।'

হংসপুচ্ছ তুলিয়া লইয়া যমরাজ বলিলেন, 'ভালো, তার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করো।'

বলিলাম, 'কি আর বর্ণনা করব, হুজুর, ছোঁড়া ছেলেবেলা থেকেই অধঃপাতে গিয়েছিল। তেরো বছর বয়সে তাড়ি খেতে শেখে...'

'তারপর?'—ধর্মরাজ জবানবন্দী লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

'ইস্কুলে ক্যাবলার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তুম, হুজুর। ক্যাবলার মতো পাজি বজ্জাত ছেলে ইস্কুলে আর একটিও ছিল না। লেখাপড়া একদম করত না, স্রেফ শয়তানি করে বেড়াত। গাঁয়ের জমিদারবাবুর ওপর তার ভীষণ আক্রোশ ছিল। তাঁর পোষা হাঁসের ডিম চুরি করে এনে পুকুর পাড়ে সেদ্ধ করে খেত; তাঁর পুকুর থেকে মাছ চুরি করে ভিন গাঁয়ে বিক্রি করে আসত। আমরা মানা করলে বলত, 'জমিদার তো চোর, তার ওপর বাটপাড়ি করলে দোষ নেই।' একদিন জমিদারের তালগাছ থেকে ভাঁড় নামিয়ে একাই ভাঁড় সাবাড় করে দিলে। তারপর টলতে টলতে ইস্কুলে এসে হাজির হল। ক্লাসে পণ্ডিত মশাই তখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন, ক্যাবলা ঘরে ঢুকেই তাঁর মাথায় বমি করে দিলে।'

দেখিলাম, যমরাজের ভয়ংকর গোঁফজোড়া হঠাৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূ-যুগল

banglabooks.in

কপালের উপর নাগ-নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে। যমরাজ ক্যাবলার উপর কুপিত হইয়াছেন, অথবা হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি মুখখানাকে বিকট রকম কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'তারপর? সংক্ষেপে বলো।'

'সংক্ষেপেই বলছি, ধর্মাবতার। ক্যাবলাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আমরা গাঁয়ের ভালো ছেলেরা তার সঙ্গে কথা কওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলুম; সে দুলে-ক্যাওরার ছেলেদের সঙ্গে দিনরাত বদ্‌মায়েসি করে বেড়াতে লাগল।

'যতই তার বয়েস বাড়তে লাগল, ততই সে বিগড়ে যেতে লাগল। তার চরিত্র একদম খারাপ হয়ে গেল, হুজুর। দুলে-পাড়ার একটি বিধবা স্ত্রীলোককে জমিদারবাবু অনুগ্রহ করতেন, ক্যাবলার নজর পড়ল তার ওপর। জমিদারবাবুর ওপর ক্যাবলার বরাবরই রাগ, সে একদিন দুলে মেয়েটাকে নিয়ে লোপাট হয়ে গেল।

'ছ'মাস পরে ক্যাবলা ফিরে এলো। শোনা গেল, মেয়েটা নাকি ক্রিশ্চান হয়ে গেছে। ক্যাবলা যেন ভারী সৎকাজ করেছে, এমনই ভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল।'

এইবার ক্যাবলা হঠাৎ কথা কহিল, বলিল, 'হুজুর, ক্ষেন্তিকে আমি নিজের বোনের মতো ভালবাসতুম। জমিদার শালা তাকে...'

'চোপ রও!'—ধর্মরাজ কটমট করিয়া তাকাইলেন, তারপর আমাকে বলিলেন, 'বলে যাও!'

আমি বলিতে লাগিলাম, 'ক্যাবলার এক খুড়ো ছিলেন, তিনি তাকে ঘরবাসী করবার জন্যে তার বিয়ে দিলেন। বউটির বয়স বছর এগারো, কিন্তু পেটে প্রকাণ্ড পিলে, হুজুর। এই পিলে-সুদ্ধু মেয়েটাকে নিয়ে ক্যাবলা একেবারে মেতে উঠল। সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু এই সময়টাতে ক্যাবলা নাকি তাড়ি গাঁজাও ছেড়ে দিয়েছিল।

'বছরখানেক এইভাবে কাটাবার পর ক্যাবলা একদিন বউকে খুড়োর কাছে রেখে বিদেশ গেল। শুনলুম, টাকা রোজগার করতে কলকাতায় গেছে।

'তারপর তিন বছর আর তার দেখা নেই। কলকাতায় সে কি করছিল, তা আপনারাই ভালো জানেন, ধর্মাবতার। শুনতুম সে ক্ষেন্তির বাড়িতে থেকে থিয়েটার করত। বাড়িতে একটি পয়সা পাঠাত না; ন-মাসে ছ-মাসে একটা চিঠি দিত—এই পর্যন্ত।

'ক্যাবলার পৈতৃক দু-এক বিঘে জমি ছিল, তাও খাজনার দায়ে নিলেম হয়ে গেল। ঘরের সম্পত্তি পরের হাতে যাবে, তাই খুড়োমশাই সেটা কিনে নিলেন। কিন্তু ক্যাবলার বউকে খাওয়াবে কে? খুড়ো হাজার হোক্ জ্ঞাতি, ভাইপো-বউকে তো চিরকাল পুষতে পারেন না? যতদিন ক্যাবলার জমি ছিল, ততদিন তাকে খোরপোষ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন?

'আমরা গাঁয়ের পাঁচজন হয়তো ক্যাবলার বউকে দু-মুঠো খেতে দিতে পারতুম। কিন্তু পরের সোমত্ত বউকে খেতে দিয়ে কে নিন্দে কুড়ুবে, হুজুর? সকলকেই তো স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ঘর করতে হয়।

'ক্যাবলার বউ-এর যখন ভীষণ দুরবস্থা, তখন জমিদারবাবু কৃপা করলেন। শিবতুল্য লোক যদি কেউ থাকে তো সে আমাদের জমিদারবাবু। এক কথায় ক্যাবলার বউ-এর সমস্ত ভার তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। বেশী কি বলব, হুজুর, তিনি তাকে গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে দিলেন। দিনের বেলা পাছে কেউ কিছু মনে করে, তাই রাত্তিরে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন। খুড়োমশাই অবশ্য সবই জানতেন, কিন্তু তিনি ধর্মভীরু লোক—কাউকে একটি কথা বলেননি।

'এইভাবে চলতে লাগল। পাড়াগাঁয়ে কোনও কথাই চাপা থাকে না, কিন্তু তাই বলে পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতেও কেউ ভালোবাসে না। বিশেষতঃ, জমিদারবাবু মানী লোক; তাই সব দিক বিবেচনা করে আমরা চুপচাপ রইলুম।

'তারপর হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে ক্যাবলা ফিরে এলো। কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না; গাঁয়েরই কোনও লোক বোধ হয় বেনামী চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়েছিল।'

banglabooks.in

ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে জানিয়েছিল?'

'তা তো মনে পড়ছে না, হুজুর।'

'চিত্রগুপ্ত, খাতা দেখ।'

খাতা দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিল, 'ইনিই বেনামী চিঠি দিয়েছিলেন। এই যে হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট রয়েছে।'

আমি বলিলাম, 'তা—বোধ হয়—হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলুম, হুজুর, ভালোর জন্যেই...'

'হুঁ। তারপর বলো।'

"তারপর বলতে আমারই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ধর্মাবতার। ক্যাবলা ঘরে ঢুকে একবার আপাদমস্তক তার বৌয়ের পানে তাকালে, তারপর জমিদারের দেওয়া সোনার চন্দ্রহার তার কোমর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বউকে একটি কথাও বললে না।

'ঘুটঘুটে রাত্তির, হুজুর। ক্যাবলা সটান জমিদারবাবুর পাঁচিল ডিঙিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকল। তারপর যা হল তা সবাই জানে। সকালবেলা দেখা গেল, জমিদারবাবু গলায় চন্দ্রহার জড়িয়ে পড়ে আছেন। পৈশাচিক কাণ্ড, ধর্মাবতার। ক্যাবলা তাঁরই চন্দ্রহার তাঁর গলায় জড়িয়ে তাঁকে খুন করেছে।'

কিছুক্ষণ বিচারসভা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধর্মরাজ একবার সজোরে গলা খাঁকারি দিলেন।

'তোমার আর কিছু বলার আছে?'

'আর কি বলব, হুজুর? আদালতে ক্যাবলার বিচার হল। আমরা সবাই সাক্ষী দিলুম। ক্যাবলা কিন্তু একনাগাড়ে মিথ্যে কথা বলে চলল। বললে, তার স্ত্রী একেবারে সতীসাধ্বী, জমিদার তার জমি নিলেম করিয়ে নিয়েছিল বলেই সে তাকে খুন করেছে। আমরা যতই বলি বউয়ের পেটে ছেলে এলো কোত্থেকে, সে ততই বলে ছেলে নয় পিলে। এতবড় পাষণ্ড ক্যাবলাটা, ফাঁসি-কাঠে ঝুলে পড়ল, তবু সত্যি কথা মানলে না।

'হুজুর, ক্যাবলার যদি ধর্মজ্ঞান থাকত তাহলে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করত, এমন তো কতই হচ্ছে। নরহত্যা করবার কি দরকার ছিল? কিন্তু আগেই বলেছি, জমিদারবাবুর ওপর তার ছেলেবেলা থেকে রাগ ছিল...'

ধর্মরাজ হঠাৎ গর্জন ছাড়িলেন, 'আসামী খালাস!'

আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

'প্রভু! ধর্মাবতার! একি বলছেন? ক্যাবলা যদি মুক্তি পায়, সমাজ টিকবে কি করে?'

ধর্মরাজ তাঁহার জ্বলন্ত চক্ষু আমার দিকে ফিরাইলেন। বাঘের মতো চাপা গর্জনে বলিলেন, 'আর তুমি—তুমি—'

ধর্মরাজের চক্ষু হইতে অসহ্য আলোর রক্তশিখা বাহির হইয়া আমার চক্ষুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; মনে হইল, আগুনের দুইটা শূল আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, সকালবেলার এক ঝলক রাঙা রৌদ্র জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া আমার চোখে পড়িয়াছে।

৫ বৈশাখ ১৩৪৫

banglabooks.in

অযাত্রা

রামবাবু আপিস যাইবার জন্য বাড়ি হইতে বহির্গত হইতেছেন। বেলা আন্দাজ ন'টা।

'দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা—'

দ্রুত মৃদুকণ্ঠে দুর্গানাম আবৃত্তি করিতে করিতে রামবাবু চৌকাঠ পার হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাদরের খুঁটে টান পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন দরজার হুড়কায় চাদর আটকাইয়া গিয়াছে।

বিমর্ষভাবে রামবাবু ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিলেন। গৃহিণী বলিলেন, 'বাধা পড়ল তো?'

'হুঁ'—মন খারাপ করিয়া রামবাবু দেয়ালে লম্বিত মা কালীর পটের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রত্যহই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার আপিস যাওয়া একটা পর্ব বলিলেই হয়। ঠিক যে সময়টিতে তিনি চৌকাঠ পার হইবেন সে সময়ে বাড়ির ভিতর কাহারও কথা কহিবার হুকুম নাই—কথা কহিলেই উহা পিছু ডাকা হইয়া পড়িবে। কলিকাতা শহর যখন শত উপায়ে অসহায় রামবাবুর প্রাণবধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে এবং আপিসের বড় সাহেব যখন প্রতি সপ্তাহে কেরানি কমাইতেছে—এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য 'পিছু-ডাক' শুনিয়াও যে নাস্তিক ঘরের বাহির হইতে পারে তাহার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—একথা কে অস্বীকার করিবে?

রামবাবু কালীমূর্তির উপর হইতে চক্ষু সরাইয়া ঘড়ির উপর স্থাপন করিলেন। সওয়া ন'টা। আপিসে পৌঁছিতে মোটামুটি পঁচিশ মিনিট সময় লাগে, সুতরাং চৌকাঠ যদি নির্বিঘ্নে পার হওয়া যায় তাহা হইলে দশটার মধ্যে আপিসে পৌঁছিবার কোনই বাধা নাই।

'কালী কালী কালী কালী কালী—'

বিঘ্নকারী কোনও উপদেবতাকে ফাঁকি দিবার জন্যই যেন রামবাবু সুড়ুৎ করিয়া দ্বার লঙ্ঘন করিয়া গেলেন। কিন্তু ফুটপাথে নামিয়াই তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। একটি গেঞ্জি-পরা লোক—বোধ হয় কোনও মেসের ম্যানেজার—তরি-তরকারি কিনিয়া হন্ হন্ করিয়া যাইতেছিল, তাহার সহিত রামবাবুর চোখাচোখি হইয়া গেল।

ক্ষণকাল তিনি স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি ততক্ষণ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, তিনি চমকিয়া ডাকিলেন, 'ওহে, শোনো।'

লোকটা ক্রুদ্ধভাবে ফিরিল, দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, 'কী চাই?'

রামবাবু তাহার দিকে এক-পা অগ্রসর হইয়া গেলেন; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার গণ্ডের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি দাড়ি কামিয়েছ—না মাকুন্দ?'

'তোর তাতে কিরে শালা?'—অগ্নিশর্মা ম্যানেজার আর একবার দাঁত খিঁচাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

খনার বচন অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। খনা বলিয়াছেন—

'যদি দেখ মাকুন্দ চোপা
এক পা'ও যেও না বাপা।'

ঐ গেঞ্জি-পরা লোকটার মসৃণ গণ্ডস্থল দেখিয়া রামবাবুর সন্দেহ হইয়াছিল যে সে মাকুন্দ। তা—মাকুন্দ হোক্ বা না হোক্, ইহার পর যাত্রা না বদলাইয়া আপিস যাওয়া চলে না। রামবাবু ফিরিলেন। গৃহিণী মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, 'আবার বাধা পড়ল?'

রামবাবু উত্তর দিলেন না, ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে একবার মা কালীর পটের দিকে তাকাই-লেন। মা কালী পূর্ববৎ জিভ বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কন্যা পুঁটুকে রামবাবু বলিলেন, 'এক গেলাস জল দাও তো, মা।'

জল পানে যাত্রা বদল হয়। গেলাস নিঃশেষ করিয়া রামবাবু আবার দেয়ালের দিকে তাকাইলেন। মা কালীর পাশে একটি মহাদেবের ছবি টাঙানো ছিল, তদ্গত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

banglabooks.in

ইদানীং বাধাবিঘ্নের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রথম বার যাত্রা করিয়া আপিসে পৌঁছানো রামবাবুর আর ঘটিয়া উঠে না। তিনি তাই বেলা নয়টা হইতে পাঁয়তাড়া ভাঁজিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তবু দেরি হইয়া যায়। ইতিপূর্বে কয়েকবার সাহেবের ধমক খাইয়াছেন। কিন্তু দৈব যেখানে পদে পদে বাধা দিতেছে সেখানে বিলম্ব না হইয়া উপায় কি?

সাহেবের কথা মনে পড়িতেই রামবাবুর সমাধি ভাঙিয়া গেল; তিনি আড়চক্ষে ঘড়ির পানে চাহিলেন। সাড়ে ন'টা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। কোনও মতে নির্বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিতে পারিলে এখনও যথা সময়ে আপিস পৌঁছানো যাইতে পারে।

'শিব শিব শিব শিব শিব—'

বলা যায় না, আবার মাকুন্দ দেখিয়া ফেলিতে পারেন; তাই রামবাবু চক্ষু বুজিয়া সবেগে দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন।

তারপরই—তুমুল ব্যাপার!

একটি অতিক্রান্তযৌবনা স্থূলাঙ্গী ঝি'র সহিত রামবাবুর সংঘর্ষ হইয়া গেল। হুলুস্থূলে কাণ্ড! রামবাবু, ঝি, আলু, পটল, হাঁসের ডিম ফুটপাথে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল; ক্ষণেক পরে ঝি উঠিয়া কোমরে হাত দিয়া তারস্বরে যে ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল তাহাতে রামবাবু দ্রুত উঠিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সশব্দে হুড়কা লাগাইয়া দিলেন।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপ করিতে করিতে রামবাবু যখন আপিসে পৌঁছিলেন তখন বেলা পৌনে এগারোটা। পৌঁছিয়াই শুনিলেন বড় সাহেব তলব করিয়াছেন।

অষ্টমীর পাঁঠার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে রামবাবু সাহেবের ঘরে গেলেন। সাহেব সংক্ষেপে বলিলেন, 'বার বার তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছি, তবু তুমি সময়ে আসিতে পার না। তোমার আর আসিবার প্রয়োজন নাই।'

রক্ষাকবচের ভারে ডুবিয়া মরার মতো বিড়ম্বনা আর নাই। রামবাবু হোঁচট খাইতে খাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ যে এই রকম একটা কিছু ঘটিবে তাহা তিনি জানিতেন। পিছুটান, মাকুন্দ, কলিশন—এতগুলা দুর্দৈব কখনও ব্যর্থ হয়! তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর চোখ দুটি আকাশের পানে তুলিলেন।

একটা নূতন বাড়ি তৈয়ার হইতেছিল—লম্বা বাঁশের আগায় একটা ভাঙা ঝুড়ি ও ঝাঁটা বাঁধা ছিল, তাহাই রামবাবুর চোখে পড়িল।

তাঁহার মনে হইল অদৃষ্ট অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে ঝাঁটা দেখাইতেছে।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

banglabooks.in

কুতুব-শীর্ষে

দুইজনে লুকাইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম যে সন্ধ্যার সময় কুতুব মিনারের ডগায় উঠিয়া নিরালায় দেখা-সাক্ষাৎ করিব। প্রণয়ী-যুগলের নিভৃত মিলনের পক্ষে এমন উচ্চস্থান আর কোথায় আছে? এখান হইতে নীচের দিকে তাকাইলে মানুষগুলাকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর দেখায়।

তা ছাড়া, অন্য একটা কারণও ছিল। কুমারী বিন্ধ্যেশ্বরীর অর্থাৎ আমার বিন্দুর পিতা মহামহোপাধ্যায় জটাধর শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পছন্দ করিতেন না। বিন্দুর সহিত বিন্দুর পূজ্যপাদ পিতার এই মতভেদের কারণ—আমি নাকি পরিপূর্ণভাবে সাহেব বনিয়া গিয়াছি; মনুষ্যত্ব এবং আরও কয়েকটা ত্বত্ত্ব আমার একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তাই আমাকে বিন্দুর সান্নিধ্যে দেখিলেই মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের শুঁয়াপোকার মত ভ্রূযুগল কপালের উপর কিলবিল করিয়া উঠিত। এবং তিনি গলার মধ্যে অস্ফুটস্বরে যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করিতেন তাহা দেবভাষা হইলেও সম্পূর্ণ প্রসাদ-গুণবর্জিত বলিয়াই আমার সন্দেহ হইত। শাস্ত্রী মহাশয় গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং জবরদস্ত লোক—সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড কলেজের প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর লইয়া একান্তমনে কেবল কন্যাকে আগলাইতেছেন।

বিন্দুর বয়স আঠারো বৎসর; গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রী মহাশয় ইহা কিরূপে সহ্য করিতে-ছেন, প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার সহজ উত্তর আছে—ফলিত জ্যোতিষ মতে উনিশ বছর বয়সে বিন্দুর একটি প্রচণ্ড ফাঁড়া আছে, সেই ফাঁড়া উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জটাধর শাস্ত্রী কন্যার বিবাহ দিবেন না। তিনি কেবল তাহাকে হবিষ্য আহার করাইয়া বেদান্ত পড়াইতেছেন।

গতিক বুঝিয়া আমরা লুকাইয়া দেখাশুনা আরম্ভ করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা এতই ক্ষণস্থায়ী যে তৃপ্তি হইত না। শেষে বিন্দুই এই মতলবটি বাহির করিয়াছিল। হবিষ্যান্ন ও বেদান্তের দ্বারা বুদ্ধি সম্ভবত মার্জিত হয়; কুতুব মিনারের শীর্ষে দেখা করিবার চাতুরী তাহার মস্তিষ্কেই উৎপন্ন হয়। ইহার পরম সুবিধা এই যে, জটাধর শাস্ত্রী কন্যাকে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণ উপলক্ষে কুতুব মিনারের মূল পর্যন্ত পৌঁছিবেন; কিন্তু তিনি বিপুলকায় ও বৃদ্ধ—কুতুব মিনারের ডগায় ওঠা তাঁহার কর্ম নয়; কন্যাটি তন্বী ও নবযৌবনা—সে পিতাকে নীচে ফেলিয়া ক্রীড়াচ্ছলে হাসিতে হাসিতে চক্রায়িত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইবে। আর আমি পূর্ব হইতেই উপরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব—

কৌশলটা বুঝিতে পারিয়াছেন?

কিন্তু এ কৌশলটাই এই কাহিনীর চরম প্রতিপাদ্য নয়—মুখবন্ধ মাত্র। কুতুব-শীর্ষে যাহা ঘটিয়াছিল (রোমাঞ্চকর কিছু নয়; পাঠক-পাঠিকা অযথা উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন না) তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য ঘটনার অকুস্থল যে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠস্থিত স্বনামখ্যাত স্তম্ভ তাহা বোধ করি এতক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যথাকালে দুই পকেটে নানাবিধ বিজাতীয় মিষ্টান্ন ভরিয়া লইয়া কুতুব-শীর্ষে আরোহণ করিলাম। একটু আগে ভাগে আসাই সমীচীন; ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের সহিত মুখোমুখি দেখা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

উপরে উঠিয়া কিন্তু দেখিলাম, আমারও আগে আর একজন এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে! অপরিচিত একজন ছোকরা সাহেব। আমাকে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ছোকরা আমারই সমবয়স্ক হইবে। সাধারণত ইংরেজদের চেহারা যেমন হয়—নাম মুখ ভাল নয়, অথচ বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ। অন্য সময় হইলে অবিলম্বে তাহার সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিতাম; কিন্তু এ সময়ে তাহাকে দেখিয়া মনটা খিঁচড়াইয়া গেল। তুমি বাপু কিজন্য এখানে আসিয়া উঠিলে? ভারতবাসীর সুখে বিঘ্ন করা ছাড়া আর কি তোমাদের অন্য কাজ নাই?

আকাশের মাঝখানে গোলাকৃতি চত্বর, কোমর পর্যন্ত পাঁচিল দিয়া ঘেরা—যেন প্রণয়-

banglabooks.in

পাখীর নিভৃত একটি নীড়। এখানে ঐ বস্তুতান্ত্রিক ইংরেজ পাষণ্ড কী করিতেছে? বিন্দুর জন্য যে চকোলেট আনিয়াছিলাম, বিমর্ষভাবে তাহাই কয়েকটা খাইয়া ফেলিলাম। লোকটা চলিয়াও তো যায় না! একটু বুদ্ধি থাকিলে আমার অবস্থা বুঝিয়া নিজেই ভদ্রভাবে নামিয়া যাইত। কিন্তু কেবল ষাঁড়ের ডালনা খাইলে বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে?

লক্ষ্য করিলাম, সে ঘাড় ফিরাইয়া মাঝে মাঝে দেখিতেছে আমি চলিয়া গিয়াছি কি না। বোধ হয় কালা আদমি কাছে থাকার জন্য সাহেবের কষ্ট হইতেছে। উঃ! এই পাপেই তো আর্যাবর্ত ইহাদের হাত হইতে যাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু আমি যে রাগ করিয়া নামিয়া যাইব তাহারও উপায় নাই—বিন্দু আসিবে। নীচে—স্তম্ভের কটি বেষ্টন করিয়া আরও কয়েকটি রেলিং-ঘেরা ব্যাল্‌কনি আছে বটে, কিন্তু সেখানে বিন্দুর সহিত একত্র দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বড় বেশী। শাস্ত্রী মহাশয় চক্ষুতে নিয়মিত সর্ষপ তৈল প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনাবশ্যক বজায় রাখিয়াছেন।

সিঁড়ির উপর দ্রুত লঘু পায়ের শব্দ! পরক্ষণেই বিন্দুর কৌতুক-হাসি-ভরা মুখ। তারপরই বিন্দুর হাসি মিলাইয়া গেল। সে থমকিয়া সাহেবের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'এ আবার কে?'

বলিলাম, 'একটা নৃশংস ইংরেজ। ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে সটান রেলিং ডিঙিয়ে ওকে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

বিষণ্ণভাবে বিন্দু আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে শূন্যের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছি। পকেট হইতে সমস্ত টফী, চকোলেট ও ক্যারামেল্ বাহির করিয়া বিন্দুকে দিলাম। তাহার মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু ম্রিয়মাণ হাসি। ক্ষুব্ধ মুখে সে টফী চিবাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'আজকের দিনটাই বৃথা গেল।'

বিন্দু বলিল, 'বাবাকে এদিকে আনতে যে কত কষ্ট পেতে হয়েছে!—'

বুঝিতে পারিলাম, পিতৃদেবতাকে কুতুব মিনারের সন্নিকটে আসিতে রাজী করা বিন্দুর পক্ষে সহজ হয় নাই। এত আয়োজন, এত কৌশল—সব ব্যর্থ! আমি কট্‌মট্ করিয়া সাহেবের দিকে তাকাইলাম।

এই সময় সাহেব একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আমাদের দিকে চাহিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। বিন্দু এতক্ষণ তাহার মুখ দেখে নাই, এখন ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, 'লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি। মনে পড়েছে—এই ছোঁড়াই ফ্যানির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ফ্যানি কে?'

'আমাদের বাগানের পাঁচিলের ওপারে একজন ফৌজী সাহেব থাকে দেখনি? ফ্যানি তারই মেয়ে। এর সঙ্গে তার—'

'তা এখানে কেন? ফ্যানির কাছে গেলেই তো পারে।'

ফ্যানির কাছে কেন যাইতেছে না এই সমস্যা লইয়া কিছুক্ষণ তিক্ত মনে গবেষণা করিলাম। —ফ্যানি সম্ভবত উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ঠিকই করিয়াছে—

বিন্দু নীচের দিকে একবার উঁকি মারিয়া হতাশ স্বরে বলিল, 'বাবা ওপর দিকে চেয়ে আছেন; এবার নেমে যেতে হবে, নয়তো সন্দেহ করবেন—'

বিন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'বিন্দু—'

'আঃ—ও কি করছ! এখনি দেখতে পাবে লোকটা।'

মরীয়া হইয়া বলিলাম, 'দেখুক গে। কোথাকার একটা বে-আক্কেলে সাহেব রয়েছে বলে আমরা প্রাণ খুলে কথা কইতে পাব না! রইল তো বয়েই গেল। আমাদের কথা তো আর বুঝতে পারবে না।'

'না না—আজ না—সব মাটি হয়ে গেল! আমি যাই।' বিন্দু ছলছলে চোখে তাহার আশাহত হৃদয়টিকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

'মুখপোড়া ড্যাক্‌রা!'—সাহেবটার দিকে বারি-বিদ্যুৎ-ভরা একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া

banglabooks.in

বিন্দু নামিয়া গেল। আমি বজ্রগর্ভ অন্তর লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ক্রমে দেখিতে পাইলাম, বহুদূরে নিম্নে বিন্দু ও তাহার পিতাকে লইয়া মোটর চলিয়া গেল। তখন আমিও শেষবার সাহেবকে রোষকটাক্ষে ভস্মীভূত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নামিবার উপক্রম করিলাম। সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত গিয়াছি—

'মশায়, শুনুন—'

পশ্চাতে শূলবিদ্ধবৎ ফিরিলাম।

সাহেব হাতজোড় করিয়া সলজ্জ স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরিষ্কার বাংলায় বলিল, 'আমায় মাপ করতে হবে।'

কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া বলিলাম, 'কি ভয়ানক! অর্থাৎ—আপনি বাংলা বলছেন যে! মানে—তবে কি আপনি ইংরেজ নয়?' বিন্দুর সহিত সায়েব সম্বন্ধে কি কি কথা হইয়াছিল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

সাহেব বলিল, 'ইংরেজ বটে, কিন্তু বাংলা জানি। পাঁচ বছর বয়স থেকে শান্তিনিকেতনে পড়েছি।...কিন্তু সে যাক। আপনারা নিশ্চয় ভেবেছেন আমি একটা অসভ্য বর্বর, কিন্তু মাইরি বলছি—আমার চলে যাবার উপায় ছিল না।' বলিয়া সাহেব সলজ্জে মাথা নীচু করিল।

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'ব্যাপার কি?'

'আমিও—' সাহেব হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল,—'আপনার উনি—অর্থাৎ যে মহিলাটি এসেছিলেন তিনি ঠিক ধরেছেন—ফ্যানির সঙ্গে আমার—'

'এইখানে দেখা করবার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ।—আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি ফ্যানি বেদান্ত এবং হবিষ্যান্নের ভক্ত কি না। কিন্তু বলিলাম, 'আপনাদের এত দূরে আসার কি দরকার? বাড়িতেই তো—'

ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িয়া সাহেব বলিল, 'আপনি ফ্যানির বাবাকে জানেন না—একটি আস্ত কাট-গোঁয়ার। একেবারে পাকা সাহেব। তাঁর বিশ্বাস আমি একেবারে নেটিভ্ হিন্দু হয়ে গেছি, ফ্যানিকে আমার সঙ্গে মিশতে দিতে চান না। তাই আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে—'

মহানন্দে সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'বন্ধু, এসো শেক্‌হ্যান্ড করি। আর যদি দেশী মতে কোলাকুলি করতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই।'

কোলাকুলি শেষ হইলে সাহেব বলিল, 'কেন যে ফ্যানি এলো না—হয়তো বুড়োটা...।'

এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত লঘু জুতার খুটখুট শব্দ! পরক্ষণেই একটি তরুণী ইংরেজ মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া প্রায় সাহেবের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, 'ও জিমি, অ্যাম্ আই ভেরি লেট্? বাট্ ড্যাডি—ওঃ!'

আমাকে দেখিয়া মেয়েটির মুখের হাসি নিবিয়া গেল; জিমির বুকের নিকট হইতে ইঞ্চিখানেক সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'হোয়াট্‌স্ হি ডুয়িং হিয়ার?'

জিমি অপ্রস্তুতভাবে আমার পানে চাহিয়া হাসিল। আমি বলিলাম, 'জিমি, চল্‌লুম ভাই, আর থাকছি না—তোমাদের মিলন মধুময় হোক্।'

কুতুব-শীর্ষ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া গেলাম।

ভাদ্র ১৩৪৫

banglabooks.in

টুথ-ব্রাশ

প্রসঙ্গটি বৈষয়িক। অপিচ মনস্তত্ত্ব যৌনতত্ত্বের সঙ্গেও ইহার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে।
রসশাস্ত্র বিষয়বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের মৌলিক মূল্য লইয়া দর-কষাকষি রসের হাটে চলিবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। 'হিউম্যান ভ্যালুস' কথাটা শুধু বিদেশী নয়, অত্যন্ত অর্বাচীন।

সুবোধবাবুর মস্তকে একটি অত্যাশ্চর্য টাক ছিল। টাক সাধারণতঃ মস্তকের সম্মুখভাগে বঙ্গোপসাগরের আকারে পড়িয়া থাকে, ইহাই রীতি। সুবোধবাবুকে দেখিয়া কিন্তু কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না যে, তাঁহার টেরি-কাটা মস্তকের সমস্ত পশ্চাদ্ভাগটা ঊষর নির্লোমতায় একেবারে ধু ধু করিতেছে। তাঁহার চরিত্রেও, বোধ করি, এমনই একটা ধোঁকা-লাগানো অ-গতানুগতিক বৈচিত্র্য ছিল, সম্মুখ দেখিয়া সহসা পশ্চাতের খবর পাওয়া যাইত না।

আমার সহিত অল্পদিনের জন্যই আলাপ হইয়াছিল; পশ্চিমের যে শহরে আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তিনি ছিলেন সেই শহরের একজন উন্নতিশীল ব্যবসাদার। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, ধীর প্রিয়ভাষী লোক, অত্যন্ত সাধারণ কথাও বেশ রস দিয়া বলিতে পারিতেন। আলাপের পূর্বে অন্য পাঁচজনের মুখে তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুই-ই শুনিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ব্যবসা-সম্পর্কে তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তৎপূর্বে ও পরে তেমনি অমায়িক।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহার সংস্পর্শে আসি নাই বলিয়াই, বোধ হয়, সুবোধবাবুকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। কার্পণ্য-দোষ তাঁহার ছিল না; প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে বহু ভদ্রবেশী অভ্যাগতের ভিড় জমিত। সুবোধবাবুর আধুনিকা ও সুচটুলা স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া একটি সামাজিক আসর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন; তাঁহার মোলায়েম হাসি-তামাসা এই সান্ধ্য সভার একটা উপভোগ্য উপাদান ছিল।

কেন জানি না, তাঁহাকে এই মজলিসের বায়ুমণ্ডলে রবারের রঙিন বেলুনের মত নির্লিপ্ত সহজতায় ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন তিনি মনের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেক কথা ও কার্য ওজন করিতেছেন, তাহার মূল্য ধার্য করিতেছেন। এ বিষয়ে মুখে তিনি কিছুই বলিতেন না, তবু তাঁহার মনের এই তুলাদণ্ডটি যে সর্বদা সক্রিয় হইয়া আছে, তাহা অনুভব করিয়া আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম।

একদিন তিনি মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি ছড়ি ব্যবহার করেন কেন, বলুন দেখি?'

যুক্তিসম্মত কোনও উত্তরই ছিল না। বেড়াইতে বাহির হইবার সময় একটা ছড়ি হাতে না থাকিলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ও নিঃসম্বল মনে হয়—এইটুকুই বলিতে পারি।

তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমার পানে সেই ওজনকরা দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কাছে এই অকারণ ছড়ি বহন করিয়া বেড়ানো যে একান্ত অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

মনুষ্যচরিত্রের গূঢ় মর্ম উদ্ঘাটন করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা হয়তো সুবোধবাবুর বিচিত্র টাক ও অন্যান্য বাহ্য অভিব্যক্তি হইতে তাঁহার প্রকৃতিগত বিশিষ্ট্য ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন, কিন্তু এক মাসের পরিচয়ের ফলে তিনি আমার কাছে যেন একটু আবছায়া রহিয়া গিয়াছেন। এমন কি, শেষের যে গুরুতর ঘটনাটা একসঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের মত তাঁহার মাথার উপর ফাটিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উগ্র আলোকেও লোকটিকে স্পষ্টভাবে চিনিতে পারি নাই। হয়তো আমারই নির্বুদ্ধিতা, কোনও বস্তুকে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবার বিদ্যা এত বয়সেও অর্জন করিতে পারি নাই। অথচ শুনিয়াছি, এই বিদ্যাটাই নাকি চরম বিদ্যা—শিক্ষা, সংস্কৃতি, এমন কি দর্শনশাস্ত্রেরও শেষ সাধনা।

banglabooks.in

গুরুতর সংবাদটি আমাকে যিনি প্রথম দিলেন, তিনি সম্ভবত সুবোধবাবুর ব্যবসায়-ঘটিত বন্ধু; উত্তেজনা-উদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, 'খবর শুনেছেন বোধ হয়?'

'কিসের খবর?'

'শোনেননি তা হলে!' হাস্যোজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি আকাশের পানে তুলিয়া তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, 'বড়ই দুঃসংবাদ। সুবোধবাবুর স্ত্রী—, তাঁকে কাল রাত্তির থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি! কোথায় গেলেন তিনি?'

'যা শুনছি—এক ছোকরা খুব ঘন ঘন যাতায়াত করত, তার সঙ্গেই নাকি কাল রাত্রে—।' তাঁহার বাম চক্ষুটি হঠাৎ মুদিত হইয়া গেল।

মোটের উপর খবরটা যে মিথ্যা নয়, তাহা আরও কয়েকজন জানাইয়া গেলেন। কেহ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধিক্কার দিলেন; কেহ বা গলা খাটো করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ঠিক এই ব্যাপারটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পুরা এক বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মস্তকের পশ্চাদ্দিকে টাক, এবং বকেয়া টাকা না পাইলে স্বজাতি বাঙালীর নামে যে মোকদ্দমা করিতে দ্বিধা করে না, তাহার স্ত্রী যে—ইত্যাদি।

সুবোধবাবুর কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল। নিরপরাধ হইয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক লজ্জা ভোগ করে, তাঁহার অবস্থা তাহাদেরই মত। সহানুভূতি জানাইবার বন্ধুর হয়তো অভাব হয় না, কিন্তু মুখের সহানুভূতিকে চোখের বিদ্রূপ যেখানে প্রতি মুহূর্তে খণ্ডিত করিয়া দিতেছে, সেখানে সহানুভূতির মত নিষ্ঠুর পীড়ন আর নাই। তাই মজা-দেখা বন্ধুর মত সমবেদনার ছুতায় তাঁহার বাড়িতে গিয়া ধৃষ্টতা করিতে সংকোচ বোধ হইতে লাগিল।

তবু না গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। মনের গহনে একটা নিষ্ঠুর শ্বাপদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুবোধবাবুর মর্মপীড়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সে-ই বোধ হয় সন্ধ্যার সময় আমাকে তাঁহার বাড়িতে টানিয়া লইয়া গেল।

অন্য দিনের মত বাড়িতে মজলিসী বন্ধুরা কেহ নাই। বারান্দায় একাকী বসিয়া সুবোধবাবু মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হাত বুলাইতেছেন; আমাকে দেখিয়া অন্যান্য দিনের মত সহাস্য সমাদরে আহ্বান করিলেন, 'আসুন আসুন!'

স্ত্রী কুলত্যাগ করিলে মানুষ ঠিক কি ভাবে আচরণ করিয়া থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সুবোধবাবুর ভাবগতিক স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। যেন কিছুই হয় নাই। হাসিমুখে দুই চারিটা সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা, এমন কি একবার একটা রসিকতা পর্যন্ত করিয়া ফেলিলেন।

বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। যাঁহার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছি, তিনি যদি দুঃখটাকে গায়েই না মাখেন, তবে সান্ত্বনা দিব কাহাকে? অপদস্থের মত নীরবে হেঁটমুখে বসিয়া রহিলাম, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিতেই পারিলাম না।

দিনের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, সুবোধবাবু তাঁহার তৌল-করা চক্ষু দিয়া আমার মনের কথাটা ওজন করিতেছেন। মুখে একটু হাসি।

চোখাচোখি হইতেই তিনি মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; তারপর বাগানের একটা ইউ-ক্যালিপ্টাস্ গাছের ডগার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমার টুথ-ব্রাশটা কে চুরি করে নিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।'

অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম, মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'টুথ-ব্রাশ!'

তিনি তেমনই অর্ধ-নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, 'হ্যাঁ, টুথ-ব্রাশ। তুচ্ছ জিনিস, সংসারযাত্রা নির্বাহের একটা সামান্য উপকরণ; যে লোকটা চুরি করেছে, তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না। কিন্তু তবু সাবধান হওয়া দরকার। ভাবছি, আর টুথ-ব্রাশ কিনব না।'

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। আমার দিকে সহসা চক্ষু নামাইয়া

banglabooks.in

তিনি বলিলেন, 'আপনি কখনও দাঁতন ব্যবহার করেছেন? শুনেছি, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ভাল। মনে করছি, এবার থেকে ইউক্যালিপ্টাসের দাঁতন ব্যবহার করব। সস্তাও হবে, আর কিছু না হোক, চুরি যাবার ভয় থাকবে না। দাঁতন কেউ চুরি করবে না!'—বলিয়া হঠাৎ একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

তারপর সুবোধবাবুর সহিত আর দেখা হয় নাই। তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাঁহার নাম দেখিতে পাই; তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মোহমুক্ত বিষয়বুদ্ধি তাঁহাকে বৈষয়িক উন্নতির পথেই লইয়া চলিয়াছে।

তিনি আবার টুথ-ব্রাশ কিনিয়াছেন, অথবা দাঁতন দিয়াই কাজ চালাইতেছেন, সে সংবাদ কিন্তু খবরের কাগজে পাই নাই।

২০ কার্তিক ১৩৪৫

নাইট ক্লাব

বিশ্বাস না-করিতে হয় না-করুন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে আমি বাধ্য। এই কলিকাতা শহরেই দু'চারটি নাইট ক্লাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। গোপনে গোপনে তাহাদের নৈশ অধিবেশন বসিয়া থাকে; অত্যাধুনিক কয়েকটি রস-পিপাসু নরনারী ভিন্ন ইহাদের সন্ধান কেহ জানে না। পাশ্চাত্ত্য মতে পরকীয়া প্রীতির পুনঃ প্রবর্তন করাই এই নব-রসিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। সকলেই জানেন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অগ্রদূত হুইস্কি এবং ভগ্নদূত নাইট ক্লাব। ইহার পর আর কিছু নাই; তস্মাৎ পরতরং নহি।

যুবতীটির নাম মীনাক্ষী। সংক্ষেপে মীনা। বাপ বড়মানুষ এবং ভালোমানুষ; তদুপরি কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা। সুতরাং কুমারী মীনার মনে সহজেই নারীজাতির দুঃসহ পরাধীনতার ব্যথা পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নারীর যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহার অবাধ প্রগতির জলতরঙ্গ শীঘ্রই বাঁধ ভাঙিয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। পিতা অর্থব্যয় করিয়া তরুণী কন্যাকে পালন করিতে বাধ্য; স্বামী যদি খোরপোষ দিতে অস্বীকৃত হয়—আদালত আছে! কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা নারীর যথেচ্ছ প্রগতিতে বাধা দিতে চায় কোন্ অধিকারে?

মীনার মনোভাব তপ্ত দুগ্ধের মতো পারিবারিক কটাহ ছাপাইয়া ছাপার অক্ষরে উথলিয়া পড়িয়াছিল। এই ফেনোচ্ছলতা যে আধারে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার নাম—'পেয়ালা'। 'পেয়ালা' সাপ্তাহিক পত্রিকা, নবতন্ত্রের নবীন তান্ত্রিক শ্রীমান ফাল্গুনী ইহার স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক।

শ্রীমান ফাল্গুনী তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিতেছেন—বাঙালী, ছিঁড়ে ফেল এই স্বকপোলরচিত নিগড়ের বন্ধন! নরনারীর যৌন সম্পর্ক নির্বিঘ্ন করো; বিবাহের অন্ধকূপে

banglabooks.in

আবদ্ধ হয়ে তোমার পৌরুষ নির্বীর্য হয়ে পড়েছে—তাকে মুক্তি দাও। দোহাই তোমার, বিয়ে করো না।

'নিতান্তই যদি বিয়ে করতে চাও—সখ্য-বিবাহ করো। যাচাই-বিবাহ করো। আর তা যদি না করো, রসাতলে যাও।'

যাচাই-বিবাহ! কথাটা খড়ের আগুনের মতো তরুণদের হৃদয়ে জ্বলিতে থাকিত। আহা, কবে সেদিন আসিবে যখন যাচাই করিতে করিতেই জীবন কাটিয়া যাইবে; বিবাহ করিয়া ভারগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

শুধু তরুণ নয়, তরুণীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মীনা ফাল্গুনীকে চিঠি লিখিল,—

'ধন্য আপনার নাম ফাল্গুনী! আপনার 'পেয়ালা' দিন দিন ফাল্গুনের 'উচ্চহাস্য অগ্নি-রসে' ভরে উঠুক! সংযমের ভীরুতা অপনীত হোক্।

'কিন্তু নারী? যোগ্য সহচর যাচাই করে নেবার অধিকার তারও চাই। নারী আর গুটি-পোকা নয়, সে এখন প্রজাপতি; ফুলে ফুলে মধুপান করে বেড়াবার অধিকার তারও আছে! একথা ভুলে যাবেন না।'

উত্তরে ফাল্গুনীর সম্পাদকীয় স্তম্ভ উত্তেজিত হইয়া উঠিলঃ

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া! আপনাকে প্রিয়া বললাম বলে কিছু মনে করবেন না। সমস্ত নারীজাতি সমস্ত পুরুষজাতির প্রিয়া—private property আমরা মানি না। আমাদের কাপালিক হতে হবে; হতে হবে নির্ভীক, হতে হবে নির্ঘৃণ, হতে হবে নির্লজ্জ। নিষ্কোষিত করতে হবে আমাদের মনকে—অসির মতো এবং সেই অসি দিয়ে কেটে ফেল্‌তে হবে গাটছড়ার গ্রন্থিকে। যৌন জীবনে আমরা গাঁট রাখব না, এই আমাদের শপথ।'

অতঃপর সম্পাদক ও লেখিকার মধ্যে পত্রাঘাতজনিত ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। চাক্ষুষ দেখাশুনা না হইলেও মনের মিল যেখানে এত গভীর সেখানে দূর হইতেই মিলনোৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে। ইন্দুর্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু—!

এইবার নাইট ক্লাবের আবির্ভাব। 'পেয়ালা' সম্পাদকের মানসিক অবস্থা অত্যাধুনিক হইলেও হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা একটু কাঁচা ছিল। তাই একদিন এক নবলব্ধ গ্রাজুয়েট বন্ধুর নিকট ক্লাবের সন্ধান পাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠিল। আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার এই প্রথম সুযোগ। তিনি মীনাকে লিখিলেনঃ

'তোমাকে এখনও চোখে দেখিনি, তবু তোমার অন্তঃসত্তা আমার অন্তঃসত্তাকে চুম্বকের মতো টানছে। কিন্তু আমাদের মিলন সাধারণ নরনারীর মতো হলে চলবে না। মুক্তির মানস-তীর্থে আমাদের যৌন মিলনের মঙ্গলশঙ্খ বাজবে। সে তীর্থ—নাইট ক্লাব।

'সেই তীর্থে আমরা যাব। ঠিকানা দিচ্ছি। নিশীথ নগরীর নিদ্রিত বুকের ধুকধুকুনি আমরা শুনতে পাব। চক্ষের প্রদীপ জেলে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়াব। বহু তীর্থ-যাত্রীর মধ্যেও পরস্পর চিনে নিতে পারব না কি?'

প্রত্যুত্তরে মীনা লিখিল, 'তোমার বাঁশি শুনেছি। যাব আমি অভিসারে; সহস্র লোক যদি সেখানে থাকে তবু তোমাকে চিনে নেব।

'আমার ভয় করছে না, বুক ঢিবঢিব করছে না। আমি যাবই। নিশ্চিন্ত থাকো।'

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ঘর; অনেকগুলি নরনারী এখানে সেখানে বসিয়া নিম্নস্বরে-ঠাট্টা-তামাশা ও পানভোজন করিতেছে; সকলেরই চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার দীপ্তি। একটি বারো-আনা-উলঙ্গ যুবতী মাঝে মাঝে আসিয়া ছোট ছোট টেবিলগুলি ঘিরিয়া নাচিয়া যাইতেছে। ঐকতান বাদ্যযন্ত্রের চাপা আওয়াজ সকলের কানে কানে একটা অকথ্য ইঙ্গিত করিতেছে।

নাইট ক্লাব। মুক্তির তীর্থ। রাত্রি যত গভীর হইতেছে, বন্ধন ততই শিথিল হইয়া আসিতেছে। তুরীয়ানন্দে উপনীত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

banglabooks.in

ঘরের এক কোণে নিজেকে যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিয়া মীনা একটি ক্ষুদ্র সোফায় বসিয়া ছিল। সম্মুখে একটা টবের পাম গাছ পাতার ঝালর দিয়া তাহাকে কতকটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু সুন্দরী যুবতীকে পাতা ঢাকা দিয়া আড়াল করা যায় না। অনেকগুলি শ্যেন-চক্ষু এই ক্ষুদ্র পাখীটির প্রতি নজর রাখিতেছিল। পরিপাটি বেশধারী একটি কদাকার যুবক অদূরে অন্য একটি টেবিলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সবুজ রঙের এক প্রকার পানীয় চুমুকে চুমুকে আস্বাদন করিতেছিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া মীনাকে দেখিতেছিল। সেও একাকী, সঙ্গিনী নাই।

মীনার বুক ঢিবঢিব করিতেছে, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। প্রায় আধ ঘণ্টা সে এখানে বসিয়া আছে, কিন্তু কই ফাল্গুনী তো চিনিতে পারিল না? মনে মনে সে ফাল্গুনীর যে চেহারা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল সেরূপ চেহারার লোক তো একটিও এখানে নাই! সে কল্পনা করিয়াছিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে একটি যুবক; চোখে ঈষৎ ধোঁয়াটে কাচের চশমা, ঠোঁটের কোণে উচ্চ অঙ্গের একটি হাসি। সে আসিয়া মীনার সম্মুখে দাঁড়াইবে, গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিবে, 'মীনা, চিনেছি তোমাকে। এসো আমার সঙ্গে।' মীনা অমনি উদ্বেলিত হৃদয়ে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিবে; বলিবে—

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী!'

কিন্তু কই? কোথায় তাহার মানস-ফাল্গুনী? ব্যাকুল দৃষ্টিতে মীনা আর একবার চারিদিকে চাহিল। বারো-আনা-উলঙ্গ মেয়েটা নির্লজ্জ ভঙ্গীতে নাচিতেছে। সকলেরই মুখে চোখে এমন একটা ভাব যাহা দেখিতে সংকোচ হয়। অদূরে বসিয়া কদাকার যুবকটা তাহার দিকে তাকাইয়া একটা বিশ্রী হাসি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার নাক মুখ হইতে সিগারেটের ধোঁয়া ধীরে ধীরে নিঃসৃত হইতেছে, যেন তাহার অন্তরের কলুষিত বাষ্প বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

চোখ বুজিয়া মীনা শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। কি করিবে? যদি ফাল্গুনী না আসে? এখান হইতে বাহির হইবে কি করিয়া? ইহারা যদি বাহির হইতে না দেয়?

ঘাড়ের কাছে একটা তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। কদাকার যুবক তাহার পিছনে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'আমিও একাকী, তুমিও একাকী—হে-হে-হে। আসুন না, পরস্পর সান্ত্বনা দেওয়া যাক।'

'না!' কুঁকড়াইয়া মীনা একপাশে সরিয়া গেল। তাহার বুক ভীষণ ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

কদাকার যুবক পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'নবাগতা দেখছি—প্রথমটা একটু বাধো বাধো ঠেকে। একপাত্র শ্যাম্পেন আনাব? খেলেই সংকোচ কেটে যাবে। হেঃ-হেঃ-হেঃ!'

মূক হইয়া বসিয়া মীনা কাঁপিতে লাগিল। এ কি জঘন্য স্থানে সে একাকিনী আসিয়াছে! হঠাৎ তার মস্তিষ্ক-রন্ধ্রে ক্রোধের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। ঐ ফাল্গুনীটা—একটা—একটা—শয়তান! তাহার অন্তঃসারশূন্য লেখায় ভুলিয়া মীনা আজ নিজের একি সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে! না না, এ স্বাধীনতা সে চায় না। এই নির্লজ্জ পাশবিকতার চেয়ে বোরখা মুড়ি দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকাও ভালো। সে প্রজাপতি হইতে চাহিয়াছিল, ভগবান তাহাকে গুবরে পোকাদের মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন?

ঘরের আলো যে অলক্ষিতে কমিয়া আসিতেছে তা মীনা বুঝিতে পারে নাই। একটা একটা করিয়া বাল্‌ব নিবিয়া যাইতেছে। ঘরটা যখন ছায়াময় হইয়া আসিয়াছে তখন মীনা হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া আতঙ্কে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়া যে কলকূজন আসিতেছে তাহা আলোকের বন্দনা নয়, তমসার প্রশস্তি।

কদাকার যুবক মীনার আঁচল টানিয়া বলিল, 'বসুন না, এই কি যাবার সময়?'

আঁচল ছাড়াইয়া মীনা পলাইবার চেষ্টা করিল, কদাকার যুবক তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

banglabooks.in

'এখানি তো অন্ধকার হয়ে সবাই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো মিশে যাবে। এ সময় হাত ছাড়তে নেই। হেঃ-হেঃ-হেঃ—'

মীনা একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময়ে কোথা হইতে আর একটি হাত আসিয়া কদাকার যুবকের কবল হইতে মীনার হাত ছিনাইয়া লইল। ত্রাস-ব্যাকুল চক্ষে মীনা একবার এই নবাগতের পানে চাহিল, তারপর ঘর অন্ধকার হইয়া গেল।

নূতন স্বর মীনার কানে কানে বলিল, 'আসুন, আপনাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।'

নূতন কণ্ঠস্বর শুনিয়া মীনা আশ্বাস পাইল। চকিতের জন্য যে মুখখানা সে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাও ভদ্রলোকের মুখ—লালসার পাঁক-মাখানো নয়। মীনা সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'শিগ্‌গির চলুন, আমি নিশ্বাস ফেলতে পারছি না।'

অবরুদ্ধ উত্তপ্ত অন্ধকারে কিছুক্ষণ সাবধানে চলিবার পর একটা দরজা, আরো খানিকটা দূরে যাইবার পর আর একটা দরজা। তারপর—

আঃ—! খোলা আকাশের মুক্ত বাতাস। মধ্যরাত্রির নির্জন পথে জনমানব নাই। শুধু তাহারা দু'জন। ল্যাম্প-পোস্টের নিচে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস টানিয়া মীনা বলিল, 'একটা ট্যাক্সি। আপনি আমাকে দয়া করে বাড়ি পৌঁছে দিন, আমি একলা যেতে পারব না।'

ট্যাক্সিতে চলিতে চলিতে মীনা অস্ফুট ব্যাকুলতায় বারবার বলিতে লাগিল, 'আর কক্ষনো যাব না—কক্ষনো না—উঃ!' কদাকার যুবকের হাতের স্পর্শ তাহার হাতে যেন এখনও পচা অশুচিতার মতো লাগিয়া আছে।

চোখের জলের ভিতর দিয়া সে পাশের যুবকটিকে দেখিল। সুশ্রী নয়—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিপছিপে গঠন নয়, চোখে ধোঁয়াটে কাচের চশমাও নাই। যা দু-একটি কথা সে বলিয়াছে তাহাও নিতান্তই মামুলী। অথচ—

মীনা কহিল, 'ফাল্গুনীটা একটা কেঁচো!'

যুবক সহানুভূতিপূর্ণ ঘাড় নাড়িল; ফাল্গুনী কে তাহা জানিবার ঔৎসুক্য পর্যন্ত দেখাইল না।

মীনা বলিল, 'এই প্রথম—এর আগে আমি আর কখনো ওরকম জায়গায় যাইনি।'

যুবক গলার মধ্যে সমবেদনাসূচক শব্দ করিল।

'আপনি ভাগ্যিস গিয়ে পড়েছিলেন, নইলে—'

যুবক একটু কাশিয়া বলিল, 'আমারও এই প্রথম।'

মীনা হঠাৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'ফাল্গুনী কে জানেন? একটা নোংরা দুর্গন্ধ সাপ্তাহিকের সম্পাদক। তার মুখ দেখলে পাপ হয়, তার লেখা পড়লে গঙ্গাস্নান করতে হয়। আর যদি কখনো আমি—!'

ট্যাক্সি বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

মীনা অপ্রগল্‌ভ সহজতায় যুবকের হাত ধরিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আমাকে খুব খারাপ মেয়ে মনে করবেন না।—ফাল্গুনীটা নিশ্চয় মদ খায়।—মুক্তি কাকে বলে আমি আজ টের পেয়েছি। বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। কাল আসবেন কি?'

নীরবে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া যুবক প্রস্থান করিল।

পরদিনটা মীনার প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল; কিন্তু যুবক আসিল না, সন্ধ্যাবেলা আসিল ফাল্গুনীর চিঠি। রাগে মীনার ইচ্ছা হইল চিঠি না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু নাইট ক্লাবে নিজে না যাওয়ার কি কৈফিয়ত দিয়াছে তাহা জানিবার জন্য চিঠি পড়িতে হইল—

'মীনা, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

'কাল বলতে পারলুম না। তুমি ট্যাক্সিতে আমাকে যা বলেছিলে সব সত্যি! শুধু—আমি মদ খাই না, সত্যি বলছি। একবার খাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু যথাসর্বস্ব বমি হয়ে গেল। সে যাক্। কাল তোমাকে দেখে আমার সব নেশা ছুটে গেছে। 'পেয়ালা' ভেঙে ফেলেছি; আসছে হপ্তা থেকে আর 'পেয়ালা' বেরুবে না।

'মীনা, তোমার চোখের জল এত সুন্দর কেন? তোমার রাগ এত মিষ্টি কেন? তোমার

banglabooks.in

ভয় এত মধুর কেন?

'আমাকে বিয়ে করবে?

'কুৎসিত জিনিস না দেখলে সুন্দরকে চেনা যায় না। নাইট ক্লাব কাল আমাকে নারীর সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটি চিনিয়ে দিয়েছে।

'কাল তুমি আমার হাতে হাত রেখেছিলে। মনে হচ্ছে, সারা জীবন ধরে ঐ স্পর্শটি আমার চাই, না হলে চলবে না।

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

২১ চৈত্র ১৩৪৫

যস্মিন্‌ দেশে

বোম্বাই শহরটি যে প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ, একথা অবশ্য সকলেই জানেন। কিন্তু এই দ্বীপকে অতিক্রম করিয়া একটি বৃহত্তর বোম্বাই আছে, পীনাঙ্গী রমণীর আঁটসাঁট পোশাক ছাপাইয়া উদ্বৃত্ত দেহভাগের মত যাহা বাহিরে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

বৈদ্যুতিক রেলের লাইন ও মোটর রাস্তা দুইই পাশাপাশি বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের খাঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর দিকে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথের ধারে ধারে এক মাইল আধ-মাইল অন্তর ছোট ছোট জনপদ—বোম্বাইয়ের তুলনায় তাহাদের আয়তন সিকি-দুয়ানির মত। এখানে যাঁহারা বাস করেন, প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহারা খাদ্যা-ন্বেষী পাখির মত ঝাঁক বাঁধিয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা কলরব করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসেন। মেয়েরা বৈকাল বেলা বাহারে থলি হাতে করিয়া বাজার করিতে বাহির হন, উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন নাই, সব মেয়েরাই সবজি বাজারে গিয়া আলু শাক কাঁকুড় কফি ক্রয় করেন, তারপর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তরুণী, তাঁহারা ক্ষুদ্র রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া নিজ নিজ 'শেঠ'এর জন্য প্রতীক্ষা করেন। শেঠ আসিলে দুজনে গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যান।

তারপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দেখা যায়, পথের দুই ধারে বাড়ির সম্মুখস্থ অন্ধকার বারান্দায় কাঠের পিঁড়িযুক্ত দোলা দুলিতেছে; অদৃশ্য মিথুনের হাসি-গল্পের মৃদু আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, কচিৎ কোমল কণ্ঠের গান অন্ধকারকে মধুর করিয়া তুলিতেছে। নিবিড় ঘনীভূত জীবনের স্পন্দন—আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে।

কিন্তু বৃহত্তর বোম্বাইয়ের এই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সহিত আমার গল্পের কোনও সম্বন্ধ নাই।

banglabooks.in

বোম্বাইয়ের সমুদ্রকূল বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ভাঙা পোর্তুগীজ ঘাঁটি দ্বারা কীর্ণ; এককালে তাহারা যে এই উপকূল বাহুবলে দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহার প্রচুর চিহ্ন এখনও সমুদ্রের ধারে ধারে ছড়ানো রহিয়াছে। প্রত্ন-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই ভগ্ন ইঁট-পাথরের স্তূপগুলি বিশেষ কৌতূহলের বস্তু।

বৈদ্যুতিক রেল-লাইনের প্রায় শেষ প্রান্তে ঐরূপ একটা বড় পোর্তুগীজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। অতি ক্ষুদ্র স্থান, দিনের বেলাও একান্ত জনবিরল। দুই চারিটি দোকান, এক-আধটি ইরাণী হোটেল, পোস্ট অফিস—এই লইয়া একটি লোকালয়; পোর্তুগীজ শক্তির গলিত শবদেহ জীবন্ত লোকালয়ের পাশে পড়িয়া যেন তাহার উপরেও মুমূর্ষার ছায়া ফেলিয়াছে।

শুনা যায় রাত্রি গভীর হইলে এই ভাঙা দুর্গের চারিপাশে নানা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করে। জীবন্ত মানুষ সে-সময় কেহ ঘরের বাহির হয় না; যদি কেহ একান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় ঐ দিকে যায়, অকস্মাৎ বহু ঘোড়ার সমবেত খুরধ্বনি তাহাকে উচ্চকিত করিয়া তোলে, যেন একদল ঘোড়সওয়ার ফৌজ পাশ দিয়া চলিয়া গেল। দৈবক্রমে দুর্গের আরও নিকটে গিয়া পড়িলে সহসা অন্ধকার স্তম্ভশীর্ষ হইতে পোর্তুগীজ সান্ত্রীর কড়া হুকুম আসে—"Halt! Quem vai la!" !

কিন্তু ভাঙা পোর্তুগীজ দুর্গের ভৌতিক ভয়াবহতার সহিত আমার কাহিনীর কোনও সম্বন্ধ নাই।

দুপুরবেলা বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গী বা দিগ্‌দর্শক লইবার প্রয়োজন হয় নাই, যে মারাঠী বন্ধুর গৃহে কয়েকদিনের অতিথিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম তিনি ট্রেনে তুলিয়া দিয়া রাস্তা-ঘাটের বিবরণ বলিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছিলাম কিন্তু দুর্গ পরিক্রমণ শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। চায়ের তৃষ্ণা যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল; একটু ক্ষুধাও যে পায় নাই এমন নয়। তাড়াতাড়ি স্টেশনের দিকে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতেছিলাম, মনের মত খাদ্য পানীয় এই নগণ্য স্থানে পাওয়া যাইবে কি না, হয়তো বোম্বাই না পৌঁছানো পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে। এমন সময় চোখে পড়িল রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র একটি ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড টাঙানো রহিয়াছে—ইস্ট ইণ্ডিয়া হোটেল।

আমিও ইস্ট ইণ্ডিয়ার লোক, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব কোণে থাকি, তাই বোধ হয় নামটা ভিতরে ভিতরে আমাকে আকর্ষণ করিল। অজ্ঞাত স্থানে নিম্নশ্রেণীর হোটেলের খাদ্য পানীয় উদরস্থ করা হয়তো সমীচীন হইবে না; তবু মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করিয়া ভাবিলাম,—দেখাই যাক না; চা যদি উপাদেয় নাও হয় গরম জলে নেশার পিত্তরক্ষা হইবে!

ছোট্ট ঘরে কয়েকটি টিনের টেবিল চেয়ার সাজানো; লোকজন কেহ নাই। পিছনের ঘর হইতে দুইটি স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর আসিতেছিল, আমার সাড়া পাইয়া পুরুষটি বাহির হইয়া আসিল।

বেঁটে দোহারা মজবুত গোছের লোকটি, রঙ ময়লা তামাটে ধরনের; পার্শী ও ইরাণী ছাড়া ভারতবর্ষের যে কোনও জাতি হইতে পারে। বয়স আন্দাজ বত্রিশ-তেত্রিশ। আমার সম্মুখে আসিয়া দুর্বোধ্য অথচ বিনীত ভাষায় কি একটা প্রশ্ন করিল।

ইংরেজীর আশ্রয় লইতে হইল। এ দেশের পনেরো আনা লোক ইংরেজী বুঝিতে পারে এবং দায়ে ঠেকিলে কষ্টেসৃষ্টে ইংরেজী বলিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিতেও পারে।

বলিলাম—"চা চাই।"

লোকটি ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ ভাল কথা। তারপর মোটের উপর শুদ্ধ

banglabooks.in

ইংরেজীতে বলিল—'কত চা চাই?'

বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। সেও বোধ হয় বুঝিল আমি এ-অঞ্চলে নূতন লোক, তাই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল—এখানে এক পয়সায় সিকি পেয়ালা, দুই পয়সায় আধ পেয়ালা, তিন পয়সায় তিন পোয়া এবং চার পয়সায় পরিপূর্ণ এক পেয়ালা চা পাওয়া যায়; আমি যেটা ইচ্ছা ফরমাস করিতে পারি। তারপর আমার বিলাতী বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'যদি কফি চান ভাল কফি দিতে পারি।'

এ দেশের লোক চায়ের চেয়ে কফি বেশী পছন্দ করে তাহা জানিতাম; কিন্তু চায়ের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ, কফি কদাচিৎ এক-আধ পেয়ালা খাইয়াছি। বলিলাম—'না, চা আনো।'

লোকটি পূর্ববৎ ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়া পিছনের ঘরে প্রবেশ করিল; আমি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। নেপথ্যস্থিত ঘরটা বোধহয় হোটেলের রান্নাঘর; সেখান হইতে অবোধ্য ভাষায় স্ত্রী-পুরুষের কথাবার্তা ও হাসির আওয়াজ আসিতে লাগিল।

অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। ধূমায়িত পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিলাম—'আঃ!' চায়ে দুধের অংশ বেশী এবং চায়ের পাতার সঙ্গে অন্যান্য সুগন্ধি মশলাও আছে। তবু স্বাদ ভালই লাগিল।

এই সময়, কেমন করিয়া জানি না, লোকটি আমাকে চিনিয়া ফেলিল। গরম চা পেটে পড়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বোধ হয় গুন্ গুন্ করিয়া একটি খাঁটি বাংলা সুর ভাঁজিয়া ফেলিয়াছিলাম; লোকটি উত্তেজনা-প্রখর চক্ষে আমার পানে চাহিল। তারপর টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিল—"আপনি বাঙালী?"

উভয়ে পরস্পর মুখের পানে পরম উদ্বেগভরে তাকাইয়া রহিলাম। বিস্ময়কর ব্যাপার! বাঙালীর ছেলে এতদূরে আসিয়া হোটেল খুলিয়া বসিয়াছে! দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল কথা বলিতেছে! 'হাঁ' বলিতে ডাহিনে-বাঁয়ে শিরঃসঞ্চালন করিতেছে!

কিংবা—বাঙালী বটে তো?

বলিলাম—'হ্যাঁ।—আপনি?'

লোকটি একগাল হাসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার আহ্লাদ ও বিস্ময়ের অবধি নাই। আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে এক গণ্ডা কথা বলিয়া গেল—'হ্যাঁ, আমিও বাঙালী মশায়। কিন্তু কি রকম চিনেছি তা বলুন!—আচ্ছা, এদিকে নতুন এসেছেন—না? বুঝেছি, রুইন্‌স দেখতে এসেছিলেন! উঃ—কদ্দিন যে বাঙালীর মুখ দেখিনি!—বম্বেতে বাঙালী আছে বটে—কিন্তু! আপনার নিবাস কলকাতাতেই তো? আমিও কলকাতার লোক মশায় —আদি বাসিন্দা—'

সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল।

'দাঁড়ান—শুধু চা খাবেন না। খাবার আছে—বাংলা খাবার। (একটু লজ্জিত ভাবে) বড় খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সিঙাড়া আর চম্‌চম্‌ নিজেই তৈরি করেছিলুম। এদিকে তো আর ওসব—

বলিতে বলিতে দ্রুত পিছনের ঘরে প্রবেশ করিল।

অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইবার পর তাহার মোটামুটি পরিচয় জানিতে পারিলাম। নাম তপেশচন্দ্র বিশ্বাস; গত সাত বৎসর এইখানেই আছে। দোকানের আয় হইতে সংসার নির্বাহ হইয়া যায়; সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে, কোনও অভাব নাই। হঠাৎ এতদিন পরে একজন টাট্‌কা স্বজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া সানন্দ উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

তপেশ জাতিতে কায়স্থ কিংবা ময়রা জানিতে পারা গেল না—জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল—কিন্তু চম্‌চম্‌ ও সিঙাড়া খাসা তৈয়ার করিয়াছে।

আমাদের চায়ের আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের কাছে গুটি

banglabooks.in

তিনেক যুবতীর আবির্ভাব হইল। এদেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে, তাহাদের মধ্যে একটি মেমেদের মত স্কার্ট পরিয়াছে, বাকি দুইটির কাছা দিয়া কাপড় পরা। সকলের হাতেই বাজার করিবার থলি; তাহারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কলকণ্ঠে ডাকাডাকি শুরু করিল। তপেশ গলা বাড়াইয়া দেখিয়া হাসিমুখে কি একটা বলিল; সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ঘর হইতেও সাড়া আসিল।

ঘরের ভিতর যে মেয়েটির সহিত তপেশকে কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম তাহাকে এতক্ষণে দেখিলাম। সে থলে হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিল, আমার প্রতি স-কৌতূহল নাতিদীর্ঘ কটাক্ষপাত করিল, তারপর তপেশকে দ্রুতকণ্ঠে কি একটা বলিয়া সখীদের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটির বয়স কুড়ি বাইশ—নিটোল সুঠাম শরীর; তাহার উপর বস্ত্রাদির বাহুল্য নাই। এ অঞ্চলে ঘাটি বলিয়া একটি জাতি আছে, তাহারা পশ্চিম ঘাটের আদিম অধিবাসী। এই জাতীয় মেয়েদের মত এমন অপূর্ব সুন্দর দেহ-গঠন খুব কম দেখা যায়। ইহারা হাঁটু পর্যন্ত আঁট-সাঁট কাছা দেওয়া রঙীন শাড়ি পরে, শাড়ির কিন্তু কোমরের ঊর্ধ্বে উঠিবার অধিকার নাই; ঊর্ধ্বাঙ্গের যৌবনোচ্ছলতাকে কেবলমাত্র একটি সস্তা ছিটের কাপড়ের আঙ্রাখার দ্বারা অযত্নভরে সংবৃত করিয়া রাখে। মাথার পরিপাটি কবরীতে ফুলের 'বেণী' জড়াইয়া ইহারা যখন উৎফুল্ল হাসিমুখে পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা তরিতরকারি বা কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে যায়, তখন নবাগতের চোখে তাহাদের এই সহজ ভ্রূক্ষেপহীন প্রগল্‌ভতা একটু বেহায়া মনে হইলেও রসজ্ঞ ব্যক্তির চোখে মাধুর্য বৃষ্টি না করিয়া পারে না।

এই মেয়েটি ঠিক ঐ ঘাটি-জাতীয় কি না জানি না; তবে তাহার ভাব-সাব বেশবাস দেখিয়া সেইরূপই মনে হয়। একটি কালো চকিতনয়না হরিণীর মত ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার ক্ষিপ্র চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তপেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এটি কে?'

টেবিলের উপর চোখ নত করিয়া তপেশ একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—'ও আমার স্ত্রী।'

নিজের স্ত্রীর দৈহিক আব্রু সম্বন্ধে বাঙালী অতিশয় সতর্ক; মনে হইল আমার সম্মুখে স্ত্রীর এই স্বল্প-বাস আবির্ভাবে তপেশ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে—কারণ আমিও বাঙালী। মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—'এখানে বিবাহাদিও করেছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ, বছর তিনেক হল—' তারপর যেন বিদ্রোহের ভঙ্গীতে একটু বেশী জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল—'এরা বড় ভাল—এমন মেয়ে হয় না—। এদের মত এমন—।' বাকি কথাটা সমুচিত ভাষার অভাবে উহ্য রহিয়া গেল। বুঝিলাম, বহুবচনটা বাহুল্য মাত্র, তপেশ স্ত্রীকে ভালবাসে; এবং পাছে আমি তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ বিপরীত ধারণা করিয়া বসি তাই তাহার মন পূর্ব হইতেই যুদ্ধোদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কথা পাল্টাইয়া দিলাম।

'এতদিন দেশছাড়া; দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তুলেই দিয়েছেন বলুন?'

বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তপেশ বলিল—'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি? সাত বছর ওমুখো হইনি, আর বোধ হয় কখনও হবও না। কি দরকার বলুন।'

আমি বলিলাম—'তা বটে। আপনার জন কিংবা বাড়ি-ঘর-দোর থাকলে তবু দেশে ফেরবার একটা টান থাকে। আপনার বোধ হয়—?'

তপেশ একটু চুপ করিয়া রহিল; তারপর টেবিলের উপর আঙুল দিয়া দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল—'বাড়ি-ঘর-দোর আপনার জন—সবই ছিল। তবু একদিন হঠাৎ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে এলুম—' বলিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হয়তো তাহার দেশত্যাগের পশ্চাতে একটা করুণ গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি লুকাইয়া আছে; এমন তো কতই দেখা যায়, স্ত্রী-বিয়োগ বা ঐ রকম কোনও নিদারুণ শোকের আঘাতে মানুষ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে; তারপর কালক্রমে বৈরাগ্য ও শোক প্রশমিত হইলে আবার দেশে ফিরিয়া যায় অথবা অন্য কোথাও নূতন করিয়া সংসার পাতে। তপেশেরও সম্ভবত

banglabooks.in

ঐ রকম কিছু হইয়া থাকিবে; তারপর ঐ হরিণনয়না বিদেশিনী মেয়েটির আকর্ষণ-জালে জড়াইয়া পড়িয়া দেশের মায়া ভুলিয়াছে।

প্রকৃত তথ্যটা জানিবার কৌতূহল হইতেছিল অথচ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলাম। তাই চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিলাম—'দেশে বিয়ে-থা করেননি বোধ হয়? এখানেই প্রথম?'

তপেশ আমার পানে চোখ তুলিল; চোখ দুটাতে বিরাগ ও অসন্তোষ ভরা। প্রথমটা ভাবিলাম, আমার গায়ে-পড়া কৌতূহলের ফলেই সে বিরক্ত হইয়াছে; কিন্তু যখন কথা কহিল তখন বুঝিলাম, তাহা নয়; তাহার মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা অতীতের ছায়া। মুখ শক্ত করিয়া সে বলিল—'দেশেও বিয়ে করেছিলাম। তিনি বোধহয় এখনো বেঁচেই আছেন—মরবার তো কোনও কারণ দেখি না! শুনবেন কেন দেশ ছেড়েছি? শোনেন তো বলতে পারি। কিন্তু আগে আর এক পেয়ালা চা এনে দিই, আর গোটা দুই মিষ্টি। কি বলেন?'

তপেশের কাহিনীটা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলিতেছি; কারণ তাহার কথায় বলিতে গেলে শুধু যে অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে তাই নয়, নানা অবান্তর কথার মিশ্রণে এলোমেলো হইয়া পড়িবে। তবে তপেশের মনে যে একটু অবচেতনার গোপন গ্লানি ছিল, গল্প বলিতে বলিতে সে যে নিজেই সাফাই গাহিয়া অবচেতনাকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছিল, এ কথাটা পাঠকের জানা দরকার, নচেৎ তাহার চরিত্রটা অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তপেশ যে একজন অতি সাধারণ সহজ প্রকৃতিস্থ মানুষ এ কথা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

কলিকাতারই কোনও অঞ্চলে তাহার বাস। ছোট্ট একটি নিজস্ব বাড়ি ছিল। বাপ তাহার বিবাহ দিয়াই মারা গিয়াছিলেন, আর কেহ ছিল না। তপেশ আই.এ. পর্যন্ত পড়িয়া কোনও মার্চেণ্ট অফিসে কেরানীর চাকরিতে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুইটি প্রাণী; আর্থিক অভাব ছিল না। কলিকাতার বাসিন্দা, বাড়ি-ভাড়া দিতে না হইলে অতি অল্প খরচে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইয়া লইতে পারে। স্ত্রীটি দেখিতে শুনিতে ভাল। চারি বৎসরের দাম্পত্য জীবনে দাইজনের মধ্যে গুরুতর অসদ্ভাব কিছু হয় নাই। ছেলেপুলে হয় নাই বটে, কিন্তু সেজন্য কাহারও মনে দুঃখ ছিল না।

সকালবেলা দৈনিক বাজার করিয়া তারপর যথাসময় আহারাদি সারিয়া তপেশ অফিসে বাহির হইত। সে বাহির হইয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে ঠিকা ঝি কাজকর্ম সারিয়া চলিয়া যাইত। অতঃপর তপেশের স্ত্রী পাড়া বেড়াইতে বাহির হইত। গায়ে একটা সিল্কের চাদর জড়াইয়া আধ-ঘোমটা দিয়া রাস্তায় নামিত। তারপর এ বাড়িতে গল্প করিয়া, ও বাড়িতে তাস খেলিয়া, বৈকালে তপেশ বাড়ি ফিরিবার কিছুক্ষণ আগে ফিরিয়া আসিত। তপেশ কিছু জানিতে পারিত না।

এমন কিছু দূষণীয় আচরণ নয়। একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক সারাটা দ্বিপ্রহর একাকিনী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিতে পারিয়া যদি পাড়ার অন্যান্য গৃহস্থের বাড়িতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা-গল্পে সময় কাটাইয়া আসে, তাহাকে মারাত্মক অপরাধী বলা যায় না। কিন্তু তপেশ যখন একজন প্রতিবেশী বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিল তখন তাহার ভাল লাগিল না। ঘরের বৌ রোজ পাড়া বেড়াইতে বাহির হইবে কেন? তাছাড়া, তাহাকে লুকাইয়া এমন কাজ করা যাহা বাহিরের লোকে জানিবে, এ কেমন স্বভাব?

তপেশ বাড়ি আসিয়া বৌকে খুব ধমক-চমক করিল। বৌ মুখ বুজিয়া শুনিল, অস্বীকার করিল না, কোনও কথার জবাব দিল না।

কিন্তু তাহার পাড়া-বেড়ানো বন্ধও হইল না। কিছুদিন পরে তপেশ আবার খবর পাইল; একটি বন্ধু এই লইয়া একটু মিঠে-কড়া রসিকতাও করিলেন। তপেশের বড় রাগ হইল। এ কি কদর্য নির্লজ্জতা। ঘরের বৌ দু-দণ্ড ঘরে থাকিতে পারে না! অবশ্য স্ত্রীর নৈতিক

banglabooks.in

চরিত্র সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই তপেশের হয় নাই, পাড়ার লোকেও কেহ এরূপ অপবাদ দিতে পারে নাই। কিন্তু তবু তপেশ বৌকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া চীৎকার ও রাগারাগি করিল। বৌ পূর্ববৎ মুখ বুজিয়া শুনিল।

এমনি ভাবে ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তপেশ বৌকে অনেক বই মাসিক-পত্রিকা আনিয়া দেয়, যাহাতে দুপুরবেলাটা তাহার গল্পাদি পড়িয়া কাটিয়া যায়, বৌও দু'একদিন বাড়িতে থাকে, তারপর আবার কোন্ দুর্নিবার আকর্ষণের টানে গায়ে চাদর জড়াইয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে। আবার ঝগড়া হয়, তপেশ ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার ভয় দেখায়, তাহাতেও কিছু ফল হয় না।

পাড়ায় এটা একটা হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরা তামাসা করে—'কি রে, তোর সেপাই আজ রোদে বেরিয়েছিল?' তপেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—দাঁত কিশ্ কিশ্ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়। তাহার মনে হয়, বৌ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীর কাছে হাস্যাস্পদ করিতেছে, তাহার আর ইজ্জত কিছুই আর রহিল না।

শেষে নাচার হইয়া তপেশ বৌকে অতি কঠিন দিব্য দিয়াছিল—'আর যদি অমন করে বাড়ি থেকে বেরোও, 'আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে।' বৌ কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তারপর তাহার পাড়া বেড়ানো বন্ধ হইয়াছিল।

তপেশ মনে একটু শান্তি অনুভব করিতেছিল। বৌয়ের শরীরে আর তো কোনও দোষ নাই। এটা একটা বদ্-অভ্যাস মাত্র, একবার ছাড়াইতে পারিলে আর ভাবনা নাই।

মাসখানেক পরে একদিন অফিসে মাহিনা পাইয়া তপেশ সকাল সকাল বাড়ি ফিরিল। বাহিরের দরজা ভেজানো; বাড়িতে বৌ নাই।—তাহার মাথার মধ্যে যেন চিড়িক মারিয়া উঠিল; সে শয়ন-ঘরে গিয়া ঢুকিল, সাবেক আমলের একটা বড় মজবুত তালা ঘরে ছিল; সেটা লইয়া সদর দরজায় চাবি দিয়া তপেশ বাহির হইয়া পড়িল। হাওড়া স্টেশনে আসিয়া বম্বের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে চাপিয়া বসিল।

সেই অবধি সে দেশছাড়া; বাড়ি অথবা বৌ-এর কি হইল তারা সে জানে না, জানিবার ঔৎসুক্যও নাই। পূর্ব জীবনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া সে নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছে।

তপেশের গল্প শেষ হইতে হইতে বেলাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। তাহাকে চা-জলখাবারের দাম দিতে গেলাম, সে কিছুতেই লইল না। বলিল—'ও কি কথা—আপনি দেশস্থ লোক—। যদি সুবিধে হয় আর একবার আসবেন কিন্তু।'

দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলাম—'কৈ তোমার স্ত্রী তো এখনো ফিরে এলেন না?'

তপেশ বলিল—'তাড়া তো কিছু নেই, বাজার করে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে ফিরবে—' বলিয়াই সচকিতে আমার মুখের পানে চাহিল।

আমি অবশ্য কিছু ভাবিয়া বলি নাই, কিন্তু নিরীহ প্রশ্নের আড়ালে কোনও অজ্ঞাত খোঁচা খাইয়া তপেশ প্রথমটা একটু থতমত হইল, তারপর গলায় একটু জোর দিয়া বলিল—'এদেশের এই রেওয়াজ—কেউ কিছু মনে করে না। —আচ্ছা নমস্কার।'

২০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

banglabooks.in

গ্যাঁড়া

আজ রাত্রে আমার কন্যার বিবাহ।

সকালবেলা দার্শনিক মনোভাব লইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছি। একটা নূতন সম্বন্ধের সূত্রপাত হইতে চলিয়াছে। মানুষের জীবনে নূতন নূতন সম্পর্কের বন্ধন ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতে থাকে!...

বাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বে ভরিয়া গিয়াছে। অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পিপীলিকার মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; কলহ করিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, আছাড় খাইতেছে। ইহাদের সকলকে ভালো করিয়া চিনি না।

আকাশে কাক-চিল আমার বাড়িটাকেই লক্ষ্য করিয়া চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; কারণ তেতলার ছাদে রান্নার আয়োজন ও ভিয়ান বসিয়াছে। কলিকাতায় কাক-চিলের সংখ্যা বড় কম নয়।

সকলের সহিত তাল রাখিয়া উঠানের এক কোণে শানাই বাজিতেছে। বাড়ি সরগরম।

এখনও দু' একজন আত্মীয়-বন্ধু আসিয়া পৌঁছিতে বাকি আছে। ভাগলপুর হইতে ছোট শ্যালকের আসিবার কথা—

বাড়ির সম্মুখে গাড়ি আসিয়া থামিল; ছোট শ্যালক গাড়ি হইতে নামিল। সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক; আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা, পায়ে বার্নিশ পাম্প্-সু, হাতে সোনার রিস্ট-ওয়াচ—বেশ—ভবিষ্যুক্ত মানুষ—'

শ্যালককে সম্ভাষণ করিলাম, 'এসো হে সমর—'

সমর আসিয়া আমাকে একটা প্রণাম ঠুকিল। অত্যন্ত চট্‌পটে কর্মপটু আমার এই শ্যালকটি! একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সর্বদাই ব্যস্ত।

প্রণাম করিতে করিতেই বলিল, 'এসে পড়লাম। আবার কালই ফিরতে হবে। গ্যাঁড়াকেও নিয়ে এলাম!...গ্যাঁড়া, তুমি বসো, আমি চট্ করে দিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

সঙ্গীকে আমার কাছে বসাইয়া সমর বাড়ির ভিতর অন্তর্হিত হইল। বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এই ভদ্র যুবকটির নাম গ্যাঁড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভালো নাম একটা আছে, কিন্তু আমি তাহা জানি না। ইনি সমরের বন্ধু, সম্ভবতঃ ধনী। ইঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব?

যা হোক, শ্যালকের বন্ধু, আমার কন্যার বিবাহে আসিয়াছেন, আপ্যায়িত করিতে হইবে। বলিলাম, 'বড় খুশি হলাম, হেঁ হেঁ—ভাগলপুরেই থাকা হয় বুঝি।'

'আজ্ঞে, বাঙালীটোলায়।'

গ্যাঁড়ার গলার আওয়াজ ঘষা-ঘষা, যেন ধোঁয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার কথার ভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটা তেজস্বিতা আছে। অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল। যুবককে ঠিক কিভাবে গ্রহণ করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। সমকক্ষের মতো ব্যবহার করিব, না সম্মানিত ব্যক্তির মতো? অথবা স্নেহভাজন কনিষ্ঠের মতো? আপনি না তুমি? অবশ্য আমি তাহার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু কেবলমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠতার জোরে কাহাকেও 'তুমি' বলা নিরাপদ নয়। তাহার পায়ের পাম্প্ ও হাতের রিস্ট-ওয়াচ বেশ দামী বলিয়াই মনে হইতেছে।

গ্যাঁড়া! নামটা এমন বেয়াড়া যে উহাকে মোলায়েম করিয়া আনাও এক রকম অসম্ভব। অথচ গ্যাঁড়া বলিতেও বাধিতেছে। মনে মনে কয়েকবার 'গেঁড়ুবাবু', 'গেঁড়ুবাবু' উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু খুব শ্রুতিমধুর মনে হইল না।

যুবক নাসিকার প্রান্তভাগ কয়েকবার কুঞ্চিত করিয়া হঠাৎ বলিল, 'ঘি পুড়ছে—ঘি পুড়ছে—' কণ্ঠস্বরে একটু অসন্তোষ প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, 'ছাদে ভিয়েন বসেছে কিনা। আপনার নাক তো খুব তীক্ষ্ণ, গেঁড়ুবাবু...'

'গ্যাঁড়া—গ্যাঁড়া। বাবু-টাবু নয়। আমাকে সবাই গ্যাঁড়া বলে ডাকে।'

banglabooks.in

বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলাম। কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত কি ভদ্রলোককে গ্যাঁড়া বলিয়াই ডাকিতে হইবে? কিন্তু মনের ভিতর সায় পাইতেছি না যে!

সমস্যা যখন এইরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সমর ফিরিয়া আসিল—

'নাও নাও, গ্যাঁড়া, আর দেরি কোরো না—কাজ আরম্ভ করে দাও। তেতলার ছাদে ভিয়েন বসেছে, তুমি সটান সেখানে চলে যাও। দিদি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

গ্যাঁড়া চক্ষের নিমেষে পাঞ্জাবি, পাম্প্‌ ও রিস্ট-ওয়াচ খুলিয়া তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইল। সমর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'খাজা তৈরি করবার জন্যে গ্যাঁড়াকে নিয়ে এসেছি। ও হল ভাগলপুরের সেরা কারিগর।'

মুহূর্ত মধ্যে গ্যাঁড়ার সহিত আমার সম্পর্ক সহজ ও সরল হইয়া গেল; তাহাকে গ্যাঁড়া এবং তুমি বলিতে মনের মধ্যে আর কোনও দ্বিধা রহিল না।

হাসিয়া বলিলাম, 'বেশ, বেশ, তাহলে আর দেরি নয়, গ্যাঁড়া, তুমি কাজে লেগে যাও। বিকেল থেকেই বড় বড় অতিথিরা আসতে আরম্ভ করবেন—চিংড়িদহের কুমার বাহাদুর, স্যার ফজলু—দেখো, যেন ভাগলপুরের নিন্দে না হয়।'

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

মৎস্য ন্যায়

প্রকাণ্ড ঝিলে অনেক মাছ বাস করে।

একদল ছোকরা মাছ ঝিলময় খেলিয়া বেড়ায়। তাহারা সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, ওজন তিন পোয়ার বেশী নয়।

ছোকরা দলের মধ্যে একটি তরুণ মাছের মনে কিন্তু সুখ নাই। তাহার বিশ্বাস, তাহার মস্তিষ্কে অন্যদের চেয়ে বেশী ঘি আছে; তাই তাহার খেলাধুলা লাফালাফি ভালো লাগে না। যাহা কিছু আনন্দদায়ক তাহাকেই সে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। সে চায় সত্যের সাক্ষাৎ, বাস্তবের অপরোক্ষ অনুভূতি। সমবয়স্ক সঙ্গীদের ক্রীড়া-কৌতুক, রঙ্গ-রস তাহার অত্যন্ত খেলো বলিয়া মনে হয়।

একদিন সে ভাবিয়া চিন্তিয়া পাকা রুইয়ের কাছে গেল।

পাকা রুইয়ের অনেক বয়স; বিজ্ঞ বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। বেশী নড়িতে চড়িতে পারে না; রাঙা গায়ে শ্যাওলা জমিয়াছে। ঝিলের সব চেয়ে গভীর অংশে পাঁকের উপর বসিয়া পাকা রুই দু'একটি বুদ্বুদ ছাড়িতেছিল এবং পলকহীন চক্ষে তাহাদের উর্ধ্বগতি নিরীক্ষণ করিতেছিল; ছোকরা মাছ তাহার কাছে গিয়া বসিল।

চোখ বাঁকাইয়া পাকা রুই ছোকরাকে দেখিল, ল্যাজ একটু নাড়িয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল, 'কি হে ভায়া, এদিকে কি মনে করে?'

banglabooks.in

ছোকরা মাছ কয়েকবার কান্‌কো খুলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস লইল, 'আপনি এত নীচে থাকেন কি করে? আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

পাকা রুই একটু হাসিয়া দুইটি বুদ্বুদ ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিল, 'তোমার এখন বয়স কম, ভায়া, গভীর জলের মর্ম বুঝবে না।—কি চাও বলো?'

ছোকরা বলিল, 'বাস্তবকে জানবার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আপনি বাস্তবের সন্ধান দিতে পারেন?'

ঘোলা চোখ দিয়া পাকা রুই কিছুক্ষণ ছোকরাকে নিরীক্ষণ করিল, 'যে জল-বাতাসে রয়েছ, তাতে বুঝি আর মন উঠছে না?'

ছোকরা বলিল, 'না। আমি চাই উলঙ্গ সত্য—কঠিন বাস্তব; এসব ছেলেখেলা আমার ভালো লাগে না। আপনি শুনেছি জ্ঞানী, ঝিলে আপনার মতো প্রবীণ আর কেউ নেই। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

'বেশ করেছ। আমার পরামর্শ যদি চাও, দলের ছেলে দলে ফিরে যাও।'

'না। আমি বাস্তবের সন্ধান চাই।'

পাকা রুই স্তিমিত নেত্রে কিছুক্ষণ পুচ্ছ স্পন্দিত করিল।

'আমার ঠোঁটের পাশে একটা কালো চিহ্ন দেখছ?'

'দেখছি।'

'ওটা বাস্তবের সীলমোহর। ভাল চাও তো খেলা করো গিয়ে।'

'না। খেলাতে আমার অরুচি, আমি সত্যিকার জীবন-সাক্ষাৎকার চাই।'

পাকা রুই একটা নিশ্বাস ফেলিল, কয়েকটি বুদ্বুদ বাহির হইল।

'বেশ, চলো তবে। আমার কিন্তু দায়-দোষ নেই।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'পশ্চিম দিকের বাঁধাঘাটে; ঐখানেই বাস্তবের আখড়া।'

'কিন্তু, সেদিকে যে যাওয়া বারণ! শুনেছি, মৎস্যপুরাণে লিখেছে, ওদিকে গেলে পাপ হয়।'

'চরম সত্যের সন্ধান পেতে হলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পাপ-পুণ্যের কথা ভুলতে হবে।'

'স্বচ্ছন্দে। আমি ওসব কুসংস্কার ভুলতেই চাই। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।'

পাকা রুই তখন ছোকরাকে লইয়া মন্থরগমনে পশ্চিমের বাঁধাঘাটের দিকে চলিল। পথে কয়েকজন ছোকরা মাছের সঙ্গে দেখা হইল; তাহারা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, 'কিরে, ভুষণ্ডি-বুড়োর সঙ্গে কোথায় চলেছিস্?'

সগর্বে পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া তরুণ বলিল, 'বাস্তবের সন্ধানে।'

ঝিলের পশ্চিম দিকে তখন সূর্যের আলো তেরছা ভাবে পড়িয়া তল পর্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। একটি সূক্ষ্ম সুতো লম্বভাবে স্বচ্ছ জলের মধ্যে ঝুলিতেছে; তাহার প্রান্তে গোলাকৃতি একটি ক্ষুদ্র বস্তু। জলের মৃদু তরঙ্গে সেই ক্ষুদ্র বস্তুটি হইতে একটি অপূর্ব স্বাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

পাকা রুই বেশ খানিকটা দূর হইতে চোখের ঠারে সেই বস্তুটি ছোকরাকে দেখাইয়া বলিল, 'সুতোর ডগায় ঐ যে ঝুলছে দেখছ, ওটি হচ্ছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। ওটি খেলে আর কিছুই জানতে বাকি থাকবে না।'—বলিয়াই পাকা রুই পিছু ফিরিল।

ছোকরা মাছ ছুটিয়া গিয়া টোপ গিলিল। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁচ করিয়া টান! কয়েক মুহূর্ত মধ্যে ছোকরা মাছ ডাঙ্গায় উঠিয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল, 'ওরে বাবারে, গেলুম রে, এ যে নিশ্বাস নিতে পারছি না!'

মানুষের গলা শোনা গেল।

'আরে দূর, এ যে একেবারে চারা মাছ! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, এখনও অনেক বড় হবে—'

আর একজন বলিল, 'চারে বড় মাছ এসেছিল, আমি ভাবলুম বুঝি সেইটেই টোপ গিলেছে—'

banglabooks.in

নির্দয়ভাবে ঠোঁট ছিঁড়িয়া মানুষটা বঁড়শি খুলিয়া লইল। তারপর—ঝপাং! ছোকরা মাছ আবার জলে গিয়া পড়িল।

ঠোঁটের যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাহার মনে হইল—আহা, অমৃত! অমৃত! অমৃত!

ছোকরা মাছ দলে ভিড়িয়া গেল।

সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে, এরি মধ্যে ফিরলি যে! বাস্তব-দর্শন হল?'

ছোকরা বলিল, 'ও কথা যেতে দে।—আয় ভাই, খেলা করি।'

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

লম্পট

হেরম্ববাবু একজন লম্পট।

বয়স পঞ্চতাল্লিশ। এ কার্যে নূতন ব্রতী নহেন; দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বেশ পরিপক্ক হইয়াছেন, সামান্য একটু নলচে আড়াল দিয়া কাজ করিয়া যান। আত্মীয়-বন্ধু এই লইয়া অন্তরালে একটু হাসি-তামাসা টীকা-টিপ্পনী করেন। কিন্তু হেরম্ববাবু কৃতবিদ্য ব্যবসাদার, পয়সাওয়ালা লোক; তাঁহার চরিত্র লইয়া প্রকাশ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার কথা কাহারও মনেই আসে না।

হেরম্ববাবুর লাম্পট্যে রোমান্সের গন্ধমাত্র নাই। পাকা ব্যবসাদারের মতো এ বিষয়ে তিনি লাভ-লোকসানের খতিয়ানের দিকে নজর রাখিয়া চলেন। কত খরচ করিয়া কতখানি আনন্দ ক্রয় করিলে লাভে থাকা যায়, সেদিকে তাঁহার মন সর্বদা সতর্ক থাকে। হেরম্ববাবুর মনস্তত্ত্ব আর খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়ে, তাই যথাসাধ্য ঢাকাঢুকি দিয়া বলিতে হইতেছে। মোট কথা, তিনি একজন পাতি লম্পট।

শহরের নিম্নপ্রান্তে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাড়ায় হেরম্ববাবু একটি ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘরটি ছিল তাঁহার আনন্দভবন; সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একটি রাত্রি তিনি এইখানে যাপন করিতেন। রাত্রি-যাপনের নির্জীব আসবাবপত্র সবই ঘরে মজুত থাকিত; সজীব উপকরণটি আসিত বাহির হইতে। আর কেহ এ ঘরের সন্ধান জানিত না; ইয়ার-বন্ধু লইয়া আমোদ করা হেরম্ববাবুর স্বভাব নয়। এ বিষয়ে তিনি অদ্বৈতবাদী।

একদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া হেরম্ববাবু নিজ আনন্দভবনে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশপূর্বক আলো জ্বালিলেন; চাদরের ভিতর হইতে একটি পাঁট বোতল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন; তারপর দেয়াল-আলমারি হইতে গেলাস, সোডা ও কর্ক্-স্ক্রু লইয়া টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

আজ তাঁহার শরীর ঈষৎ ক্লান্ত, কিন্তু মনের মধ্যে অনেকখানি চঞ্চলতা রহিয়াছে। চঞ্চলতার কারণ, যে অভিসারিকাটির আজ দশটা হইতে সাড়ে দশটার মধ্যে আসিবার কথা,

banglabooks.in

সে সাধারণী নয়। হেরম্ববাবু খেলোয়াড় লোক; অনেক খেলাইয়া মাছটিকে ডাঙায় তুলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, মাছটিও গভীর জলের মাছ।

একপাত্র সোডা-মিশ্রিত সোমরস পান করিবার পর হেরম্ববাবুর ক্লান্তি কাটিয়া গেল, শরীর বেশ চনমনে হইল। তিনি উঠিয়া পাঞ্জাবি ও চাদর খুলিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিলেন, তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সিগারেট ধরাইয়া তিনি আর এক পাত্র ঢালিলেন; চুমুকে চুমুকে তাহাই আস্বাদ করিতে করিতে হাত-ঘড়ি দেখিলেন, পৌনে নয়টা। এখনও অনেক সময়; আগ্রহের প্রাবল্যে আজ হেরম্ববাবু বড় তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ক্ষতি নাই, এরূপ অবস্থায় প্রতীক্ষা করার মধ্যেও বেশ রস আছে।

দ্বিতীয় পাত্রটি শেষ হইবার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, গলা ছাড়িয়া গান করেন কিংবা তবলা বাজান। কিন্তু গলা ছাড়িলে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি টেবিলের উপর টপাটপ তবলা বাজাইতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। তারপর হেরম্ববাবু আর এক পাত্র ঢালিয়া সিগারেট ধরাইলেন। ঘড়িতে দেখিলেন সওয়া-নয়। সময় বড় আস্তে কাটিতেছে; ঘড়ি কানে দিয়া দেখিলেন, চলিতেছে কি না। ঘড়ি টিকটিক করিয়া জানাইল, সে সচল আছে।

ক্রমে বোতলের রং হেরম্ববাবুর চক্ষুতে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, ঘরটি যেন ফিকা গোলাপী ধোঁয়ায় আবছা হইয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন অনাগতা অভিসারিকার কথা...মানস-বিলাসে মনের বল্গা ছাড়িয়া দিলেন।...

বোতলের লালিমা কমিয়া কমিয়া তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। হেরম্ববাবু মানস-বিলাসে ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছেন ও সুরুণী লেহন করিতেছেন।

একটি রমণী নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, হেরম্ববাবু টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন। বোতলটা উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

কাছে আসিয়া রমণী তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ নাড়া দিল। হেরম্ববাবু বিজবিজ করিয়া কিছু বলিলেন, কিন্তু জাগিলেন না; স্বপ্ন-বিলাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বোধ হয় আপত্তি জানাইলেন।

রমণীর দুই অধর-কোণ হাসির অনুকৃতিতে একটু অবনত হইল। সে হেরম্ববাবুকে ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। হেরম্ববাবু বিজবিজ করিয়া আপত্তি করিলেন। কিন্তু রমণী তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া শয্যার কাছে লইয়া গেল এবং সন্তর্পণে শোয়াইয়া দিল। হেরম্ববাবুর বিজবিজ কথাগুলি একটি স্থির হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া অধরে লাগিয়া রহিল।

শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া একান্ত প্রণয়হীন চক্ষে রমণী কিছুক্ষণ তাঁহার পানে তকাইয়া রহিল। শেষে খোঁপা হইতে একটি গোলাপ ফুল লইয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিল; তারপর আলো নিবাইয়া সাবধানে দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে হেরম্ববাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তিনি গত রাত্রির কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। মাথার ভিতরটা বারুদ-ঠাসা বোমার মত হইয়া আছে, কিন্তু স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল। তারপর—?

ম্লান বিমর্দিত গোলাপটি তাঁহার চোখে পড়িল।

হেরম্ববাবু মনের মধ্যে পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন। বাস্তবের স্মৃতি ও মনোবিলাসের স্মৃতি মিলিয়া তাঁহাকে দৃঢ় প্রত্যয় দিল যে, কাল রাত্রিটা ভালোই কাটিয়াছে।

ব্যবসাদার হেরম্ববাবু যে ঠকিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া পড়িলেন। উল্টানো বোতলটার তলায় তখনও কিছু তরলদ্রব্য ছিল, তাহাই পান করিয়া তিনি খোঁয়াড়ি ভাঙিলেন।

৭ আষাঢ় ১৩৫১

banglabooks.in

আরব সাগরের রসিকতা

আরব দেশের হাস্যরসের সহিত পরিচয় নাই; কিন্তু একবার আরব সাগরের রসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

অনেক দিন ধরিয়া আরব সাগরের তীরে বাস করিতেছি, কিন্তু এক দিনও সমুদ্র-স্নান হয় নাই। বন্ধুরা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন। গৃহিণীর আধুনিকা বান্ধবীরাও যে-ভাবে কথা কহিতেছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রুতিমধুর লাগিতেছিল না,—'এত দিন বম্বে-তে আছেন, সী-বেদিং করেননি?...ভয় করে বুঝি? তা করবারই কথা—যারা আগে কখনও সমুদ্র দেখেনি, তাদের ভয় করবে বৈ কি।'

একদিন গৃহিণী বলিলেন, 'ওগো, সমুদ্রে স্নান না করলে আর তো মান থাকে না! চলো এক দিন।'

আমি বলিলাম, 'বেশ তো, চলো। কিন্তু বেদিং কস্টিউম্ কিনতে হবে যে।'

গৃহিণী উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'ওই বেহায়া পোশাক পরে আমি নাইবো? কেটে ফেললেও না।'

'কিন্তু—'

গৃহিণী কিন্তু সতেজে ঐ বিলাতী বর্বরতা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, পদ্মায় স্নান করিয়াছেন—সমুদ্রে তাঁহার ভয় কি? তিনি বাঙালীর কুলবধূ, নিজের চিরাভ্যস্ত সাজ-পোশাকেই স্নান করিবেন। যে যা খুশী বলুক।

ভালই হইল। বেদিং কস্টিউমের আজকাল দাম কম নয়। একটা দম্‌কা খরচ বাঁচিয়া গেল।

সমুদ্র আমার বাড়ি হইতে পোয়াটাক মাইল দূরে। ইতিপূর্বে কয়েক বার বীচে বেড়াইতে গিয়াছি; স্থানটা দেখাশুনা আছে। বেশ নির্জন স্থান; তবে সকালে-সন্ধ্যায় স্নানার্থীর ভিড় হয়। আমরা পরামর্শ করিয়া পরদিন ঠিক দুপুরবেলা বাহির হইলাম। এই সময়টায় ভিড় থাকে না। সমুদ্রের সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা একটু নিভৃতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন জানিতাম না যে, সেদিন ঠিক দুপুরবেলাই জোয়ার আসিবার সময়।

বীচে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দিঙ্‌মণ্ডল পর্যন্ত সমুদ্র যেন মাতাল হইয়া টলমল করিতেছে! বড়-বড় ঢেউ বেলাভূমিকে আক্রমণ করিতেছে, বালুর উপর শুভ্র ফেনের একটা সীমা-রেখা আঁকিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বীচে কেহ নাই। এপাশে ওপাশে অনেক দূরে জলের মধ্যে দু'-একটা মুণ্ড উঠিতেছে নামিতেছে দেখিলাম। বীচের পিছনে নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে একসারি ছোট ছোট কেবিন; যাহারা নিয়মিত সমুদ্র-স্নান করিতে চায়, তাহারা ঐ কেবিন ভাড়া লয়।

এক শ্বেতাঙ্গী যুবতী শিস দিতে দিতে একটি কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গোলাপী রঙের বেদিং কস্টিউম্, মাথায় রবারের টুপি, কোমরে একটি বড় টার্কিশ তোয়ালে জড়ানো। আমাদের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া নৃত্যচঞ্চল চরণে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

গৃহিণী চাপা তর্জনে বলিলেন, 'মরণ নেই বেহায়া ছুঁড়ির! খবরদার বলছি, ওদিকে তাকাবে না!'

হেঁটমুণ্ডে জলের দিকে চলিলাম। গৃহিণী শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াইয়া লইলেন। ভাগ্যক্রমে আমি হাফ্-প্যান্ট পরিয়া আসিয়াছিলাম।

জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া গৃহিণী কিন্তু আর অগ্রসর হইতে চান না। আমারও সুবিধা বোধ হইতেছিল না। কিন্তু এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওদিকে শ্বেতাঙ্গী তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! ঢেউয়ের নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে—

banglabooks.in

যেন গোলাপী রঙের একটি মৎস্যনারী!

গৃহিণীকে বলিলাম, 'এসো, ডাঙায় দাঁড়িয়ে কি সী-বেদিং হয়?

জলের পানে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, 'ঢেউগুলো বড্ড বড় বড়?'

'তা হোক্ না—সমুদ্রের ঢেউ বড়ই হয়। ঐ দেখ না, ও মেয়েটা কেমন ঢেউ খাচ্ছে।'

"আবার ওদিকে তাকাচ্ছ!'

'না না, ও অনেক দূরে আছে। এখান থেকে বিশেষ কিছু দেখা যায় না—এসো।'

হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে জলে লইয়া গেলাম। বেশী নয়, হাঁটু জল পর্যন্ত গিয়াছি কি, বিভ্রাট বাধিয়া গেল! প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল। গৃহিণী পড়িয়া গেলেন; ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঢেউ ফিরিয়া গেলে তিনি হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আর একটা ঢেউ আসিয়া আবার তাঁহাকে আছাড় মারিয়া ফেলিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'ওগো, আমাকে ধরো—আমি যে খালি পড়ে যাচ্ছি! কোথায় গেলে তুমি—আমাকে ফেলে পালালে?'

তাঁহাকে ধরিবার মত অবস্থা আমার ছিল না। প্রথম গোটা দুই ঢেউ অতি কষ্টে সামলাইয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৃতীয় ঢেউটা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। ঢেউয়ের তলায় গড়াইতে গড়াইতে আমি প্রায় ডাঙায় গিয়া উঠিলাম। দু'-এক ঢোক লোণা জলও পেটে গিয়াছিল। কোনমতে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখি, গৃহিণী তখনও এক হাঁটু জলে আছাড় খাইতেছেন! ঢেউগুলা এত দ্রুত পরম্পরায় আসিতেছে যে, তিনি পলাইয়া আসিতে পারিতেছেন না! তাঁহার কণ্ঠ হইতে অনর্গল চীৎকার নিঃসৃত হইতেছে, 'ওগো, কেমন মানুষ তুমি! আমাকে ফেলে পালালে! আমার যে কাপড় খুলে যাচ্ছে—'

শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া দেখি, জলের মধ্যে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে। সত্যই গৃহিণী বিবসনা হইতেছেন! ঢেউগুলা দুঃশাসনের মত ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বসন ধরিয়া টানিতেছে। আঁচল শিথিল হইয়া গেল! আর একটা ঢেউ—তিনি প্রাণপণে শাড়ির প্রান্ত আঁকড়াইয়া আছেন। আর একটা ঢেউ—ব্যস্! নারীর লজ্জা-নিবারণকারী শ্রীমধুসূদন বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন না; দুঃশাসনরূপী আরব সাগর গৃহিণীর শাড়ি কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মরীয়া হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম। অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়া শেষ পর্যন্ত গৃহিণীকে একান্ত নিরাবরণ অবস্থায় ডাঙায় টানিয়া তুলিলাম। তিনি নেহাৎ তন্বী নন—কিন্তু থাক্!

চারিদিক ফাঁকা, কোথাও এতটুকু আড়াল-আবডাল নাই। উপরন্তু ভোজবাজির মত ঠিক এই সময় কোথা হইতে কতকগুলা লোক জুটিয়া গেল! তাহারা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে নিজেদের ভাষায় (সম্ভবত আরবী) মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-কালে পঞ্চপাণ্ডবের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে তাকাইলাম—হে মধুসূদন, তুমি কত দূরে!

হঠাৎ দেখি, দূর হইতে শ্বেতাঙ্গী মেয়েটা ছুটিয়া আসিতেছে। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে তাহার বড় তোয়ালেখানা গৃহিণীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।...

সেদিন তোয়ালে-পরিহিতা গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কি করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সে প্রশ্ন করিয়া পাঠক-পাঠিকা আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে মনে চোখ বুজিয়া থাকেন।

১৮ আষাঢ় ১৩৫১

banglabooks.in

এপিঠ ওপিঠ

তরুণ আই-সি-এস্ সুখেন্দু গুপ্ত প্রেমে পড়িয়াছে; তাহার ইস্পাতের ফ্রেমে-আঁটা মজবুত হৃদয় নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে।

শুধু প্রেমে পড়িলে দুঃখ ছিল না; কিন্তু এই চিত্তবিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন সে ডুবিয়া ডুবিয়া কয়েক ঢোক জল খাইয়াছিল, সেই অনুতাপের জ্বালা আজ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

সুখেন্দু ছেলে খারাপ নয়। তবে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, অতিবড় সাধু ব্যক্তিরও মাঝে মাঝে পা পিছলাইয়া যায়। বিশেষত বিলাতে পথঘাট একটু বেশী পিছল; তাই সুখেন্দুর পদস্খলনকে আমাদের উদার-চক্ষে দেখিতে হইবে। আমাদের একটা বদ্অভ্যাস আছে, ঐ জাতীয় ত্রুটিকে আমরা একটু বড় করিয়া দেখি এবং ক্রমাগত সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে থাকি। যাঁহারা বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু এ বিষয়ে ঢের বেশী সংস্কার-মুক্ত।

যাহোক, সুখেন্দুর মনস্তাপ যে আন্তরিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে সে গোটা হৃদয় লইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। তারপর তিন বছর কাটিয়াছে; হৃদয় কোনও গোলমাল করে নাই। বাংলাদেশের এক মহকুমায় সগৌরবে রাজত্ব করিতে করিতে অন্য এক মহকুমায় বদলি হওয়া উপলক্ষে কিছুদিনের ছুটি পাইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এখানে আসিয়াই তাহার হৃদয় হঠাৎ জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

যুবতীটির নাম এণা; বাংলা সরকারের একজন মহামান্য অফিসারের কন্যা। বয়স কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে—তন্বী, রূপসী, কুহকময়ী—এণা সত্যই অনন্যা। সে গভর্নরের পার্টিতে বল্‌নাচ নাচিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোথাও প্রগল্ভতার ইসারা পর্যন্ত নাই; কথায়-বার্তায় সে পরম নিপুণা, কিন্তু তাহার প্রকৃতিটি বড় মোলায়েম; সে ইংরেজীতে রসিকতা করিতে পারে, আবার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী গাহিয়া চিত্তহরণ করিতেও জানে। দর্পণে সে যে-দেহটি দেখিতে পায় তাহা যৌবনের অকলঙ্ক লাবণ্যে ঝলমল, কিন্তু দর্পণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না সেই অন্তরটি কত নিবিড় রহস্যের জালে ছায়াময় হইয়া আছে তাহা কে অনুমান করিবে?

প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন্দু ঘাড় মুচড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর কোনও আশা ছিল না। ওদিকে অপর পক্ষও একেবারে অনাহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সুখেন্দু অতি সুপুরুষ এবং অত্যন্ত স্মার্ট্; কোনও দিক দিয়াই তাহার যোগ্যতায় এতটুকু খুঁত ছিল না। তাই অন্তরের গহন বনে এণাও বিলক্ষণ ঘা খাইয়াছিল।

তারপর আলাপ যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, দুজনের মধ্যে আকর্ষণও তেমনি দুর্নিবার হইয়া উঠিল। মুখের কথা যখন সাধারণ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে, চোখের ভাষা তখন আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত হইয়া উঠে। চোখের ভাষা নীরব হইলে কি হইবে, উহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সুখেন্দু দেখিতে পায়, এণার নরম চোখ দুটি মিনতিভরা উৎকণ্ঠায় তাহার স্বীকারোক্তির প্রতীক্ষা করিয়া আছে; এণা দেখে, সুখেন্দুর ঠোঁটের কাছে কথাগুলি কাঁপিতেছে, কিন্তু তাহারা আবেগের বাঁধনহারা প্লাবনে বাহির হইয়া আসে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। সুখেন্দু বিরসমুখে অন্য কথা পাড়ে।

এইভাবে কয়েকটা অন্তর্গূঢ় অগ্নিগর্ভ দিন কাটিয়া গেল, সুখেন্দুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল।

আর সময় নাই; দুদিন পরেই তাহাকে কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অথচ যে কথাটি বলিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় মন্থন করিয়া অনুতাপের হলাহল বাহির হইয়াছে। যতবার সে বলিবার জন্য মুখ খুলিয়াছে ততবার বিবেক আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

banglabooks.in

গ্র্যান্ড হোটেলে নিজের কক্ষে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে করিতে সুখেন্দু ভাবিতে-ছিল, 'কী করি! আমি জানি ও আমাকে চায়—কিন্তু ওকে ঠকাবো? না না, অনাঘ্রাত ফুলের মত ওর মন, অনাবিদ্ধ রত্নের মত ওর দেহ। আর আমি! না—কিছুতেই না।'

মন স্থির করিয়া সুখেন্দু চিঠি লিখিতে বসিল। মুখে যাহা ফুটি-ফুটি করিয়াও ফোটে না, কাগজে কলমে তাহা ভালই ফোটে।

'—আমি তোমাকে ভালবাসি।

'একথা জানতে তোমার বাকি নেই। আমিও তোমার চোখের নীরব বার্তা পেয়েছি, বুঝতে পেরেছি তোমার মন। কিন্তু তবু মুখ ফুটে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারিনি। আমার অপরাধী মন কুণ্ঠায় নীরব থেকেছে।

'তোমাকে আমি ঠকাতে পারব না। যা কোনও দিন কারুর কাছে স্বীকার করিনি, আজ তোমাকে জানাচ্ছি। বিলেতে যখন ছিলুম, তখন একেবারে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করতে পারিনি। কিন্তু তখন তো তোমাকে চিনতুম না। ভাবিও নি যে তোমার দেখা পাব।

'ক্ষমা করতে পারবে না কি? শুনেছি ভালবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে। যদি ক্ষমা করতে পারো, চিঠির জবাব দিও। যদি না পারো—বিদায়। আমার হৃদয় চিরদিন তোমারই থাকবে।'

চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া সুখেন্দু হোটেলেই বসিয়া রহিল; সেদিন আর কোথাও বাহির হইতে পারিল না।

পরদিন বিকালে চিঠির উত্তর আসিল।

'—তুমি এসো—শীগ্‌গির এসো। দু'দিন তোমাকে দেখিনি।

'তুমি তোমার মনের গোপন কথা বলতে পেরেছ—তাতে আমারও মনের রুদ্ধ কবাট আজ খুলে গেছে। আজ আর আমার লজ্জা নেই; নিজের মন দিয়ে বুঝেছি, ভালবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।

'আমিও জীবনে একবার ভুল করেছি। কিন্তু আজ তা মনে হচ্ছে কোন্ জন্মান্তরের দুঃস্বপ্ন।

'তুমি লিখেছ তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমিও পারলুম কই? আর ক্ষমা! তুমি এসো—তখন ক্ষমার কথা হবে।'

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মেল ট্রেন রাত্রির অন্ধকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় সুখেন্দু নিজের বাঙ্কে শুইয়া একদৃষ্টে আলোর পানে তাকাইয়া আছে; নির্বাপিত পাইপটা ঠোঁটের কোণ হইতে ঝুলিতেছে।

গভীর রাত্রি; কামরায় আর কেহ নাই।

সুখেন্দু পাইপটা বালিশের তলায় রাখিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিল। তারপর যেন অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, 'বাপ্! খুব বেঁচে গেছি!'

৬ শ্রাবণ ১৩৫১

banglabooks.in

ঝি

বংশে সাত পুরুষে কেহ চাকরি করে নাই, তাই প্রথম চাকরি পাইয়া ভয় হইয়াছিল, না জানি কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভাগ্যে আছে।

মর্চেন্ট আপিসে কেরানির চাকরি। যাঁহার চেষ্টায় ও সুপারিশে চাকরি পাইয়াছিলাম তিনি আপিসের বড়বাবু, আমার পিতৃবন্ধু—নাম গণপতি সরকার। ভেল্‌কি-টেল্‌কি দেখাইতে পারিতেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সহজেই চাকরি জুটিয়াছিল। এমন কি আমাকে কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিতে হয় নাই।

গণপতিবাবুর চেহারাটি ছিল তাঁহার পাকানো উড়ানি চাদরের মতই ধোপদুরস্ত এবং শীর্ণ নমনীয়তায় বঙ্কিম; তাঁহাকে নিংড়াইলে এক বিন্দু রস বাহির হইবে এমন সন্দেহ কাহারও হইত না। ক্রমশ জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি বিলক্ষণ রসিক লোক, কিন্তু তাঁহার সরসতা ছিঁচকে চোরের মত এমন অলক্ষ্যে যাতায়াত করিত যে সহসা ধরা পড়িত না।

তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিবার পর তিনি মাঝে মাঝে মুখের বামভাগে একপ্রকার ভঙ্গী করিতেন; তাহাতে তাঁহার অধরোষ্ঠের প্রান্ত হইতে চোখের কোণ পর্যন্ত গালের উপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাঁজ পড়িয়া যাইত। এই ভঙ্গীটাকে হাসিও বলা যায় না, মুখ-বিকৃতি বলিলেও ঠিক হয় না—

যেদিন প্রথম আপিস করিতে গেলাম, গণপতিবাবু আমার সাজ-পোশাক পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আর সব ঠিক আছে, কিন্তু লপেটা চলবে না; কাল থেকে শু পরে আসবে। চলো, তোমাকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। সাহেবের সামনে বেশী কথা কইবে না; তিনি যদি রসিকতা করেন, বিনীতভাবে মুচ্‌কি হাসবে।'

বলিয়া তিনি গালের ভঙ্গী করিলেন।

বেশ ভয়ে ভয়েই সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া কিন্তু একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। সাহেব মোটেই নয়—ঘোরতর কালা আদমি। চণ্ডীর মহিষাসুরকে জলজ্যান্ত নরমূর্তিতে কল্পনা করিলে ইঁহার চেহারাখানা অনেকটা আন্দাজ করা যায়; বেঁটে, মোটা, গজস্কন্ধ, চক্ষু দুটি কুঁচের মত লাল, তাহার উপর বিলাতী পোশাক পরিয়া অপূর্ব খোলতাই হইয়াছে! বয়স অনুমান করা কঠিন, তবে চল্লিশের নিচেই। প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একমুখ পান চিবাইতেছেন এবং দেশলায়ের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছেন।

পরে জানিতে পারিয়াছিলাম মিস্টার ঘনশ্যাম ঘোষ একজন অতি তুখড় ও কর্মনিপুণ ব্যবসায়ী, বছরে বার দুই বিলাত যান; সেখানে কোম্পানির বিলাতী কর্তৃপক্ষ তাঁহার কথায় ওঠে বসে। বস্তুত, বিলাতী সওদাগরী আপিসে একজন বাঙালীর এমন অখণ্ড প্রতাপ আর কখনও দেখা যায় নাই।

আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ব্যবহার করিলেন যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভয় তো দূর হইলই, ইনি যে একজন অত্যন্ত কদাকার ব্যক্তি একথাও আর মনে রহিল না। কথার অমায়িকতায় মুহূর্ত মধ্যে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন।

'এই যে বড়বাবু, এটি বুঝি আপনার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট? বেশ বেশ।...দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে?—বসো।...বড়বাবু, আপনি আপনার কাজে যান না...বিয়ে করেছ? বেশ বেশ, আরে, তোমাদেরই তো বয়েস। এখন চাকরি হল, আর কি! মন লাগিয়ে কাজ করবে—ব্যস, দেখতে দেখতে উন্নতি; আমার আপিসে কাজের লোক পড়ে থাকে না...নাও, পান খাও... আরে, লজ্জা কিসের? তোমরা হলে ইয়ং ব্লাড, নতুন বিয়ে করেছ, পান খাও তা কি আর আমি জানি না? আমার আপিসে ডিসিপ্লিনের অত কড়াকড়ি নেই...নাও নাও—হে হে হে...'

তারপর সুখস্বপ্নের মত দিনগুলি কাটিতে লাগিল। চাকরি যে এত মধুর তাহা কোনদিন কল্পনা করি নাই। কাজকর্ম এমন কিছু নয়, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দু'ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দিনের কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে পারে। তারপর অখণ্ড অবসর,

banglabooks.in

সমবয়স্ক সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প-গুজব, বারান্দায় গিয়া সিগারেট টানা। কর্তা প্রায়ই ডাকিয়া পাঠান; তাঁহার সামনে চেয়ারে গিয়া বসি, তিনি পান দেন, খাই, কখনও বাড়ি হইতে ভাল পান সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিই। তিনি খুশী হইয়া খুব রঙ্গতামাশা করেন; কখনও বা রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার হাসি-তামাশা একটু আদিরস-ঘেঁষা হইলেও ভারি উপাদেয়। বস্তুত, তিনি যে অত্যন্ত নিরহংকার অমায়িক প্রকৃতির মানুষ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না।

গণপতিবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন, 'ওহে বাবাজী, একটু সামলে চলো। কর্তা তোমাকে ভাল নজরে দেখেছেন খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু যতটা রয়-সয় ততটাই ভাল। আস্কারা পেয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলো না—নিজের পোজিশন বুঝে চলো। কর্তা লোক খারাপ নয়, কিন্তু কথায় বলে—বড়র পিরিতি বালির বাঁধ...'

লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কর্তার সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ একেবারে খাঁটি রাখিয়াছিলেন! কর্তা তাঁহার সহিতও হাস্য-পরিহাস করিতেন, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি ছাড়া আর কোন উত্তরই দিতেন না।

মাস তিনেক কাটিবার পর একদিন দুপুরবেলা অবকাশের সময় কর্তার ঘরে গিয়াছি; ঘরে পা দিয়াই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলাম। কর্তা নিজের চেয়ারে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন, আমার সাড়া পাইয়া চোখ তুলিলেন। তাঁহার চোখ দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। জবাফুলের মত লাল চোখে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কি চাও? এ ঘরে তোমার কি দরকার?'

তাঁহার এ-রকম কণ্ঠস্বর কখনও শুনি নাই, থতমত খাইয়া গেলাম, 'আজ্ঞে—আমি...'

তিনি লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিলেন, 'পান চিবুতে চিবুতে পাঞ্জাবি উড়িয়ে আপিস করতে এসেছ ছোকরা? এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি পেয়েছ বটে! গায়ে ফুঁ দিয়ে ইয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিই? যাও টুলে বসে কাজ করোগে। তোমার মত পুঁচকে কেরানি খবর না দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে কোন্ সাহসে? ফের যদি এ-রকম বেচাল দেখি, দূর করে দেব...'

হোঁচট খাইতে খাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।—এ কি হইল?

নিঃসাড়ে নিজের জায়গায় গিয়া বসিলাম। অভিভূতের মত আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

আমি নূতন লোক, তাই বড়বাবুর পাশেই আমার আসন। চোখ তুলিয়া দেখিলাম তিনি গভীর মনঃসংযোগে খস্‌খস্ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, আর সকলে নিজ নিজ কাজে মগ্ন, কেহ মাথা তুলিতেছে না। আমি কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কি হয়েছে, কাকাবাবু?'

তিনি লেখা হইতে চোখ না তুলিয়াই চাপা গলায় বলিলেন, 'কাজ করো—কাজ করো...'

সেদিন সন্ধ্যার পর গণপতিবাবুর বাসায় গেলাম। তক্তপোশের উপর বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, সদয়কণ্ঠে বলিলেন, 'এসো বাবাজী।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; লজ্জায় ধিক্কারে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শেষে অতি কষ্টে বলিলাম, 'কি হয়েছে আমায় বলুন। আমার কি কোন দোষ হয়েছে?'

তিনি বলিলেন, 'না—তোমার আর দোষ কি? তবে বলেছিলুম, বড়র পিরিতি বালির বাঁধ...'

'এর মধ্যে কোনও কথা আছে। আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, কাকাবাবু।'

তিনি কিছুক্ষণ একমনে ধূমপান করিলেন।

'খুলে বলবার মত কথা নয়, বাবাজী।'

banglabooks.in

'না, আপনাকে বলতে হবে। কেন উনি আজ আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করলেন?'

তিনি দীর্ঘকাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন; কেবল তাঁহার গালে মাঝে মাঝে খাঁজ পড়িতে লাগিল।

'বলুন কাকাবাবু!'

'তুমি ছেলের মত, তোমার কাছে বলতে সংকোচ হয়। আসল কথা—ঝি।' বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; তাঁহার গালে একটা বড় রকমের খাঁজ পড়িল।

কিন্তু—ঝি! কথাটা ঠিক শুনিয়াছি কি না বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বললেন—ঝি?'

গণপতিবাবু ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, ক'দিন থেকে বড় সাহেবের মন ভাল যাচ্ছে না...আয়া জানো—আয়া? যে-সব ঝি সাহেবদের ছেলে মানুষ করে? আমাদের বড় সাহেবের ছেলের আয়া হপ্তাখানেক হল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

মাথা গুলাইয়া গেল; গণপতিবাবু এ সব আবোল-তাবোল কি বলিতেছেন? বুদ্ধি-ভ্রষ্টের মত বলিলাম, 'কিন্তু—কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।'

গণপতিবাবু তখন বুঝাইয়া দিলেন। স্পষ্ট কথায় অবশ্য কিছুই বলিলেন না, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে, অর্ধপূর্ণ ভ্রূ-বিলাসে, সময়োচিত নীরবতায় এবং গালের বিচিত্র ভঙ্গী-দ্বারা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সংক্ষেপে ব্যাপার এই—আমাদের বড় সাহেব বছর তিনেক আগে বিপত্নীক হন; তাঁহার পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই মারা যান। তারপর হইতে শিশুকে লালনপালন করিবার জন্য ঝি—অর্থাৎ আয়া রাখা হয়। সেই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ঘনশ্যামবাবু অত্যন্ত যত্নসহকারে ঝি নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও কারণে ঝি মনের মত না হইলে, কিংবা ছাড়িয়া গেলে সাহেবের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, এমন কি তাঁহার স্বভাবই একেবারে বদলাইয়া যায়। গত কয়েক মাস একটি ক্রিশ্চান যুবতী কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ বিবাহ করিবার অজুহাতে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; অথচ মনের মত নূতন ঝি পাওয়া যাইতেছে না। তাই এই অনর্থ।

থ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এও কি সম্ভব! এই কারণে মানুষের চরিত্রে এমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু গণপতিবাবু তো গুল মারিবার লোক নহেন। তবু এক সংশয় মনে জাগিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিন্তু উনি আবার বিয়ে করেন না কেন?'

এ প্রশ্নের সদুত্তর গণপতিবাবু দিলেন।—ঘনশ্যামবাবুর শ্বশুর অদ্যাপি জীবিত; তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রকাণ্ড জমিদার। তাঁহার সন্তানসন্ততি কেহ জীবিত নাই, এই দৌহিত্রই—অর্থাৎ ঘনশ্যামবাবুর পুত্রই—তাঁহার উত্তরাধিকারী। কিন্তু শ্বশুরমহাশয় জানাইয়া দিয়াছেন যে, জামাতা বাবাজী যদি পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া এক দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়কে সেবায়েত নিযুক্ত করিবেন।

সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। তবু একটা গোলচোখো রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিল। এমন সব ব্যাপার যে দুনিয়ায় ঘটিয়া থাকে তাহার অভিজ্ঞতা তখন একেবারেই ছিল না।

তারপর পাঁচ ছয় দিন কাটিল। আপিসে যতক্ষণ থাকি, কাঁটা হইয়া থাকি; কি জানি কখন আবার মাথার উপর হুড়মুড় শব্দে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে! ইতিমধ্যে দু'-তিন জন সহকর্মীর সামান্য ত্রুটির জন্য অশেষ লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে। চাকরি যে কী বস্তু তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেদিন আপিসে গিয়া সবেমাত্র নিজের আসনে বসিয়াছি, আর্দালি আসিয়া খবর দিল বড় সাহেব তলব করিয়াছেন। প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। এই রে, না জানি কোথায় কি ভুল করিয়া বসিয়াছি, আজ আর রক্ষা নাই!

ফাঁসির আসামীর মত কর্তার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া

banglabooks.in

হেঁটমুখে দেরাজ হইতে কি একটা বাহির করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভাল জর্দা আনিয়েছি—দেখ দেখি খেয়ে; মুক্তো-ভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড় গরম জিনিস!—হে হে হে...'

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া এই ভাবে চলিল—যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়। ইনি যে কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে পারেন তাহা কল্পনা করাও কঠিন। কোথায় সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র দৃষ্টি, কোথায় সে কর্কশ দুঃসহ গলার আওয়াজ! তিনি আবার আমাকে তাঁহার সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি মন্দ লোক একথা আর কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিতে বসিতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিলাম, 'কাকাবাবু, ব্যাপার কি?'

গণপতিবাবুর কলমে একগাছি চুল জড়াইয়া গিয়াছিল; সেটিকে নিব্ হইতে সন্তর্পণে মুক্ত করিয়া তিনি অবিচলিতভাবে আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই ঘষা গলায় বলিলেন, 'কি পাওয়া গেছে।'

বলিয়া গালের ভঙ্গী করিলেন।

৪ অগ্রহায়ণ ১৩৫১

অসমাপ্ত

কয়েক জন নবীন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল।

তিনি অর্ধমুদিত নেত্রে গড়গড়ার নলে একটি দীর্ঘ টান দিলেন; কিন্তু যে পরিমাণ টান দিলেন, সে পরিমাণ ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন নল রাখিয়া তিনি বলিলেন—

'আজকাল তোমাদের লেখায় 'প্রকৃতি' কথাটা খুব দেখতে পাই। পরমা প্রকৃতি এই করলেন; প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এই হল, ইত্যাদি। প্রকৃতি বলতে তোমরা কি বোঝো তা তোমরাই জানো; বোধ হয় ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, তাই প্রকৃতি নাম দিয়ে একটা নূতন দেবতা তৈরি করে তার ঘাড়ে সব কিছু চাপিয়ে দিতে চাও। ভগবানের চেয়ে ইনি এককাঠি বাড়া, কারণ ভগবানের দয়া-মায়া আছে, ধর্মজ্ঞান আছে। তোমাদের এই প্রকৃতিকে দেখলে মনে হয়, ইনি একটি অতি আধুনিকা বিদুষী তরুণী—গ্রেড্ পড়েছেন এবং কুসংস্কারের কোনও ধার ধারেন না। মানুষের ভাগ্য ইনি নির্দয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করছেন, অথচ মানুষের ধর্ম বা নীতির কোনও তোয়াক্কা রাখেন না।

এই অত্যন্ত চরিত্রহীন স্ত্রীলোকটির তোমরা নাম দিয়েছ—প্রকৃতি। এঁকে আমি বিশ্ব-সংসারে অনেক সন্ধান করেছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। একটা অন্ধ শক্তি আছে মানি, কিন্তু তার বুদ্ধি-সুদ্ধি আক্কেল-বিবেচনা কিছু নেই। পাগলা হাতীর মত তার স্বভাব,

banglabooks.in

সে খালি ভাঙতে জানে, অপচয় করতে জানে। তার কাজের মধ্যে কোনও নিয়ম আছে কি না কেউ জানে না; যদি থাকে তাও তোমাদের ঐ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত—অর্থাৎ নিয়ম আছে বটে কিন্তু তার কোন মানে হয় না।'

চাকর কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, শরৎচন্দ্র নলে মৃদু মৃদু টান দিলেন।—

'সব চেয়ে পরিতাপের কথা তোমাদের প্রকৃতি আর্টিস্ট নয়; কিংবা তোমাদের মত আর্টিস্ট। তার সামঞ্জস্য-জ্ঞান নেই, পূর্বাপর জ্ঞান নেই। কোথায় গল্প আরম্ভ করতে হবে জানে না, কোথায় শেষ করতে হবে জানে না, নোংরামি করতে এতটুকু লজ্জা নেই, মহত্ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই—ছন্নছাড়া নীরস একঘেয়ে কাহিনী ক্রমাগত বলেই চলেছে। একই কথা হাজার বার বলেও ক্লান্তি নেই। আবার কখনও একটা কথা আরম্ভ হতে না হতে ঝপাং করে শেষ করে ফেলছে। মূঢ়—বিবেকহীন—রসবুদ্ধিহীন—

একবার একটা গল্প বেশ জমিয়ে এনেছিল; ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ভণ্ডুল করে ফেললে।

গল্পটা বলি শোনো। গৃহদাহ পড়েছ তো, কতকটা সেই ধরনের; তফাৎ এই যে, এ গল্পটা বলেছিল তোমাদের প্রকৃতি—অর্থাৎ সত্য ঘটনা।

পানা-পুকুরের তলায় যেমন পাঁক, আর ওপরে শ্যাওলা, সমাজেরও তাই। পাঁক কুশ্রী হোক, তবু সে ফসল ফলাতে পারে; শ্যাওলার কোনও গুণ নেই। নিষ্ফলতার লঘুত্ব নিয়ে এরা শুধু জলের ওপর ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু তাই বলে এদের জীবনে তীব্রতার কিছুমাত্র অভাব নেই। বরঞ্চ কৃত্রিম উপায়ে এরা অনুভূতিকে এমন তীব্র করে তুলেছে যে, পঞ্চরংয়ের নেশাতেও এমন হয় না। সত্যিকার আনন্দ কাকে বলে তা এরা জানে না, তাই প্রবল উত্তেজনাকেই আনন্দ বলে ভুল করে; সত্যের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই, তাই স্বেচ্ছাচারকেই এরা পরম সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

ভূমিকা শুনে তোমরা ভাবছ গল্পটা বুঝি ভারি লোমহর্ষণ গোছের একটা কিছু। মোটেই তা নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে চিরন্তন ত্রিভুজ, এও তাই—অর্থাৎ দুটি যুবক এবং একটি যুবতী। সেই সুরেশ, মহিম আর অচলা।

কিন্তু এদের চরিত্র একেবারে আলাদা। এ গল্পের অচলাটি সুন্দরী কুহকময়ী হ্ল্যাদিনী—হৃদয় বলে তাঁর কিছু ছিল কি না তা তোমাদের প্রকৃতি দেবীই বলতে পারেন। ছিল ভোগ করবার অতৃপ্ত তৃষ্ণা, আর ছিল ঠমক, মোহ, প্রগল্‌ভতা—পুরুষের মাথা খাওয়ার সমস্ত উপকরণই ছিল।

ওদিকে মহিম ছিল দুর্দান্ত একরোখা গোঁয়ার; যুদ্ধের মরসুমে সে টাকা করেছিল প্রচুর—ধনকুবের বললেও চলে। আর সুরেশ ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ, ভয়ানক কুচুটে—কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে মধ্যবিত্ত। টাকার দিক দিয়ে মহিমের সঙ্গে যেমন তার তুলনা হত না, চেহারার দিক দিয়ে তেমনি তার সঙ্গে মহিমের তুলনা হত না। দুজনে দুজনকে হিংসে করত, বাইরে লৌকিক ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের সম্পর্কটা ছিল সাপে-নেউলে।

এই তিনজনকে নিয়ে পানা-পুকুরের ওপর ত্রিভুজ রচনা হল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। কিছুদিন অচলা এদের দুজনকে খেলালে, তার পর ঠিক করে নিলে কাকে বেশী দরকার। সেকালে কি ছিল জানি না, কিন্তু আজকালকার দিনে যদি কুবের আর কন্দর্প কোনও রাজকন্যের স্বয়ংবর-সভায় আসতেন, তাহলে কুবেরের গলাতেই মালা পড়ত, কন্দর্পকে তীরধনুক গুটিয়ে পালাতে হত।

মহিমের সঙ্গেই অচলার বিয়ে হল। সুরেশ বেশ হাসিমুখে পরাজয় স্বীকার করে নিল; কারণ সে বুঝেছিল, এ পরাজয় শেষ পরাজয় নয়, মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম চক্কর মাত্র। হয়তো সে অচলার চোখের চাউনি থেকে কোনও আভাস পেয়েছিল।

একটা কথা বলি। প্রেমিকেরা চোখের ভাষা বুঝতে পারে, এমনি একটা ধারণা আছে—একেবারে মিথ্যে ধারণা। প্রেমিকেরা কিচ্ছু বোঝে না। স্ত্রীজাতির চোখের ভাষা বুঝতে

banglabooks.in

পারে শুধু লম্পট।

বিয়ের পরে একদিন মহিমের বাগানে চায়ের জলসা ছিল। জমজমাট জলসা, তার মাঝখানে সুরেশ বললে, "মহিম, তুমি শুনে সুখী হবে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তবে নেহাৎ সিপাহী সেজে নয়; ঠিক করেছি পাইলট হয়ে যাব।"

একটু শ্লেষ করে মহিম বললে, "তাই না কি! এ দুর্মতি হল যে হঠাৎ?"

সুরেশ হেসে উত্তর দিলে, "হঠাৎ আর কি, কিছুদিন থেকেই ভাবছি। এ যুদ্ধটা তো তোমার আমার মত লোকের জন্যেই হয়েছে; অর্থাৎ আমার মত লোক যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর তোমার মত লোক টাকার পিরামিড তৈরি করবে।"

মহিমের মুখ গরম হয়ে উঠল, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারলে না। সে ভারী একরোখা লোক কিন্তু মিষ্টভাবে কথা কাটাকাটিতে পটু নয়।

আকাশে একটা এরোপ্লেন উড়ছিল; তার পানে অলস কটাক্ষপাত করে সুরেশ বললে, "আমার পাইলটের লাইসেন্স আছে কিন্তু প্লেন নেই। তোমার প্লেনটা ধার দাও না—যুদ্ধ করে আসি। যদি ফিরি প্লেন ফেরৎ পাবে; আর যদি না ফিরি, তোমার এমন কিছু গায়ে লাগবে না। বরং নাম হবে।"

রাগে মহিম কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে রইল, তারপর কড়া একগুঁয়ে সুরে বলে উঠল, "তোমাকে প্লেন ধার দিতে পারি না, কারণ আমি নিজেই যুদ্ধে যাব ঠিক করেছি।"

বলা বাহুল্য, দু'মিনিট আগেও যুদ্ধে যাবার কল্পনা তার মনের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না।

মাস দুয়ের মধ্যে মহিম সব ঠিক-ঠাক করে এরোপ্লেনে চড়ে যুদ্ধে চলে গেল। যাবার সময় উইল করে গেল, সে যদি না ফেরে অচলা তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

সুরেশের কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া হল না। বোধ করি, ধারে এরোপ্লেন পাওয়া গেল না বলেই তার যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জন দেওয়া ঘটে উঠল না।

বর্মার আকাশে তখন যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বাজছে; বেঁটে বীরেরা হু-হু করে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষেও গেল-গেল রব। যারা পালিয়ে আসছে তাদের মুখে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প।

মহিম ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। তিন মাস কাটল। এ দিকে মহিমের বাড়িতে প্রায় প্রত্যহই উৎসব চলেছে; গান-বাজনা নাচ নৈশ-ভোজন। স্বামীর কথা ভেবে ভেবে অচলার মন ভেঙ্গে না পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তো! সেদিকে সুরেশ খুবই দৃষ্টি রাখে, সর্বদাই সে অচলার সঙ্গে আছে। দুপুর রাত্রে যখন আর সব অতিথিরা চলে যায়, তখনও সুরেশ অচলাকে আগলে থাকে। যেদিন অতিথিদের শুভাগমন হয় না, সেদিন সুরেশ একাই অচলার চিত্তবিনোদন করে। ক্রমে লোকলজ্জার আড়াল-আবডালও আর কিছু থাকে না, তোমাদের প্রকৃতি দেবী ব্যাপারটাকে নিতান্ত নির্লজ্জ এবং শ্রীহীন করে তোলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহিম নিয়মিত চিঠি পায়, বন্ধু-বান্ধবের চিঠি, অচলার চিঠি। বন্ধু-বান্ধবের চিঠিতে ক্রমে ক্রমে নানা রকম ইসারা-ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল। নিতান্ত ভাল মানুষের মত তাঁরা অচলার জীবনযাত্রার যে বর্ণনা লিখে পাঠান তার ভিতর থেকে আসল বক্তব্যটা ফুটে ফুটে বেরোয়। মহিম গোঁয়ার বটে কিন্তু নির্বোধ নয়; সে বুঝতে পারে। অচলার চিঠিতে মামুলি শুভাকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের বাঁধা গৎ ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকে না, তাও ক্রমশঃ এমন শিথিল হয়ে আসতে লাগল যে মনে হয়, ঐ মামুলি বাঁধা গৎ লিখতেও অচলার ক্লান্তিবোধ হয়। মহিমের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। সে মনে মনে গর্জাতে লাগল।

সে ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাল, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হল না। যুদ্ধের অবস্থা সঙীন; এখন কেউ ছুটি পাবে না।

এই সময় মিত্রপক্ষের এক দল বিমান শত্রুর একটা ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান করল। মহিমকে যেতে হল সেই সঙ্গে। তুমুল আকাশ-যুদ্ধ হল। মিত্রপক্ষের কয়েকটা বিমান ফিরে

banglabooks.in

এল, কিন্তু মহিম ফিরল না। তার জ্বলন্ত প্লেনখানা উল্কার মত যুদ্ধের আকাশে মিলিয়ে গেল।

মহিমের মৃত্যু-সংবাদ যখন কলকাতায় পৌঁছল, তখন পানা-পুকুরের মাঝখানে ঢিল ফেলার মত বেশ একটা তরঙ্গ উঠল। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়, আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অচলা কালো রঙের শোক-বেশ পরল কিছু দিনের জন্য, তারপর মহিমের উইল অনুসারে আদালতের অনুমতি নিয়ে তার সম্পত্তির খাস মালিক হয়ে বসল। সুরেশ এত দিন একটা আলাদা বাড়ি রেখেছিল, এখন খোলাখুলি এসে মহিমের বাড়িতে বাস করতে লাগল। যার টাকা আছে তাকে শাসন করে কে? দু'জনে মিলে এমন কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে যা দেখে বোধ করি 'ভেলু'রও লজ্জা হয়।

মহিম কিন্তু মরেনি। তার আহত প্লেনখানা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে এসে আসামের জঙ্গলের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল। মহিমের চোট লেগেছিল বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। তারপর সে কি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আশী মাইল হাঁটা-পথ চলে শেষ পর্যন্ত রেলপথে কলকাতা এসে পৌঁছল, তার বিশদ বর্ণনা করতে গেলে শিশু-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, সে কলকাতায় ফিরে এল। সে যে মরেনি এ খবর সে মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে জানাল না; তার বেঁচে থাকার খবর কেউ জানল না।

কলকাতায় এসে সে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে ছদ্মনামে ঘর ভাড়া করে রইল।

সেই দিনই সে সংবাদপত্রে একটা খবর দেখল—মহিমের বিধবা স্ত্রী রেজেস্ট্রি অফিসে সুরেশকে বিয়ে করেছে, আজ রাত্রে তার বাড়িতে এই উপলক্ষে ভোজ। শহরের গণ্যমান্য সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

মহিম ঠিক করল, আজ রাত্রে ভোজ যখন খুব জমে উঠবে, তখন সে গিয়ে দেখা দেবে।

ভেবে দেখো ব্যাপারটা। চরিত্রহীনা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর দু'মাস যেতে না যেতেই স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিয়ে করেছে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্বামী চলেছে প্রতিশোধ নিতে। গল্প জমাট হয়ে একেবারে চরম ক্লাইম্যাক্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর কি হল বল দেখি?

কিছুই হল না।

মহিম সন্ধ্যার পর নিজের বাড়িতে যাবার জন্য যেই রাস্তায় পা দিয়েছে অমনি এক মিলিটারি লরি এসে তাকে চাপা দিলে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল, তার মুখখানা এমনভাবে থেঁতো হয়ে গেল যে, তাকে সনাক্ত করবার আর কোনও উপায় রইল না।

ওদিকে অচলার বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভোজ চলল। গণ্যমান্য অতিথিরা আশী টাকা বোতলের মদ খেয়ে রাত্রি তিনটের সময় হর্ষধ্বনি করতে করতে বাড়ি ফিরলেন। কত বড় একটা ড্রামা শেষ মুহূর্তে এসে নষ্ট হয়ে গেল, তা তারা জানতেও পারলে না।

তাই বলছিলুম, তোমাদের প্রকৃতি সত্যিকার আর্টিস্ট নয়। ক্লাইম্যাক্স বোঝে না, poetic justice জানে না—কেবল নোংরামি আর বাজে কথা নিয়ে তার কারবার। সত্যি কি না তোমরাই বল।'

শরৎচন্দ্র নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা বিলম্বিত টান দিলেন; কিন্তু কলিকাটা গড়গড়ার মাথায় পুড়িয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, ধোঁয়া বাহির হইল না।

৮ অগ্রহায়ণ ১৩৫১

banglabooks.in

শাপে বর

সস্তায় বাড়ি ভাড়া লইয়া বড় প্যাঁচে পড়িয়াছিলাম।

কয়েক বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও এমন মৌরসী পাট্টা লইয়া বসে নাই; এই পোড়া কলিকাতা শহরেই চেষ্টা করিলে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী বাড়ি কম ভাড়ায় পাওয়া যাইত।

পাড়াটা তেমন খোপদুরস্ত নয়; বাড়িখানাও পুরানো, কিন্তু বেশ ঝরঝরে; এঁদোপড়া নোনাধরা নয়। তাহার উপর ভাড়া মাত্র কুড়ি টাকা শুনিয়া দাঁও মারিবার মতলবে একেবারে এক বছরের লেখাপড়া করিয়া লইয়াছিলাম। মনে মনে এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলাম যে, বাড়িওয়ালার খুব মাথা মুড়াইয়াছি। এই কলিকালে বাড়িওয়ালার মাথা তাহার পিতৃশ্রাদ্ধেও কেহ মুড়াইতে পারে না, এ জ্ঞান তখনও হয় নাই।

জ্ঞান হইল যেদিন গৃহপ্রবেশ করিলাম সেইদিন সন্ধ্যাবেলা। দিনের আলো একটু ঘোলাটে হইতে না হইতে ঘরের মধ্যে ফর্-ফর্ ফর্-ফর্ শব্দ শুনিয়া দেখি, আরশোলা উড়িতেছে। তারপর যতই রাত্রি হইতে লাগিল ততই আরশোলা বাড়িতে লাগিল; পুরোনো বাড়ির অসংখ্য ফাঁক-ফোকর-ফাটল হইতে বাহির হইয়া ঘরে ঘরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের অগণ্য বলিলেও যথেষ্ট হয় না, পঙ্গপালের মতো সীমা-সংখ্যাহীন আরশোলা। মানুষ সম্বন্ধে তাহাদের মনে লেশমাত্র সম্ভ্রম নাই, জামাকাপড় ভেদ করিয়া শরীরের এমন দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল যে, মৃতদেহেরও বিপন্ন হইয়া পড়িবার কথা। রাত্রে মশারির মধ্যে শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই, কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া ইহারা আমাদের দাম্পত্য নিদ্রাকে নিরতিশয় বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিল। আমাকে যৎপরোনাস্তি উস্তম-খুস্তম তো করিলই, ওদিকে গৃহিণীর অবস্থা সত্য সত্যই সঙ্গীন করিয়া তুলিল।

তারপর যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, সমস্ত প্রয়োগ করিয়া এই নিশাচর পতঙ্গ-গুলোকে নিপাত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা এতই সংখ্যাগরিষ্ঠ যে কোনও ফল হইল না। দিনের বেলায় ইহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতে আবার দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া আসে। কয়েক দিনের মধ্যেই ইহাদের উৎপাতে পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

রবিবার সকালে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম। বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারি, কিন্তু বাড়িওয়ালা কোনও ছুতানাতাই শুনিবে না, কান ধরিয়া এক বৎসরের ভাড়া আদায় করিয়া লইবে। অথচ এ বাড়িতে আর কিছুদিন থাকিলেই হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে পরিধেয় বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে, ইহাও একপ্রকার সুনিশ্চিত। বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে গালি দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কোনও ফল নাই। এখন উপায় কি?

চোখ তুলিয়া দেখি, ফেলু সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া ফেলু সবিস্ময়ে দন্তবিকাশ করিল; আমি হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

ফ্যালারামের সহিত আমার অনেক দিনের পরিচয়—প্রায় পাঁচ বছর পাশাপাশি বাড়িতে বাস করিয়াছি; ইদানীং কিছুকাল যাবৎ সে শহরের এক প্রান্তে এবং আমি অন্য প্রান্তে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু মাঝে মাঝে ট্রামে বাসে দেখা হইত। ফেলু বয়সে আমার কনিষ্ঠ, নেহাত সরল ভালোমানুষ গোছের লোক। নিয়মিত কোনও কাজকর্ম করিত বলিয়া আমার জানা নাই, অথচ বেশ স্বচ্ছলভাবেই সংসার চালাইত দেখিতাম। অন্ততঃ আমার নিকট হইতে কখনও টাকা ধার চাহে নাই। টাকা উপার্জনের নানা ফন্দি তাহার মাথায় ঘুরিত এবং আপাতদৃষ্টিতে ফন্দিগুলো হাস্যকর মনে হইলেও সে তাহা হইতেই কিছু না কিছু রোজগার করিয়া লইত।

সে আসিয়া বলিল, 'এ কি দাদা! আপনি এখানে?'

বলিলাম, 'কয়েকদিন হল এ বাড়িতে উঠে এসেছি। তুমি এদিকে কি মনে করে?'

banglabooks.in

ফেলু আমার পাশে বসিয়া বলিল, 'বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, দাদা। বাড়িওলা নোটিশ দিয়েছে, তার নাকি মেয়ের বিয়ে।'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। ভগবান কি সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিলেন! যথা-সাধ্য তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম, 'বাড়ি খুঁজছ! তা আমি এ বাড়িটা ছেড়ে দেব ভাবছি, আপিস থেকে বড় দূর হয়। তোমার যদি পছন্দ হয় নিতে পারো।'

বাড়িখানা একবার ঘুরিয়া দেখিয়াই ফেলু পছন্দ করিয়া ফেলিল, বস্তুতঃ দিনের বেলা বাড়ি কাহারও অপছন্দ হইবার কথা নয়। ভাড়া কুড়ি টাকা শুনিয়া ফেলু আরও মুগ্ধ হইল। আমি তখন বলিলাম, 'সারা বছরের ভাড়াটা কিন্তু আগাম দিয়ে দিতে হবে ভাই। জানো তো বাড়িওয়ালাদের ব্যাপার—চুষুণ্ডি ব্যাটারা—'

ফেলু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ঈষৎ বিহ্বলভাবে বলিল, 'কিন্তু দু'শ' চল্লিশ টাকা তো এখন বার করতে পারবো না দাদা, একটু টানাটানি যাচ্ছে, মেরেকেটে দু'শ' টাকা দিতে পারি। তা বাকি টাকাটা যদি পরে নেন্—'

আমিও ক্ষণেক চিন্তা করিলাম। এই সুযোগ—অগ্রিম যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ, পরে আরশোলার খবর পাইলে ফেলুর মতো ভালমানুষও আর টাকা দিবে না।

সুতরাং উদার কণ্ঠে বলিলাম, 'বেশ, দু'শ' টাকাই নেব। তুমি তো আর পর নও। বাকি টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না।'

আহ্লাদে ও কৃতজ্ঞতায় ফেলু গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। স্থির হইল আগামী রবিবার সে এ বাড়িতে উঠিয়া আসিবে, আমি ইতিমধ্যে অন্য বাড়ি খুঁজিয়া লইব।

অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে ফেলু সপরিবারে আসিয়া বাড়ি দখল করিল; আমি দুইশত টাকা পকেটে পুরিয়া বাড়িটিকে মনে মনে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় লইলাম। স্থির করিলাম, ভবিষ্যতে ফেলারামকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিব। তার স্বভাবটা খুবই শান্ত, কিন্তু বলা তো যায় না।

মাস দুয়েক নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ একদিন এক সিনেমা বাড়ির দর-দালানে ফেলুর সহিত দেখা। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কাটিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু সে 'দাদা দাদা' বলিয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আরশোলা সম্বন্ধে যত প্রকার কৈফিয়ত ভাবিয়া লওয়া সম্ভব তাহা ভাবিয়া লইলাম।

ফেলুর মুখে কিন্তু জিঘাংসার ভাব না দেখিয়া একটু খটকা লাগিল। সে যেন আমাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছে। তবু মুখে সংশয়কুণ্ঠিত একটু হাসি আনিয়া বলিলাম, 'আরে ফেলু যে! তারপর, কেমন আছ?'

ফেলু একগাল হাসিয়া একগঙ্গা কথা বলিয়া গেল, 'ভালোই আছি দাদা। ভাগ্যে বাড়ি-খানা আপনি দিয়েছিলেন, বলতে নেই তারই কল্যাণে করে খাচ্ছি। আপনি লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না, বাড়িটিতে আরশোলা ছিল দাদা—এন্তার আরশোলা ছিল। তাই দেখে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, দিলুম এক সাইনবোর্ড টাঙিয়ে—'হাঁপানির পাঁচন।' বললে বিশ্বাস করবেন না দাদা, কাতারে কাতারে লোক; সকাল-বিকেল নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই। বৌ রান্নাঘরে উনুন জ্বেলে আরশোলার ক্বাথ তৈরি করে, আর আমি তাই আট আনা শিশি বিক্রি করি। কলকাতা শহরে এত হেঁপো রুগী আছে, কে জানত? রোজ নিদেন পক্ষে দশ টাকার ওষুধ বিক্রি করি; হাঁপানির ধন্বন্তরী নাম বেরিয়ে গেছে। কিন্তু—'

যেন একটু বিমনা হইয়া চিন্তা করিল, 'একটু ভাবনার কথা হয়েছে দাদা, আরশোলা ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। আচ্ছা, আপনি তো অনেক জানেন শোনেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আরশোলার টেণ্ডার কল্ করলে কেমন হয়। এমন ব্যবসাটা শেষে আরশোলার অভাবে ফেঁসে যাবে?'

banglabooks.in

ইহাকেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং—!
৯ পৌষ ১৩৫১

ভাল বাসা

যুদ্ধের হিড়িকে বোম্বাই শহরে বাঙালী অনেক বাড়িয়াছে। আগে যত ছিল তাহার প্রায় চতুর্গুণ। তিন বছর আগেও বোম্বাইয়ের পথেঘাটে গুজরাতী-মারাঠী-পার্শী-গোয়ানিজ মিশ্রিত জনারণ্যে হঠাৎ একটি সিঁদুর-পরা বাঙালী মেয়ে বা ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা পুরুষ দেখিলে মন পুলকিত হইয়া উঠিত, যাচিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা হইত। এখন আর সেদিন নাই। এখন পদে পদে হাফ-প্যাণ্ট-পরা দ্রুতপদচারী বাঙালী যুবকের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া যায়। যাঁহারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁহারা পূর্ববৎ শহরের উত্তরাঞ্চলে খানিকটা স্থানে বাঙালীপাড়া তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছেন; নূতন আমদানী যাহারা, তাহারা শহরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কোথায় কি ভাবে থাকে তাহার ঠিকানা করা কঠিন। তাহারা যুদ্ধের জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়াছে, যখন যুদ্ধ শেষ হইবে তখন আবার ভাঁটার টানে বাংলা দেশের বিপুল গর্ভে ফিরিয়া যাইবে।

গত সাত বৎসর যাবৎ আমিও এ-প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছি। তবে আমি বোম্বাই শহরের সীমানার বাহিরে থাকি; বেশী দূর নয়, মাত্র আঠারো মাইল। বাড়িটি ভাল এবং পাড়াটি নিরিবিলি; ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের কল্যাণে অল্প সময়ের মধ্যে শহরে পেঁছানো যায়। কোনও হাঙ্গামা নাই। শহরে থাকার সুখ ও পাড়াগাঁয়ে থাকার শান্তি দুই-ই একসঙ্গে ভোগ করি। বন্ধুরা হিংসা করেন—কিন্তু সে যাক। এটা আমার কাহিনী নয়, ঘেঁচুর উপাখ্যান।

মাসকয়েক আগে একটা কাজে শহরে গিয়াছিলাম। গিরগাঁও অঞ্চলের জনাকীর্ণ ফুটপাথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখি—ঘেঁচু! বিকালবেলার পড়ন্ত রৌদ্রে খাকি হাফ্-প্যাণ্ট ও হাফ্-শার্ট-পরা কৃষ্ণকায় ছোকরাকে দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না—আমাদের ঘেঁচুই বটে। তাহার চেহারাখানা এমন কিছু অসামান্য নয় কিন্তু অমন শজারুর মত খোঁচা খোঁচা চুল এবং তিনকোণা কান আর কাহারও হইতেও পারে না।

ঘেঁচুকে ছেলেবেলা হইতেই চিনি; আমাদের গাঁয়ের ছেলে—বিষ্ণু মাইতির ভাইপো। এখন বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি দাঁড়াইয়াছে। যখন তাহাকে শেষ দেখি তখন সে গাঁয়ের মিড্‌ল স্কুলে পড়িত এবং ডাংগুলি খেলিত। চেহারা কিছুই বদলায় নাই, কেবল একটু ঢ্যাঙা হইয়াছে। এই ছেলেটা বাংলা দেশের অজ পাড়াগাঁয়ের একটি পঙ্কিল পানাপুকুরের অতি ক্ষুদ্র পুঁটিমাছের মত ছিপের এক টানে একেবারে বোম্বাইয়ের শুক্‌না ডাঙায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম—'আরে ঘেঁচু! তুই!'

banglabooks.in

ঘে'চু একটা ইরাণী হোটেল হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইতেছিল, আমার ডাক শুনিয়া ক্ষণকাল বুদ্ধিভ্রষ্টের মত তাকাইয়া রহিল; তারপর লাফাইয়া আসিয়া এক খাম্‌চা পায়ের ধুলা লইল—

'বটুকদা!'

তাহার আনন্দবিহ্বলতার বর্ণনা করা কঠিন। হারানো কুকুরছানা অচেনা পথের মাঝখানে হঠাৎ প্রভুকে দেখিতে পাইলে যেমন অসংবৃত আনন্দে অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠে, ঘে'চুও তেমনি আমাকে পাইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল—কি বলিবে কি করিবে কিছুই যেন ভাবিয়া পায় না। সে সামান্য একটু তোৎলা, কিন্তু এখন তাহার কথা পদে পদে আটকাইয়া যাইতে লাগিল—'হাঃ হাশ্চর্য! আপনি কী করে আমাকে দেখে ফেললেন? আম্মিও আপনার ঠ্‌ঠিকানা লিখে এনেছিলুম, ক্‌কিন্তু কাগজের চিল্‌তেটা কোথায় হাঃ হারিয়ে গেল। আর ক্কী করে খোঁজ নেব? কেউ একটা কথা বুঝতে পারে না, কিড়ির মিড়ির করে কী বলে আম্মিও বুঝতে পারি না—এসে অবধি একটা বাঙালীর মুখ দেখিনি। ভাঃ ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল—নইলে তো—'

নিজের কাজ ভুলিয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়াই তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলাম। ছেলেটা ভালমানুষ, তাহার উপর বলিতে গেলে এই প্রথম পাড়াগাঁয়ের বাহিরে পা বাড়াইয়াছে। নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। দিন সাতেক হইল সে বোম্বাই আসিয়াছে, আসিয়াই কোন এক যুদ্ধ-সম্পর্কিত কারখানায় যোগ দিয়াছে। একটা মাথা গুঁজিবার আস্তানা খুঁজিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল, শেষে এক মারাঠী সহকর্মীর কৃপায় একটা চৌলে একটি খোলি পাইয়াছে। সেইখানেই থাকে এবং চৌলের নীচের তলায় একটা নিরামিষ হোটেলে খায়। এখানে আসিয়া অবধি মাছের মুখ দেখে নাই, কেবল ডাল রুটি আর তেলাকুচার তরকারি খাইয়া তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

বর্ণনা শেষ করিয়া ঘে'চু সজলনেত্রে বলিল, 'বটুকদা, এদেশের রান্না আমি মুখে দিতে পারি না; খাবারের দিকে যখন তাকাই প্রাণটা হু হুঃ করে ওঠে। আর কিছু নয়, দুটি ভাত আর মাছের ঝোল যদি পেতুম—'

বলিলাম—'সে না হয় ক্রমে সয়ে যাবে। কিন্তু তুই যে এখানে একটা মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছিস্ এই ভাগ্যি। আজকাল তাই কেউ পায় না।'

ঘে'চু বলিল—'মাথা গোঁজবার জায়গা যদি স্বচক্ষে দেখেন বটুকদা, তা হলে আপনারও কান্না পাবে। আসবেন—দেখবেন? বেশী দূর নয়, ঐ মোড়টা ঘুরেই—'

ঘে'চুর সঙ্গে তাহার বাসা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড একখানা চারতলা বাড়ি, তাহার আপাদমস্তক পায়রার খোপের মত ছোট কুঠুরী বা খোলি। প্রত্যেক কুঠুরীতে একটি করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবার থাকে; সেই একটি ঘরের মধ্যে শয়ন রান্না সব কিছুই সম্পাদিত হয়। ইহাই বোম্বাইয়ের চৌল। এক একটি বড় চৌলে শতাধিক ভদ্র দরিদ্র পরিবার কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া বৎসরের পর বৎসর বাস করে। ঐটুকু পরিসরের অধিক বাসস্থান পাওয়া যায় না। বোধ করি ইহারা প্রয়োজনও মনে করে না।

ঘে'চুর খোলি চৌলের চারতলায়। তিনপ্রস্থ অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। লম্বা সঙ্কীর্ণ বারান্দা এপ্রান্ত ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহারই দুই পাশে সারি সারি ঘরের দরজা। বারান্দায় অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, কুস্তি লড়িতেছে। প্রত্যেকটি দ্বারের কাছে একটি দুটি স্ত্রীলোক মেঝেয় বসিয়া গম বা ডাল বাছিতেছে, নিজেদের মধ্যে হাসিতেছে, গল্প করিতেছে। অপরিচিত আগন্তুক কেহ আসিলে ক্ষণেক নিরুৎসুক চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া আবার ডাল বাছায় মন দিতেছে।

বারান্দার একপ্রান্তে ঘে'চুর ঘর। দেখিলাম, ঘরটি আসো ঘর ছিল না,-ব্যাল্‌কনি ছিল। ঘরের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান গৃহস্বামী স্থানটি তক্তা দিয়া ঘিরিয়া সম্মুখে একটি দরজা বসাইয়া রীতিমত ঘর বানাইয়া ভাড়া দিতেছেন। ভিতরটি দেশালায়ের বাক্সের

banglabooks.in

কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঘেঁচুর একটি তেরঙ্গা ও গুটানো বিছানাতেই তাহার অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে।

ঘেঁচু বলিল—'দেখছেন তো! দরজা বন্ধ করলে দম বন্ধ হয়ে যায়, আর খুলে রাখলে মনে হয় হাঃ হাটের মাধ্যিখানে বসে আছি। সাতদিন রয়েছি, একটা লোকের সঙ্গে মুখ-চেনাচেনি হয়নি। কেউ ডেকে কথা কয় না, আর কী বা কথা কইবে! বুঝতে পারলে তো! ইংরেজিও কেউ বোঝে না, সব সাত্রাবাজারের গোমস্তা। বলুন তো, এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে? কেন যে মরতে চাকরি করতে এসেছিলুম! এক এক সময় লোভ হয়, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাবার কি জো আছে—লড়াইয়ের চাকরি—ধরেই জেলে পুরে দেবে—'

ছেলেটার কথা শুনিয়া বড় মায়া হইল, বলিলাম—'চল্ ঘেঁচু, তুই আমার বাড়িতে থাকবি। আমার একটা ফালতু ঘর আছে—হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবি। আর কিছু না হোক, তোর বৌদির রান্না ডালভাত তো দু'বেলা পেটে পড়বে।'

আহ্লাদে ঘেঁচু নাচিয়া উঠিলেও, শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা গেল ব্যবস্থাটা খুব কার্যকরী নয়। ঘেঁচুকে সকাল আটটার মধ্যে কারখানার হাজ্‌রি দিতে হয়। এক-ঘণ্টা ট্রেনে আসিয়া তারপর আরো আধঘণ্টা পায়ে হাঁটিয়া ঠিক আটটার সময় প্রত্যহ কারখানায় হাজির হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর মনে হইল না।

ঘেঁচু দুঃখিতভাবে বলিল—'আমার কপালে নেই তো কী হবে! কিন্তু বটুকদা, এখানে আর পারছি না। আপনি অন্য কোথাও একটা ভালো বাসা দেখে দিন—যেখানে সকাল বিকেল দুটো বাংলা কথা শুনতে পাই—আর যদি মাঝে মাঝে দুটি মাছের-ঝোল ভাত পাওয়া যায়—'

আমি বলিলাম—'চেষ্টা করব। কিন্তু আজকাল ভাল বাসা পাওয়া তো সহজ কথা নয়। যদি বা একটা ভদ্রলোকের মত ঘর পাওয়া যায়, তার ভাড়া হয়তো পনের টাকা কিন্তু পাগ্‌ড়ী দিতে হবে দেড় হাজার।'

ঘেঁচু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—'পাগ্‌ড়ী?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাগ্‌ড়ী; যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। সেলামী আর কী! গভর্মেণ্ট আইন করে দিয়েছে বাড়িওয়ালারা ভাড়া বাড়াতে পারবে না, তাই রসিদ না দিয়ে মোটা টাকা গোড়াতেই আদায় করে নেয়। এ তো আর ভেতো বাঙালীর বুদ্ধি নয় —গুজরাতী বুদ্ধি।'

ঘেঁচু বলিল—'ও বাবা, অত টাকা কোথায় পাব! মাইনে তো পাই কুল্লে—'

বলিলাম, 'না না, সে তোকে ভাবতে হবে না। বাসা যদি জোগাড় করতে পারি, বিনা পাগ্‌ড়ীতেই পাবি। চেষ্টা করব দাদারে, মানে বাঙালীপাড়ায়। তোর ভাগ্যে থাকে তো এক-আধটা ঘর পেলেও পেতে পারি। কিন্তু তুই ভরসা রাখিস নে; মনে ভেবে রাখ এই-খানেই তোকে থাকতে হবে। আর একটা কথা বলি, যখন এদেশে এসেছিস তখন এদেশের ভাষাও শিখতে আরম্ভ কর। নইলে এভাবে কদ্দিন চালাবি?'

কাতরভাবে ঘেঁচু বলিল—'সে তো ঠিক কথা বটুকদা, কিন্তু ও কিচির মিচির ভাষা কি শিখতে পারব? ভাষা শুনলে মনে হয় ছাল কড়াই দাঁতে ফেলে চিবচ্ছে—'

বলিলাম—'নতুন নতুন অমনি মনে হয়—ক্রমে সয়ে যাবে। কথায় বলে যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।"

নিরপরাধ আসামী যেভাবে ফাঁসির আজ্ঞা গ্রহণ করে তেমনি ভাবে ঘেঁচু বলিল—'বেশ, আপনি যখন বলছেন—'

সেদিন ঘেঁচুকে তাহার কোটরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। স্থির করিলাম অবকাশ পাইলেই দাদারে গিয়া তাহার জন্য ভাল বাসার খোঁজ করিব। সেখানে অনেক ভদ্রলোক আছেন, তাঁহাদের কাহারও পরিবারে একটি আলাদা ঘর ও দুটি মাছের-ঝোল ভাত জোগাড় করা বোধ করি একেবারে অসম্ভব হইবে না।

banglabooks.in

তারপর পাঁচটা কাজে পড়িয়া ঘেঁচুর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে পড়িল প্রায় দু'হপ্তা পরে। বেচারা নির্বান্ধব পুরীতে তেলাকুচার তরকারি খাইয়া কত কষ্টই না পাইতেছে এবং অসহায় ভাবে আমার পথ চাহিয়া আছে। অন্ততঃ মনে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দাদারে গেলাম। ঘেঁচুর কপাল ভাল; দু-একজনের সঙ্গে কথা কহিয়াই খবর পাইলাম, একটি ভদ্রলোকের বাসায় একটি ঘর শীঘ্রই খালি হইবার সম্ভাবনা আছে—যে বৈতনিক অতিথিটি ঘর দখল করিয়া আছেন তিনি নাকি শীঘ্রই বদলি হইয়া চলিয়া যাইবেন। দ্রুত গিয়া ভদ্রলোককে ধরিলাম। সনির্বন্ধ অনুরোধ বিফল হইল না। বৈতনিক অতিথিটির চলিয়া যাইতে এখনও হপ্তা-দুই দেরি আছে, কিন্তু তিনি বিদায় হইলেই ঘেঁচু তাঁহার স্থান অধিকার করিবে, এ ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল।

ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম ঘেঁচুকে সুখবরটা দিয়া যাই, সে আশায় বুক বাঁধিয়া এই কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

ঘেঁচুর চৌলে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাহার কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখি সে মেঝেয় বিছানা পাতিয়া বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বটুকদা, আপনি বলে গিছলেন, এই দেখুন মারাঠী প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। ব্বাপ্, এর নাম কি ভাষা, স্রেফ্ পাথর আর ইঁটপাটকেল। হুঃ হুচ্চারণ করতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা; যখন ধরেছি, হয় এস্পার নয় ওস্পার।'

হাসিয়া বলিলাম—'বেশ বেশ। কিন্তু শিখছিস কার কাছে? শুধু বই থেকে তো শেখা যায় না।'

ঘেঁচু বলিল—'সে জোগাড় হয়েছে। ৩৭ নম্বর ঘরে থাকে—বেঙ্কটরাও বলে একজন মারাঠী। বেশ ভদ্রলোক, আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় হবে; একটু আধটু হিঃ হিংরিজি বলতে পারে—সে-ই শেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের translation পড়েছে কিনা, বাঙালীর ওপর ভারি ভক্তি।'

রবীন্দ্রনাথ, আর কিছু না হোক, বাঙালীর জন্য ঐটুকু করিয়া গিয়াছেন; বিদেশে তাঁহার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিলে খাতির পাওয়া যায়।

যা হোক, ঘেঁচুকে বাসার খবর দিয়া তাহার মাছের-ঝোল ভাত সম্ভোগের আসন্ন সম্ভাবনার আশ্বাস জানাইলাম। সে আহ্লাদে এতই তোৎলা হইয়া গেল যে তাহার একটা কথাও বোঝা গেল না। অতঃপর সে-রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম।

দু'হপ্তা পরে দাদারের ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে, বাসা খালি হইয়াছে, এখন ঘেঁচু ইচ্ছা করিলেই তাহা দখল করিতে পারে। আবার ঘেঁচুর কাছে গেলাম। তাহাকে তাহার নূতন বাসায় অধিষ্ঠিত করিয়া তবে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব।

সন্ধ্যার পর বাতি জ্বলিয়াছিল। ঘেঁচুর দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে বেশ একটি ছোটখাট মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। মেঝেয় পাতা বিছানার উপর চা এবং এক থাল চিঁড়া চীনাবাদাম ভাজা (এদেশের ভাষায় 'ভাজিয়া'); তাহাই ঘিরিয়া বসিয়াছে ঘেঁচু এবং একটি মহারাষ্ট্র-মিথুন। পুরুষটি বেঁটে, নিরেট ধরনের চেহারা, বুদ্ধিমানের মত মুখ; নারীটি কুঙ্কুমচিহ্নিত-ললাট, আঁটসাঁট আঠারো হাত শাড়ি পরা একটি স্নিগ্ধ কমকান্তি যুবতী। চা পান, 'ভাজিয়া' ভক্ষণ ও হাস্য-কৌতুকের ফাঁকে ফাঁকে ভাষা-শিক্ষা চলিতেছে। আর, একটি হাফ্-প্যাণ্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিহিত দুই বছরের বালক আপন মনে ঘরময় দাপাইয়া বেড়াইতেছে।

আমাকে দেখিতে পাইয়া ঘেঁচু একটু সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বন্ধুদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

'এই যে আসুন বটুকদা। ইনি হলেন গিয়ে বেঙ্কটরাও পাটিল, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলুম। আর ইনি হচ্ছেন ওঁর স্ত্রী হংসাবাই। আর ঐ যে দেখছেন ছোট্ট মানুষটি, উনি হচ্ছেন এঁদের ছেলে।'

banglabooks.in

নবপরিচিতদের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া বিছানার একপাশে বসিলাম। যুবকটি একটু গম্ভীর অল্পভাষী, যুবতীটি সপ্রতিভ মৃদুহাসিনী। মারাঠী মেয়েদের মধ্যে ঘোম্টা বা পর্দা কোনকালেই নাই; অনাত্মীয় পুরুষের সহিত সুষ্ঠু মেলামেশার কোনও বাধা নাই। দেখিলাম ঘেঁচু এই নবীন মারাঠী-দম্পতীর বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

ঘেঁচু শিশুটির গতিবিধি স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কী দুষ্টু যে ঐ ছেলেটা—যাকে বলে আস্ত ডাকাত, একেবারে আসল বর্গী। ওর নাম কি জানেন, বিঠ্‌ঠল! যাকে আমাদের দেশে বিট্‌লে বলে তাই।' ঘেঁচু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বলিলাম—'ঘেঁচু, তোমার নতুন বাসা খালি হয়েছে—কালকেই গিয়ে দখল নিতে পার।'

ঘেঁচু হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া তোৎলাইতে আরম্ভ করিল। তাহার তোৎলামি কতকটা শান্ত হইলে বুঝিলাম সে বলিতেছে—'আমি এইখানেই থাকি বটুকদা, এখানে মন বসে গেছে। এ'দের সঙ্গে ভূভাব হয়ে অবধি...জানেন, আজকাল, আমি এ'দের সঙ্গেই খাবার ব্যবস্থা করেছি। এ'রা রুটি ভাত দুইই খান; মাছ-মাংস অবিশ্যি হয় না, কিন্তু ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। হংসাবোদি যে কী সুন্দর রাঁধেন তা আর কী বলব। বড্ড ভাল লোক এ'রা। আমি আর কোথাও যাব না বটুকদা, মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলুম—'

শিশু বর্গীটি ইতিমধ্যে ঘেঁচুর ট্রাঙ্কের উপর উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঘেঁচু তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল—'এই বিট্‌লে, এদিকে আয়—ইক্‌ড়ে ইক্‌ড়ে—'

বুঝিলাম, ঘেঁচুর ভাল বাসার আর প্রয়োজন নাই, সে ঐ বস্তুই আরও ঘনিষ্ঠ আকারে লাভ করিয়াছে।

৮ চৈত্র ১৩৫১

আধিদৈবিক

পুলিনবিহারী পালের নাম অল্প লোকেই জানে। অথচ তাঁহার মত প্রগাঢ় পণ্ডিত, সর্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পুরুষ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব তাঁহার এত ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের নামের পিছনে ময়ূরপুচ্ছ রচনা করিতে পারিতেন। জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কের কথা ছাড়িয়া দিই, সমস্ত গলিঘুঁজির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; অতিবড় গূঢ় বিদ্যার আলোচনা করিয়াও কেহ তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। কেবল একটি বিদ্যা তাঁহার ছিল না—ঘানিযন্ত্র হইতে কি করিয়া তৈল বাহির করিতে হয় তাহা তিনি শিখিতে পারেন নাই। এই জন্যই বোধ করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার খোঁজ রাখে না।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল; ভক্তিভরে তাঁহাকে পুলিন্দা

banglabooks.in

বলিয়া ডাকিতাম। বিপদে আপদে অর্থাৎ বিদ্যাঘটিত কোনও সঙ্কটে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতাম। কখনও নিরাশ করেন নাই, তাঁহার ভাস্বর বুদ্ধির প্রভায় মনের সমস্ত সংশয় ঘুচাইয়া দিয়াছেন। মানুষ হিসাবে হয়তো সহজ ও স্বাভাবিক বলা যায় না, সাধারণে তাঁহাকে খামখেয়ালী বলিবে। কিন্তু এমন পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ, একান্তভাবে নিরভিমান মানুষে আর দেখি নাই। বিবাহাদি করেন নাই; পয়সার পিছনে দৌড়িবার মত মানসিক দীনতা যেমন তাঁহার ছিল না, পয়সার প্রয়োজনও তেমনি খুব কম ছিল। উচ্চ অঙ্গের দুই একটা ইংরেজী ও মার্কিন পত্রিকাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু কিছু টাকা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার অনাড়ম্বর একক জীবন চলিয়া যাইত।

বছর দুই পুলিন্দাকে দেখি নাই; মাঝে মাঝে ডুব মারা তাঁহার অভ্যাস। একদিন খবর পাইলাম, তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বজ্‌বজ্‌ লাইনের একটি জনপদে বাস করিতেছেন এবং একাগ্রচিত্তে বাংলা ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করিতেছেন। বিস্মিত হইলাম না, কারণ অকস্মাৎ ডুব মারিয়া অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে আবির্ভূত হওয়া পুলিন্দার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য।

একদিন বৈকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই সেজন্যও বটে, তা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। কয়েক মাস হইতে একটা আধ্যাত্মিক সংশয় আমার মনকে পীড়া দিতেছিল; বোধ করি ত্রিশের কোঠা পার হইলে সকলেরই এইরূপ হয়। আধ্যাত্মিক সংশয়টি আর কিছুই নয়, সেই আদিম সংশয়—জন্মান্তর আছে কিনা, মরিবার পর আত্মা থাকে কিনা, ভূতপ্রেত আছে কিনা। প্রাচীন মুনি ঋষি অবতারগণের সহিত আধুনিক মুনি ঋষি ও চিন্তাবীরগণের এ বিষয়ে এত অধিক মতদ্বৈধ যে মনটা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল। খাঁচায় ধরা পড়া ইঁদুরের মত আমার বুদ্ধি একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল কিন্তু কোনও দিকেই পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এইরূপ মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পুলিন্দার খবর পাইয়া ভাবিলাম তাঁহার কাছেই যাই, এ সমস্যার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সন্তোষজনক সমাধান যদি কেহ দিতে পারে তো সে পুলিন্দা।

তাঁহার আস্তানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ছোট্ট স্টেশনের নিকটে প্রকাণ্ড এক তামাকের গুদামে তিনি বাস করিতেছেন। দ্বিতল বাড়ির উপরতলায় তামাকের পাতার বস্তা ঠাসা আছে, নিচের তলায় দুটি ঘর লইয়া পুলিন্দা থাকেন। উপরতলার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, অধিকাংশ সময়ই উপরতলাটা বন্ধ থাকে।

এই দুই বৎসরে পুলিন্দার বয়স যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মাথাটি স্বভাবতই ডিম্বাকৃতি; লক্ষ্য করিলাম, ডিম্বের উপর হইতে চুল ঝরিয়া গিয়া শীর্ষস্থানটি বেশ চক্‌চকে হইয়াছে; নাকের উপর একজোড়া চাল্‌শের চশমা বসিয়াছে। কিন্তু স্বভাব বিন্দুমাত্র বদ্‌লায় নাই; তেমনি মেঝেয় মাদুর পাতিয়া চারিদিকে পুঁথি কাগজপত্র ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চশমার উপর দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, 'এই যে এসেছ।' এবং এক টিপ নস্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন।

বলিলেন—'দ্যাখো, বাংলা ভাষাটা দিন দিন বড় দুর্বল হয়ে পড়ছে—আর সে তেজ নেই, ধমক নেই, বড় বেশী বিনয়ী বড় বেশী মিহি হয়ে যাচ্ছে। ঐ যে আমাদের সাহিত্যে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি ঢুকেছিল এটা তারই ফল। এমন দিন ছিল যখন বাঙালী রেগে গেলে দু'চারটে গরম গরম কথা বলতে পারত, শব্দের তাল ঠুকে বহ্বাস্ফোট করতে পারত; কিন্তু এখন বাঙালীকে জুতো-পেটা করলেও তার মুখ দিয়ে গোঙানি আর কাৎরানি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ বেরুবে না। বেরুবে কোত্থেকে? ভাষার সে হুঙ্কার, শব্দের সে দাপট থাকলে তো! বাঙালী জাতটাও তাই দিন দিন মিইয়ে যাচ্ছে, মেদিয়ে যাচ্ছে। বাঙালীকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে হলে নতুন নতুন জোরালো শব্দ আমদানি করতে হবে—সংস্কৃত ইংরিজি ফারসী ভাষায় যেখানে যত জবরদস্ত শব্দ আছে সব বাংলা ভাষার পেটের মধ্যে পুরে দিয়ে তাদের হজম করতে হবে। দ্যাখো, বাংলা ভাষাটা অপভ্রংশের ভাষা। অপভ্রংশের দোষ এই যে, সে শব্দকে মোলায়েম করে ফেলে, সহজ করে ফেলে। ও আর চলবে না। এখন থেকে ইয়া বড়

banglabooks.in

বড় গোব্দা গোব্দা মৌলিক শব্দ ব্যবহার করো। নইলে নিস্তার নেই।'

আমি ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম—'কিন্তু ক্রমাগত সাধু ভাষায় কথা বলা—'

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি পুঙ্গব।'

চমকিয়া বলিলাম—'সে কি?'

তিনি বলিলেন—'মানে ষাঁড়। আমার কথাটা ভাল করে বোঝো—'

অতঃপর দুই ঘণ্টা ধরিয়া বঙ্গবাণীর শিরাধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারের প্রসঙ্গ চলিল; বাংলা ভাষা তথা বাঙালীর যে নিদানকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরাৎ নাদব্রহ্মরূপী বিষ-বটিকা প্রয়োগ না করিলে রোগীর কোনও আশাই নাই একথা পুলিন্দা অত্যন্ত মজবুত-ভাবে প্রমাণ করিয়া দিলেন। উদ্বিগ্নভাবে শ্রবণ করিলাম। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্নটি ভুলি নাই; তাই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি যখন আলো জ্বালিতে উঠিলেন, তখন আমি তাক্ বুঝিয়া আমার আধ্যাত্মিক সমস্যাটি পেশ করিয়া দিলাম।

পুলিন্দা আলো জ্বালিয়া আবার আসিয়া বসিলেন; নাকের মধ্যে ডবল-টিপ নস্য ঠুসিয়া দিয়া সজলনেত্রে বলিলেন—'ভূত প্রেত আত্মা পরমাত্মা পরলোক জন্মান্তর অসিদ্ধ—কারণ প্রমাণাভাব।'

এইভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া পুলিন্দা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন; ক্রমে প্রসঙ্গ জমিয়া উঠিল; আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করিবার স্থান নাই; কিন্তু যুক্তির ধাপে ধাপে প্রমাণের সোপান রচনা করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত আমার বুদ্ধিকে যে স্থানে লইয়া উপনীত করিলেন সেখানে ভূতপ্রেত নাই জন্মান্তরও নাই। দেখা গেল আসলে ওগুলি বাসনাপ্রণোদিত অলীক ভাবনা—wishful thinking! চার্বাক হইতে বার্টরান্ড রাসেল পর্যন্ত সমস্ত মনীষীর উক্তি তাঁহার যুক্তিকে সমর্থন করিল—শরীরই সর্বস্ব, মন-বুদ্ধি-আত্মা সমস্তই দেহের বিকার মাত্র, সুতরাং শরীর নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

রাত্রি অনেক হইয়া গেলেও আলোচনার শেষে মনে বেশ শান্তি অনুভব করিলাম; যাহোক তবু পাকা রকম একটা কিছু পাওয়া গেল। আত্মার দেহবিমুক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি নাই থাকে তবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল। দুনৌকায় পা দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করার কোনও মানে হয় না।

আর একদিন আসিব, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ মাথার উপর ভীষণ দুম-দাম্ শব্দে চমকিয়া উঠিলাম; যেন উপরের গুদাম ঘরে অনেকগুলো পালোয়ান যৌথভাবে মল্ল-যুদ্ধ শুরু করিয়া দিয়াছে। উপরে কেহ থাকে না শুনিয়াছিলাম, তামাক পাতার আড়তে মানুষের থাকা সম্ভবও নয়; তবে এত রাত্রে কাহারা বন্ধ ঘরের মধ্যে এমন দুর্দান্ত দুরন্ত-পনা আরম্ভ করিয়া দিল?

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম—'ও কী?'

পুলিন্দা নিশ্চিন্তভাবে নাকের চশমা খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—'ও কিছু নয়। এগারোটা বেজেছে তো! রোজ রাত্রে ঐ রকম হয়। ওপরে কয়েকটা ভূত আছে, তারাই এই সময় দাপাদাপি করে।'

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। উপরে দাপাদাপি চলিতে লাগিল। বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উপরের ঘরে সত্যই যদি ভূতের পাল কুস্তি লড়িতেছে তবে এতক্ষণ ধরিয়া কী শুনিলাম?

পুলিন্দা বলিলেন—'ভয়ের কিছু নেই, ওরা কোনও অনিষ্ট করে না। দশ মিনিট পরে সব চুপচাপ হয়ে যাবে।'

আমি বলিয়া উঠিলাম—'পুলিন্দা! সত্যই ওরা ভূত? আপনি বিশ্বাস করেন?'

তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করে অনুসন্ধান করেছি, জ্যান্ত জীব হতে পারে না। ইঁদুর বেড়াল তামাকের ধার ঘেঁষে যাবে না, আর মানুষও নয়। সুতরাং ভূতই বটে।'

'কিন্তু—কিন্তু এতক্ষণ ধরে এই যে আপনি প্রমাণ করলেন—'

banglabooks.in

পুলিন্দা বলিলেন—'তুমি একটি হর্দম—মানে হাঁদা। প্রমাণের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি? ভূত আছে এটা ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায় না, তাই বলে বিশ্বাস করব না? ঐ যারা ওপরে হুটোপাটি করছে ওরা কি প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে? জেনে রাখো, যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আচ্ছা রাত হয়েছে, আজ এস তাহলে—'

উপরে ভূতের নৃত্য চলিতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।

২৪ চৈত্র ১৩৫১

ভূতোর চন্দ্রবিন্দু

বিভূতি ওরফে ভূতোকে সকলেই গোঁয়ার বলিয়া জানিত। কিন্তু সে যখন বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল তখন দেখা গেল বৌটি তাহার চেয়েও এক কাঠি বাড়া, অর্থাৎ একেবারে কাঠ-গোঁয়ার। কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেও বেশী বিলম্ব হয় নাই।

ছোট শহর, সকলেই সকলকে চেনে। ভূতোকে সকলেই চিনিত এবং মনে মনে ভয় করিত। গাঁট্টা-গোঁট্টা নিরেট চেহারা; কথাবার্তা বেশী বলিত না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাহার হাত যেমন দরাজ ছিল, তেমনি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে মুখ ফুটিবার আগেই তাহার হাত ছুটিত। বাড়িতে তাহার এক সাবেক পিসী ছিলেন এবং বাজারে ছিল এক কাঠের গোলা; পিসী বাড়িতে ভাত রাঁধিতেন এবং গোলা হইতে সেই ভাতের সংস্থান হইত। কাঠ কিনিতে আসিয়া যে সব খদ্দের দরদস্তুর করিত তাহাদের প্রায়ই পিঠে চেলা কাঠ খাইয়া ফিরিতে হইত।

ভূতোর সম্পর্কে 'চন্দ্রবিন্দু' নামক একটি শব্দ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। একবার ফুটবল খেলিতে গিয়া ভূতো প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের পেটে হাঁটুর গুঁতো মারিয়া তাহাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দিয়াছিল। নেহাৎ খেলা বলিয়াই ভূতোর হাতে দড়ি পড়ে নাই, কিন্তু তদবধি 'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' কথাটা শহরে প্রবচন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের নামের সম্মুখে চন্দ্রবিন্দু বসিবার ভয়ে ভূতোকে সহজে কেহ ঘাঁটাইত না।

যাহোক, এই সব নানা কারণে ভূতো পাড়ার ছোকরা-দলের চাঁই হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করিলে খরচের অধিকাংশ সে বহন করিত এবং কাহারও সহিত ঝগড়া হাতাহাতি করিবার প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া তাহাকে সম্মুখে আগাইয়া দিত। ভূতোর অবশ্য কিছুতেই আপত্তি ছিল না; বস্তুত মারামারির গন্ধ পাইলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখাই দায় হইত।

ভূতোর বৌয়ের নাম বিবাহের আগে পর্যন্ত ছিল ক্ষান্ত, এখন হইয়াছে পুষ্পরানী। তাহাকে তন্বী শ্যামা শিখর-দশনা বলা চলে না, কিন্তু স্বাস্থ্য ও যৌবনের গুণে দেখিতে ভালই বলা যায়। মুখখানি গোল, বড় বড় চোখ, গাল দুটি উঁচু উঁচু; শরীরও গোলগাল

banglabooks.in

বেঁটেখাটো, দেখিলে বেশ মজবুত বলিয়া বোঝা যায়। বৌকে ভূতোর বেশ পছন্দই হইয়াছিল, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে হঠাৎ দু'জনের মধ্যে ফারখৎ হইয়া গেল। কারণ অতি সামান্য। রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ভূতো হৃদয়ের উদারতাবশত প্রস্তাব করিয়াছিল যে বধূ খাটের ডান পাশে শয়ন করুক, কারণ ডান পাশের জানালা দিয়া বাতাস আসে। ক্ষান্ত কিন্তু ডান দিকে শুইতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়াছিল। দু'জনেই গোঁয়ার; ভূতো যতই জোর দিয়া হুকুম করিয়াছিল, ক্ষান্ত ততই মাথা নাড়িয়াছিল; ফল কথা, ভূতোর উদারতা সে-দিন সার্থক হয় নাই, ক্ষান্ত শেষ পর্যন্ত বাঁ পাশেই শুইয়াছিল। বিপরীত দিকে মাথা করিয়া শুইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, কিন্তু গোঁয়ার বলিয়া কেহই কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই।

সে-রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভূতোর ইচ্ছা হইয়াছিল, গলা টিপিয়া বৌকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দেয়; কিন্তু স্ত্রীজাতির গায়ে হাত তোলা অভ্যাস ছিল না বলিয়া তাহা পারে নাই, কেবল মনে মনে তর্জন গর্জন করিয়াছিল। সকালে উঠিয়াই সে পাশের ঘরে নিজের পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পিসী সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় থাকিতেন না; বিশেষত চন্দ্রবিন্দু হইবার ভয় তাঁহারও ছিল, তাই তিনি দেখিয়া-শুনিয়াও বাঙ্-নিষ্পত্তি করেন নাই। তাহার পর ছয়-সাত মাস কাটিয়াছে কিন্তু ভূতোর পারিবারিক পরিস্থিতি পূর্ববৎ আছে।

ক্ষান্তর মুখ দেখিয়া তাহার মনের কথা ধরা যায় না। সে কান্নাকাটি করে নাই, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই; বরঞ্চ ভূতোর সংসারটি পিসীর হাত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। ভূতোর জীবনযাত্রা সেজন্য কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। সে সকাল-বেলা চা খাইয়া গোলায় চলিয়া যাইত, দুপুরবেলা আসিয়া স্নানাহার করিয়া খানিক নিদ্রা দিত তারপর আবার গোলায় যাইত। রাত্রে ফিরিয়া আহার করিয়া পুনরায় নিদ্রা দিত। ক্ষান্ত নামক একটি মানুষ যে বাড়িতে আছে তাহা সে লক্ষ্যই করিত না। ক্ষান্তও বিশেষ করিয়া নিজেকে ভূতোর লক্ষ্যবস্তু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত না।

ভূতোর বিবাহ-ব্যাপারটা যে ভাল উৎরায় নাই, এ কথা তাহার দলের সকলেই অনুমান করিয়াছিল এবং মনে মনে খুশি হইয়াছিল। সকলের মনেই ভয় ছিল, বিবাহের পর বৌয়ের খপ্পরে পড়িয়া ভূতো দলাদলি ছাড়িয়া দিবে—এমন তো কতই দেখা যায়। পুরুষের বহির্মুখী মন দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পাইয়া অন্তর্মুখী হয়। কিন্তু দেখা গেল, ভূতো নির্বিকার; বরং তাহার দাঙ্গা করিবার স্পৃহা আরও বাড়িয়া গেল। একদিন সে এক শ্বাদন্ত কাষ্ঠ-ক্রেতার মুখে ঘুষি মারিয়া তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিল, কিন্তু ক্রেতার দাঁতেও বিষ ছিল, ভূতোর হাত কাটিয়া গিয়া বিপর্যয় ফুলিয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ, কোমেণ্ট, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিলেন; কয়েক দিন ভূতোকে বাড়িতেই আবদ্ধ থাকিতে হইল। ক্ষান্ত তাহার যথারীতি পরিচর্যা করিল কিন্তু দু'জনের মধ্যে একটি কথারও বিনিময় হইল না।

এইভাবে চলিতে লাগিল। ভূতো সারিয়া উঠিয়া আবার গুণ্ডামি আরম্ভ করিল। সে কদাচিৎ বাড়িতে থাকিলে দলের ছেলেরা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। একদিন দুপুর-বেলা ভূতো ঘুমাইতেছিল, ছেলেরা একেবারে তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত।

—'ভূতোদা, দিন দিন অরাজক হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা কিছু না করলে আর তো পাড়ার মান থাকে না।'

জানা গেল, মাণিক নামক দলের একটি ছেলে এক বিলাতী কুকুরছানা পুষিয়াছিল। কুকুরছানাটিকে সে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কারণ বাঁধিয়া না রাখিলে কুকুরের রোখ কমিয়া যায়। কিন্তু আজ সকালে কুকুরশাবক দড়ি কাটিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং মুক্তির আনন্দে একেবারে বদ্যিপাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর বদ্যিপাড়ার নৃশংস ছোঁড়ারা তাহাকে ধরিয়া ল্যাজ ও কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

মাণিক প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিল—'এ কুকুরের কান কাটা নয় ভূতোদা, আমাদের পাড়ার কান কেটে নিয়েছে ওরা। এর জবাব তুমি যদি না দাও—'

banglabooks.in

কার্তিক বলিল—'বাদ্যপাড়ার ছোঁড়াগুলোর বড় বাড় বেড়েছে, ধরাকে সরা দেখছে। সে-দিন থিয়েটার করেছিল, লোকে একটু ভাল বলেছে কি না, অমনি আর মাটিতে পা পড়ছে না; যেন ভাল থিয়েটার আর কেউ করতে পারে না! তুমি যতক্ষণ ওদের একটাকে ধরে চন্দ্রবিন্দু না করে দিচ্ছ ততক্ষণ ওরা ঢিট হবে না ভূতোদা।'

ভূতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'হুঁ।' এবং লংক্লথের পাঞ্জাবিটা গলাইয়া লইয়া দলবল সব বাহির হইয়া গেল। ক্ষান্ত পাশের ঘর হইতে সমস্তই দেখিল, শুনিল, কিন্তু মুখ টিপিয়া রহিল। কেবল তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বলিতে থাকিল।

এবার ব্যাপার কিছু বেশী দূর গড়াইল। ভূতোর গোলাতেই সাধারণত দলের আড্ডা বসে, কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন সকালে ভূতোর বাড়িতে দল জমিয়াছিল; মহা উৎসাহে সকলে বিগত দিনের ঘটনা আলোচনা করিতেছিল ও চা খাইতেছিল; এমন সময় থানার সব্-ইন্সপেক্টর পরেশবাবু দেখা দিলেন। ছেলের দল তাঁহাকে দেখিয়া নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরেশবাবু খুব খানিকটা উচ্চহাস্য করিলেন, তার পর উপবেশন করিয়া কহিলেন, 'বিভূতিবাবু, আপনার নামে অনেক কথা আমাদের কানে এসেছে কিন্তু উড়ো খবর বলে আমরা কান দিইনি। এবার কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ও-পাড়ার রতন থানায় সানা লেখাতে এসেছিল। আপনি কাল তাকে চড় মেরেছিলেন, ফলে সে আর কানে শুনতে পাচ্ছে না।'

ভূতো বলিল,—'বেশ তো, করুক না মামলা। চড় মারার জন্যে পাঁচ টাকা জরিমানা বৈ তো নয়।'

পরেশবাবু বলিলেন—'রতন যদি সত্যিই কালা হয়ে যায় তাহলে দু'বছর ম্যাদ পর্যন্ত অসম্ভব নয়।' তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'যাহোক, আপনি দুষ্টু-বজ্জাত লোক নয়, তাই আপনাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা আমি চেপে দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলবেন। নাচাবার লোক দুনিয়ায় অনেক আছে; কিন্তু যে নাচে পায়ে খিল ধরে তারই।'

পরেশবাবুর উপদেশের ফলেই হোক অথবা উপলক্ষের অভাবেই হোক, অতঃপর কিছুদিন ভূতো শান্তশিষ্ট হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আগাইয়া আসিতেছিল; ভূতোর দল সরস্বতী পূজার সময় থিয়েটার করে, উদ্যোগ-আয়োজন পুরা দমে আরম্ভ হইয়াছিল। রাত্রে ভূতোর গোলায় একটা চালার নীচে মহলার আসর বসে। ভূতোর অবশ্য অভিনয় করিবার সখ নাই, কিন্তু সে অভিনেতাদের চা তামাকের ব্যবস্থা করিতে সারাক্ষণ সেইখানেই থাকে এবং প্রয়োজন হইলে গানের মহলার সঙ্গে একটু আধটু মন্দিরা বাজায়। আর্টের সঙ্গে ভূতোর সম্পর্ক ইহার বেশী নয়।

নির্দিষ্ট দিনে মহা ধুমধামের সহিত থিয়েটার হইল। অভিনয় কিন্তু শত্রুপক্ষ ছাড়া আর কাহাকেও বিশেষ আনন্দ দান করিতে পারিল না। দৈব দুর্বিপাকের উপর কাহারও হাত নাই, অভিনয়ের মাঝখানে সীনের দড়ি যদি হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায়, হারমোনিয়ামের মধ্যে ইঁদুর ঢোকে এবং কাটা সৈনিক স্টেজের মেঝের উপর পিপীলিকার যৌথ আক্রমণে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া 'বাপ রে' বলিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে অভিনয় জমিবে কি করিয়া? শত্রুপক্ষ সদলবলে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ ভরিয়া হাততালি দিল। ভূতোর দলের মনে আর সুখ রহিল না।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মফঃস্বলের শহরে এক রাত্রি থিয়েটার হইলে সাত দিন ধরিয়া তাহার প্রেতকৃত্য চলে। পরদিন দুপুরবেলা বাদ্যপাড়ার কয়েকটা ব্যাদড়া ছেলে ভূতোর গোলার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানা প্রকার টিট্‌কারি কাটিতে লাগিল। ভূতো গোলায় ছিল না, অভ্যাসমত বাড়ি গিয়াছিল, কিন্তু গতরাত্রের অভিনেতাদের মধ্যে কয়েক জন মচ্ছিভঙ্গভাবে সেখানে বসিয়া ছিল। বাছা বাছা বচনগুলি তাহাদের কানে যাইতে লাগিল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত তাহাদের সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

banglabooks.in

কিন্তু ভুতো নাই, এই দুর্মুখ শিশুপালগুলোকে শায়েস্তা করিবে কে? কিছুক্ষণ অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া কার্তিক তাহার অনুজ গণেশকে বলিল,—'গণশা, চুপি চুপি গিয়ে ভুতোদাকে খবর দে তো। আজ সব মিঞাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়ে তবে ছাড়ব—'

গণেশের বয়স কম, গায়ে জোরও আছে, সে বলিল—'কিন্তু আমরাও তো পাঁচ জন আছি—ওদের ধরে আচ্ছা করে ঠুকে দিলেই তো হয়—'

কার্তিক চোখ পাকাইয়া বলিল—'পাকামি করিস্‌নি গণশা। যার কর্ম তাকে সাজে। ঠুকে দেবার হলে আমরা এতক্ষণ দিতুম না! যা শীগ্‌গির ভুতোদাকে খবর দে—আমরা ততক্ষণ ঘাপটি মেরে আছি। খবর দিয়েই তুই ফিরে আসবি কিন্তু।'

ধমক খাইয়া গণেশ নিঃশব্দে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল। ওদিকে শিশুপালদের বাক্যবাণ তখন স্তরে স্তরে আরও শাণিত ও মর্মভেদী হইয়া উঠিতেছে।

ভুতোর মনও আজ ভাল ছিল না। আহারাদির পর সে বিছানায় শুইয়া ছিল কিন্তু ঘুমায় নাই। এমন সময় গণেশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া—'ভুতোদা, তুমি শীগ্‌গির এস, বাঁদ্যপাড়ার চ্যাংড়ারা এসে গোলার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে—' বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল, তখন ভুতোর বুকের ধিকি-ধিকি আগুন একেবারে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এমনি একটি সুযোগেরই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আজ দেখিয়া লইবে—বাঁদ্যপাড়ায় চন্দ্রবিন্দুর পত্তন তৈয়ার করিবে!

তড়াক করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সে একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া লইল, তারপর দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষান্ত কখন অলক্ষিত ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দৃশ্যটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, ভুতো রাগ ভুলিয়া কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল; তারপর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দ্বারের কাছে আসিল। স্বামী-স্ত্রীতে ফুলশয্যার পর প্রথম কথা হইল। ভুতো বলিল—'পথ ছাড়।'

ক্ষান্তর মুখ কঠিন, ডাগর চোখ আরও বড় হইয়াছে; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'না, তুমি যেতে পাবে না।'

নারীজাতির এই অসহ্য স্পর্ধায় ভুতো স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে চাপা গর্জনে বলিল—'সর বলছি!'

ক্ষান্ত চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল—'না, সরব না।'

ভুতোর আর সহ্য হইল না, সে রূঢ় ভাবে ক্ষান্তকে হাত দিয়া সরাইয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল। ক্ষান্তও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে পরিবর্তে ভুতোকে সবলে এক ঠেলা দিল।

এই ঠেলার জন্য ভুতো যদি প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে সম্ভবত কিছুই হইত না কিন্তু সে ক্ষান্তর শরীরে এতখানি শক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না; অতর্কিত ঠেলায় বেসামাল ভাবে দু'পা পিছাইয়া গিয়া সে বেবাক ধরাশায়ী হইল। ক্ষান্ত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তাহার আজ গোঁ চাপিয়াছে ভুতোকে কিছুতেই বাহিরে যাইতে দিবে না। তাই, ভুতো আবার ধড়মড় করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ওদিকে বাঁদ্যপাড়ার দল দীর্ঘকাল একতরফা তাল ঠুকিয়া শেষে ক্লান্ত ভাবে চলিয়া গেল। গোলার মধ্যে কার্তিকের দল মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। গণেশ অনেকক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভুতোর দেখা নাই। শেষে আর বসিয়া থাকা নিরর্থক বুঝিয়া কার্তিক গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তিক্ত স্বরে কহিল—'দুত্তোর! ভুতোদার'ই যখন চাড় নেই তখন আমাদের কিসের গরজ। চল্ বাড়ি যাই।'

কার্তিক ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বাকি তিনজন গেল না, তিন হাঁটু এক করিয়া বসিয়া রহিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর মাণিক বলিল—'খবর পেয়েও ভুতোদা এলো

banglabooks.in

না—এর মধ্যে কিছু ইয়ে আছে। জানা দরকার।—যাবি ভূতোদা'র বাড়ি?'

তিনজনে ভুতোর বাড়ি গেল। বাড়ি নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই। ভুতোর ঘরের দরজা ভিতর হইতে চাপা রহিয়াছে। মাণিক ইতস্তত করিয়া দরজায় একটু চাপ দিল। দরজা একটু ফাঁক হইল।

সেই ফাঁক দিয়া তিনজনে দেখিল, ভুতো মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া বক্ষ-লীনা শকুন্তলার মুখে চুম্বন করিতেছে।

লজ্জায় ধিক্কারে তিনজনে দরজা হইতে সরিয়া আসিল। তাহাদের বীর অধিনায়কের যে এমন শোচনীয় অধঃপাত হইবে তাহা তাহারা কল্পনা করিতেও পারে নাই। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে তাহারা ভাবিতে লাগিল,—ভুতো এতদিনে নিজেই চন্দ্রবিন্দু হইয়া গিয়াছে।

১৮ আষাঢ় ১৩৫২

সেকালিনী

হলুদপুরের কবিরাজ শ্রীহরিহর শর্মার কন্যা শৈল আমাদের কাহিনীর নায়িকা। কিন্তু আজকাল গল্পের নায়িকাদের যেসব অসমসাহসিক প্রগতিপূর্ণ কার্য করিতে দেখা যায় তাহার কিছুই সে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। শৈল নিতান্ত সেকালিনী।

হলুদপুর স্থানটির এক পা শহরে এক পা গ্রামে। তবে সামনের পা শহরের দিকে। গত কয়েক বছরে সে বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নাগরিক সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, হলুদপুরে দুটি স্কুল পর্যন্ত হইয়াছে—একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের। তা'ছাড়া লাইব্রেরী আছে, নাট্য-সমিতি আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীহরিহর শর্মাও আছেন।

দু'বছর আগে পর্যন্ত হরিহর কবিরাজ হলুদপুরের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন, সারা হলুদপুরের নাড়ী তাঁহার মুঠোর মধ্যে ছিল। মরিতে হইলে হলুদপুরের রোগী হরিহর কবিরাজের হাতে মরিত, বাঁচিতে হইলে তাঁহার হাতেই বাঁচিত। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, মেডিক্যাল কলেজের নূতন পাসকরা এক ডাক্তার তাঁহার পাশের বাড়িতে আসিয়া প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করিয়াছে।

হরিহর কবিরাজ একনিষ্ঠ সেকেলে মানুষ। সেকালের সহিত একালের ভেজাল দিয়া একটা বর্ণসঙ্কর জীবন-প্রণালী গঠন করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; হলুদপুরের দ্রুত অগ্রগতি তিনি প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রথমটা বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া শেষে নিজের গৃহেই সেকালত্বের একটি ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কন্যা শৈল স্কুলে পড়িতে যাইতে পায় নাই; দশ বছর বয়স

banglabooks.in

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। গৃহিণী হৈমবতী শেমিজ ব্লাউজ পরিতেন না। সংসারে সাবানের পাট ছিল না; প্রয়োজন হইলে মেয়েরা ক্ষার খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিবে। বেশী কথা কি, বাড়িতে পাথুরে কয়লা ঢুকিতে পাইত না, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কাঠ-কয়লা ও ঘুঁটের দ্বারা রন্ধনাদি কার্য নির্বাহ হইত। রাত্রে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিত।

এইরূপে আবহাওয়ার মধ্যে শৈল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে যে পরিপূর্ণরূপে সেকালিনী হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গৃহস্থালীর সকল কর্মে সে নিপুণা হইয়াছিল, এমন কি কবিরাজ মহাশয়ের পাচনাদি রন্ধনেও তাহার যথেষ্ট পটুত্ব জন্মিয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়ার দিক দিয়া 'ক' অক্ষরটি পর্যন্ত কেহ তাহাকে শেখায় নাই। মাতা হৈমবতী শক্ত মেয়েমানুষ ছিলেন; স্বামীর কাঠিন সেকালত্ব সম্বন্ধে মনে মনে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত স্বামীর ইচ্ছা পালন করিয়া চলিতেন। শৈল যখন বড় হইয়া উঠিল তখন তিনি সর্বদা তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন এবং রাত্রে তাহাকে লইয়া এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শৈল শেমিজ বা ব্লাউজ পরিবার অনুমতি পাইল না। কেবল রাঙা-পাড় শাড়ি পরিয়াই সে যৌবনে উপনীত হইল।

শৈল মেয়েটি দেখিতে ছোটখাটো এবং অত্যন্ত নরম; বস্তুত তাহাকে দেখিলে ঐ নরম শব্দটাই সর্বাগ্রে মনে আসে—সে সুন্দরী কি চলনসই তাহা লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। চোখের দৃষ্টি, মাথার চুল, লালপেড়ে শাড়িতে সযত্নে আবৃত দেহটি—সবই যেন নরম তুল্‌তুল করিতেছে। স্বভাবটিও তাই; মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়, নরম হাসিটি কিশলয়-পেলব অধরপ্রান্তে লাগিয়া থাকে। বয়স যদিও ষোল পূর্ণ হইতে চলিল তবু দেখিলে চৌদ্দ বছরেরটি বলিয়া মনে হয়।

তাহার সত্যকার চৌদ্দ বছর বয়স হইতে হরিহর তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কারণ, যতই সেকেলে হউন্, আইন ভঙ্গ করায় তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে সুপাত্র যোগাড় হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। হরিহর যে-ধরনের সুপাত্র চান, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বাংলা দেশে সেরূপ পাত্র একান্ত বিরল। তিনি চান সংস্কৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত সুদর্শন অবস্থাপন্ন পাল্‌টি ঘরের ছেলে। কার্যকালে দেখা গেল, যদি বর মেলে তো ঘর মেলে না, ঘর-বর মেলে তো কোষ্ঠী মেলে না। এইরূপে দেরি হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়া হরিহরের মন হইতে কন্যাদায়ের চিন্তা কিছু দিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিল। কলেজে পাসকরা ছোকরা ডাক্তার অজয় গাঙ্গুলী বাহির হইতে আসিয়া যখন তাঁহার পাশের বাড়িতেই ডাক্তারী আরম্ভ করিল তখন হরিহর এইরূপ ব্যবহারকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু অজয় ছেলেটি অতিশয় বিনয়ী ও বাক্‌পটু। সে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিল এবং এমনভাবে কথাবার্তা বলিল যেন সে হরিহরের অধীনেই আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। হরিহর মনে মনে একটু নরম হইলেও অনুরাগ-বিরাগ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল, হলুদপুরের যেসব লোক এতদিন তাঁহার উপরেই জীবন-মরণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল তাহারা অধিকাংশই এই নবীন ডাক্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখন হরিহরের অন্তঃকরণ তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত পাচনের মতই তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু করিবার কিছু ছিল না, অগত্যা তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাশের বাড়িতে বাইরের লোক এসেছে; দক্ষিণ দিকের জানালাগুলো যেন বন্ধ থাকে।'

ফলে বাড়ির দক্ষিণ দিকের তিনটি জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

দশ বছর বয়সে শৈলর জীবন যখন বাড়ির চারিটি ঘর ও পাঁচিল-ঘেরা উঠানের মধ্যে

banglabooks.in

আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে এই জানালাগুলিই ছিল বহির্জগতের সহিত তাহার প্রধান যোগসূত্র। জানালা দিয়া দক্ষিণের বাতাস আসে, খোলা মাঠের গন্ধ আসে, পাশের বাড়িটাও দেখা যায়; একটু তেরছাভাবে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে পথের লোক চলাচল চোখে পড়ে। নির্জন দ্বিপ্রহরে জানালায় দাঁড়াইয়া শৈল ঘরের সহিত বাহিরের ক্ষণিক সংযোগ স্থাপন করিত। আকাশে নীল রঙের ঘুড়ি উড়িতেছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশে তাহাদের সুতাগুলি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে; রাস্তা দিয়া বিচালি-বোঝাই গরুর গাড়ি নিশ্চিন্ত মন্থরতায় চলিয়া যাইতেছে; পাশের বাড়ির কার্নিসে একটা পায়রা গুমরিয়া গুমরিয়া কাহার উদ্দেশে অভিমান ব্যক্ত করিতেছে।—রাত্রে শয়নের পূর্বে সে শয়নঘরের জানালাটিতে গিয়া দাঁড়াইত। অন্ধকার ঘর, বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না; শৈল গায়ের কাপড় একটু আলগা করিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইত। বাহিরের অন্ধকার ঝিঁঝিঁপোকার ঝঙ্কারে পূর্ণ হইয়া থাকিত, গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির পরী-আলো জ্বলিত আর নিভিত; দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিত—

কিন্তু জানালাগুলি যখন বন্ধ হইয়া গেল তখন শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, তাহার মুখের হাসিও ম্লান হইয়া গেল না। রাত্রে শয়নের পূর্বে সে কেবল একবার বন্ধ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইত; পুরোনো জানালার তক্তায় একটা চোখ উঠিয়া গিয়া একটি ফুটা হইয়াছিল, সেই ফুটায় চোখ দিয়া সে বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিত, তারপর বিছানায় গিয়া শয়ন করিত। মা কাজকর্ম শেষ করিয়া আসিয়া দেখিতেন শৈল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহোক, হরিহর কবিরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী-সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া আবার যথারীতি কাজকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমনে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতি মারাত্মক নয়। বিশেষত দীর্ঘ একাধিপত্যের সময় তিনি যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আবার কন্যার জন্য পাত্রের সন্ধানে মন দিলেন। শৈলর বয়স তখন চতুর্দশী পার হইয়া পূর্ণিমায় পা দিয়াছে।

কয়েকমাস খোঁজাখুঁজির পর কাছেপিঠে হালুইপুরে গ্রামে একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্র ভালই অর্থাৎ হরিহর যাহা চান তাহার ষোল আনা না হোক চৌদ্দ আনা বটে। হরিহর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। মেয়ে দেখাদেখির কোনও কথা উঠিল না, কারণ দুই পক্ষই গোঁড়া—ঠিকুজি কোষ্ঠী যখন মিলিয়াছে তখন অন্য কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্বাদ-পর্বটাও বর যখন বিবাহ করিতে আসিবে তখনই সম্পন্ন হইবে।

আষাঢ়ের শেষের দিকে বিবাহের দিন। উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত, আত্মীয়-কুটুম্বেরা এখনও আসিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন সময় বিবাহের ঠিক সাত দিন আগে একটি ব্যাপার ঘটিল। স্নান করিবার সময় শৈলর হাত পিছলাইয়া জলভরা ঘটি তাহার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর পড়িল। আঙ্গুলটা থেঁতো হইয়া নখ প্রায় উড়িয়া গেল। রক্তারক্তি কাণ্ড!

হরিহর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বিবাহের মাত্র সপ্তাহকাল বাকি, এই সময় মেয়েটা এমন কাণ্ড করিয়া বসিল! সাত দিনের মধ্যে ঘা শুকাইবে বলিয়াও মনে হয় না। ক্ষতবৃদ্ধা কন্যাকে তিনি পাত্রস্থ করিবেন কি করিয়া?

হরিহর বরপক্ষকে দুর্ঘটনার কথা জানাইলেন এবং বিবাহ কিছুদিন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। বরপক্ষ বিরক্ত হইলেন, হয়তো কন্যার সুলক্ষণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। দুই পক্ষে একটু কথা কাটাকাটি হইল। তারপর বরপক্ষ অপ্রসন্নভাবে জানাইলেন যে তেসরা শ্রাবণ একটি বিবাহের দিন আছে, সেই দিনের মধ্যে যদি বিবাহ সম্ভব হয় তবেই তাঁহারা বিবাহ দিবেন নচেৎ সম্বন্ধ ভাঙিয়া যাইবে; যেখানেই হোক, শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাত্রের বিবাহ দিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

হরিহর তেসরা তারিখের মধ্যে ঘা সারাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু 'বুড়ির গোপান' প্রভৃতি ডাকাতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ঘা সারিল না। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঘা সারা সহজ কথা নয়; বিশেষত মেয়েরা খালি পায়ে থাকে, চলিতে ফিরিতে পায়ে হোঁচট

banglabooks.in

লাগে, আরোগ্যোন্মুখ ঘা আবার আউরাইয়া উঠে। তেসরা শ্রাবণ তো এমন অবস্থা হইল যে, শৈলকে শয্যা লইতে হইল। আঙ্গুলের ঘা বারবার অতর্কিত আঘাত পাইয়া বিষাইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল।

শৈলর ঘা কিন্তু তবু সারে না, মাঝে মাঝে একটু উন্নতি হয় আবার বাড়িয়া যায়। সারা শ্রাবণ মাসটাই এইভাবে কাটিল। হরিহর ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। হৈমবতীর মায়ের-প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন—'ওগো, ঘা তো কিছুতেই সারছে না; শেষে কি মেয়েটা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যাবে!—একবার ঐ ডাক্তার ছেলেটিকে খবর দিলে হয় না?'

হরিহর অনেকক্ষণ মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সংক্ষেপে বলিলেন, 'বেশ, খবর পাঠাও।'

খবর পাইয়া অজয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল। হরিহর কোনও কথা না বলিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন; শৈল দালানের মেঝেয় বসিয়া ছিল, নীরবে তাহার পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। অজয় শৈলর পায়ের বন্ধন খুলিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিল; শৈল পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

এতটুকু আইবুড়ো মেয়েকে সম্ভ্রম দেখানো অজয়ের অভ্যাস নাই; সে স্থানটি টিপিতে টিপিতে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি খুকি, লাগছে?'

শৈলর মুখ একটু বিবর্ণ হইল; একবার অধর দংশন করিয়া সে তেমনি পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

অজয় তখন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিল, তারপর তাহাতে টিঞ্চার আয়োডিন ঢালিতে ঢালিতে মুচ্কি হাসিয়া বলিল, 'এবার জ্বালা করছে তো?'

শৈল এবারও মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। তাহার মুখখানি কিন্তু আরও একটু পাংশু দেখাইল।

মলম লাগাইয়া ভাল করিয়া পা ব্যাণ্ডেজ করিয়া অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিহরকে বলিল, 'তিন দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলবেন, বোধহয় ততদিন শুকিয়ে যাবে। বেশী নড়াচড়া কিন্তু বারণ। খুকি, দৌড়াদৌড়ি কোরো না।'

এবার শৈলর মুখের বিবর্ণতা ভেদ করিয়া একটু অরুণাভা দেখা দিল। সে নীরবে একবার অজয়ের দিকে আয়ত দৃষ্টি হানিয়া আবার মাথা হেঁট করিল। অজয়ের হঠাৎ মনে হইল মেয়েটাকে সে যতটা খুকী মনে করিয়াছিল বোধহয় ততটা খুকী নয়। সে একটু অপ্রস্তুত হইল।

বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিহর ট্যাঁক হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া অজয়কে দিতে গেলেন, অজয় হাত জোড় করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, 'আমরা দুজনেই ডাক্তার। আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিল—'একটা কথা এতদিন বলবার সাহস হয়নি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।'

হরিহর ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন, অজয় তখন বলিল, 'আমার মা অনেক দিন থেকে অম্বলে ভুগ্ছেন। কিন্তু তিনি বিধবা মানুষ, ডাক্তারী ওষুধ খেতে চান না। তা ছাড়া আমার ওষুধে কাজও কিছু হচ্ছে না। এখন যদি আপনি ব্যবস্থা করেন।'

হরিহরের মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল; তিনি বুঝিলেন অজয় তাঁহাকে ঋণী করিয়া রাখিতে চায় না। বলিলেন, 'বেশ, আজ বিকেলে আমি তোমার বাড়ি যাব।'

বৈকালে অজয়ের মাকে পরীক্ষা করিয়া হরিহর ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন—পাচন, গুলি ও অবলেহ। ঔষধ ব্যবহারের বিধি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এক হপ্তা এই চলুক, আশা করি দোষটা কেটে যাবে।'

তিন দিনের দিন শৈলর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখা গেল ঘা শুকাইয়া গিয়াছে। ওদিকে

banglabooks.in

অজয়ের মা সপ্তাহকাল ঔষধ সেবন করিয়া দিব্য চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে দুই পরিবারের মধ্যে প্রথম স্বার্থ-সংঘাতের উষ্মা অনেকটা প্রশমিত হইল, হয়তো পরস্পরের প্রতি একটু শ্রদ্ধাও জন্মিল; কিন্তু উহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পাইল না। স্বার্থের ঠোকাঠুকি যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক, সেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হওয়া বড়ই কঠিন। হরিহর ও অজয়ের সম্পর্ক দেঁতো হাসি ও মিষ্ট কথার পর্যায়ে উঠিয়া আটকাইয়া রহিল।

এদিকে শ্রাবণ মাস ফুরাইয়া ভাদ্র মাস আরম্ভ হইয়াছে। শৈলর শরীরও সারিয়াছে। মাঝে আর দুটি মাস বাকি, অঘ্রাণ মাসে মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে। হরিহর আবার সবেগে তত্ত্ব-তল্লাস আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কার্তিক মাসের শেষে একটি পাত্র পাওয়া গেল, হরিহর আর বিলম্ব না করিয়া দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। পাত্রটি এবার অবশ্য তেমন মনের মত হইল না, হরিহর যাহা চান তাহার আট আনা মাত্র। কিন্তু উপায় কি। মেয়ের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হইতে চলিল, আর বিলম্ব করা চলে না। আবার বাড়িতে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিবাহের সাত দিন আগে, দুপুরবেলা হরিহরের উঠানে প্রকাণ্ড উনানের উপর প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে কোনও একটি রসায়ন তৈয়ার হইতেছিল। এরূপ কবিরাজী ঔষধ নিত্যই বাড়িতে তৈয়ার হয়। শৈল একলা দাঁড়াইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল। বহু গাছ-গাছড়া ও গুড়ের মত একটি বস্তু একত্র সিদ্ধ হইয়া বেশ একটি স্বর্ণাভ গাঢ় পদার্থে পরিণত হইয়াছে, বড় বড় বুদ্বুদ উদ্‌গীর্ণ করিয়া টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে।

উঠানে কেহ কোথাও নাই, শৈল একাকিনী দাঁড়াইয়া হাতা নাড়িতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক হাতা তুলিয়া আবার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতেছিল কতখানি গাঢ় হইয়াছে। শীতের রৌদ্র তেমন কড়া নয়, কিন্তু আগুনের আঁচে তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। আর, নরম ঠোঁটে একটুখানি গোপন মিষ্ট হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

এক হাতা ফুটন্ত পদার্থ তুলিয়া লইয়া শৈল সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইল। কেহ নাই; মায়ের ঘরে দরজা খোলা রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি এখন কাঁথা মুড়ি দিয়া একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। শৈল সুমিষ্ট হাসিতে হাসিতে নিজের বাঁ হাতের কব্জির উপর ফুটন্ত হাতা উপুড় করিয়া দিল।

একটা চাপা চীৎকার—! কিন্তু শৈল চীৎকার করে নাই, চীৎকার আসিল ঘরের ভিতর হইতে। হৈমবতী ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আর্তোক্তিতে শৈলর বোধ হয় হাত কাঁপিয়া গিয়াছিল, সবটা পদার্থ তাহার কব্জিতে না পড়িয়া মাটিতে পড়িল।

আগুনখাকীর মত হৈমবতী আসিয়া মেয়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখে শৈল চক্ষু নত করিয়া রহিল। হৈমবতী যে সমস্তই দেখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি সহসা কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, বয়লারে বাষ্পাধিক্য ঘটিলে যেরূপ শব্দ করিয়া বাষ্প বাহির হয় তিনি সেইরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তারপর সহসা শৈলর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শৈলকে খাটে বসাইলেন, একটি তালের পাখা শক্ত করিয়া হাতে ধরিয়া বলিলেন, ইচ্ছে করে পায়ে ঘটি ফেলেছিলি। আবার আজ হাত পুড়িয়েছিস। হারামজাদি, কি চাস তুই বল।'

শৈল উত্তর না দিয়া মায়ের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিল; ক্রুদ্ধা হৈমবতী তাহার পিঠে পাখার এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর মাতা ও কন্যার মধ্যে কি হইল তাহা আমরা জানি না। আধঘণ্টা পরে হৈমবতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং স্বামীর ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা হরিহর অজয়ের বাড়ি গেলেন। অজয় রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিল,

banglabooks.in

তাহাকে বলিলেন, 'তুমি একবার শৈলকে দেখে যেও, সে আবার হাত পুড়িয়ে ফেলেছে।'

অজয় চলিয়া গেল। তখন হরিহর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মাতার সহিত কথা কহিলেন।

ইহার পর হলুদপুরের রোগীরা লক্ষ্য করিল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকের মধ্যে একটা আশ্চর্য রকমের রফা হইয়া গিয়াছে। অজয় রোগীকে বলে—'আপনার রোগ ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি বরং কবিরাজ মশায়কে দেখান।' হরিহর নিজের রোগীকে বলেন—'তোমার দেখছি চেরা-ফাড়ার ব্যাপার আছে, তুমি বাপু অজয়ের কাছে যাও।'

কথাটা এখনও প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু অজয়ের সহিত শৈলর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘ মাসে বিবাহ। আশা করা যাইতেছে, এবার আর কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটিবে না, সেকালিনী মেয়ে শৈলর বিবাহ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইবে।

২৭ আষাঢ় ১৩৫২

মুখোস

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই যে মুখে মুখোস পরিয়া ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই গূঢ় তত্ত্বটির প্রতি সাধারণের সতর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আমি আপাততঃ মাত্র চারিটি চরিত্র নমুনাস্বরূপ সর্বসমক্ষে হাজির করিতেছি, আশা করিতেছি এই চারিটি ভাত টিপিলেই হাঁড়ির খবর আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

অর্ধশতাব্দীকাল পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও নরেশবাবু শরীরটিকে দিব্য তাজা রাখিয়াছিলেন, চুলও যাহা পাকিয়াছিল তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁহার সৌম্য সুদর্শন চেহারাখানি দেখিলে তাঁহাকে একটি পরম শুদ্ধাচারী ঋষি বলিয়া মনে হইত। অবশ্য গোঁফ-দাড়ির হাঙ্গামা ছিল না, তিনি প্রত্যহ সযত্নে ক্ষৌরকার্য করিতেন; সুচিক্কণ মুণ্ডিত মুখ-মণ্ডলে একটি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক হাসি সর্বদাই ক্রীড়া করিত। চোখের চাহনিতে এমন একটি স্বপ্নাতুর সুদূর-দুর্লভ আবেশ লাগিয়া থাকিত যে, মনে হইত তাঁহার প্রাণপুরুষ পৃথিবীর ধুলামাটি হইতে বহু ঊর্ধ্বে ত্রিগুণাতীত তুরীয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছে। মোট কথা, তাঁহাকে দেখিলে মানুষের মনে স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভ্রমের উদয় হইত।

নরেশবাবু বিবাহ করেন নাই। সারা জীবন বিদেশে থাকিয়া তিনি ব্যবসাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়াছেন; এখন বোধ করি 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য গুটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। নিরুদ্বেগ শান্তিতে জীবনের বাকি দিনগুলি উপভোগ করিবেন ইহাই ইচ্ছা।

বিদেশ হইতে নরেশবাবু একটি অনুচর সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহার নাম বাবাধৎ সিং সংক্ষেপে বাবা সিং। নামটি যে কিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয় তাহা তাহার চেহারা দেখিলেই বুঝা

banglabooks.in

যায়। বসন্তের গুটিচিহ্ন আঁকা হাঁড়ির মত একটা মুখ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট ধৃষ্টতা-ভরা চক্ষু দুটি সর্বদা ঘুরিতেছে, যেন একটা ছুতা পাইলেই টুঁটি কামড়াইয়া ধরিবে। দেহ-খানা আড়ে-দীঘে প্রায় সমান। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো রঙের পাঞ্জাবি পরিয়া ও মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি চড়াইয়া সে যখন বুক চিতাইয়া পথ দিয়া হাঁটে, তখন সম্মুখের ভদ্র পথিক অপমানের ভয়ে সশঙ্কে পথ ছাড়িয়া দেয়। বাঘা সিং নরেশবাবুর পুরাতন ভৃত্য। সে কোনও কাজ করে না, কেবল বাড়ির সদর দরজার পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া থাকে; তাহার অনুমতি না লইয়া তাহাকে ডিঙাইয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে এমন সাহস কাহারও নাই। সারাদিন টুলের উপর বসিয়া বাঘা সিং পান চিবায়, পানের গাঢ় রস তাহার কশ বাহিয়া গড়াইতে থাকে; যেন সে কাঁচা মাংস চিবাইতেছে।

নরেশবাবুর বাড়িটি ছোট, ছিমছাম, দ্বিতল। পাশেই আর একটি ছোট বাড়ি আছে, সেটি একতলা। পুরানো বাড়ি, উপরে কোমর পর্যন্ত পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। এই বাড়িতে যিনি বাস করেন তাঁহার নাম দীননাথ। নিরীহ ভালমানুষ লোক, সামান্য কেরানিগিরি করেন। শীর্ণ কোলকুঁজো ধরনের চেহারা, মোটা চশমার ভিতর দিয়া যেভাবে পৃথিবীর দিকে তাকান তাহাতে মনে হয় তিনি পৃথিবীকে ভয় করিয়া চলেন। পৃথিবী তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করে নাই, অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে চিরদিন পিছনেই ফেলিয়া রাখিয়াছে; তাই তিনিও শামুকের মত সসঙ্কোচে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার পরিবারে যে একটি মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই এজন্যও তিনি মনে মনে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ সামান্য মাহিনা সত্ত্বেও তাঁহার ঘরে অনটন নাই। মেয়ের অবশ্য বিবাহ দিতে হইবে কিন্তু সেজন্য দীননাথ চিন্তিত নন; প্রভিডেন্ট ফণ্ডে যে টাকা জমিয়াছে তাহাতে মেয়ের বিবাহ দেওয়া চলিবে।

মেয়েটির নাম অমলা। বয়স সতেরো বছর; একবার তাহার উপর চোখ পড়িলে আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। নূতন যৌবনের দুর্নিবার বহির্মুখিতা পাকা ডালিমের মত তাহার সারা দেহে যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, চোখে মুখে চঞ্চল প্রগল্‌ভতা। অমলা নিজের রূপ-যৌবন সম্বন্ধে সম্ভবত অচেতন নয়; সে চোখ বাঁকাইয়া তাকায়, মুখ টিপিয়া হাসে, খোলা ছাদে দুপুরবেলা চুল এলো করিয়া চুল শুকায়। রাস্তায় একটু উঁচু শব্দ হইলে সে ছুটিয়া গিয়া আলিসার উপর বুক পর্যন্ত ঝুঁকাইয়া নিচে রাস্তার পানে তাকাইয়া দেখে; তাহার গায়ের কাপড় সব সময় ঠিক থাকে না, অতি তুচ্ছ কারণে অসম্বৃত হইয়া পড়ে।

নরেশবাবু নিজের দ্বিতলের জানালা হইতে অমলাকে দেখিয়াছিলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। মন্তব্যটি ঋষিজনোচিত কি না বলিতে পারি না, কারণ সেকালের মুনিঋষিরা নারীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কিরূপ মন্তব্য করিতেন তাহার কোনও নজির নাই। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ভাষায় উহা একেবারেই অচল। 'ছলনা' শব্দটা অসভ্য ইতরজনের মুখে মুখে অপভ্রষ্ট হইয়া বড়ই বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে।

অমলাও নরেশবাবুকে দেখিয়াছিল। অমলা ছাদে উঠিলেই নরেশবাবু নিজের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেন; আকাশের পানে এমন মুগ্ধ ভাবে তাকাইয়া থাকিতেন যেন ঐ দুরবগাহ নীলিমার মধ্যে তাঁহার সাধনার পরম বস্তুকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে চক্ষু নিচের দিকে নামিত, মুখের হাসিটি আরও মুগ্ধ-মধুর হইয়া উঠিত। অমলার মনে বোধ করি শ্রদ্ধার উদয় হইত; সে সঙ্কুচিতভাবে গায়ের কাপড় সামলাইয়া, চলনভঙ্গীকে অতিশয় মন্থর করিয়া, পিছনে দু'একটি চকিত দৃষ্টি হানিতে হানিতে নিচে নামিয়া যাইত।

দীননাথ এসবের কিছুই খবর রাখিতেন না। অফিস হইতে ফিরিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইয়া যাইত; তাড়াতাড়ি একপেয়ালা চা ও কিছু জলখাবার গলাধঃকরণ করিয়া তিনি বাহিরের ঘরের জানালার পাশে তক্তপোশে গিয়া বসিতেন, তাক হইতে একটি পেঙ্গুইন-মার্কা ইংরেজী ডিটেকটিভ উপন্যাস পাড়িয়া লইয়া তক্তপোশের উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। অমলা আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলে তিনি নির্বিচারে হুঁ দিয়া যাইতেন,

banglabooks.in

কারণ কথাগুলি তাঁহার এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত, ক্ষণেকের জন্যও মস্তিষ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইত না।

একদিন অমলা বলিল—'বাবা, পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে, তুমি দেখেছ?'

দীননাথ বলিলেন—'হুঁ।'

অমলা বলিল—'আমিও দেখেছি—বোধহয় খুব সাধু লোক। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন—'

'হুঁ।'

'ঝি বলছিল ওঁর বাড়ির দরজায় একটা দুশমনের মত লোক বসে থাকে, দেখলেই ভয় করে।'

'হুঁ হুঁ' বলিয়া দীননাথ বইয়ের পাতা উল্টাইলেন।

এমনি ভাবে কয়েক হপ্তা কাটিবার পর একদিন সকালবেলা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গিয়া অমলা দেখিল, একটি কাগজের মোড়ক ছাদে পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একটি রাঙা টক্‌টকে গোলাপফুল। অমলা চোখ বাঁকাইয়া জানালার দিকে তাকাইল; নরেশবাবু স্নিগ্ধ হাসি-হাসি মুখে আকাশের পানে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার গায়ে চাঁপা রঙের একটি সিল্কের কিমোনো সদ্যঃস্নাত তরুণ তাপসের অঙ্গে গৈরিক বসনের মত শোভা পাইতেছে।

ফুলটিকে অমলা পূজার নির্মাল্য বলিয়া মনে করিল কিনা কে জানে; সে নরেশবাবুর দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল, তারপর ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সেটি খোঁপায় গুঁজিল। নরেশবাবু একবার চক্ষু নামাইলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিলেন। লোহা গরম হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার মুখের হাসি আরও স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অফিসে বড়সাহেবের শাশুড়ী মারা গিয়াছিল, এই আনন্দময় উপলক্ষে অর্ধদিনের ছুটি পাইয়া দীননাথ দ্বিপ্রহরেই বাড়ি ফিরিলেন। পথে আসিতে একটি ডাব কিনিয়া লইলেন। অমলা ডাব খাইতে চাহিয়াছিল, অমলা চিনি দিয়া ডাবের কচি শাঁস খাইতে ভালবাসে; ডাবের জলটা দীননাথ পান করেন।

বাড়ি আসিয়া দীননাথ ধড়াচুড়া ছাড়িলেন, তারপর দা লইয়া ডাব কাটিতে বসিলেন। অমলা গেলাস চামচে প্রভৃতি লইয়া কাছে বসিল। দু'জনের মুখেই হাসি। অমলা বলিল—'খুব কচি ডাব, না বাবা?'

দীননাথ ডাবের মাথায় এক কোপ বসাইয়া বলিলেন—'হুঁ। তুলতুলে শাঁস বেরুবে। আমাকে একটু দিস।'

অমলা বলিল—'আচ্ছা। তুমিও আমাকে একটু জল দিও।'

এই সময় সদর দরজার কড়া নড়িল। ঝিয়ের এখনও আসিবার সময় হয় নাই, তবু ঝি আসিয়াছে মনে করিয়া অমলা দ্বার খুলিতে গেল।

মিনিটখানেক পরে অমলা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল; তাহার হাতে একটা দশ টাকার নোট ও গোলাপী রঙের একখানা চিঠি। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাপের পাশে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ও বাবা, এসব কী দ্যাখো!'

দীননাথ চিঠি পড়িলেন এবং নোট দেখিলেন; তারপর দা তুলিয়া লইয়া তীরবেগে বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, চিঠিখানি নরেশবাবুর লেখা ও নোটখানিও তাঁহারই—বাঘা সিং লইয়া আসিয়াছিল।

নরেশবাবু দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া দীননাথের সদর দরজা লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বাঘা সিং উঠিপড়ি করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, পিছনে দা হস্তে দীননাথবাবু। বাঘা সিং বেশী দূর পলাইতে পারিল না, চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল; দীননাথ ডালকুত্তার মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন।

banglabooks.in

হৈ হৈ কাণ্ড; লোক জমিয়া গেল। দীননাথ বাঘা সিংয়ের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া এলোপাথাড়ি দা চালাইতেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি ক্রোধান্ধ অবস্থায় দা'টি উল্টা করিয়া ধরিয়াছিলেন, ধারের দিকটা বাঘা সিংয়ের গায়ে পড়িতেছিল না। সে কিন্তু পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া চলিয়াছিল—'বাপ রে! জান্ গিয়া! পুলিশ! মার ডালা!—'

নরেশবাবু পাংশু মুখে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কী দুর্দৈব! মেয়েটা তো রাজীই ছিল; কে জানিত মড়া-খেকো বাপ্‌টা ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরিয়াছে এবং তার এত বিক্রম।

ওদিকে অমলা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, বালিশে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। এত নোংরা মানুষের মন! তাহার সতেরো বছরের নিষ্পাপ জীবনে এমন জঘন্য ব্যাপার কখনও ঘটে নাই। আজ একি হইল! মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হইলে সে না হাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা কি মন্দ? তবে কেন লোকে তাহার সম্বন্ধে যা-তা ভাবিবে!

২১ শ্রাবণ ১৩৫২

পরীক্ষা

বিনায়ক বসুর ড্রয়িংরুম।

রাত্রিকালে বিদ্যুৎবাতির আলোয় ঘরটি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। ফিকা সবুজ রংয়ের দেয়াল; নূতন আধুনিক গঠনের আসবাব। তিনটি আলোর বাল্‌ব ঘরে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ঘরটি প্রায় ছায়াহীন করিয়া তুলিয়াছে।

ঘরের দুইপাশে দুইটি দ্বার, একটি ভিতরে এবং অন্যটি বাহিরে যাইবার পথ। ঘরের তৃতীয় দেয়ালের মাঝখানে ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জের সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটি প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে।

বিনায়ক বসু ডিনার শেষ করিয়া ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিয়াছে এবং একটি কৌচে প্রায় চিৎ হইয়া শুইয়া একখানি ইংরেজী উপন্যাস পড়িতেছে। তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবির উপর একটি সিল্কের ড্রেসিং গাউন।

বিনায়কের বয়স ত্রিশের নিচেই, সে এখনও অবিবাহিত। তাহাকে সুপুরুষ বলা চলে। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা কোঁকড়া চুল; মুখের লালিত্যের সঙ্গে এমন একটা পরিমার্জিত হঠকারিতার ভাব মিশ্রিত আছে যে, তাহাকে চালিয়াৎ বলিয়া মনে হয় এবং তাহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও খট্‌কা লাগে। উপরন্তু সে তরুণীদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারে; তরুণীরাও কেন জানি না, তাহার প্রতি একটু বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হন। এই সব কারণে শহরে তাহার কিছু বদনাম রটিয়াছে।

বিনায়ক সরকারী ইঞ্জিনীয়ার; মাস দুই পূর্বে সে পশ্চিমবঙ্গের এই সমৃদ্ধ শহরে বদলি হইয়া আসিয়াছে এবং স্থানীয় অভিজাত সমাজের তরুণীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

banglabooks.in

করিয়াছে।

নিবিষ্ট মনে বই পড়িতে পড়িতে বিনায়ক অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিতেছিল এবং ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া শূন্যে তাকাইতেছিল, যেন তাহার মনের মধ্যে অন্য কোনও চিন্তা ঘোরাঘুরি করিতেছে। একবার সে বই রাখিয়া উঠিল; ঘরের কোণে একটি ক্ষুদ্র আলমারি ছিল, তাহার ভিতর হইতে বোতল ও পেগ বাহির করিয়া পেগ পূর্ণ করিয়া লইয়া আবার আসিয়া বসিল। বই পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে পেগে চুমুক দিতে লাগিল।

বাহিরের দিকের দরজা দিয়া একটি উর্দিপরা ফিটফাট খানসামা প্রবেশ করিল; তাহার হাতে জার্মান সিল্ভারের রেকাবের উপর একখানি চিঠি। খানসামা নিঃশব্দে প্রভুর সম্মুখে রেকাব ধরিল। বিনায়ক চিঠি তুলিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। তাহার ভ্রূ একটু উঠিল। সে একবার ঘড়ির দিকে তাকাইল; পাশের টেবিলে বুদ্বুদের ন্যায় কাচে ঢাকা সুন্দর একটি টাইমপীস্, তাহাতে দশটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট হইয়াছে। বিনায়ক চিঠিখানি ড্রেসিং গাউনের পকেটে রাখিল, পেগ তুলিয়া লইয়া খানসামার দিকে না তাকাইয়াই বলিল, 'তুমি এখন যেতে পার, তোমাকে আর দরকার হবে না।—হ্যাঁ, সদর দরজা বন্ধ করবার দরকার নেই।'

খানসামা 'জী' বলিয়া প্রস্থান করিল।

বিনায়ক পেগে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া রাখিয়া দিল; একটি জয়পুরী কৌটার মধ্য হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে পড়িল—

"বিনায়কবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে—আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি আসব—সে সময় যেন কেউ না থাকে—

ইতি—মণিকা নন্দী।"

বিনায়কের মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। সে চিঠি মুড়িয়া পকেটে রাখিল, তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়া সেটা অ্যাশ্ট্রেতে ফেলিয়া পেগ তুলিয়া লইল।

পেগ ঠোঁটের কাছে তুলিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের ওপার হইতে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল, 'বিনায়কবাবু, আসতে পারি?'

বিনায়ক ক্ষণেক দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর পেগ নামাইয়া রাখিয়া হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

বিনায়কঃ এস মণিকা।

মণিকা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার আবির্ভাবে ঘরটা যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। মণিকা শুধু সুন্দরী নয়, তাহার মুখে চোখে বুদ্ধি ও চিত্তবলের এমন একটি প্রভা আছে যে তাহা তাহার দৈহিক সৌন্দর্যকে আরও ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। মণিকার বয়স কুড়ি বছর, তাহার কবরীতে যূথীফুলের মালা, পরিধানে চাঁপা রঙের একটি সূক্ষ্ম বেনারসী শাড়ি, কর্ণে কণ্ঠে মণিবন্ধে মুক্তার লঘু অলঙ্কার, উচ্ছল যৌবনের ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া সে যখন বিনায়কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন মনে হইল, সেকালে রাজকন্যারা বুঝি এমনি ভাবেই চোখ ধাঁধাইয়া স্বয়ংবর-সভায় আবির্ভূতা হইতেন।

মণিকার অধরে একটু হাসি লাগিয়া আছে; বিরাগ ও অনুরাগ অবিশ্লেষ্যভাবে মিশিয়া গেলে বোধ করি মেয়েদের মুখে এইরূপ হাসি দেখা দেয়। মণিকা বলিল, 'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

বিনায়ক পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ধরিল, মণিকাকে দেখিয়া তাহার বুক যে দুরুদুরু করিতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না।

বিনায়কঃ সেকালের পণ্ডিতগুলো ঠিক ধরেছিল। স্ত্রীজাতির চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—কখন কী ঘটবে বলা যায় না। আমার ভাগ্য যে হঠাৎ এত প্রসন্ন হয়ে উঠেছে তা দশটা বেজে পঁচিশ মিনিটের আগে জানতে পারিনি। তাই সামাজিক ভদ্রবেশ পরবার সময় পেলুম না।

banglabooks.in

মণিকা এই ত্রুটি-স্বীকারের কোনও উত্তর না দিয়া চিঠিখানি লইয়া নিজের ব্লাউজের মধ্যে রাখিল।

মণিকাঃ এটার আর বোধ হয় আপনার দরকার নেই?

বিনায়ক মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিনায়কঃ না। তা ছাড়া তোমার চিঠি আমার কাছে না থাকাই ভাল। সাবধানের মার নেই। কিন্তু যাক্, তোমার সংবর্ধনা করা হয়নি। এস—বোসো—

মণিকাকে সোফায় বসাইয়া সিগারেটের জয়পুরী বাক্সটা তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া বিনায়ক বলিল, 'নাও।'

মণিকা একবার বাক্সের দিকে তাকাইল, একবার বিনায়কের মুখের পানে তাকাইল; তারপর শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আমি সিগারেট খাই না। আপনার পরিচিতা মহিলারা সকলেই বিনায়ক বলিল, 'নাও।'

বিনায়কঃ সকলেই নয়। তবে কয়েকজন আছেন যাঁরা এক টানে একটা আস্ত সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি যখন ধূমপান কর না তখন অন্য কোনও পানীয়ের ব্যবস্থা করি! চা—? কফি—? সরবৎ—?

মণিকা পেগের দিকে কটাক্ষপাত করিল।

মণিকাঃ আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, বরং আপনি যা খাচ্ছিলেন সেটা শেষ করে ফেলুন।

বিনায়কঃ আমি—? ওঃ!

অর্ধপূর্ণ পেগ হাতে তুলিয়া লইয়া বিনায়ক হাসিল।

বিনায়কঃ তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমি মাতাল নই। মাঝে মাঝে ডিনারের পর একটু পোর্ট খাই, শরীর ভাল থাকে। তুমিও ইচ্ছে করলে খেতে পার। মেয়েদের পোর্ট খেতে বাধা নেই।

মণিকাঃ ধন্যবাদ। পোর্ট আর ব্রান্ডি-হুইস্কির মধ্যে কি তফাৎ তা বোঝবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। সুতরাং ওটা থাক্।

বিনায়ক পেগ নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিল।

বিনায়কঃ বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে। আমার অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় কি?

সে কৌচের অন্য প্রান্তে বসিল। মণিকা ঘরের চারিদিকে একবার সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইল; রাজার ছবির উপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

মণিকাঃ আপনি খুব সৌখীন লোক দেখছি। কিন্তু রাজার ছবি কেন? ওতে আপনার ড্রয়িংরুমের শোভা আরও বেড়েছে বলে মনে হয়?

বিনায়কঃ না। ওটা ভেক।

মণিকাঃ ভেক?

বিনায়কঃ হ্যাঁ। ইংরেজের চাকরি করতে হলে ওটা দরকার হয়।

মণিকাঃ (ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে) আমার বাবাও ইংরেজের চাকরি করেন, এ জেলার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তিনি। কিন্তু তিনি তো ঘরে রাজার ছবি টাঙান্ নি।

বিনায়কঃ তবে কার ছবি টাঙিয়েছেন?

মণিকাঃ কারুর নয়। বাবার ঘরে কোনও ছবিই নেই।

বিনায়কঃ আমার ঘরে কিন্তু অন্য ছবি আছে।

মণিকাঃ (চারিদিকে চাহিয়া) কই—কোথায়? দেখছি না তো!

বিনায়কঃ এস আমার সঙ্গে—দেখাচ্ছি।

সে উঠিয়া রাজার ছবির দিকে গেল, মণিকাও তাহার অনুবর্তিনী হইল। বিনায়ক ছবির ফ্রেমের উপর একটা বোতাম টিপিতেই রাজার ছবি উল্টাইয়া গিয়া তাহার স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখা দিল। মণিকা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর একটু অপ্রতিভভাবে হাসিল।

banglabooks.in

মণিকাঃ ভুলে গিয়েছিলুম আপনি ইঞ্জিনীয়ার। বেশ কল বানিয়েছেন—

সে ফিরিয়া গিয়া কৌচে বসিল।

মণিকাঃ কিন্তু এতে একটা কথা প্রমাণ হল।

বিনায়কঃ কী প্রমাণ হল?

মণিকাঃ প্রমাণ হল যে আপনার ভেতরে এক বাইরে আর। আপনি সাদা লোক নন।

বিনায়কঃ (হাসিয়া) এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। পৃথিবীতে সাদা লোক ক'টা পাওয়া যায়? তুমি আজ যে ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তার মধ্যেও তো লুকোচুরি রয়েছে।

মণিকার মুখ একটু লাল হইল, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনায়কের মুখের পানে চাহিল।

মণিকাঃ লুকোচুরি কিছু নেই। আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

বিনায়কঃ বেশ তো। কিন্তু সেজন্য এই রাত্রে একলা আসার দরকার ছিল কি? অন্তত তোমার ছোট ভাই শম্ভু সঙ্গে এলে কোন দোষ হত না।

মণিকা যেন একটু অস্বস্তি অনুভব করিল, একবার চকিত চক্ষে বাহিরের দ্বারের পানে তাকাইল, তারপর একটু তাড়াতাড়ি বলিল, 'একলা আসার দরকার ছিল। আমার কথা গোপনীয়। এ বাড়িতে আর কেউ নেই তো?'

বিনায়কঃ কেউ না। স্রেফ তুমি আর আমি।

বিনায়ক আড়চোখে মণিকার পানে তাকাইল। মণিকার মুখে ক্ষণেকের জন্য শঙ্কার ছায়া পড়িল, তারপরই সে সোজা হইয়া বসিল, তাহার চক্ষু প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় প্রখর হইয়া উঠিল। বিনায়ক তাহা লক্ষ্য না করিয়া বাক্স হইতে সিগারেট লইতে লইতে প্রশ্ন করিল, 'আপত্তি নেই? খেতে পারি?'

মণিকাঃ স্বচ্ছন্দে।

সিগারেট ধরাইয়া বিনায়ক কৌচের পাশে বসিল, কয়েকটা ধোঁয়ার আংটি ছাড়িয়া বলিল, 'এবার তোমার গোপনীয় প্রশ্ন আরম্ভ হোক।'

মণিকা বিনায়কের পানে তাকাইল না, দেয়ালে মহাত্মার ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আজ সকালে আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

বিনায়কঃ হ্যাঁ।

মণিকাঃ আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন?

বিনায়কঃ করেছিলুম।

চকিতে বিনায়কের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফিরাইয়া মণিকা বলিল, 'বিয়ের প্রস্তাব করবার কী যোগ্যতা আছে আপনার?'

সিগারেটের ছাই সন্তর্পণে অ্যাশ্-ট্রেতে ঝাড়িয়া বিনায়ক নীরসকণ্ঠে বলিল, 'যোগ্যতার পরিচয় তো আজ সকালে তোমার বাবার কাছে দিয়েছি। আমি সরকারী ইঞ্জিনীয়ার, বর্তমানে চার শ' টাকা মাইনে পাই; ভবিষ্যতে মাইনে আরও বাড়বে। আমার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল—'

মণিকাঃ (অধীরভাবে) আমি ও যোগ্যতার কথা বলছি না। বিয়ে করবার নৈতিক যোগ্যতা আপনার আছে কি?

বিনায়কঃ কথাটা একটু পরিষ্কার করে না বললে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।'

মণিকাঃ বিনায়কবাবু, যে কুমারী আপনাকে বিয়ে করবে, সে আপনার কাছে নৈতিক পবিত্রতা আশা করতে পারে, একথা আপনি স্বীকার করেন?

বিনায়কঃ নিশ্চয় স্বীকার করি। শুধু তাই নয়, আমি বিশ্বাস করি, যে-পুরুষের নৈতিক পবিত্রতা নেই তার বিয়ে করা উচিত নয়।

মণিকা কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে বিনায়কের পানে চাহিয়া রহিল।

মণিকাঃ তাহলে আপনি বিয়ে করতে চান কোন্ সাহসে?

বিনায়কঃ (গম্ভীরভাবে) আমার সে দাবী আছে।

banglabooks.in

মণিকা অবিশ্বাসের তীক্ষ্ম হাসি হাসিয়া উঠিল।

মণিকাঃ বিনায়কবাবু, আপনি নিজেকে যতটা সাধু বলে প্রমাণ করতে চান, সত্যি আপনি ততটা সাধু নন। আজ আমি নিজের চোখে আপনাকে মদ খেতে দেখেছি। তা ছাড়া শহরে আপনার অন্য বদনামও আছে—

বিনায়কঃ অসম্ভব নয়, বদনাম কার না হয়? কিন্তু মদের কথা যে বললে, আগেই বলেছি আমি মাতাল নই, নিয়মিত মদ খাই না—

মণিকাঃ প্রমাণ করতে পারেন?

বিনায়কঃ (হাসিয়া) একথা প্রমাণ করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীও প্রমাণ করতে পারেন না যে তিনি লুকিয়ে মদ খান না; ওটা তাঁর চরিত্র থেকে অনুমান করে নিতে হয়। তোমার কথাই ধরো। আজ তুমি একলা লুকিয়ে আমার বাড়িতে এসেছ। লোকে যদি মনে করে তুমি রোজ রাত্রে আমার বাড়িতে আসো, সেকথা কি সত্য হবে?

মণিকাঃ আচ্ছা, ও কথা ছেড়ে দিলুম। কিন্তু আপনি যে স্ত্রীজাতির সঙ্গ খুবই ভালবাসেন একথা অস্বীকার করতে পারেন?

বিনায়ক হাসিয়া উঠিল, দগ্ধাবশেষ সিগারেট অ্যাশ্-ট্রের উপর ঘষিয়া নিভাইয়া বলিল, 'কি মুস্কিল, অস্বীকার করতে যাব কোন্ দুঃখে? স্ত্রীজাতির সঙ্গ যদি ভালই না বাসব, তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে চাই কেন?'

মণিকার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

মণিকাঃ হেসে ওড়াবার চেষ্টা করবেন না। দু' মাস হল আপনি এ শহরে এসেছেন, এরি মধ্যে আপনার সব কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।—অমিতা সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক তা সবাই জানে।

বিনায়কের মুখ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল।

বিনায়কঃ না, কেউ জানে না। অমিতার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক—তা শুধু আমি জানি আর অমিতা জানে।

মণিকাঃ সত্যি? খুব গোপনীয় সম্পর্ক বুঝি? আমরা জানতে পারি না?

বিনায়কঃ অমিতা আমার ভাবী ভাদ্রবধূ। তোমরা জান না, আমার ছোট ভাই বিলেত গেছে। অমিতা তাকে ভালবাসে।

মণিকা থতমত খাইয়া গেল।

মণিকাঃ ও, তা তাই যদি হয়, তাহলে এত লুকোচুরির কি দরকার?

বিনায়কঃ লুকোচুরির কারণ অমিতার বাবা এ বিয়ের বিরুদ্ধে, তিনি জাতের বাইরে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না।

মণিকার দৃষ্টি নত হইল, কিন্তু তখনি আবার সে চোখ তুলিল।

মণিকাঃ আচ্ছা, সে যেন হল। মেয়ে-স্কুলের টিচার মিসেস রমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধটা কি রকম?

বিনায়কঃ তিনি আমার বান্ধবী।

মণিকাঃ (মুখ টিপিয়া) বান্ধবী। ও কথাটার অনেক রকম মানে হয়।

বিনায়ক ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, 'মণিকা, আমার সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পার, কিন্তু একটি শুদ্ধচরিত্রা নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলা সম্বন্ধে ও রকম ইঙ্গিত করলে অপরাধ হয়।'

মণিকার মুখে লজ্জার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেরু-দণ্ডও শক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সে ঈষৎ তিক্তস্বরে বলিল, 'আর হাস-পাতালের লেডি ডাক্তার মিস মল্লিকা? তিনিও কি শুদ্ধচরিত্রা নিষ্ঠাবতী মহিলা? তাঁর সঙ্গেও তো আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা।'

বিনায়কের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

বিনায়কঃ শ্রীমতী মল্লিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু অন্য ধরনের। শিকারের সঙ্গে

banglabooks.in

শিকারীর যে ঘনিষ্ঠতা, তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও সেই রকম। ভুল বুঝো না; তিনি শিকারী—আর আমি শিকার। ভাগ্যক্রমে এখনও অক্ষত শরীরে আছি।

মণিকা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; বিনায়কও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। মণিকা অস্থিরভাবে ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন কিছুতেই তাহার মনের অসন্তোষ দূর হইতেছে না।

বিনায়কঃ কি হল! আর কোনও প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছ না?

মণিকাঃ ক'টা বেজেছে? আমি এবার বাড়ি যাব।

ঘড়ি দেখিবার জন্য বিনায়ক পিছন ফিরিতেই মণিকা এক অদ্ভুত কাজ করিল, মদের শূন্য পেগটা তাহার হাতের কাছেই ছিল, ক্ষিপ্র হস্তসঞ্চালনে তাহা মেঝেয় ফেলিয়া দিল। ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া কাচ ভাঙার শব্দ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবাতি নিভিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের ভিতর হইতে মণিকার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর আসিল, 'ঐ যাঃ! এ কী হল! আলো নিভে গেল! বিনায়কবাবু?'

বিনায়কঃ কোনও ভয় নেই। মাঝে মাঝে এমন হয়—পাওয়ার হাউসে কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। তুমি যেমন আছ তেমনি দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে পায়ে কাচ ফুটে যেতে পারে। আমি পাশের ঘর থেকে মোমবাতি নিয়ে আসছি।

মণিকাঃ না না, আপনি কোথাও যাবেন না, আমার ভয় করবে।

বিনায়কের হাসির শব্দ শোনা গেল।

বিনায়কঃ আচ্ছা আমি দেশলাই জ্বালছি।

সে ফস করিয়া দেশলাই জ্বালিল। অন্ধকার কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হইল না, দু'জনকে আবছায়াভাবে দেখা গেল। মণিকা সেই অস্পষ্ট আলোকে সাবধানে পা ফেলিয়া আবার কৌচে আসিয়া বসিল। দেশলাই-কাঠি নিভিয়া গেল।

মণিকাঃ আপনার কাচের গ্লাসটা ভেঙে ফেললুম—

বিনায়কঃ কি করে ভাঙল?

মণিকাঃ কি জানি অসাবধানে হাত লেগে গিছল।

বিনায়ক আবার দেশলাই জ্বালিল। দেখা গেল, তাহার মুখে একটু বাঁকা হাসি লাগিয়া আছে।

বিনায়কঃ মদের গ্লাস ভাঙার মধ্যে হয়তো নিয়তির কোনও ইঙ্গিত আছে।

মণিকাঃ তা জানি না। আপনি অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কাছে আসুন, আমার যে ভয় করছে।

বিনায়ক মণিকার কাছে গিয়া বসিল। দেশলাই নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গেল।

মণিকাঃ আমার হাত ধরুন।

বিনায়কঃ হাত ধরলে দেশলাই জ্বালব কি করে?

মণিকাঃ দেশলাই জ্বালতে হবে না।

কিছুক্ষণ নীরব। বিনায়ক মণিকার হাত ধরিয়া আছে কিনা অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

বিনায়কঃ মণিকা!

মণিকাঃ কী?

বিনায়কঃ ঘর অন্ধকার—

মণিকাঃ জানি।

বিনায়কঃ তুমি আর আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।

মণিকাঃ হুঁ।

বিনায়কঃ আমার মত অসাধু লোকের সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় করছে না?

মণিকাঃ না।

বিনায়কঃ তোমরা অদ্ভুত জাত। সাধে পণ্ডিতেরা বলেছেন—

banglabooks.in

মণিকাঃ পণ্ডিতদের কথা শুনতে চাই না।

বিনায়কঃ বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মণিকাঃ না। আলো জ্বললে বাড়ি যাব।

বিনায়কঃ আলো কখন জ্বলবে ঠিক নেই। আজ রাত্রে না জ্বলতেও পারে।

মণিকা কথা বলিল না। ক্ষণেক পরে বিদ্যুৎবাতি যেমন হঠাৎ নিভিয়া গিয়াছিল তেমনি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল, দুইজনে পাশাপাশি কৌচের উপর বসিয়া আছে, মণিকার ডান হাত বিনায়কের বাম মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ।

মণিকা বিনায়কের মুখের পানে চাহিয়া মধুর আনন্দোচ্ছল হাসিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নম্র কুহক-কোমল স্বরে বলিল, 'এবার আমি বাড়ি যাই!'

বিনায়কও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিনায়কঃ তুমি আজ আমাকে অনেক জেরা করেছ। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

মণিকাঃ কি প্রশ্ন?

বিনায়কঃ আমি ভাগ্যবান কিম্বা হতভাগ্য সেটা জানাবে কি?

মণিকা বিনায়কের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

মণিকাঃ তুমি ভাগ্যবান কিনা জানি না, কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ নয়।

বিনায়কের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে মণিকার সম্মুখে গিয়া তাহার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

বিনায়কঃ আর তোমার মনে সন্দেহ নেই?

মণিকাঃ না।

বিনায়কঃ (হাসিয়া) অন্ধকারের পরীক্ষায় পাস করেছি তাহলে?

মণিকাঃ হ্যাঁ। (চমকিয়া) অ্যাঁ, কি বললে? অন্ধকারের পরীক্ষা! তুমি—তুমি বুঝতে পেরেছ?

বিনায়কঃ তা পেরেছি—

মণিকাঃ কী করে বুঝলে?

বিনায়কঃ খুব সহজে। তুমি যখন হাত দিয়ে গ্লাসটা ফেলে দিলে তখন আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলুম, ঘড়ির কাছে সবই দেখতে পেলুম। তারপরই আলো নিভে গেল। বুঝতে দেরি হল না যে, গ্লাস ভাঙার শব্দটা সঙ্কেত, তোমার যে সহচরটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বারান্দায় মেন্ সুইচ বন্ধ করে দিলেন। সহচরটি বোধ হয় শম্ভু—না?

মণিকা নীরব বিস্ময়ে ঘাড় নাড়িল।

বিনায়কঃ এর পরে তোমার এই রাত্তিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার প্ল্যানটা পরিষ্কার হয়ে গেলঃ অন্ধকারে আমি কোনও অসভ্যতা করি কিনা তাই পরীক্ষা করতে চাও। যখন বুঝতে পারলুম তখন পরীক্ষায় পাস করা আর শক্ত হল না।

মণিকার মুখ আবার সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

মণিকাঃ কিন্তু—কিন্তু—আমার সন্দেহ তো তাহলে গেল না। তুমি যদি জেনে-শুনে—

বিনায়ক হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

বিনায়কঃ একটু সন্দেহ থাকা ভাল। কবি বলেছেন—"ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম একান্ত বিশ্বাসে হয়ে আসে জড় মৃতবৎ, তাই তারে মাঝে মাঝে জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।"* কিন্তু মণিকা, আমি যদি সত্যিই অসভ্যতা করতুম? শম্ভু এসে অবশ্য আমাকে উত্তম-মধ্যম দিত। কিন্তু তুমি কী করতে?

মণিকার মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল।

মণিকাঃ কী আর করতুম, তোমাকেই বিয়ে করতুম। তুমি কি আমার কিছু রেখেছ? আমার নিজের ইচ্ছে বলে কি কিছু আছে?

---

*রাজা ও রানী

banglabooks.in

দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া মণিকা কাঁদিবার উপক্রম করিল। স্নেহে আনন্দে বিনায়কের মুখ কোমল হইয়া উঠিল। সে মণিকার চুলের উপর একবার লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'ওহে শম্ভু, ভেতরে এস।'

আঠারো বছরের হৃষ্টপুষ্ট বলবান যুবক শম্ভু একটি হকি-স্টিক্ হাতে লইয়া প্রবেশ করিল এবং প্রসন্নমুখে দন্ত বিকশিত করিল।

বিনায়কঃ শম্ভু, তোমার বোনকে শীগ্গির বাড়ি নিয়ে যাও। আর বেশী দেরি করলে আমার বদনাম রটে যাবে।

২৭ শ্রাবণ ১৩৫৪

নূতন মানুষ

এমন আশ্চর্য ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই। নেপালচন্দ্রের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কাঁদিল না, স্রেফ বলিল, 'পেস্তা!'

নেপালের মনে বড় ধোঁকা লাগিল। এ কি রকম ছেলে? একে তো পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি আঠারো বছরের তরুণীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার উপর পাকিস্তানে বাস—চারিদিকে পেস্তা-বাদামখোর মুস্কো জোয়ান ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এরূপ অবস্থায় ছেলে যদি ভূমিষ্ঠ হইয়াই পেস্তার ফরমাস করে তবে কার না সন্দেহ হয়? কিন্তু নেপাল ভালমানুষ লোক, সে লজ্জায় সন্দেহের কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না।

ষষ্ঠী পূজার দিন নেপালের স্ত্রী বলিলেন, 'ছেলের মুখ অবিকল তোমার মত হয়েছে।'

নেপাল অনেকক্ষণ ধরিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু নিজের মুখের সহিত কোন সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাইল না; বরং অত্যন্ত পরিপক্ক ডেঁপো ছেলের মত একটা মুখ। এত অল্প বয়সে মুখ এত পাকিল কি করিয়া নেপাল ভাবিয়া বিস্মিত হইল। শুধু একটা ভরসার কথা, গায়ের রঙ পেস্তাবাদামপুষ্ট কাবুলী ধাঁচের নয়, বরং খাঁটি বাঙালীর মতই নবজলধরকান্তি।

একুশ দিনের দিন আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইয়া নেপালের পুত্র গম্ভীর স্বরে বলিল, 'ইডলি!'

কি সর্বনাশ! নেপাল চমকিয়া উঠিল। 'ইডলি' একপ্রকার মাদ্রাজী খাদ্য। তাহার মনে পড়িল পুত্রজন্মের নয় দশ মাস পূর্বে সে একবার অল্পদিনের জন্য সস্ত্রীক মাদ্রাজে গিয়াছিল। এত অল্প বয়সে এমন বাচাল ছেলে বাঙালীদের ঘরেও দেখা যায় না। তবে কি—তবে কি মাদ্রাজেই কোন গণ্ডগোল ঘটিয়াছে নাকি?

নেপালের মনে আর সুখ রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ছেলেটা দেশ-বিদেশের খাবারের নাম করিতেছে, যদি বাঙালীর ছেলেই হয় তবে সন্দেশ রসগোল্লার নাম করে না

banglabooks.in

কেন? পেস্তা এবং ইডলি কি সন্দেশ রসগোল্লার চেয়েও মুখরোচক? অন্তত পান্তুয়া কিংবা জিলিপি বলিতে পারিত! যে ছেলে অবলীলাক্রমে পেস্তা এবং ইডলি বলিতে পারে তাহার পান্তুয়া বা জিলিপি উচ্চারণ করা কি এতই শক্ত?

তারপর, এক মাস বয়সে নেপালের পুত্র একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া হাই তুলিল এবং বলিল, 'নাপ্পি!'

নাপ্পি! নেপাল শিহরিয়া উঠিল। এ যে ক্রমে ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে! যুদ্ধের সময় জাপানীরা বর্মা আক্রমণ করিলে একদল বর্মী পলাইয়া আসিয়া তাহার বাড়ির কাছে আশ্রয় লইয়াছিল বটে। হরি হরি!

নেপাল আর থাকিতে পারিল না। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, এ ছেলে কোন দেশের মানুষ?'

স্ত্রী হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'ও নতুন যুগের মানুষ। ওর দেশ নেই, সব দেশই ওর দেশ। পৃথিবীর হাওয়া বদলে গেছে বুঝতে পারছ না?'

হয়তো বদলাইয়া গিয়াছে, নেপাল বুঝিতে পারে নাই। হয়তো ভবিষ্যতের ছেলেরা অ্যাটম বোমা হাতে লইয়া রৈ রৈ করিতে করিতে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবে, তাহাদের দেশকালপাত্র জ্ঞান থাকিবে না; বানর বংশে যেমন মানুষ জন্মিয়াছিল, মানুষ বংশে তেমনি অতিবানর জন্মিবে। Evolution না Atavism?

কিন্তু সে যাহা হোক সব ছেলেই যদি ঐ রকম হয়, তাহা হইলে অবশ্য এ ছেলেকে সন্দেহ করা চলে না—

নেপাল এইসব চিন্তা করিতেছে এমন সময় শুনিল ছেলে পরিষ্কার বলিতেছে—'ল্যাংচা!'

নেপালের হৃৎযন্ত্র তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। যাক, তবু ছেলে বাঙলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

২৭ ফাল্গুন ১৩৫৪

ভক্তিভাজন

মাতালকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবার প্রথা আমাদের দেশে নাই। বরঞ্চ মাতালের প্রতি কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখাইলে বন্ধু-বান্ধব সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠেন, গৃহিণীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। বস্তুত মদ্য পান করা যে অতিশয় গর্হিত কার্য, বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তবু আমার প্রতিবেশী রাগাঙ্গা সাহেবকে যে আমি সম্প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে তাহাও মানিয়া লইতে আমি বাধ্য।

banglabooks.in

ব্রাগাঞ্জা একজন গোয়ানিজ পিদ্রু। এদেশে গোয়ানী খৃষ্টানরা সাধারণত ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাগাঞ্জার চেহারাটি যেমন প্যাণ্টুলুনপরা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত, মানুষটিও অতিশয় শান্তশিষ্ট ও নির্বিরোধ। আমার বাড়ির পাশে একটা খোলার ঘরে বাস করিত এবং মোটরমিস্ত্রীর কাজ করিত। আমি কখনও তাহাকে শাদা-চক্ষু অবস্থায় দেখি নাই; সর্বদাই তাহার গোলাপী চক্ষু দুটি ঢুলুঢুলু। আমার সঙ্গে দেখা হইলে কোমল হাস্য করিয়া কপালে হাত ঠেকাইত। দুনিয়ার কাহারও সহিত তাহার অসদ্ভাব আছে এমন কথা শুনি নাই; মাতাল অবস্থাতেও সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না। আবার কাহারও সহিত অতিরিক্ত মাখামাখিও ছিল না। সে আপন মনে মদ খাইত এবং বানচাল মোটরের তলায় প্রবেশ করিয়া ঠুক্‌ঠাক করিত।

গত মহাযুদ্ধের সময় বোম্বাই শহরে মানুষের যে জোয়ার আসিয়াছিল তাহা বোম্বাই শহরকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া উপকণ্ঠেও প্রবাহিত হইয়াছিল। আমি থাকি উপকণ্ঠে। এতদিন বেশ নিরিবিলি ছিলাম, আমার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে খোলা মাঠ পড়িয়া ছিল। ক্রমে সেখানে দুটি-একটি টিনের চালা বা ঘর দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

একদিন দেখিলাম আমার বাড়ির ঠিক সম্মুখে কোনও এক ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এক চায়ের দোকান খুলিয়া সাইনবোর্ড লট্‌কাইয়া দিয়াছে—শ্রীবিলাস হিন্দু হোটেল। নিতান্তই দীনহীন ব্যাপার, টিনের চালার নীচে কয়েকটি বার্নিশহীন কাঠের টেবিল ও লোহার চেয়ার। কিন্তু খদ্দের জুটিতে বিলম্ব হইল না। এদিকে তখন মার্কিন গোরার ভিড়। দেখিলাম, শাদা সিপাহীরা লোহার চেয়ারে বসিয়া অম্লানবদনে চা ও চিঁড়েভাজা খাইতেছে। দোকানদার লোকটা রোগাপটকা ছিল, দেখিতে দেখিতে খোদার খাসী হইয়া উঠিল।

সাহেবদের দেখাদেখি দেশী-খদ্দেরও অনেক জুটিয়াছিল। কিন্তু ব্রাগাঞ্জাকে কোনও দিন দোকানে ঢুকিতে দেখি নাই। চায়ের মত নিরামিষ নেশায় তাহার রুচি ছিল না।

তারপর একদিন মহাযুদ্ধ শেষ হইল। সাহেব সিপাহীরা ক্রমে ভারতরক্ষারূপ নিঃস্বার্থ কর্তব্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল। শ্রীবিলাস হোটেলের চায়ের ব্যবসাতেও ভাটা পড়িল।

কিন্তু ব্যবসায়ে ভাটা পড়িলে ব্যবসায়ীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে; তখন সে মরীয়া হইয়া আবার ব্যবসা জাঁকাইবার নানা ফন্দি-ফিকির বাহির করিতে থাকে। একদিন লক্ষ্য করিলাম, শ্রীবিলাস হোটেলের স্বত্বাধিকারী গ্রামোফোন কিনিয়াছে এবং তাহাতে লাউড্‌-স্পীকার লাগাইয়া তারস্বরে তাহাই বাজাইতেছে।

প্রথমটা বিশেষ বিচলিত হই নাই। সিনেমার বর্ণসঙ্কর গান আমার ভালই লাগে; তাহাতে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উচ্চ গাম্ভীর্য না থাক, প্রাণ আছে, চঞ্চলতা আছে। তাহাই বা আজকাল কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু যখন দেখিলাম, দোকানদার মাত্র দুই তিনটি রেকর্ড কিনিয়াছে এবং সেগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে বাজাইয়া চলিয়াছে, তখন মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গীত ভাল জিনিস; কিন্তু সকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যদি একই সঙ্গীত বারম্বার শুনিতে হয়, তাহা হইলে স্নায়ুমণ্ডলের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মনুষ্যজাতিকে অনেক নব নব আবিষ্কার দান করিয়াছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর দান বোধ হয়—যান্ত্রিক শব্দ। শতবর্ষ পূর্বেও পৃথিবীতে এত শব্দ ছিল না। মেঘগর্জনই তখন শব্দের চূড়ান্ত বলিয়া মনে হইত। এখন মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে এমন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে যাহার কাছে বজ্রপাতও কপোত-কূজন বলিয়া মনে হয়। লাউড্‌-স্পীকার যন্ত্র গ্রামোফোনও এইরূপ একটি শব্দ-যন্ত্র। 'এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়, দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।' শুধু বিস্ময় নয়, মানুষ এই শব্দের আক্রমণে কেমন যেন জবুথবু হইয়া গিয়াছে!

শরীরের একই স্থানে যদি ক্রমাগত হাত বুলানো হয় তাহা হইলে প্রথমটা বেশ আরাম লাগে কিন্তু ক্রমে অসহ্য হইয়া ওঠে। গান শোনাও তেমনি। প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন একই গান শুনিতে শুনিতে স্নায়ুমণ্ডলী বিদ্রোহ করে। প্রাণ ছট্‌ফট্‌

banglabooks.in

করে; ইচ্ছা করে কোথাও ছুটিয়া পলাইয়া যাই।—কিন্তু যাঁহারা শহরের বাসিন্দা তাঁহাদের পক্ষে এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা নূতন নয়; সুতরাং বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

মরীয়া হইয়া একদিন দোকানদারকে গিয়া বলিলাম, 'বাপু, চায়ের দোকান করেছ তা এত গান বাজনার কী দরকার?'

দোকানদার এক গাল হাসিয়া বলিল, 'শেঠ্, গ্রামোফোন কেনার পর আমার খদ্দের বেড়েছে।'

দেখিলাম কথাটা মিথ্যা নয়; অনেকগুলি গলায়-রুমাল-বাঁধা হাফ্-শার্ট-পরা ছোকরা বসিয়া চা খাইতেছে ও টেবিল বাজাইতেছে। বলিলাম, 'তা খদ্দেরকে গান শোনানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আস্তে বাজাও না কেন? পাড়ার লোকের কান ঝালাপালা করে কি লাভ?'

সে বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কেন, আপনি কি গান ভালবাসেন না? এ দেশের লোক কিন্তু খুব গান ভালবাসে।'

চলিয়া আসিলাম। লোকটা আমাকে সংগীত-রস-বঞ্চিত পাষণ্ড মনে করিল তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যে আমার অনুরোধে গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া ব্যবসার ক্ষতি করিবে এমন সম্ভাবনা দেখিলাম না।

পুলিশে খবর দিব কিনা ভাবিতে লাগিলাম। এদেশে আইন-কানুন নিশ্চয় একটা কিছু আছে; যন্ত্র-সঙ্গীতের উৎপীড়ন হইতে নিরীহ মানুষকে রক্ষা করিতে পারে এমন আইন কি নাই? হয়তো আছে; কিন্তু পুলিশ কিছু করিবে কি? এদেশের পুলিশের সে রোয়াব নাই, গাম্ভীর্য নাই, দাপট নাই। রাস্তার ধারে যে-সব হলুদে শামলাপরা কনস্টেবল দেখিয়াছি তাহারা মনে সম্ভ্রম উৎপাদন করে না; তাহাদের দেখিলে ইয়ার্কি দিবার ইচ্ছা হয়, নালিশ জানাইবার ইচ্ছা হয় না। আমি যদি নালিশ করি, পুলিশ হয়তো মিঠেভাবে একটু মুচ্‌কি হাসিবে। তাহাতে আমার কি লাভ?

এইভাবে মাসখানেক চলিল। স্নায়ু বলিয়া শরীরে যাহা ছিল ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে, মস্তিষ্কের মধ্যে চাতক পাখির কাত্‌রানির মত একটা ব্যাকুলতা পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ডাক্তারেরা যাহাকে নার্ভাস ব্রেক-ডাউন বলেন সেই অবস্থায় পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়—

পরিত্রাণায় সাধুনাং—ইত্যাদি।

ত্রাণকর্তা যে কত বিচিত্ররূপে সম্ভবামি হন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অপার তাঁহার মহিমা।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় একদিন বাড়ির সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিভিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে কোথায় মিস্ত্রী পাইব; রাগাঙ্গার কথা মনে পড়িল। সে মোটর-মিস্ত্রী, নিশ্চয় বিদ্যুৎ সম্বন্ধে জানে শোনে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

সম্মুখের হোটেলে তখন উদ্দাম সঙ্গীত চলিয়াছে—'পহেলি মোহব্বত কি রাত।' অন্ধকারে প্রথম প্রণয়-রজনীর উল্লাস যেন আরও গগনভেদী মনে হইতেছে।

রাগাঙ্গা আসিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলো জ্বালিয়া দিল। বিশেষ কিছু নয়, একটা ফিউজ পুড়িয়া গিয়াছিল। আমি রাগাঙ্গাকে একটি টাকা দিলাম। তৈলাক্ত হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল; কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে একবার থামিল; একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'স্যর, এই গান শুনতে আপনার ভাল লাগে?'

লক্ষ্য করিলাম, তাহার ঢুলুঢুলু চক্ষের মধ্যে ফুলঝুরির ফুল্‌কির মত একটা আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বলিলাম, 'ভাল লাগে! অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তুমিও তো দিনরাত শুনছ, তোমার ভাল লাগে?'

রাগাঙ্গা মাথাটি দক্ষিণ হইতে বামে আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, 'না, ভাল লাগে না।'

রাগাঙ্গা চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গেল না; এত রাত্রে অপ্রত্যাশিত একটি টাকা

banglabooks.in

পাইয়াছে, বোধ হয় মদের সন্ধানে গেল। ওদিকে গান চলিয়াছে—'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা—'

রাত্রি সাড়ে দশটা। শুইতে গিয়া কোনও লাভ আছে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় শ্রীবিলাস হোটেলে রৈ রৈ মার্ মার্ শব্দ হইয়া গ্রামোফোনটা মধ্যপথে থামিয়া গেল; তৎপরিবর্তে চীৎকার চেঁচামেচি দুম্দাম্ শব্দ আসিতে লাগিল।

ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। দেখি, হোটেলে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গিয়াছে। তফাৎ এই যে দক্ষযজ্ঞে অনেকগুলা ভূত যজ্ঞ পণ্ড করিয়াছিল, এখানে একা ব্রাগাঞ্জা। সে একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া সেই নিরীহ নির্বিরোধ ব্রাগাঞ্জা বলিয়া চেনা শক্ত। গ্রামোফোনটাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া সে তাহার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, টেবিল চেয়ার পেয়ালা গেলাস যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাই ধরিয়া আছাড় মারিতেছে। আর গভীর গর্জনে বলিতেছে—'ড্যাম্ লারে লাপ্পা—টু হেল্ উইথ গিলি গিলি গিলি—ডেভিল্ টেক্ পহেলি মোহব্বত কি রাত...'

রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। হোটেলের মালিক ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ঐকতানে চেঁচাইতেছে; কিন্তু এই দুর্দান্ত মাতালকে বাধা দিবার সাহস তাহাদের নাই।

মদমত্ত অবস্থায় পরের সম্পত্তি নাশ করার অপরাধে ব্রাগাঞ্জার জেল ও জরিমানা হইল। জেল খাটিয়া আসিয়া ব্রাগাঞ্জা পূর্ববৎ মোটর মেরামত করিতেছে; যেন কিছুই হয় নাই। কিন্তু শ্রীবিলাস হোটেলের গ্রামোফোন বাজনা বন্ধ হইয়াছে। ব্রাগাঞ্জা নাকি দোকানের মালিককে ইসারায় জানাইয়াছে যে, আবার গ্রামোফোন বাজিলে আবার সে দক্ষযজ্ঞ বাধাইবে।

ব্রাগাঞ্জাকে আমি ভক্তি করি, তা যে যাই বলুন। মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যাইবার সাহস যাহার আছে সে আমাদের সকলেরই নমস্য।

একদিন তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম, 'সেদিন তুমি আমার বিদ্যুৎবাতি মেরামত করে দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাকে উচিত পুরস্কার দিইনি। এই নাও।'

ব্রাগাঞ্জা কপালে হাত ঠেকাইয়া সলজ্জ মিটিমিটি হাসিল। সে মাতাল হইলেও নির্বোধ নয়।

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

সম্প্রতি মদ্য-নিবারণী আইন জারি হইয়াছে; কিন্তু সেজন্য ব্রাগাঞ্জার আটকায় না।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

banglabooks.in

গ্রন্থি-রহস্য

গোদার মত এমন সচ্চরিত্র এবং গম্ভীর প্রকৃতির বানর আমি আর দেখি নাই। ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, গোদা বাংলাদেশের বানর নয়। শুনিয়াছি, সুমাত্রা কি বোর্নিও কি ঐ রকম একটা দ্বীপ তাহার জন্মস্থান।

গোদাকে বানর না বলিয়া অতি-বানর বলা চলে। শুধু তাহার স্বভাব-চরিত্রের জন্য নয়, তাহার চেহারাটাও সাধারণ বানরের তুলনায় প্রকাণ্ড। সোজা হইয়া দাঁড়াইলে তাহার খাড়াই পাঁচ ফুটের কম হইত না। গায়ে জোরও ছিল অমানুষিক, তিন সুতের লোহার ছড় দুই হাতে বাঁকাইয়া দু'ভাঁজ করিয়া দিতে পারিত।

কিন্তু গোদার গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিবার আগে তাহার মালিক শশধরবাবুর কথা বলা উচিত। শশধরবাবু সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আমি জানি যাহা আর কেহ জানে না; পনেরো বছর ধরিয়া আমি তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলাম। পারিবারিক চিকিৎসক কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। কারণ শশধরবাবুর পরিবারের মধ্যে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার বানর গোদা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

শশধরবাবু আদৌ দরিদ্র ছিলেন। তারপর পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এক ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উপার্জন না করিয়া তিনি সংসারধর্ম কিছুই করিবেন না। অতঃপর ত্রিশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। শশধরবাবু নানাবিধ ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়াছেন, কলিকাতার সবচেয়ে মূল্যবান পাড়ায় বাগান-ঘেরা বাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহাদি করেন নাই। তিনি মিশুক এবং মিষ্টভাষী লোক কিন্তু বাজারে তাঁহার দুর্নাম ছিল। পরদ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার নাকি তিলমাত্র বিবেকবুদ্ধি নাই। তাঁহার সমধর্মী ব্যবসায়ীরা সকলেই তাঁহাকে ভয়ে ভক্তি করিত এবং আড়ালে শশধরবাবু না বলিয়া বিষধরবাবু বলিত।

শশধরবাবুর বয়স এখন পঞ্চান্ন বছর। বছর চারেক আগে তিনি কোথা হইতে গোদাকে আনিয়া বাড়িতে পুষিলেন। গোদা তখনও পূর্ণবয়স্ক হয় নাই, কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়া পাড়া-পড়শীর তাক্ লাগিয়া গেল। তবু কেহই বিস্মিত হইল না। শশধরবাবুর মত যাহাদের একক অবস্থা তাহারা টিয়াপাখি পোষে, কুকুর বেড়াল পোষে, শশধরবাবু বানর পুষিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে? ইহার মধ্যে যে বহুদূরদর্শী বিষয়বুদ্ধি থাকিতে পারে, তাহা কাহারও মাথায় আসিল না।

গোদা কিছুদিন শিকলে বাঁধা রহিল, তারপর শশধরবাবু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ির সর্বত্র তাহার গতিবিধি, কিন্তু সে কোনও প্রকার দৌরাত্ম্য করিল না, একটা কাচের গেলাস পর্যন্ত ভাঙিল না। বাগানেও সে যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনও গাছের একটা পাতা ছেঁড়ে না। বানরের এইরূপ আদর্শ চরিত্র দেখিয়া সকলে মুগ্ধ। ক্রমে শশধরবাবু তাহাকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করিতে শিখাইলেন। আমাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইলে গোদার হাতে চিঠি দিয়া আমার কাছে পাঠাইতেন। গোদা আসিয়া দ্বারের কড়া নাড়িত, দ্বার খুলিলে চাকরের হাতে চিঠি দিয়া গম্ভীর মুখে বেঞ্চিতে বসিয়া থাকিত। তারপর চিঠির উত্তর লইয়া মন্দমন্থর পদে ফিরিয়া যাইত।

গোদার কার্যকলাপ প্রথমটা পাড়ায় খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল কিন্তু ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। গোদা পরিচিত দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

এইভাবে দিন কাটিতেছে, শশধরবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গোদা চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। শশধর-বাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে মিনিট পাঁচেকের পথ।

শশধরবাবু একাকী ড্রয়িং-রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমরা প্রবেশ করিলে বলিলেন—'এই যে ডাক্তার, এস। গোদা, তুই ঐ কোণের চেয়ারে বোস্ গিয়ে।'

গোদা মুখে অমায়িক গাম্ভীর্য লইয়া কোণের চেয়ারে বসিল। শশধরবাবু তখন সোফায় আমার পাশে উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখে-চোখে একটা চাপা উত্তেজনা,

banglabooks.in

পঞ্চান্ন বছরের শুষ্ক শরীরেও যেন এই উত্তেজনার আমেজ লাগিয়াছে। তিনি গলায় গিট্‌কারি দিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন—'একটা সুখবর আছে। আজ থেকে কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম। এবার সংসারধর্ম করব।'

বুঝিলাম, এতদিনে তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। শীর্ণ গাল-বসা মুখ, চোখের কোলে চামড়া কুঞ্চিত হইয়াছে, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলি সংখ্যালঘু হইয়া মস্তকের লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। ঝুনো চেহারা। কাজকর্ম হইতে অবসর লইবার উপযুক্ত সময় বটে। কিন্তু সংসারধর্ম! জীবনের তিন ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটাইয়া এই শরীরে নূতন করিয়া সংসার পাতা চলে কি?

মুখে মামুলী অভিনন্দন জানাইয়া বলিলাম—'তা বেশ তো, ভালই। আপনার এত টাকা ভোগ করবার লোক চাই তো!'

তিনি বলিলেন—'শুধু তাই নয়, নিজেরও তো ভোগ করা চাই। তোমাকে ডেকেছি, আমার শরীরটা ভাল করে পরীক্ষা করবে। শরীর অবশ্য ভালই আছে। তুমি তো জানোই, রোগ-টোগ আমার কিছু নেই। তবে—'

তাঁহার মনের কথা বুঝিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল শরীরে ব্যাধি কিছু নাই বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়াছে। এ বয়সে তাহা অস্বাভাবিক নয়। কাশিয়া বলিলাম—'হ্যাঁ—তা—শরীর তো বেশ ভালই। তবে সংসারধর্ম করার ধকলও তো আছে—আপনার অভ্যেস নেই—'

শশধরবাবু বলিলেন—'তোমার কথা বুঝেছি। আমি এর জন্যে তৈরি ছিলাম। তবে শোনো, আমি মতলব করেছি ভিয়েনায় যাব।'

'ভিয়েনা!'

'হ্যাঁ, ভরোনফ্ চিকিৎসার কথা জানো তো?'

'ভরোনফ্ চিকিৎসা! ওঃ—'

'আমার সন্দেহ ছিল, তাই গোদাকে পুষেছি। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব—সস্তায় ভাল জিনিস হবে। বুঝেছ?'

চোখের ঠুলি খসিয়া পড়িল। শশধরবাবু প্রকৃতির নিকট পরাজিত হইবেন না, তাই চার বছর ধরিয়া গোদাকে পুষিতেছেন! এখন ভিয়েনায় গিয়া গোদার গ্ল্যান্ড্ নিজের দেহে কলম লাগাইবেন, গোদার যৌবন আত্মসাৎ করিয়া নিজে যুবক হইবেন। তাঁহার বৈষয়িক দূরদর্শিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

শশধরবাবু ডাকিলেন—'গোদা, এদিকে আয়।'

গোদা তৎক্ষণাৎ পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন—'কেমন হবে মনে হয়?'

আমি ডাক্তার, গ্রন্থি-বদল বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা। সুতরাং সায় দিতে হইল। গোদাকে লক্ষ্য করিলাম, সে সপ্রশ্নভাবে আমাদের মুখের পানে চাহিতেছে, যেন আমাদের আলোচনার মর্মানুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে বানর, আমাদের কুটিল অভিসন্ধি বুঝিল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—'গোদা কিন্তু বাঁচবে না। তখনি তখনি মরবে না বটে, কিন্তু দু'চার মাসে শুকিয়ে মরে যাবে।'

শশধরবাবু বলিলেন—'সে কথাও ভেবেছি। আমার গ্ল্যান্ড্ তো ফেলাই যেতো, ওর গায়ে বসিয়ে দেব। তাতে কিছুদিন টিকবে।'

হয়তো টিকিবে এবং মানুষের গ্রন্থি বানরের গায়ে বসাইলে কিরূপ ফল হয়, তাহারও একটা পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার ফল যে কিরূপ অদ্ভুত দাঁড়াইবে, তাহা তখনও জানিতাম না। শশধরবাবুকে নমস্কার করিয়া এবং গোদার সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড করিয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর শশধরবাবু গোদাকে লইয়া ভিয়েনা গেলেন এবং মাস কয়েক পরে ফিরিয়া

banglabooks.in

আসিলেন।

দেখা করিতে গেলাম। ফটকের কাছে গোদা বসিয়া আছে। তাহার চেহারার কোনও তারতম্য দেখিলাম না; মুখ তেমনি গম্ভীর। আমার পানে কপিশ-পিঙ্গল চোখ তুলিয়া একবার চাহিল। মনে হইল তাহার চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঝিলিক মারিয়া উঠিল।

বাড়ির বারান্দায় শশধরবাবু ছিলেন। চেহারার সত্যই উন্নতি হইয়াছে; বয়স দশ বছর কম বলিয়া মনে হয়। আমি সহাস্যে বলিলাম—'এই যে, দিব্যি উন্নতি হয়েছে দেখছি।'

অতঃপর তিনি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তিনি আরক্ত নয়নে বলিলেন—'উন্নতি হয়েছে? তুমি আমার সর্বনাশ করেছ! তুমি যদি মানা করতে তাহলে একাজ আমি করতাম না। যাও—বেরোও! আর যদি আমার বাড়িতে পা দাও, মার খেতে হবে!' বলিয়া ফটকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

হতভম্ব হইয় ফিরিয়া আসিলাম। মাথার মধ্যে একঝাঁক দুশ্চিন্তা তার পাকাইতে লাগিল। এ কী অভাবনীয় পরিবর্তন! শশধরবাবু হাসিমুখে মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারেন; কিন্তু কটু কথা বলিতে আজ পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ শোনে নাই। তবে কি হিতে বিপরীত হইয়াছে? গোদার তেজালো গ্রন্থি শশধরবাবুর বুড়ো শরীরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে? কোন্ দিক হইতে তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে?

এই ঘটনার কয়েকদিন পর হইতে পাড়ায় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একদিন সকালবেলা আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়া দেখি রাত্রে জানালা ভাঙিয়া কেহ ঘরে ঢুকিয়াছিল, ঔষধের শিশি বোতল সমস্ত ভাঙিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ঔষধাদি ছিল।

এমন অর্থহীন ধ্বংসলীলায় কাহার কী লাভ? শশধরবাবুর উপর ঘোর সন্দেহ হইল। তিনি আমার উপর চটিয়াছেন, তার উপর বানরের গ্রন্থি তাঁর শরীরে আছে। হয়তো এই সর্বনাশের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। বানরের গ্রন্থি তাহার স্বভাবকে বানরের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর আরও কয়েকটা বাড়িতে উপর্যুপরি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। অজ্ঞাত চোর রাত্রিকালে জানালা ভাঙিয়া বাড়িতে প্রবেশ করে এবং জিনিসপত্র ভাঙিয়া-চুরিয়া চলিয়া যায়; কখনও সোনারূপার দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়!

পাড়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পাড়ার ছেলেরা লাঠি-সোঁটা লইয়া রাত্রে পাড়া পাহারা দিতে লাগিল।

ইহা যে শশধরবাবুর কীর্তি, তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, উপরন্তু শশধরবাবু হয়তো মানহানির মোকদ্দমা আনিবেন।

আরও কয়েক দিন কাটিল। তারপর হঠাৎ একদিন চোর ধরা পড়িয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! চোর শশধরবাবু নয়, গোদা! আমাদের নিরীহ শান্ত-শিষ্ট গোদা, যে-গোদা বিনা অনুমতিতে গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছিঁড়িত না, সে এই কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে।

আমার হিসাবের গোড়াতেই গলদ ছিল। বুঝিলাম, গোদার নিষ্পাপ শরীরে শশধর-বাবুর দুষ্ট গ্রন্থি প্রবেশ করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছে, গোদাকে দুর্জয় চোর করিয়া তুলিয়াছে। গোদা বানর, তাই এত শীঘ্র ধরা পড়িয়া গেল, শশধরবাবু ত্রিশ বছরেও ধরা পড়েন নাই।

শশধরবাবু যে আমার উপর চটিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতেও বাকি রহিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে জীবন সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গোদার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক গ্রন্থি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উল্টা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আশাহত শশধরবাবুর সমস্ত আক্রোশ আমার উপর পড়িয়াছিল।

কিন্তু এখন বোধ হয় আমার উপর আর তাঁহার আক্রোশ নাই। যত দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে। তিনি নাকি বিবাহ করিবেন না, সংসারধর্মের

banglabooks.in

সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিতেছি তিনি যোগ অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই শ্রীমৎ হনুমানদাস বাবাজী নামক সাধুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

গোদার জন্য কিন্তু বড় দুঃখ হয়। পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছে, আর শশধরবাবু তাহার গ্রন্থি চুরি করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবেন! এর চেয়ে অবিচার আর কি হইতে পারে?

৩০ আষাঢ় ১৩৫৮

অলৌকিক

বর্ষা নামিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও বর্ষা নামে নাই। চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে। দ্বিপ্রহরে তাপমান যন্ত্রের পারা অবলীলাক্রমে ১১৮° পর্যন্ত উঠিয়া যায়। মনে হয়, আর দু'-চার দিন বৃষ্টি না নামিলে গয়া শহরের লোকগুলার অচিরাৎ গয়াপ্রাপ্ত ঘটিবে।

একটি পাকা বাড়ি। দ্বিপ্রহরে তাহার দরজা জানালা সব বন্ধ; দেখিলে সন্দেহ হয় বাড়ির অধিবাসীরা বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি গৃহিণী ও পুত্রবধূকে লইয়া দার্জিলিঙ পালাইয়াছেন বটে, কিন্তু বাকি সকলে বাড়িতেই আছে। ইহারা সংখ্যায় তিনজন। এক, কর্তার পুত্র সুনীল; সে কলেজের ছুটিতে বাড়ি আসিয়া বিরহ এবং গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ হইতেছে, কারণ বৌ দার্জিলিঙে। দুই, সুনীলের বিবাহিতা ছোট বোন অনিলা। সে শ্বশুরবাড়ি হইতে অনেক দিন বাপের বাড়ি আসিয়াছে, শীঘ্রই শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবেন, তাই সে দার্জিলিঙ যাইতে পারে নাই। তিন, তাহাদের ঠাকুরমা। বৃদ্ধা অতিশয় জবরদস্ত ও কড়া মেজাজের লোক, বাড়ি হইতে তাঁহাকে নড়ানো কাহারও সাধ্য নয়।

দ্বিতলের একটি ঘরে অনিলা দ্বার বন্ধ করিয়া আঁচল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আর একটি ঘরে সুনীল লুঙ্গি পরিয়া গায়ে ভিজা গামছা জড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়াছিল। তাহার চক্ষু কড়িকাঠের দিকে, মন দার্জিলিঙ পাহাড়ে। দার্জিলিঙ পাহাড়ে গিয়াও মন কিন্তু তিলমাত্র ঠাণ্ডা হয় নাই। দেহমনের উত্তাপে গামছা যখন শুকাইয়া যাইতেছে, তখন সে কুঁজোর জলে গামছা ভিজাইয়া আবার গায়ে জড়াইতেছে।

ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুটা বাজিল। এখনও চার ঘণ্টা এই বহ্নি প্রদাহ চলিবে; আকাশে সূর্যদেব ভস্মলোচন সন্ন্যাসীর মত একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন।

অনিলা আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সুনীলের দরজায় করাঘাত করিয়া অবসন্ন কণ্ঠে ডাকিল, 'দাদা!'

banglabooks.in

সুনীল দরজা খুলিয়া দিল। দুই ভাই বোন কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সুনীল বলিল, 'কি চাই?'

ক্লান্ত মিনতিভরা সুরে অনিলা বলিল, 'দাদা, একটা কাজ করবে?'

সন্দিগ্ধভাবে সুনীল বলিল, 'কি কাজ?' এ অবস্থায় কাজের নাম শুনিলেই মন শঙ্কিত হইয়া ওঠে।

অনিলা বলিল, 'আমার গলায় দড়ি বেঁধে কুয়োতে চোবাতে পারো? তবু যদি একটু ঠাণ্ডা পাই।'

সুনীল একটু বিবেচনা করিয়া বলিল, 'চোবাতে পারি, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? আমার শরীর তো ঠাণ্ডা হবে না!'

অনিলা বলিল, 'তোমার শরীর ঠাণ্ডার দরকার কী? তোমার অর্ধাঙ্গিনী দার্জিলিঙে আছেন, তাঁকে চিঠি লেখো না, শরীর আপনি জুড়িয়ে যাবে।'

সুনীলের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, সে বলিল, 'চিঠি লিখব! অর্ধাঙ্গিনীকে চিঠি লিখব! এ জন্মে আর নয়। অরুচি হয়ে গেছে।' ভিজা গামছা বুকে ঘষিয়া বক্ষস্থল কিঞ্চিত শীতল করিয়া বলিল, 'চিঠি লিখলেই যদি শরীর জুড়িয়ে যায়, তুই হেবোকে চিঠি লিখগে যা না।'

হাবু অনিলার স্বামীর ডাক-নাম। তাহাকে হেবো বলিয়া উল্লেখ করিলে অনিলা চটিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার রাগ হইল না। বস্তুতঃ স্বামীর চিঠি কয়েকদিন হইল আসিয়াছে, কিন্তু সে রাগ করিয়া উত্তর দেয় নাই। বিবাহিতা যুবতীদের এমনই স্বভাব, ক্লেশের কোনও কারণ ঘটিলেই তাঁহাদের সমস্ত রাগ পতিদেবতার উপর গিয়া পড়ে।

অনিলা বলিল, 'বাজে কথা বোলো না, ওর উপর আমার আর একটুও ইয়ে নেই। যদি কোনও উপায় থাকে তো বল।'

সুনীল বলিল, 'একমাত্র উপায় যজ্ঞ করা। আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক সেদিন বলছিলেন, যজ্ঞ করলেই বৃষ্টি হয়—যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ।

অনিলার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'দাদা!'

সুনীল বলিল, 'কি?'

অনিলা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, 'বড়ি!'

সুনীলের শঙ্কা হইল, গরমে অনিলার মাথার ঘিলু গলিয়া গিয়াছে, তাই সে এলোমেলো কথা বলিতেছে।

'বড়ি! কিসের বড়ি?'

'বড়ি বড়ি—বড়া বড়ির নাম শোনোনি কখনও?'

'শুনেছি। তা কি হয়েছে?'

'বলছি, ঠাকুরমা যদি বড়ি দেন, তাহলে নিশ্চয় বিষ্টি হবে। আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যে হয়নি।'

কথাটা সত্য। সেকালের ঋষিরা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হইত কিনা এতকাল পরে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ঠাকুরমা বড়ি দিলে বৃষ্টি নামিবেই। আজ পর্যন্ত ইহার অন্যথা হয় নাই। এ বিষয়ে ঠাকুরমার ব্যতিক্রমহীন রেকর্ড আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত রাগ করিয়া বড়ি দেওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সুনীল একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'বুদ্ধিটা মন্দ বার করিস নি। কিন্তু বুড়ীকে রাজী করানো শক্ত হবে।'

অনিলা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'চল না, দাদা, চেষ্টা করে দেখি। যেমন করে পারি রাজী করাবো। আমার ডাল ভিজানো আছে। বড়ার অম্বল করব বলে ভিজিয়েছিলাম—'

সুনীল বলিল, 'আচ্ছা তুই এগো, আমি লুঙ্গিটা ছেড়ে যাচ্ছি।' ঠাকুরমা দু'চক্ষে লুঙ্গি পরা দেখিতে পারে না, লুঙ্গি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কার্যসিদ্ধি তো হইবেই না, অনর্থক বকুনি খাইতে হইবে।

banglabooks.in

নিচের তলায় ঠাকুরঘরটি সববচেয়ে ঠাণ্ডা, কারণ এই ঘরে সংসারের পানীয় জলের ঘড়াগুলি থাকে। ঠাকুরমা মেঝেয় শুইয়া এক হাতে পাখা নাড়িতেছেন, অন্য হাতে মহাভারত বাগাইয়া ধরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। অনিলা প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ওমা, তুমি ঘুমোও নি দিদি! তা এই গরমে কি আর ঘুম হয়। পাখা নেড়ে নেড়ে হাতটা বোধ হয় ধরে গেছে। দাও, আমি বাতাস করছি।'

শিয়রের কাছে বসিয়া অনিলা ঠাকুরমার হাত হইতে পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল। ঠাকুরমার মুখখানি ঝুনা নারিকেলের মত, বাহিরে শুষ্ক হইলেও ভিতরে শাঁস আছে। তিনি নাতিনীর প্রতি একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। অনিলা বলিল, 'বাবাঃ, কি গরমই পড়েছে এবার, চিংড়িপোড়া হয়ে গেলুম। এমন গরম আগে আর কখনও পড়েনি।'

ঠাকুরমা বলিলেন, 'কেন পড়বে না, ফি বছরই পড়ে।'

এই সময় সুনীল প্রবেশ করিল; বিনা বাক্যব্যয়ে ঠাকুরমার পায়ের কাছে বসিল এবং তাঁহার একটা পা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া টিপিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া বলিলেন, 'নেলো, ঠ্যাং ছেড়ে দে শিগ্‌গির। আজ তোদের হয়েছে কি?'

সুনীল বলিল, 'হবে আবার কি, কিছু না। সবাই বলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা গুরুজনকে ভক্তিচ্ছেদ্দা করতে জানে না। তাই দেখিয়ে দিচ্ছি। গুরুজনের মত গুরুজন পেলেই ভক্তিচ্ছেদ্দা করা যায়।' বলিয়া আরও প্রবলবেগে পা টিপিতে লাগিল।

অনিলা পাখা চালাইতে চালাইতে বলিল, 'যাই বল, মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ী সকলেরই আছে; তাঁদের কি আমরা ভক্তি করি না? কিন্তু এমন ঠাক্‌মা ক'টা লোকের আছে? আমাদের কি ভাগ্যি বল্ দেখি দাদা!'

ঠাকুরমা উঠিয়া বসিলেন, পর্যায়ক্রমে নাতি ও নাতিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, 'কি মতলব তোদের বল্ দিকি! ঠিক্ দুপুরবেলা আমাকে ছেঁদো কথা শোনাতে এলি কেন?'

সুনীল আহত স্বরে বলিল, 'কোথায় ভাবলাম, দুপুরবেলাটা বৃথাই কেটে যাচ্ছে, যাই ঠাকুরমার সেবা করিগে, তবু পরকালের একটা কাজ হবে। তা তুমি বলছ ছেঁদো কথা। তবে আর আমরা যাই কোথায়?' বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অনিলা বলিল, 'শুধু কি তাই! বাবা দার্জিলিঙ থেকে চিঠি লিখেছেন—তোরা ঠাকুরমার দেখাশুনো করছিস তো! বাবা যদি এসে দেখেন—'

ঠাকুরমা ধমক দিয়া বলিলেন, 'আ গেল যা! ইনি আবার ঢাকের পেছনে ট্যামটেমি এলেন! যা বেরো আমার ঘর থেকে। দুটো ভূত-পেত্নী জুটেছে!'

ভূত-পেত্নী কিন্তু নাছোড়বান্দা। সুনীল আবার ঠাকুরমার পা টানিয়া টিপিবার উপক্রম করিল। ঠাকুরমা অনিলার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া সুনীলের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিলেন—'তোরা যাবি, না আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবি! বেরো শিগ্‌গির, আমি এখন দ্রৌপদীর রন্ধন উপাখ্যান পড়ছি।'

সুনীল এইরূপ একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল, বলিয়া উঠিল, 'দ্রৌপদীর রন্ধন উপাখ্যান। হুঃ, রন্ধনের কী জানত দ্রৌপদী? তোমার মতন বড়ি দিতে জানত?'

অনিলা অমনি বলিল, 'সে আর জানতে হয় না। দ্রৌপদী তো তস্য কালের মেয়ে, আজকালই বা কটা মেয়ে ঠাক্‌মার মতন বড়ি দিতে পারে? সরোজিনী নাইডু পারে? বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পারে?—আহা সেই কবে ঠাক্‌মার বড়ি খেয়েছি, এখনও যেন মুখে লেগে আছে।'

সুনীল সশব্দে ঝোল টানিয়া বলিল, 'বলিস নি, বলিস নি, আমার জিভে জল আসছে।'

ঠাকুরমার মনটা নরম হইল, কিন্তু সন্দেহ দূর হইল না। তিনি বলিলেন, 'নে, আর ন্যাকরা করতে হবে না, আসল কথাটা কী তাই বল্। কি চাস তোরা?'

সুনীল অবাক হইয়া বলিল, 'চাইব আবার কি, তোমার সেবা করতে চাই। তবে বড়ির

banglabooks.in

কথায় মনে পড়ে গেল। কদ্দিন তোমার বড়ি খাইনি। দুটি বড়ি পাড়োনা দিদি।'

অনিলা বলিল, 'হ্যাঁ দিদি, লক্ষ্মীটি দিদি, আমার ডাল ভিজানো আছে, আমি এক্ষুনি বেটে দিচ্ছি—'

কিছুক্ষণ ঠাকুরমার কলহ-কলিত কণ্ঠের সহিত নাতি-নাতিনীর করুণ মিনতি মিশ্রিত হইল; তারপর বৃদ্ধা পরাভূত হইলেন। কিন্তু আদৌ উহারা যে বড়ি পাড়াইবার মতলবেই আসিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারিলেন না।

বেলা তিনটের সময় ঠাকুরমা তেলমাখানো থালায় কয়েকটি বড়ি পাড়িয়া রোদে দিলেন।

বেলা চারটের সময় আকাশের কোণে সিংহের মত স্ফীত কেশর কয়েকটা মেঘ মাথা তুলিল। দেখিতে দেখিতে গুরুগুরু ধ্বনির সহিত বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। অতি ভৈরব হরষ, ক্ষিতিসৌরভ রভস, কিছুই বাদ পড়িল না। ঠাকুরমার বড়ি ভাসিয়া গেল।

কিন্তু ইহাই একমাত্র অলৌকিক ঘটনা নয়।

পুলক রোমাঞ্চিত রাত্রি। বৃষ্টির উদ্দাম প্রগল্‌ভতা কমিয়াছে; টিপিটিপি মেঘ-বধূরা যেন অভিসারে চলিয়াছে।

সুনীল নিজের ঘরে চিঠি লিখিতে বসিয়াছে—

প্রিয়তমাসু, আজ প্রথম বিষ্টি নেমেছে—

অনিলা নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া চিঠি লিখিতেছে—

প্রিয়তমেষু—

১০ ভাদ্র ১৩৫৯

সন্ন্যাস

সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত স্তম্ভে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম—বাবা, মা মারা গিয়াছেন। আপনি এবার ফিরিয়া আসুন।

শ্রীরামধন ঘোষ। ফুলগ্রাম। বাঁকুড়া।

সংবাদপত্রের এই স্তম্ভটি আমার প্রিয়। রোজই পড়ি। ছেলে ম্যাট্রিক ফেল করিয়া পলায়ন করিয়াছে, পিতা বিজ্ঞাপন দিতেছেন—ফিরিয়া এস, বেশী মারিব না। এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই বাহির হয়। কিন্তু পুত্র পিতাকে অভয় জানাইয়া ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন। আমার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

দেখিলাম, হিমালয়ের সানুদেশে গিরিগুহার সম্মুখে পাঁচজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন; মাঝখানে ধুনী জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসীদের চেহারা তপঃকৃশ, মাথা হইতে বটগাছের ঝুরির

banglabooks.in

মত জটা নামিয়াছে। তাঁহারা মিটিমিটি চক্ষে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

কিন্তু দেহ যতই নিষ্কম্প হোক, আজ তাঁহাদের মন চঞ্চল। ধ্যানধারণায় চিত্ত সমাহিত হইতেছে না। কারণ, গাঁজা ফুরাইয়া গিয়াছে।

গুহা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র শহর আছে, একজন সন্ন্যাসী সেখানে গাঁজা আনিতে গিয়াছেন। বাকি পাঁচজন কান খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

দীর্ঘকাল কাটিবার পর অদূরে নিম্নাভিমুখে নুড়ি গড়াইয়া পড়ার শব্দ হইল। কেহ আসিতেছে। একজন সন্ন্যাসী উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে হাসির আভাস দেখিয়া অন্য সন্ন্যাসীরা বুঝিলেন গাঁজা আসিতেছে।

অবিলম্বে ষষ্ঠ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝুলি হইতে একটি পুরুষ্টু কাগজের মোড়ক বাহির করিতেই অপেক্ষমান সন্ন্যাসীরা বিদ্যুদ্বেগে নিজ নিজ ঝুলি হইতে গাঁজার কলিকা বাহির করিলেন। দেখিতে দেখিতে গঞ্জিকার ধূমগন্ধে হিমালয়ের সানুদেশ আমোদিত হইয়া উঠিল।

গাঁজার কলিকা নিঃশেষিত হইলে সন্ন্যাসীরা আবার ভাবযুক্ত হইয়া যোগাসনে বসিলেন। মুখমণ্ডল প্রসন্ন, মন কূটস্থ চৈতন্যের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিতেছে।

একটি সন্ন্যাসীর কিন্তু চিত্ত স্থির হইল না। গাঁজার মোড়ক খবরের কাগজের ছিন্নাংশটা অদূরে পড়িয়া ছিল, তাঁহার মন বারবার সেইদিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সন্ন্যাসী যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ উসখুস করিবার পর তিনি উঠিলেন, কাগজের টুকরাটি কুড়াইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কাগজে সংবাদ কিছু নাই, কেবল বিজ্ঞাপন। সন্ন্যাসী তাহাতেই তন্ময় হইয়া গেলেন।

তারপর হঠাৎ একটি বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। অন্য সন্ন্যাসীদের চটকা ভাঙিয়া গেল। তাঁহারা বিরক্ত চক্ষু তুলিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিলেন।

সন্ন্যাসী তখন খবরের কাগজটি পতাকার মত ঊর্ধ্বে নাড়িতে নাড়িতে নৃত্য করিতেছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন, 'কি হল?'

সন্ন্যাসী ক্ষণেকের জন্য নৃত্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'মরেছে! মরেছে! লাইন ক্লিয়ার!' বলিয়া আবার নাচিতে লাগিলেন।

'কে মরেছে?'

'বৌ! খাণ্ডার রণচণ্ডী মরেছে। আমি চললাম, ঘরে ফিরে চললাম!'

সন্ন্যাসী নাচিতে নাচিতে অদৃশ্য হইলেন। কাগজখানা পড়িয়া রহিল।

অন্য পাঁচজন সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে সকলের মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল।

একজন হাত বাড়াইয়া কাগজটি তুলিয়া লইলেন, আগাগোড়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার নৃত্য করিবার মত কোনও বিজ্ঞাপনই তাহাতে নাই।

একে একে সকলেই কাগজটি দেখিলেন। সমবেত নাসিকা হইতে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। তারপর তাঁহারা আর এক দফা গাঁজা চড়াইলেন।

সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসগ্রহণের মূলতত্ত্ব গুহায় নিহিত। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান রচনা করা প্রয়োজন। দেশে যে সাধু-সন্ন্যাসী বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি?

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

banglabooks.in

আদায় কাঁচকলায়

এতদিন যাহা শহরসুদ্ধ লোকের হাসি-ঠাট্টার বিষয় ছিল, তাহাই হঠাৎ অত্যন্ত ঘোরালো ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদা বাঁড়ুয্যের কন্যা নেড়ীকে লইয়া কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পুত্র বদাই উধাও হইয়াছে। শুধু তাই নয়—

কিন্তু ব্যাপারটা আরও আগে হইতে বলা দরকার।

শহরের এক প্রান্তে নির্জন রাস্তার ধারে ঘেঁষাঘেঁষি দুটি বাড়ি। পঞ্চাশ বছর আগে শহরের পৌরসঙ্ঘ বোধ করি হাত-পা ছড়াইবার মানসে এইদিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তারপর কী ভাবিয়া আবার হাত গুটাইয়া লইয়াছে। অনাদৃত পথের পাশে কেবল দুটি বাড়ি একঘরে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পিছনে এবং সামনে ঘন জঙ্গল।

বাড়ি দুটি করিয়াছিলেন দুই বন্ধু। তাঁহারা বহুকাল গত হইয়াছেন; তাঁহাদের দুই ছেলে এখন বাড়ি দুটিতে বাস করিতেছেন এবং পৈতৃক বন্ধুত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরস্পর শত্রুতা করিতেছেন। শহরের লোক তাঁহাদের নামকরণ করিয়াছেন—আদা বাঁড়ুয্যে এবং কাঁচকলা গাঙ্গুলী।

কলহের কোনও হেতু ছিল না; একমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস করাই কলহের কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আদা বাঁড়ুয্যের ছাগল যদি কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পালং শাকে মুখ দেয় অমনি শহরে ঢি ঢি পড়িয়া যায়; আবার কাঁচকলা গাঙ্গুলীর একমাত্র বংশধর বদাই যদি বাঁড়ুয্যে-কন্যা নেড়ীকে জানালায় দেখিয়া চক্ষু মিটিমিটি করে, তাহা হইলে এই দুর্বৃত্ততার খবর কাহারও অবিদিত থাকে না। ভাগ্যক্রমে দুইজনেই বিপত্নীক, নহিলে দুই গিন্নীর সঙ্ঘর্ষে পাড়ায় কাক-চিল বসিতে পাইত না।

মহকুমা শহর, আকারে ক্ষুদ্র; চারিদিকে জঙ্গল। মাঝে মাঝে চুরি-ডাকাতিও হয়। আদা বাঁড়ুয্যে পৌরসঙ্ঘের কেরানী। দীর্ঘকাল কেরানীগিরি করিয়া তাঁহার শরীর কৃশ ও মেজাজ রুক্ষ হইয়াছে। উপরন্তু বাড়িতে অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা এবং পাশের বাড়িতে অবিবাহিত শত্রুপুত্র। বাঁড়ুয্যের বদ্‌-মেজাজের জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কাঁচকলা গাঙ্গুলীর শহরে একটি মনিহারীর দোকান আছে। হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা, গালভরা হাসি। বাঁড়ুয্যে ছাড়া আর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ নাই। সকলের সঙ্গেই দাদা-ভাই সম্পর্ক।

দু'জনেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অতি সাধারণ অবস্থা।

আদা বাঁড়ুয্যে সকালবেলা আপিস যান; পথে যাইতে যাইতে হয়তো দেখেন কাঁচকলা গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে কয়েকজন ছোকরা উত্তেজিতভাবে জটলা করিতেছে। গাঙ্গুলীর দোকানে প্রত্যহ সকালবেলা খবরের কাগজের আড্ডা বসে; কিন্তু আজ যেন উত্তেজনা কিছু বেশী। নানাপ্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, গাঙ্গুলীও দোকানে থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিয়াছেন। একজন ছোকরা বাঁড়ুয্যেকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠে—'এই যে বাঁড়ুয্যে-দা, খবর শুনেছেন? পেরুমল মারোয়াড়ীর গদিতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে।'

বাঁড়ুয্যে স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষতার সহিত বলেন—'বটে, ডাকাত ধরা পড়েছে?'

একজন বলে—'ডাকাত কোথায়, পুলিস পৌঁছুবার আগেই পেরুমলের যথাসর্বস্ব নিয়ে কেটে পড়েছে।'

বাঁড়ুয্যে বলেন—'পুলিসের চোখ থাকলে ডাকাত ধরতে পারত। এ শহরে ডাকাতের মত চেহারা কার তা সবাই জানে।' বলিয়া গাঙ্গুলীর দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া চলিতে আরম্ভ করেন।

ছেলেরা হাসিয়া উঠে। গাঙ্গুলী দোকান হইতে গলা বাড়াইয়া বলেন—'তোমাদের বাড়ি থেকে যদি কখনো ঘটি বাটি চুরি যায়, কে চুরি করেছে বলতে হবে না। ছিঁচকে চোরের মত চেহারা শহরে একটাই আছে।'

banglabooks.in

বাঁড়ুয্যে শুনিতে পাইলেও কানে তোলেন না, হন্ হন্ করিয়া আপিসের দিকে চলিয়া যান।

এইভাবে চলিতেছে। কলহের কটুকাটব্য কখনও বা থানা পর্যন্ত পৌঁছয়। থানার দারোগা উভয়ের পরিচিত, সহাস্য সহানুভূতির সহিত নালিশ চাপা দেন।

কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপর্যুপরি দুইটি ঘটনা ঘটিয়া শহরসুদ্ধ লোককে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় পোস্ট আপিসের ঠেলাগাড়ি চিঠিপত্র লইয়া স্টেশনে যায়। স্টেশন ও ডাকঘরের মাঝে মাইলখানেক রাস্তার ব্যবধান; তাহার মধ্যে খানিকটা রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সেদিন ঠেলাগাড়ি যথাসময়ে স্টেশনে যাইতেছিল, সঙ্গে ছিল তিনজন পিওন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একটা মুখোশ-পরা ডাকাত দমাদ্দম বোমা ফাটাইতে ফাটাইতে তাহাদের আক্রমণ করিল; তাই দেখিয়া পিওন তিনজন ঠেলাগাড়ি ফেলিয়া থানার অভিমুখে ধাবিত হইল।

পুলিস আসিয়া দেখিল, বোমারু ডাকাত একটি ব্যাগ কাটিয়া রেজেস্ট্রি ইন্সিওরের খামগুলি লইয়া গিয়াছে। একজন পিওন দূর হইতে ডাকাতকে দেখিয়াছিল, মুখ দেখিতে না পাইলেও চেহারাটা তাহার চেনা-চেনা মনে হইয়াছিল। অনেকটা যেন কাঁচকলা গাঙ্গুলীর মত।

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় দারোগা সদলবলে গাঙ্গুলীর বাড়িতে হানা দিলেন। গাঙ্গুলী সরকারী মেল-ব্যাগ লুঠ করিয়াছেন, একথা পুরাপুরি বিশ্বাস না করিলেও একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দরোগা যে ব্যাপার দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। গাঙ্গুলীর দরজার সম্মুখে বাঁড়ুয্যে এবং গাঙ্গুলীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। উভয়ে পরস্পরকে যে ভাষায় সম্বোধন করিতে-ছেন, তাহা ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত। দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠালাঠি বাধিতে আর দেরি নাই।

দারোতাকে দেখিয়া বাঁড়ুয্যে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। বলিলেন—'দারোগাবাবু, এসেছেন—ধরুন ব্যাটাকে। কড়াক্কড় করে বেঁধে নিয়ে যান।'

হতভম্ব দারোগা বলিলেন—'কি হয়েছে?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'আমার সর্বনাশ করেছে হতভাগা। বাপ-ব্যাটায় সড় করে আমার মেয়েকে কুলত্যাগিনী করেছে। আমার জাত মেরেছে।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'মিছে কথা—মিছে কথা। আমার ছেলে একটা পঞ্চাশের গাড়িতে বর্ধমান গেছে মামার বাড়িতে। কোন্ শালা বলে—' ইত্যাদি।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'দারোগাবাবু, এই দেখুন চিঠি। আমার মেয়ে কি লিখে রেখে গেছে দেখুন।'—

দারোগা চিঠি পড়িলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

বাবা,

গাঙ্গুলী মশাইয়ের ছেলের সঙ্গে তুমি তো আমার বিয়ে দেবে না, তাই আমি ওর সঙ্গে পালিয়ে চললুম। প্রণাম নিও।

ইতি—নেড়ী।

দারোগা মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'আপনার মেয়ে নাবালিকা নয়। সে যদি নিজের ইচ্ছেয় কারুর সঙ্গে পালিয়ে থাকে, আমরা কিছু করতে পারি না। আপনি কখন জানতে পারলেন?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'ছ'টার সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, এই চিঠি রয়েছে, মেয়ে নেই। ঐ নচ্ছার গাঙ্গুলীটা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল, দোর ঠেলাঠেলি করে বার করলুম। এতবড় বেহায়া, বলে তোমার মেয়ের খবর আমি জানি না, আমার ছেলে মামার বাড়ি গেছে। চোর—ডাকাত—বোম্বেটে—'

দারোগা জিজ্ঞেস করিলেন—'সেই ছ'টা থেকে আপনারা ঝগড়া করছেন?'

banglabooks.in

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'সেই ছ'টা থেকে; এখনও জল দিইনি মুখে। আমার গায়ে যদি জোর থাকত, ঘাড় ধরে শালাকে থানায় নিয়ে যেতুম।'

দারোগা চিন্তা করিলেন। রাস্তায় ডাকাতি হইয়াছে সাতটার সময়। এদিকে আদা ও কাঁচকলার ঝগড়া বাধিয়াছে ছটার সময়। সুতরাং পিওনটা ভুল করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবু—

দারোগা বলিলেন—'গাঙ্গুলী মশাই, আপনার বাড়ি আমরা খানাতল্লাশ করব।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'আসতে আজ্ঞা হোক। আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখুন, ওর মেয়ের গন্ধ যদি আমার বাড়িতে পান, আমি বেগের গাঙ্গুলী নই।'

দারোগা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ গাঙ্গুলীর বাড়ি তল্লাশ করিল। দারোগা অবশ্য বাঁড়ুয্যে-কন্যাকে খুঁজিতেছিলেন না; কিন্তু তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহাও পাওয়া গেল না। চোরাই ইন্সিওর চিঠিগুলির চিহ্নমাত্র গাঙ্গুলীর বাড়িতে নাই। প্রস্থানকালে দারোগা বলিলেন—'গাঙ্গুলী মশাই, কিছু মনে করবেন না, আপনার উপর অন্য কারণে সন্দেহ হয়েছিল। শত্তুরের সাক্ষীতে আপনি বেঁচে গেলেন।'

গাঙ্গুলী ও বাঁড়ুয্যে যুগপৎ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গভীর রাত্রে বাঁড়ুয্যের দরজায় টোকা পড়িল।

বাঁড়ুয্যে দ্বার খুলিয়া বলিলেন—'এস ভাই—এস।'

আদা বাঁড়ুয্যে কাঁচকলা গাঙ্গুলীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে তক্তপোশে বসাইলেন। তক্তপোশের উপর অনেকগুলি ইন্সিওর খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা হল। তাই বা মন্দ কি?'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'হ্যাঁ ওই টাকায় বদাই কলকাতায় মনিহারীর দোকান খুলতে পারবে।'

উভয়ে মধুর হাস্য করিলেন। বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'তারপর—কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'কিচ্ছু না। দুটো পট্‌কা ছুঁড়তেই পিওন ব্যাটারা মাল ফেলে পালাল।

'কিন্তু পুলিস গন্ধ পেয়েছিল।'

'হুঁ। ভাগ্যিস অ্যালিবাই তৈরি করা গেছল!—কিন্তু এবার উঠি। খামগুলো পুড়িয়ে ফেলো বেহাই।'

'সে আর বলতে'—বাঁড়ুয্যে অন্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'বিয়েটা দেখতে পেলুম না এই শুধু দুঃখু।'

গাঙ্গুলী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—'পৌনে বারোটায় লগ্ন। তার মানে এতক্ষণ সম্প্রদান হয়ে গেছে। তা দুঃখ কি বেহাই, কালই নাহয় বর্ধমানে গিয়ে মেয়ে-জামাই দেখে এস। আমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা তো তুমি জানোই।'

বাঁড়ুয্যের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল। তিনি উঠিয়া গাঙ্গুলীকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন—'বেহাই, আমি মেয়ের বাপ, আজ তো আমারই খাওয়াবার কথা। তোমার জন্যে ভাল মিষ্টি এনে রেখেছি। চল, খাবে চল।

১২ ভাদ্র ১৩৬০

banglabooks.in

আদা বাঁড়ুয্যের কন্যা নেড়ীকে লইয়া কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পুত্র বদাই অন্তর্হিত হইবার পর শহরে যে ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে বাঁড়ুয্যে শনিবার রাত্রির ট্রেনে বর্ধমান গিয়া চুপি চুপি মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া আসিয়াছেন। পনরো শত টাকাও বদাইয়ের হস্তগত হইয়াছে।

বদাই যে নেড়ীকে বিবাহ করিয়াছে, একথাটাও কেমন করিয়া শহরে জানাজানি হইয়া গিয়াছে। বাঁড়ুয্যেকে এ বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি সক্রোধে হাত-মুখ নাড়িয়া বলেন, 'আমার মেয়ে নেই, মরে গেছে।' মনে মনে বলেন—ষাট্! ষাট্!

গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'বদাইকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি। হোক একমাত্র ছেলে, তবু ওর মুখ দেখব না।'

ডাক-গাড়ির ডাকাতির অবশ্য কিনারা হয় নাই।

২

গভীর রাত্রে বাঁড়ুয্যের সদর দরজা ভেজানো ছিল, গাঙ্গুলী নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন।

বাঁড়ুয্যে তক্তপোশে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, হুঁকাটি বেহাইয়ের হাতে দিলেন। গাঙ্গুলী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারপর বেহাই, কেমন দেখলে?'

বাঁড়ুয্যের ভগ্নদন্ত মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি মুখ ঢোখাইয়া বলিলেন, 'দিব্যি মানিয়েছে ছোঁড়া-ছুঁড়িকে—ঠিক যেন হর-পার্বতী।'

গাঙ্গুলী বলিলেন, 'আমারও দেখবার জন্যে মনটা হাঁচোড়-পাঁচোড় করছে—'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন, 'এখন নয়। এখন তুমি দোকান বন্ধ করলে লোকের সন্দেহ হতে পারে। আর দু'দিন যাক।'

'হুঁ'—গাঙ্গুলী হুঁকায় অধর সংযোগ করিয়া টান দিলেন—'আর কিছু খবর আছে নাকি?'

'খবর আর কি! তবে দেড় হাজার টাকায় কুলাবে না। জাঁকিয়ে দোকান করতে হলে আরও হাজার দুই টাকা চাই। তা ছাড়া সংসার খরচও আছে, বলতে নেই ওরা এখন সংসারী হল—'

গাঙ্গুলী বলিলেন, 'তা তো বুঝেছি; কিন্তু দু'হাজার টাকা পাই কোথায়? তুমি একটা মতলব বার কর না দাদা' বলিয়া হুঁকাটি আবার বাঁড়ুয্যের হাতে ধরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়া বাঁড়ুয্যে মুখ তুলিলেন, 'শহরে একটা সার্কাস এসেছে না?'

গাঙ্গুলী বলিলেন, 'হ্যাঁ, শহরের ছোঁড়ারা মেতে উঠেছে। দুটো বাঘ, তিনটে সাইকেল-চড়া মেয়ে, একটা বনমানুষ—'

'বনমানুষ?'

'হ্যাঁ, প্রকাণ্ড বনমানুষ। দেখলে ভয় করে।'

বাঁড়ুয্যে আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে লাগিলেন।

৩

সার্কাসের দল ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের একপাশে তাঁবু ফেলিয়াছে। তাঁবুর পিছনে জন্তু-জানোয়ারের আস্তানা। একটা ক্যাঙারু, কয়েকটি বানর, দুটি লোম-ওঠা বাঘ এবং একটি বনমানুষ। বনমানুষটিই আসল দ্রষ্টব্য জীব। ভয়ঙ্কর চেহারা, মানুষের সহিত সাদৃশ্যই যেন তাহার চেহারাটাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

banglabooks.in

জন্তু-জানোয়ার দেখিবার জন্য ছেলেদের ভিড় তো অষ্টপ্রহর লাগিয়াই থাকে, বুড়োরাও বাদ যান না। আদা বাঁড়ুয্যে সকালে আপিস যাওয়ার মুখে একবার উঁকি মারিয়া যান। বনমানুষের খাঁচার মধ্যে দুই-চারিটা ছোলাভাজা ফেলিয়া দেন। ছোকরাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'নাম যদিও বনমানুষ, তবু শহরেই থাকে এরা। মানুষের পূর্বপুরুষ—হুঃ! পূর্বপুরুষ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? মাসতুত ভাই। চেহারার আদল দেখে চিনতে পারছ না?'

ছেলেরা শ্লেষ উপভোগ করে। বনমানুষ ছোলাভাজা খুঁটিয়া খাইতে খাইতে গভীর ভ্রূকুটি করিয়া তাকায়।

অপরাহ্ণে আসেন কাঁচকলা গাঙ্গুলী। ক্যাঙারুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছেলেদের ডাকেন, 'ওহে দ্যাখো দ্যাখো, ভাবছ এটা ক্যাঙারু, অস্ট্রেলিয়ার জন্তু? মোটেই তা নয়। আমার পাশের বাড়িতে থাকতো, সার্কাসওয়ালারা ধরে এনে রেখেছে।'

সার্কাস বেশ চলিতেছে, ছেলে-বুড়ো সকলেই খুশী। তারপর হঠাৎ একদা রাত্রিকালে এক ব্যাপার ঘটিল। বনমানুষ খাঁচার তালা ভাঙিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪

পরদিন সকালবেলা গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে আড্ডা জমিয়াছিল। বনমানুষ পালানোর গল্পই হইতেছিল; বনমানুষটা একেবারে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

বনমানুষ নিশ্চয়ই বনে গিয়াছে, আলোচনা এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এমন সময় পল্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আড্ডাধারীদের মাঝখানে বসিয়া পড়িল।

সবাই প্রশ্ন করিল, 'কি রে! কি রে পল্টু, কি হয়েছে?'

পল্টু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বনমানুষ!'

'কোথায়! কোথায়! তুই দেখেছিস?'

পল্টুর বয়স পনরো-ষোল, একটু ন্যালা-ক্যাবলা গোছের। সে বলিল, 'আমার ময়নার জন্যে ফড়িং ধরতে বনের ধারে গিয়েছিলুম। ওরে বাবা, হঠাৎ আওয়াজ হল—গাঁক! ওরে বাবা, ছুটে প্যালিয়ে আসছিলুম, একটা কুলগাছের ঝোপের আড়াল থেকে বনমানুষটা আমাকে খিমচে নিলে। এই দ্যাখো।'

সকলে দেখিল পল্টুর নিতম্বের কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং ভিতরে চামড়ার উপর কয়েকটি রক্তমুখী আঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। আঁচড়গুলি বনমানুষের নখের আঁচড় হইতে পারে, আবার কুলকাঁটার আঁচড় হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না, দেখিতে দেখিতে গাঙ্গুলীর দোকান শূন্য হইয়া গেল। গাঙ্গুলীও অসময়ে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বনমানুষ পল্টুকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন অবস্থা করিয়াছে যে, পল্টুর প্রাণের আশা নাই। দিনে-দুপুরে শহর থমথমে হইয়া গেল; রাস্তায় লোক চলাচল নাই, দোকানপাট বন্ধ। যাহাদের নিতান্তই কাজের দায়ে পথে বাহির হইতে হইয়াছে, তাহারা লাঠি-সোঁটা লইয়া ভয়চকিত নেত্রে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে। যাহাদের ঘরে বন্দুক আছে, তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বন্দুককে তেল মাখাইতে লাগিল।

৫

সার্কাস ম্যানেজারের থানায় তলব হইয়াছে, দারোগা তাঁহাকে ধমকাইতেছেন, 'আপনার দোষ, বনমানুষ পালায় কেন? মনে রাখবেন, যদি কারুর অনিষ্ট হয়, আপনার হাতে হাতকড়া

banglabooks.in

পড়বে।'

সার্কাস ম্যানেজার মিনতি করিয়া বলিলেন, 'হুজুর, আমার রামকানাই নিরীহ ভালমানুষ, মুখ তুলে কারুর পানে তাকায় না—'

'রামকানাই কে?'

'আজ্ঞে আমার বনমানুষের নাম রামকানাই।'

'বটে! খাসা রামকানাই আপনার। খবর পেলাম, পল্টু বলে একটি স্কুলের ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে।'

'আজ্ঞে হতেই পারে না। রামকানাই বেহদ্দ ভীতু। স্কুলের ছেলে দেখলেই কেঁদে ফ্যালে। ওরা ওকে ভারি বিরক্ত করে কিনা।'

'তা সে যাই হোক, চারিদিকে তল্লাশ করুন। হয়তো বনের মধ্যে ঢুকেছে। আজই ধরা চাই।'

সার্কাস ম্যানেজার নিজের দলবল লইয়া জঙ্গল তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রামকানাইকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার ঢেঁট্রা পিটাইয়া পুরস্কার ঘোষণা করিলেন—যে কেহ রামকানাইয়ের খবর আনিতে পারিবে সে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবে।

সকলে বন্ধ দ্বারের আড়াল হইতে ঢেঁট্রা শুনিল, কিন্তু এই ভর সন্ধ্যাবেলা পঞ্চাশ টাকার লোভেও কেহ ঘর হইতে বাহির হইল না।

রামকানাই তখন আদা বাঁড়ুয্যের বাড়ির পিছনদিকে একটা এঁদোপড়া ঘরের মধ্যে বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত চিনাবাদাম ভাজা খাইতেছিল।

৬

মিহিলাল নামক এক হিন্দুস্থানী স্যাকরা বাজারে দোকান করিত। সামান্য দোকান, রুপার কাজই বেশী। কিন্তু নিশুতি রাত্রে তাহার কাছে লোক আসিত, সোনার গহনা নামমাত্র দামে বিক্রয় করিয়া যাইত; মিহিলাল তৎক্ষণাৎ গহনা গলাইয়া সোনা করিয়া ফেলিত।

সে-রাত্রে মিহিলাল দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। খিড়কির দরজায় খুট্খুট্ শব্দ শুনিয়া ঘুম-চোখে উঠিয়া দরজা খুলিল। তারপর 'বাপ রে!' বলিয়া একটি চীৎকার ছাড়িয়া সদর দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল বিপুলকায় রামকানাই। রামকানাইয়ের পিছনে কেহ ছিল কি না তাহা মিহিলাল দেখিবার অবসর পাইল না।

সকাল হইলে মিহিলাল কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। দেখিল বনমানুষ তাহার দোকান তচ্নচ্ করিয়া গিয়াছে; বিশেষত যে-ঘরে তাহার রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি থাকিত সে ঘরের অবস্থা শোচনীয়। একটিও হাঁড়ি আস্ত নাই, চাল ডাল তেল ঘি আনাজ চারিদিকে ছড়ানো। তাহার মাঝে মাঝে বনমানুষের পায়ের দাগ।

একটি হাঁড়িতে মসুর ডালের নীচে ষাট ভরি সোনা লুকানো ছিল, সোনা নাই।—

মিহিলাল পুলিসে খবর দিল না। চোরের মায়ের কান্না কেহ শুনিতে পায় না। ব্যথিত চিত্তে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি তাজ্জব ব্যাপার! বনমানুষও সোনা চেনে!

আশেপাশের দোকানদারেরা অবশ্য জানিতে পারিল, কাল রাত্রে মিহিলালের দোকানে বনমানুষ আসিয়াছিল; কিন্তু সোনার কথা কেহ জানিল না। মিহিলাল কিল খাইয়া বেবাক কিল চুরি করিল।

banglabooks.in

৭

সার্কাস ম্যানেজার পুরস্কারের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। যে-ব্যক্তি রামকানাইয়ের সন্ধান দিতে পারিবে সে একশত টাকা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তবু রামকানাইকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যগ্রতা কাহারও দেখা গেল না। মিহিলালের দোকানের খবরটা পল্লবিত হইয়া শহরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। মিহিলাল আর বাঁচিয়া নাই, বনমানুষ তাহাকে ঘাড় মট্‌কাইয়াছে।

বিকেলবেলা সার্কাস ম্যানেজার থানায় বসিয়া দারোগার ধমক খাইতেছিলেন এবং কাঁদো কাঁদো মুখে রামকানাইয়ের ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রের গুণগান করিতেছিলেন এমন সময় কাঁচকলা গাঙ্গুলী হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—'দারোগাবাবু, বনমানুষের খবর পেয়েছি।'

ম্যানেজার লাফাইয়া উঠিলেন, 'কৈ—কোথায়?'

গাঙ্গুলি একবার ম্যানেজারের দিকে চোখ ফিরাইয়া দারোগাকে বলিলেন, 'একশো' টাকা পুরস্কার দেবার কথা, পাবো তো?'

ম্যানেজার একশত টাকার নোট পকেট হইতে বাহির করিয়া দারোগার সম্মুখে রাখিলেন—'হুজুর, এই টাকা আপনার কাছে জমা রইল, যদি রামকানাইকে পাওয়া যায় আপনিই এঁকে পুরস্কার দেবেন।'

দারোগা বলিলেন, 'বেশ। গাঙ্গুলীমশায়, বনমানুষ কোথায় দেখলেন?'

গাঙ্গুলী বলিলেন, 'আজ্ঞে বনের মধ্যে। আমার বাড়ির ছাদের ওপর থেকে দূরবীণ লাগিয়ে দেখলাম একটা গাছের তলায় কম্বলের মত পড়ে আছে। ভাল করে দেখি—বনমানুষ!'

ম্যানেজার বলিলেন, 'চলুন চলুন। আহা, আমার রামকানাই দু'দিন না খেয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে—'

দলবল সহ ম্যানেজার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নির্দিষ্ট গাছের উদ্গত শিকড়ে মাথা রাখিয়া রামকানাই নিদ্রাগত। তাহার নাক ডাকিতেছে।

আফিমের মাত্রা বোধহয় একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অনেক ঠেলাঠেলির পর রামকানাইয়ের ঘুম ভাঙিল। সে উঠিয়া হাই তুলিল, আঙুল মট্‌কাইল, তারপর ম্যানেজারের গলা জড়াইয়া মুখ চুম্বন করিল।

৮

নৈশ বৈবাহিক-সম্মেলনে কাঁচকলা গাঙ্গুলী বলিলেন, 'কেমন হল বেহাই?'

আদা বাঁড়ুয্যে বলিলেন, 'খাসা হল। শাককে শাক তলায় মুলো। পুরস্কারের টাকাটা উপরি।'

গাঙ্গুলী বলিলেন, 'এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ি। বদাই আর নেড়ীকে দেখবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে। এখন গেলে কেউ সন্দেহ করবে না, ভাববে পুরস্কারের টাকায় কলকাতায় ফুর্তি করতে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ। এবার দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়। সোনা সঙ্গে নিয়ে যেও।'

'নিশ্চয়। আচ্ছা বেহাই, মিহিলালের দোকানে যে সোনার তাল আছে এটা বুঝলে কি করে?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন, 'শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখলে চেনা যায়। মিহিলালের ওপর অনেকদিন থেকে নজর ছিল। ওর ঘরে বৌ আছে কিন্তু রাত্রে দোকানে শোয়। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খায়, বাইরে ছোট্ট দোকান করে রেখেছে, ভেতরে ভেতরে চোরাই মালের কারবার চালায়। ব্যাটা ইর্তেল ঘুঘু।'

গাঙ্গুলী হাসিলেন, 'তা ভালই হল, চুরির ধন বাটপাড়িতে গেল।'

banglabooks.in

আদা বাঁড়ুয্যেও কাঁচকলা গাঙ্গুলীর চোখে চোখ তুলিয়া মৃদুমন্দ হাসিলেন।
৯ কার্তিক ১৩৬০

শ্রেষ্ঠ বিসর্জন

সাপ্তাহিক 'উল্কা'র সম্পাদক সুদর্শন রায় টেবিলে বসিয়া অধীর ভাবে একটা পেন্সিলের পশ্চাদ্ভাগ চুষিতেছিলেন।

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা; কাল সকালেই কাগজ বাহির করিতে হইবে। অথচ তাঁহার টেক্কা মার্কা রিপোর্টার অজেন্দ্র পালের এখনও দেখা নাই। সেই যে সে বেলা একটার সময় বালিগঞ্জের ন্যুডিস্ট্ কলোনিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে—এখনও ফিরিল না।

ওদিকে একটা ভারি গোপনীয় অথচ ইণ্টারেস্টিং খবর সম্পাদকের কানে আসিয়াছে, সেটা সম্বন্ধে কালকের কাগজে কিছু থাকাই চাই। গোপনীয় খবর ইণ্টারেস্টিং করিয়া বাহির করিবার জন্যই 'উল্কা'র কাট্‌তি; 'উল্কা'র পাঠকেরা ইহা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করে না। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া খবরের বাজার এত মন্দা যাইতেছে যে একটা হৃদয়গ্রাহী কেচ্ছাও 'উল্কা'য় বাহির হয় নাই। এবারে গরম গরম একটা কিছু না থাকিলেই নয়—'উল্কা'র বদনাম রটিয়া যাইবে। বিশেষতঃ, আজিকার এই খবরটা যদি অন্য কোনও সম্পাদক সংগ্রহ করিয়া রাতারাতি ছাপিয়া বাহির করিয়া দেয়, তবে তো 'উল্কা'র প্রেস্টিজ্ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যাইবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পাদকের কথা স্মরণ হইতেই সুদর্শন রায় পেন্সিলটা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তবু অজেন্দ্র পালের দেখা নাই।

অবশ্য 'উল্কা'র আরও রিপোর্টার আছে; কিন্তু অজেন্দ্র পাল তাহাদের মধ্যে সেরা। দুর্দমনীয় তারুণ্যের বলে সে সর্বত্র অপ্রতিহতগতি। সে ছাড়া আজিকার এই গোপনীয় খবরের তত্ত্বোদ্ঘাটন আর কেহ করিতে পারিবে না।

সম্পাদক ভাবিতে লাগিলেন, 'ছোঁড়া গেল কোথায়?...কোন তরুণীর খপ্পরে পড়েনি তো?...কিংবা...শেষে ন্যুডিস্ট্‌দের দলে ভিড়ে পড়ল নাকি!...'

দুশ্চিন্তায় সম্পাদক মহাশয় পেন্সিলটাকে একেবারে দাঁতন-কাঠি করিয়া ফেলিলেন।

ক্রমে ঘড়ির কাঁটা একপাক ঘুরিয়া গেল; প্রেসম্যান করুণভাবে দ্বারের কাছে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। সম্পাদক পেন্সিলটাকে শেষ করিয়া ফেলিলেন। তারপর রাত্রি সাড়ে আটটার সময় অজেন্দ্র পাল ফিরিয়া আসিল।

তাহার চেহারা স্মার্ট; জুল্‌পি ও ঈষৎ গোঁফ আছে। পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিল, 'এই নিন্—পাঠিয়ে দিন প্রেসে।'

banglabooks.in

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সম্পাদক বলিলেন, 'কি করছিলে এতক্ষণ?'

অজেন্দ্র পাল বলিল, 'ন্যুডিস্ট্ কলোনিতেই ছিলুম। সেখানে পুকুর পাড়ে উপুড় হয়ে বসে প্রোফেসার হরেকৃষ্ণ চট্টরাজ আর কুমারী সুনীতি মুখার্জি বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করছিলেন, তাই নোট করে নিচ্ছিলুম। তাঁদের দুখানা স্ন্যাপশট্ও তুলেছি—একখানা সামনে থেকে, একখানা পেছন থেকে।'

অজেন্দ্র ক্যামেরা ও ফিল্ম-স্পুল টেবিলের উপর রাখিল। সম্পাদক প্রীত হইয়া বলিলেন, 'বেশ। তোমাকে এখনি আর একটা কাজে বেরুতে হবে।'

অজেন্দ্র উপবেশন করিল, গোঁফের উপর অঙ্গুলি বুলাইয়া কহিল, 'Shoot!'

সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অনীতা সোমকে চেন?'

অজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিল, 'অবশ্য চিনি। বিখ্যাত তরুণী লেখিকা, 'আলিঙ্গন' নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করেছেন।'

সম্পাদক বলিলেন, 'হ্যাঁ তিনিই। আমি খবর পেয়েছি, তিনি আজ রাত্রে আত্মহত্যা করবেন। গোপনীয় খবর। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সাহিত্য পরিষদের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এ বিষয়ে পুরো রিপোর্ট চাই—তোমাকে যেতে হবে।'

অজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, 'এই তরুণ বয়সে তিনি কেন প্রাণ বিসর্জন দিতে চান?'

'আজ পর্যন্ত কেউ বঙ্গ সাহিত্যের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেননি—তাই তিনি পথ দেখাচ্ছেন।'

'ও—বেশ।' অজেন্দ্র উঠিল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'চললুম আমি। রাত্রি একটার মধ্যেই রিপোর্ট পাবেন।'

অজেন্দ্র প্রস্থান করিল। সম্পাদক ন্যুডিস্ট্ কলোনির রিপোর্ট প্রেসে পাঠাইয়া দিয়া, ফোটো ডেভেলপ করিতে দিলেন। তারপর নিকটবর্তী হোটেলে আহারাদি করিতে গেলেন। আজ আর বাড়ি গেলে চলিবে না।

পান ভোজন শেষ করিয়া ফিরিতে সাড়ে দশটা বাজিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ফোটো তৈয়ার হইয়া আসিয়াছে। সম্পাদক দীর্ঘকাল ধরিয়া ফোটো দুটি নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'নাঃ, এ ছবি ছাপা চলবে না। দেশে যে রকম সাধু-সন্ন্যাসীর উৎপাত, ছাপলেই ধরে জেলে পুরে দেবে।'

অতঃপর সম্পাদক অজেন্দ্র পালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বারোটা বাজিল, তারপর একটা; কিন্তু তথাপি অজেন্দ্রের দেখা নাই। সম্পাদক রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। 'আরে বাপু, একটা ছুঁড়ি ছাদ থেকে লাফিয়ে মরবে, তার জন্যে এত দেরি কিসের? এক মিনিটের তো কাজ!'

কিন্তু যদি না মরিয়া থাকে? হয়তো শুধুই ঠ্যাং ভাঙিয়াছে—সাহিত্য পরিষদ আর কত উঁচু। সম্পাদকের রাগ আরও চড়িয়া গেল—মনুমেণ্ট হইতে লাফাইলে কি দোষ ছিল? যদি আত্মহত্যাই করিতে চাস্, তবে একটু উঁচু জায়গা হইতে লাফা না কেন? যত সব—

যখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল তখন সম্পাদক উঠিয়া দুইবার সবেগে মেজের উপর পদদাপ করিলেন, তার পর ক্লান্তভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বলিলেন, 'কোন্ শালা আর—'

সকালে অজেন্দ্র পাল আসিয়া দেখিল, সম্পাদক টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন। অজেন্দ্র গলা খাঁকারি দিল।

আরক্তনেত্রে মাথা তুলিয়া সম্পাদক বলিলেন, 'কোন্ শালা...এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

অজেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, 'এই নিন্ রিপোর্ট।'

সম্পাদক বলিলেন, 'সে ছুঁড়ি মরেছে তাহলে? মানে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে?'

অজেন্দ্র বলিল, 'তিনি প্রাণ বিসর্জন দেননি।'

banglabooks.in

'অ্যাঁ—তবে তুমি কি কচু রিপোর্ট এনেছ?'

অজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিল, 'তিনি প্রাণ বিসর্জন দেননি বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস বিসর্জন দিয়েছেন।'

সম্পাদক চটিয়া বলিলেন, 'মানে—কি কচু বিসর্জন দিয়েছেন?'

অজেন্দ্র গোঁফের প্রান্তে একটু তা দিয়া সগর্বে বলিল, 'সতীত্ব।'

কা তব কান্তা

এই কাহিনী বর্তমান কালের কি ভবিষ্য কালের তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। এ যুগে মহাকাল যেরূপ প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়াছেন তাহাতে বর্তমানকাল চক্ষের নিমেষে অতীতে পরিণত হইতেছে, ভূত-ভবিষ্যৎ একাকার হইয়া যাইতেছে। এই ছুটাছুটি ও হুড়াহুড়ির হিড়িকে মাটির বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতেছি। অন্যান্য স্থাবর বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ নামক গৃহপালিত সংস্কারটি গৃহের মতই অনাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ এই বাক্যটাকে প্রসারিত করিয়া যস্মিন্ কালে যদাচারঃ এই বাক্যটি প্রবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

অথ—

দক্ষিণ আমেরিকার একটি রাজ্য। চির-বসন্তের দেশ। বসন্ত ঋতু কখনও একটু আতপ্ত হয়, কখনও বা একটু শীতল হয়। অন্য ঋতু নাই। সোনালী দিনগুলি রুপালী রাত্রে মিলাইয়া যায়; আবার সূর্যের পরশমণি রূপাকে সোনা করিয়া তোলে। জীবন-নদী দ্রুতবিলম্বিত ছন্দে সঞ্চারিত হয়; জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি এই রাজ্যে আসিয়া যেন ক্ষণকালের জন্য ক্লান্তি বিনোদন করে।

এই রাজ্যে ভারতীয় দূতাবাস আছে। দূতাবাসে যে-কয়জন ভারতীয় রাজপুরুষ আছেন তন্মধ্যে দুইজন বাঙালী; করঞ্জ রায় এবং উন্মেষ গুপ্ত। তাহারা মধ্যম শ্রেণীর রাজপুরুষ, দূতাবাসের সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় বাসা লইয়া একত্র বাস করে। দুজনেই যুবা পুরুষ এবং সস্ত্রীক।

ভারতীয় দৌত্য-বিভাগে যাহারা কাজ করেন, তাহাদের নানা সদ্গুণের সঙ্গে রূপও থাকা চাই, অর্থাৎ চেহারা ভাল হওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, তাহাদের স্ত্রীরাও সুদর্শনা হইবে এইরূপ একটি অলিখিত নিয়ম আছে। কারণ দূতাবাসের রাজপুরুষদের নিয়তই স্ত্রী লইয়া আন্তর্জাতিক পার্টি ও জলসায় যোগ দিতে হয়, সেখানে ভারতের পক্ষ হইতে খেঁদি-বুঁচির আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় নয়; তাহাতে ভারত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ধারণা খারাপ

banglabooks.in

হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে উন্মেষ গুপ্ত ও করঞ্জ রায় যেমন সুপুরুষ, তাহাদের স্ত্রী উন্মনা ও কিঙ্কিণীও তেমনি কান্তিমতী।

তাহাদের বাসা বাড়িটি স্প্যানিশ্ আমেরিকান ছাঁদের একতলা বাড়ি, তাহাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে উন্মেষ ও উন্মনা থাকে, অন্য ভাগে থাকে করঞ্জ ও কিঙ্কিণী। কেবল স্ত্রী-পুরুষের সংসার; তাহারা বড় আনন্দে আছে। যেন পাশাপাশি খোপে জোড়ের পায়রা।

একদিন অপরাহ্ণে উন্মনা ও কিঙ্কিণী বাড়ির সংলগ্ন বাগানে বেড়াইতেছিল। বাগানটি ফুলে ফুলে ভরা। কিঙ্কিণীর ভারি বাগানের শখ, সে নিজের হাতে বাগানটি গড়িয়া তুলিয়াছে; এ দেশের নানা জাতীয় মরসুমী গাছ তো আছেই, ভারতবর্ষ হইতে চাঁপা স্থলপদ্ম শিউলি প্রভৃতি গাছ আনাইয়া পুঁতিয়াছে। উন্মনার অত বাগানের শখ না থাকিলেও সে গাছপালা লতাপাতা ফুল ফল ঘেরা পরিবেশ ভালবাসে। দুজনেই প্রসন্নমনা, বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা, গড়ন-পেটনেও প্রায় একই রকম, বেশবাসও একই ধরনের। একই সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালাই করা দুটি প্ল্যাসটারের মূর্তি।

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দুজনে অলস কণ্ঠে লঘু বাক্যালাপ করিতেছে। আজ তাহাদের কোথাও যাইবার নাই; গতকল্য মার্কিন দূতাবাসে একটা বড় গোছের পার্টি হইয়া গিয়াছে, নাচ-গান শেরি-শ্যাম্পেন চলিয়াছে। আজ বিশ্রাম। উন্মেষ ও করঞ্জ দুপুরে-বেলা লাঞ্চের পর কাজে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। সাধারণত তাহাদের কাজকর্ম কিছু থাকে না, আজ বোধহয় হঠাৎ দূতোবাসে কোনও কাজ পড়িয়াছে।

আকাশে এরোপ্লেনের দূরাগত গুঞ্জন অনেকক্ষণ ধরিয়া শোনা যাইতেছিল, এখন দেখা গেল একটা ভাইকাউন্ট প্লেন পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছে নিভৃতে অবতরণ করিল, তাহার ভ্রমর-গুঞ্জন ক্ষান্ত হইল। ওই দিকে এরোড্রোম আছে, নিয়মিত প্লেনের যাতায়াত হয়; কিন্তু প্লেনগুলো শোরগোল করে না, চুপিচুপি আসে, চুপিচুপি যায়।

উন্মনা ও কিঙ্কিণী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর উন্মনা বলিল, 'কারা এল কে জানে!'

কিঙ্কিণী বলিল, 'যাদের ছুটোছুটি করে বেড়াতে ভাল লাগে তারাই এল, আর কে আসবে।'

উন্মনা হাসিয়া বলিল, 'তোর এক জায়গায় ভিত গেড়ে বসে থাকতে ভাল লাগে। সকলের তো তা নয়।'

কিঙ্কিণী বলিল, 'তা কি করব। এমন দেশ পেলে কি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে। শীত নেই, গরম নেই, পচা বর্ষা নেই; যেন মেঘদূতের অলকাপুরী।'

উন্মনা বলিল, 'আচ্ছা কিঙ্কিণী, তোর দেশের জন্যে মন কেমন করে?'

কিঙ্কিণী একবার স্নিগ্ধ চোখে বাগানের চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল, 'না ভাই, এই দেশটাই আমার নিজের দেশ বলে মনে হয়। বাংলা দেশে আমার কেই বা আছে, কেউ নেই। তবে যদি কেউ বাংলা দেশ থেকে জুঁই চামেলি জবা ফুলের চারা এনে দেয়, খুব ভাল লাগে।—তোর কি বাংলা দেশের জন্যে মন কেমন করে নাকি?'

উন্মনা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না; আমার মনে হয় পৃথিবীর সর্ব দেশই আমার দেশ। ইচ্ছে করে নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়াই।'

সহসা কিঙ্কিণী নাসা-পুট স্ফুরিত করিয়া বলিয়া উঠিল, 'উন্মনা, গন্ধ পাচ্ছিস? কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ? নিশ্চয় ফুল ফুটেছে। আয় খুঁজে দেখি।'

বাগানের এক কোণে কাঁঠালী চাঁপার ঝাড়। সেইদিকে যাইতে যাইতে কিঙ্কিণী হাসি-মুখে বলিল, 'একমাস পরে বকুল গাছে ফুল ধরবে। তখন যে কী মজা হবে! সারা বাগান বকুলের গন্ধে ভরে থাকবে—'

তাহারা কাঁঠালী চাঁপার ঝাড়ে লুকোনো ফুল খুঁজিতেছে, এমন সময় দূতাবাসের মোটর আসিয়া ফটকের সামনে থামিল। মোটর হইতে নামিল একা উন্মেষ। সাধারণত উন্মেষ

banglabooks.in

ও করঞ্জ একসঙ্গে দূতাবাসের গাড়িতে বাসায় ফেরে, আজ উন্মেষকে একা ফিরিতে দেখিয়া উন্মনা ও কিঙ্কিণী তাহার দিকে অগ্রসর হইল। উন্মনা স্বামীকে প্রশ্ন করিল, 'একা যে! দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায়?'

উন্মেষের টেনিস-খেলা শরীরে একটি বেত্রবৎ নমনীয়তা আছে। সে নাটকীয় ভঙ্গীতে দুই বাহু তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল, 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—'

কিঙ্কিণী দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, 'কি হয়েছে?'

উন্মেষ বাগানের ইতি-উতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িল, 'আহা, এমন সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে!'

কিঙ্কিণী তাহার টাই ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'শিগ্গির বল কি হয়েছে?'

উন্মেষ তখন বলিল, 'কি আর হবে, করঞ্জ'র বদলির হুকুম এসেছে।'

'অ্যাঁ' কিঙ্কিণীর মুখ পাংশু হইয়া গেল।

উন্মেষ বলিল, 'তাও কি কাছাকাছি! একেবারে পৃথিবীর ও-প্রান্তে।'

উন্মনা কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'কোথায়?'

'লেনিনগ্রাডে। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে।'

শুনিয়া কিঙ্কিণী টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, উন্মেষ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পৃষ্ঠের উপর বাহুবেষ্টন পূর্বক অকপট অনুকম্পার স্বরে বলিল, 'There there, don't be upset darling, আমরা সবাই পদ্মপাতার জল। কাল হয়তো আমার অস্ট্রেলিয়ায় বদলি হওয়ার হুকুম আসবে।'

কিঙ্কিণী উন্মেষের কোটের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাষ্পবিকৃত স্বরে বলিল, 'না না, আমি যাব না—আমি যাব না—'

উন্মেষ উন্মনাকে চোখের ইশারা করিল; দুজনে কিঙ্কিণীর দুই বাহু ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল, সোফায় শোয়াইয়া দিল। উন্মনা ত্বরিতে এক পেয়ালা গরম দুধে ব্রাণ্ডি মিশাইয়া কিঙ্কিণীকে খাওয়াইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া কিঙ্কিণী বলিল, 'ও কখন আসবে?'

উন্মেষ বলিল, 'এখনি আসবে। চার্জ্ বোঝানো, পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা, কালকের প্লেনে সীট বুক করা, সব কাজ সেরে ফিরবে।'

'কালকের প্লেনে!'

'হ্যাঁ। দিল্লি থেকে জরুরী তার এসেছে, কালকেই তোমাদের বেরুতে হবে।'

কিঙ্কিণী সোফায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল. মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর করঞ্জ ফিরিল। ক্লান্ত ও বিমর্ষ মুখে কিঙ্কিণীর সোফার পাশে বসিতেই কিঙ্কিণী মাথা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'আমি যাব না, যাব না. যাব না—'

করঞ্জ কিঙ্কিণীর হাত ধরিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে স্ত্রীকে এক রাজ্যের দূতাবাসে ফেলিয়া অন্য রাজ্যের দূতাবাসে বদলি হওয়া সম্পূর্ণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ, ইহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটময় হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু কিঙ্কিণী বুঝিল না. মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি শীত সহ্য করতে পারি না। লেনিনগ্রাডে ভীষণ শীত; সেখানে গেলে আমি শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাব।'

করঞ্জ আর এক দফা বুঝাইবার উদ্যোগ করিল, কিঙ্কিণী বলিল. 'একমাস পরে আমার বকুলগাছে ফুল ফুটবে। আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।' বলিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

করঞ্জ হতাশ ভাবে উন্মেষ ও উন্মনার পানে চাহিল। উন্মেষ তাহাকে ঘাড় নাড়িয়া

banglabooks.in

ইশারা করিল; দুইজনে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে দ্বার বন্ধ করিল। উন্মনা কিঙ্কিণীর শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

আধঘণ্টা পরে উন্মেষ দ্বার একটু ফাঁক করিয়া হাতছানি দিয়া উন্মনাকে ডাকিল। উন্মনা উঠিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, প্রশ্ন-কুতূহলী চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'কত দূর? সমস্যার সমাধান হল?'

উন্মেষ বলিল, 'দু'জনে পরামর্শ করে একটা রাস্তা বার করেছি। কিন্তু সব নির্ভর করছে তোমার উপর।'

'তাই নাকি? প্রস্তাবটা কী শুনি।'

করঞ্জ প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়া বলিল। শুনিয়া উন্মনা চকিত চপল চক্ষে তাহাদের দু'জনের পানে চাহিল। কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া ভাবিল, তারপর হাসি-ভরা মুখ তুলিয়া বলিল, 'মন্দ কি! একটা নতুন ধরনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে।'

করঞ্জ মহানন্দে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'উন্মনা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি যদি রাজী না হতে—'

উন্মনা অবাক হইয়া বলিল, 'রাজী হব না কেন! আমার তো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে।'

উন্মেষ বলিল, 'কিঙ্কিণীর কাছে প্রস্তাবটা তাহলে তুমিই কর, উন্মনা।'

'আচ্ছা।'—উন্মনা করঞ্জের পানে একটি সুস্মিত কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল। উন্মেষ করঞ্জের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল; দু'জনে প্রগাঢ় ভাবে শেক্‌-হ্যাণ্ড করিল।

উন্মনা ফিরিয়া গিয়া কিঙ্কিণীর কাছে বসিল, 'উঠে বোস্ কিঙ্কিণী, কথা আছে।'

কিঙ্কিণী নির্জীব ভাবে বাহুতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। উন্মনা তখন মৃদুকণ্ঠে তাহাকে প্রস্তাবটি শুনাইল। শুনিতে শুনিতে কিঙ্কিণীর চোখে মুখে সজীবতা ফিরিয়া আসিল, সে সোজা হইয়া বসিল। উন্মনা প্রস্তাব শেষ করিয়া বলিল, 'আমরা কে কার বউ এদেশে কেউ তা ভাল করে ঠাহর করতে পারে না। আমরা যেমন চীনে-জাপানীদের মুখের তফাৎ বুঝতে পারি না, ওদেরও সেই দশা। বেশী কথা কি, আমাদের নিজেদের অ্যামব্যাসেডর হরিআপ্পা সাহেব সেদিন আমাকে তুই বলে ভুল করলেন।—তাহলে কি বলিস? রাজী?'

কিঙ্কিণী আবেগভরে উন্মনার গলা জড়াইয়া গণ্ডে চুম্বন করিল, বলিল, 'রাজী।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারিজনে দূতাবাসের স্টেশন ওয়াগনে চড়িয়া এরোড্রোমে উপস্থিত হইল। পাসপোর্ট দেখানো ইত্যাদি কর্ম নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইল।

প্লেন ছাড়িতে বিলম্ব নাই। উন্মেষ করঞ্জের পৃষ্ঠে সাদর চপেটাঘাত করিয়া বলিল, 'ব' ভোয়াজ্।'

করঞ্জ বলিল, 'গুড্ বাই। বী গুড্।'

কিঙ্কিণী উন্মনা পরস্পর আলিঙ্গন করিল। কিঙ্কিণী উন্মনার কানে কানে বলিল, 'পৌঁছে চিঠি দিস।'

তারপর করঞ্জ ও উন্মনা বাহুতে বাহু জড়াইয়া প্লেনে গিয়া উঠিল। উন্মেষ ও কিঙ্কিণী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িতে লাগিল।

১৫ আশ্বিন ১৩৬৮

banglabooks.in

গল্প-পরিচয়

১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২ সন) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ষোল বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম ছোট গল্প—একটি অলৌকিক কাহিনী—রচনা করেন। গল্পটির নাম 'প্রেতপুরী'। পুষ্পপাত্র পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েও লেখক দীর্ঘকাল এটিকে তাঁর কোন গল্পগ্রন্থে স্থান দেননি। ১৯৬৪ সালে শারদীয় রোমাঞ্চ পত্রিকায় এই গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়। লেখকের শেষ অলৌকিক গল্প হল 'কামিনী' (১৯৬৫)। এই দুটি গল্পই ঘটনাচক্রে একই গ্রন্থে—'রঙীন নিমেষ'এ—অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শরদিন্দুবাবু তাঁর প্রথম অলৌকিক গল্পেই ভূতজ্ঞানী বরদার সংগে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দিকের ভূতের গল্পগুলি মূলতঃ বরদারই কাহিনী। অধিকাংশ গল্পের পশ্চাৎপট মুংগের শহর ও বিহারের গ্রামাঞ্চল। বরদার গল্প বলার এক নিজস্ব ভঙ্গী ছিল। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলে সে শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করে দিত. তারপর শ্রোতারা সামলাইয়া ওঠবার আগেই গল্প শুরু করত। তখন আর তাকে থামানোর উপায় ছিল না। এইভাবেই সে অল্পকালের মধ্যে পাঠকদের মনে আসন পেতে বসে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সংগেও একবার ভূতান্বেষী বরদার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে কাহিনী—ব্যোমকেশ ও বরদা—ইতিপূর্বে শরদিন্দু অম্নিবাস প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে।

এক কৌতূহলী পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে লেখক মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে বলেছিলেন: 'ভূতের গল্প সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। বরদা চরিত্র কাল্পনিক। নতুন কোন আইডিয়া না পেলে ভৌতিক গল্প আর লিখব না। আসলে বরদাই আমাকে ছেড়ে গেছে. আমি বরদাকে ছাড়িনি।'

কেবলমাত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছোট গল্পগুলির মধ্য থেকে নির্বাচন করে দু'ধরনের গল্প অম্নিবাসের বর্তমান খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম একত্রিশটি গল্প অলৌকিক ধরনের; লেখকের সমস্ত অলৌকিক গল্পগুলি এখানে দেওয়া হল। বত্রিশ থেকে আশী সংখ্যক বাকী গল্পগুলি হল মূলতঃ সরস কাহিনী—হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকরসই যার প্রধান উপজীব্য।

গল্পগুলি রচনাকাল অনুসারে সন্নিবিষ্ট; 'শ্রেষ্ঠ বিসর্জন' গল্পটির রচনার তারিখ কেবল জানা যায়নি। লেখকের সমুদয় গল্প সঙ্কলনের পর গল্পগ্রন্থগুলির পরিচয় নির্দেশ করা হবে।

গ্রন্থের সংস্করণ ভেদে কোন কোন গল্পে সামান্য পাঠ-ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া লেখক তাঁর ব্যক্তিগত কপিতে নিজে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছিলেন। এইভাবে সংশোধিত পাঠই বর্তমান সঙ্কলনে গ্রহণ করা হয়েছে।

শরদিন্দুবাবুর কতকগুলি হাস্য ও কৌতুকরসের গল্প নিয়ে ইতিপূর্বে দুটি সঙ্কলন গ্রন্থ বেরিয়েছিল—সরস গল্প ও হসন্তী। এই দুটি বইএর সব গল্প বর্তমান সঙ্কলনে পাওয়া যাবে।

অলৌকিক ও অতিলৌকিক গল্পেরও একটি সঙ্কলন 'কল্পকুহেলী' নামে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীসুভদ্রকুমার সেন লিখিত সেই গ্রন্থের ভূমিকার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

'...কনে বৌয়ের ঘোমটার আবরণ সরাতে চাওয়াটা যেমন অযৌক্তিক এবং অশোভন. তেমনি অলৌকিক অতিলৌকিক কাহিনীর সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা চাওয়াটা অযৌক্তিক ও অপরিণত মননের পরিচায়ক।

সার্থক অলৌকিক কাহিনীর একটি মূল ধর্ম হল the benefit of the doubt গল্পটি পড়ে শেষ করবার পর পাঠকের মনে কিছু সন্দেহ থেকে যাওয়া চাই; অর্থাৎ ব্যাপারটি হলেও হতে পারে এই ধরনের অনুভূতি পাঠকের মনে রেশ জাগিয়ে রাখে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।...

banglabooks.in

['কালো মোরগ'] গল্পটিকে যদি বিশ্লেষণ করি দেখব যে, ঘটনায় পরম্পরা এমনই যে গোকুলবাবুর মন সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছে। পাঠক ঘটনাগুলি এই ভাবে সাজালেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারবেন। জামায় টান লাগা—সেই বিশেষ গাছটি দেখা—অবদুল্লা কাহিনী স্মরণ—শীতের মায়াবী কুয়াশা ছড়ানো সন্ধ্যা—ভগ্নপ্রায় কবরখানা—এবং সর্বোপরি মোরগটির রংয়ের সঙ্গে আবদুল্লার দাড়িগুলির সাদৃশ্য। তারও চেয়ে বড় কথা গোকুলবাবুর মন সেই সময়ে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় উত্তেজিত ছিল। এই ভাবে অবচেতন মনের নজীর ও দোহাই দিয়ে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকমনে কিছু খুঁতখুঁতুনি থেকে যায়। সমগ্র ব্যাপারটিই কি অবচেতন মনের কারসাজি? কিংবা আরো কিছু বুদ্ধির অগম্য অভিজ্ঞতা জীবনের অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকে? এই সংশয়েই অলৌকিক কাহিনীর রসসৃষ্টি বা সার্থকতা। ঠিক এই রকম ঘটনা জীবনে হয়তো ঘটে না, একথা হয়তো সত্য; কিন্তু এধরনের ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। ঘটেনি বা ঘটে না বলেই ঘটবে না একথা জোর করে বলা চলে না।...

...বরদার উক্তিব্যক্তি সম্বন্ধে তার বন্ধুরা স্থিরনিশ্চয় নয়। ইংরেজী হলে বলতুম রীতিমত sceptic। বরদার বর্ণিত কাহিনীগুলি তারে বন্ধুরা শুনতে অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে পরাঙ্মুখ। অথচ যখন গল্প বলা শেষ হয় তখন তারা গল্পটিকে গাঁজাখুরি বলে সরাসরি উড়িয়ে দিতেও পারে না। ঘরে ফিরে যেতে তাদের গা ছমছম করে। ধরা যাক 'নীলকর' গল্পটি। গল্পের নায়িকা কবুতরী সেই ধরনের মেয়ে যাদের বলে পুংশ্চলী। কাহিনীর শুরু থেকে তার ব্যবহার তার চরিত্র ও স্বভাব অনুযায়ী। কিন্তু নীলকর সাহেবের সেই কোৎঘরে বরদার সামনে তার ব্যবহার কি hysteria-জনিত, নাকি অন্য কোনো কারণ-জাত? বরদা তার উত্তর জানে কি? অন্ততঃ তার বন্ধুরা সঠিক উত্তরটি জানে না।...

ভূতুড়ে বাড়ি প্রকল্পনা (theme) আশ্রয় করে কাহিনী...'প্রতিধ্বনি' এবং 'অশরীরী'...। পুরনো বাড়ি জীবন-নাট্যের অনেক বাহ্যিক ও আন্তরিক দৃশ্যের নীরব সাক্ষী। জন্ম-মৃত্যুর লাল নীল সুতোয় বোনা জীবন-নক্সার বহু বিচিত্রতা তার কক্ষে কক্ষে অলিন্দে অলিন্দে আজও হয়তো আঁকা হয়ে আছে, কে জানে। যে সব নরনারী একদিন তাদের দুঃখসুখের, হাসিকান্নার ছন্দেবিছন্দে এই ঘরগুলিকে ভরিয়ে রেখেছিল, আজ তারা কোথায়? পাত্র পাত্রীরা হয়তো অনন্তে বিলীন হয়েছে, কিন্তু তাদের তীব্র অনুভূতি, জ্বলন্ত ইমোশন—সে সবও কি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে? কোথাও কি কোনো 'অনাহত বীণাতারে' তারা বাজছে না? কোথাও কি বাতাসের দমকে দমকে ঈথারের থরে থরে, সময়ের স্তরে স্তরে সেগুলি সঞ্চরণ করে না? যেমন করে মহাফেজখানায় পুরোনো কাগজপত্র রক্ষিত হয়, তেমন কোথাও থাকে না কি? বছরের পর বছর কেটে যায়, সেসব কাগজপত্র কেউ নেড়ে-চেড়ে দেখেও না; কিন্তু একদিন কেউ তো সেগুলো দেখতেও পারে?

'প্রতিধ্বনি' গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, এই গল্পে অলৌকিকের কোনো রূপে প্রকাশিত নেই। তবু সে আছে। তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বাতাসের মতো আলোর গতিপথের মতো দৃষ্টিগোচর না হলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

'অশরীরী' গল্পে বক্তার কাঁধে হঠাৎ শিমুল ফুল পড়ার কল্পনাটি বড় সুন্দর। ব্যাপারটি কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়?

এই ধরনের কাকতালীয় (?) দেখি 'মরণ-ভোমরা' গল্পে। বক্তা গল্প বলা শেষ করলেন। বন্ধ ঘর। চুরোটের ধোঁয়ায় ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। একজন উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শীতল বাতাস নিয়ে এল আরাম আর একটা কালো কুচকুচে কালো ভ্রমর।

'শূন্য শুধু শূন্য নয়' এবং 'সবুজ চশমা' fantasy জাতীয় রচনা।

'মায়া কুরঙ্গী' এবং 'সতী' মূলতঃ অতি-অলৌকিক কাহিনী। 'মায়া কুরঙ্গী'র শেষ অনুচ্ছেদে হঠাৎ বক্তার নারীমুখ চিত্রণ কুশলতায় লেখকের তুলির টানটি (touch) বড়

banglabooks.in

সুন্দর।

'চিরঞ্জীব' গল্পের মুখ্য চরিত্র চিরঞ্জীব-কে গল্পিকাবীর মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পের সমস্ত আবহাওয়াটি বদলে গেল কর্ণেল ভর্মার একটি প্রশ্নেঃ 'চিরঞ্জীব! কোথায় সে?'...

'কামিনী' গল্পে প্রচলিত প্রকল্পনাকে নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর একটি আশ্চর্য গল্প 'বহুরূপী'। এই গল্পের প্রকল্পনা doppelgaenger কল্পনাকে আশ্রয় করেনি। পক্ষান্তরে জীবিত ও অ-জীবিতের এই লুকোচুরির কল্পনাটি খুব চমৎকার। এবং বরদাকে impersonate করার কল্পনাটি তুলনাহীন।

'ছোট কর্তা'য় জীবিত ও অজীবিতের মধ্যে এক মধুর সম্পর্কের স্নিগ্ধ চিত্র আঁকা হয়েছে। পারিবারিক ও বাস্তু প্রেতাত্মা—ইংরেজী হলে বলতুম domestic ghost-প্রকল্পনাটি অভিনব।

'নিরুত্তর' ও 'ফকির বাবা' occult জাতীয় গল্প।

'পিছু পিছু চলে' গল্পটির নাম সহজেই হতে পারত 'এড়ানো যায় না।' সত্যবান গজাধর সিন্ধে কাকে দেখছে? অনন্ত মারাঠে কে? অনন্তের প্রেত কে? নাকি তার নিজের বিবেক অনন্তের রূপ ধরে তাকে তাড়া করে ফিরছে?

শ্রীষুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অলৌকিক-অতিলৌকিক কাহিনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্থানীয় পরিবেশের যথাযথ ও সুন্দর বিনিয়োগ। 'মধু-মালতী' গল্পে পুণা শহর ও মারাঠা জীবন যথাযথ ও সুন্দর ভাবে বিম্বিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতের এই শান্ত স্নিগ্ধ শহরটির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা 'মধু-মালতী' বা 'চিরঞ্জীব' পড়তে বসে নিশ্চয়ই মন-কেমনের হাওয়া অনুভব করবেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের বিহার প্রদেশ, বিশেষতঃ মুঙ্গের শহর বরদার কাহিনীগুলিকে উদ্ভাসিত করেছে। পরিবেশ-সৃষ্টির এই সহজ কুশলতায় অলৌকিকের মধ্যেও মানবিক রস সঞ্চারিত হয়ে, গল্পগুলিকে আরো বেশী চিত্তহারী করেছে।'

'শ্রেষ্ঠ গল্প'এর ভূমিকায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লেখকের ভূতের গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

'ভূতের ভয় মানুষের সংস্কারগ্রস্ত মনকে আদিম যুগ থেকে অধিকার করে আছে। ভয় যেমন প্রবল, আকর্ষণও তেমনি দুর্বার। কিন্তু ভৌতিক রহস্য চিরদিনই অন্ধকারে আবৃত। এ যুগের মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এই অন্ধকারকে আলোকিত করবার জন্যে অলৌকিক লোকেও তার বুদ্ধির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ভৌতিক রহস্যলোকে কবি-কল্পনা চিরকালই প্রসারিত হয়েছে। আমাদের ত্রৈলোক্য মুখুজ্জের ভূতুড়ে গল্প থেকে পরশুরামের 'ভূশণ্ডীর মাঠে'র রসিকতা পর্যন্ত বিচিত্র রসের অনেক ভৌতিক কাহিনী লিখিত হয়েছে। শরদিন্দুবাবুর ভূতের গল্পে ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ের উপাদানই বেশী। ফলে সেগুলোতে ভয়ানক-রসের চেয়ে অদ্ভুত-রসেরই পরিবেশন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বলেছিল, 'মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর কি আছে? তা সে যে-ই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।" শরদিন্দুবাবু জন্মজন্মান্তরের জীবনধারাকে সাহিত্যে গ্রথিত করে রেখেছেন। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যেকার তমসাবৃত জীবনরহস্য স্বভাবতই তাঁকে আকর্ষণ করেছে। এখানেই তাঁর ভূতের গল্পের উৎপত্তি।'

'চুয়াচন্দন' গল্পগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি গল্পের বিষয়ে লিখেছিলেন (শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩)ঃ

'...'কর্তার কীর্তি'র জমিদার হৃষীকেশবাবুর চিত্রটি বড়ই উপভোগ্য। প্রাচীনকালের একজন জমিদারের ইনি type। রাগিলে ইনি আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কাচের গেলাস ভাঙিলে ইঁহার রাগ কমিয়া আসে। হৃষীকেশবাবু রাগে অন্ধ হইয়া টেবিল চেয়ার ভাঙিয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ কেহ হাতের কাছে একটি কাচের গেলাস আগাইয়া

banglabooks.in

দিল! তিনি তাহা ভাঙিয়া শান্ত হইলেন। এ চিত্র যেমন সজীব তেমনি সত্য।

'মরণ-ভোমরা' ও 'রক্ত-খদ্যোত' ভৌতিক গল্প। ভূতের গল্পের দুটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ—তাহা ভূত হওয়া চাই ও গল্প হওয়া চাই। শরদিন্দুবাবু এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার প্রধান রস—রহস্যের রস। সংস্কার এখানে বুদ্ধির বড় শরীক। শরদিন্দুবাবুর মধ্যে এই রহস্য ঘনীভূত করিয়া তুলিবার শক্তি যথেষ্টই আছে।...এবার হইতে ভোমরা দেখিলেই শরদিন্দুবাবুর কথা মনে পড়িবে, কি জানি তিন দিনের মধ্যে কাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে।'

শরদিন্দুবাবু তাঁর জীবদ্দশায় বরদার গল্পগুলি নিয়ে একটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ করার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর নোটখাতায় এই সংগ্রহের একটি ভূমিকার খসড়া দেখা যায়। সেটির আংশিক উদ্ধৃতি বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

''রক্ত-খদ্যোত' গল্পের শেষ কয়েক পংক্তির ভাবাংশ স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি গল্প হইতে গৃহীত হইয়াছে।

'অশরীরী' লিখিবার সময় দ্য-মোপাসাঁর 'La Horla' নামক গল্পটি মনের পশ্চাৎপটে বিদ্যমান ছিল। উভয় গল্পই ডায়েরীর আকারে লেখা—কিন্তু বিষয়বস্তুতে কোনো মিল নাই। 'অশরীরী'কে দ্য-মোপাসাঁর ভাবানুপ্রেরণায় লিখিত বলা যাইতে পারে।

অন্য গল্পগুলি মৌলিক।'

২৮ জুলাই ১৯৭৫ শোভন বসু